# রংমশাল

সপ্তম বর্ষ
১ম সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৪৯


কবিতা

## নব-বৈশাখে

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

বৈশাখে আজ ঐ শাখে দ্যাখ্
ফুট্‌লো রঙের ফুলঝুরি ;
দোল্ দিয়ে যায় আল্‌তো বাতাস,
হাতছানি দেয় লাল্‌চে আকাশ,
স্বপন লোকের পাচ্ছি আভাস—
আজ্‌কে সকল দিক্ জুড়ি' ।
ফুট্‌লো রঙের ফুলঝুরি ।

বৈশাখে আজ বই রেখে আয়
বৈঠা হাতে ধর্ চেপে,
চল্ চলে যাই মাঝ-দরিয়ায়,
প্রীতির রঙে প্রাণ ভরি আয়,
খুশীর নেশায় গান ধরি' আয়,
সবাই মিলে যাই ক্ষেপে ;
বৈঠা হাতে ধর্ চেপে ।

নদীর ওপর অধীর হোলো
আবীর গোলা রং মেখে,—
ঝর্ণা ঝরে সোনার আলোর,
রংমশালের রঙীন্ ঝাল্‌র
দুলিয়ে দিয়ে আজ হোলো ভোর,—
জানিয়ে দিল সঙ্গে কে ?
সাজ্‌ল ধরা রং মেখে।

শঙ্খ বাজে পাখীর গলায়,—
শঙ্খচিলের কণ্ঠেতে,
আস্‌লো আজি মনোহরণ,
রঙীন্ গড়ন্, নবীন ধরণ্,
আমরা তারে করব বরণ,
উঠ্‌ছে রে তাই মন্ মেতে ;
গান ওঠে আজ কণ্ঠেতে।

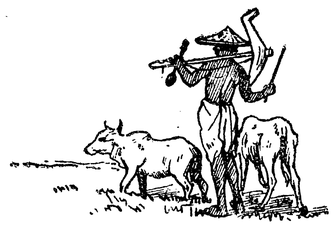

# রংমশালের আদর্শ

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ

এই সংখ্যার সঙ্গে তোমাদের প্রিয় রংমশাল সপ্তম বর্ষে পড়লো। বৎসরের এই শুভ দিনটিতে প্রার্থনা করি তোমাদের মনের ছোট্ট আঙিনাটিতে আলো ও আনন্দ সহস্রধারে ঝরে পড়ুক।

রংমশাল এখনও তোমাদের মতই ছোট্ট আছে। কিন্তু তোমাদের এতগুলি ভাইবোন যার, তার আর ভয় কি ? তাই এই যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যেও রংমশাল আবার সগর্ব্বে তোমাদের স্নেহ ও প্রীতির নিশানা নিয়ে তোমাদেরই দ্বারে হাজির হোলো।

এই কয় বৎসরে রংমশালের একমাত্র আদর্শ ছিল বাঙ্গলার ছেলেমেয়েদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটু আলো ও আনন্দ পরিবেষণ করা। আজও আমাদের সেই আদর্শই আছে। বাঙ্গলা দেশের শিশু-পত্রিকা, কাজেই ক্ষমতা অল্প, অনেক কিছুই তোমাদের দিতে চাই, কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না। কিন্তু তবুও আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির সীমার মধ্যেই আনতে চেয়েছি যা' তোমাদের ভালো লাগবে—গল্পে, রূপকথায়, কবিতায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে। এটুকু হয়তো স্পর্দ্ধা করে বলতে পারি যে বাংলাদেশের যে কোন শিশু মাসিক পত্রিকার তুলনায় রংমশালের মারফৎ যে সব লেখা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছি, তা' শুধু সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র্য ও বিষয়বস্তুতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছে। কথাটা সত্য বলেই বলতে পেরেছি, কেবল আত্ম-প্রশংসা হলে বলতাম না। এবং এইজন্যই বলতে পেরেছি যে এটুকু আমাদের সব সময়েই মনে আছে যে, যা' তোমাদের দিয়েছি তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশী আমাদের দিতে হবে, কিন্তু তার জন্যে চাই তোমাদের সাহচর্য্য। অর্থাৎ, তোমরা যদি, ধরো, প্রত্যেকেই দুজন করে' গ্রাহক বা গ্রাহিকা সংগ্রহ করে' তোমাদের দল ভারী করতে পারো, তাহলেই দেখবে রংমশাল আরো কত ভালো, কতো সুন্দর হয়ে উঠবে। তা ছাড়া আমাদের ত অঙ্গীকার আছেই যে যুদ্ধের শেষে যখন কাগজপত্র মালমশলার দাম আগেকার মত হবে, রংমশাল আবার নূতন কলেবরে তোমাদের কাছে আসবে। তবে এখনও একথা মনে রেখো যে রংমশাল আকারে ও রচনায় বাংলার ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। আমাদের দাবী, রংমশাল "ছোট-দের বড়ো কাগজ", আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এ তো হ'ল ঘরের কথা। বৎসরের প্রথম দিনটিতে প্রথমেই মনে পড়ে তোমাদের, আমাদের কথা। স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ যেখানে সেখানেই মন ছুটে যায় আগে। কিন্তু ঘরের কথা ছাড়াও কয়েকটি কথা বলতে চাই, যা আশা করি তোমরা মন দিয়ে শুনবে।

কথাটা আমাদের আদর্শ নিয়ে। আগেই বলেছি যে আমাদের আদর্শ বাঙ্গলার ছেলেমেয়েদের জীবনে একটু আলো ও আনন্দের পরিবেষণ করা। আমরা চাই শুধু রংমশাল নয়, বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক শিশুপত্রিকারই এই আদর্শ হোক্। কিন্তু সম্প্রতি কোনো কোনোখানে বক্তৃতায় যা শুনেছি বা লেখায় যা পড়েছি তাতে মনে হয় এই আদর্শের বিরুদ্ধে আর একটা আদর্শ মাথা তুলে উঠছে যাতে সমস্ত শিশুসাহিত্যের গতি অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এই বিপরীত আদর্শ আর কিছুই নয়ঃ এই আদর্শটি হচ্ছে, শিশু পত্রিকার ভিতর দিয়ে পাঠশালার পণ্ডিতি করা। অর্থাৎ তোমাদের ক্লাশরুমের আবহাওয়াটাকে স্কুলের বাইরে, যেখানে সবুজের খেলা স্বপ্ন বোনে, সেখানে তুলে আনা। শুনেছিলাম চীনদেশে নাকি Alice in Wonderland এবং অন্যান্য কয়েকটি রূপকথার বই পড়া নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল তার কারণ এগুলোতে নাকি ছেলেমেয়েরা মিথ্যা শিখে। ধরো, আজ পাঠশালার গুরুমশাইরা যদি সভা করে' ঠিক করেন যে "ঠাকুরমার ঝুলি" পড়া উচিত নয় কারণ বেঙ্গমা বেঙ্গমীরা কথা বলতে পারে না, কিংবা বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি হয় না, কিম্বা যদি বলেন যে রামায়ণ একটা অত্যন্ত অপাঠ্য বই কারণ "দশানন" কোন জীব হতে পারে না, অর্থাৎ কোনো জীবের দশটা মাথা হতে পারে না,—তাহলে বাঙ্গলাদেশের শিশু সাহিত্যের কি দুর্দ্দশা হয় বলো ত? এঁরা চাইবেন শিশুসাহিত্যের প্রতি পাতায় থাকবে সত্যকথায় ঠাসা, থাকবে কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের ছড়াছড়ি, পাশে অভিধান রেখে বানান করে পড়তে হবে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, এবং প্রতি রচনার শেষে লিখতে হবে তার নীতিবাক্য, এই ধরো, "পাঠে অবহেলা করিও না" কিংবা "স্থান বিশেষে মাসীর কাণ কামড়াইয়া লইতে পারো" ইত্যাদি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলেই এঁরা তাদের দিতে বলবেন শিক্ষা, আমাদের চিন্তাশীল নরহরির মত। নরহরিকে চেন ত? নরহরির মা নরহরির ছোট ভাগ্নেটীকে এনে বললেন, বাবা নরহরি, তোমার ভাগ্নেকে একটু আদর কর! তখন চিন্তাশীল নরহরি বললে—

"আদর করব? আচ্ছা এসো আদর করি। (শিশুকে কোলে লইয়া) কী করে আদর আরম্ভ করি? রোসো একটু ভাবি।"

নরহরি চিন্তামগ্ন হলো। মা বললেন, "আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?" নরহরি যেন অবাক হয়ে বললে, "ভাবতে হবে না মা? বলো কী? ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলেদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জানো? ছেলেবেলাকার এক একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধরে আমাদের সমস্ত যৌবনকালকে আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এটা যখন ভেবে দেখা যায়—তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়! এইটে একবার ভেবে দেখো দেখি মা!"



মা বললেন, যাক বাবা, সে কথা আরেকটু পরে ভাববো, এখন তোমার ভাগ্নেটীর সঙ্গে দুটো কথা কও দেখি। তখন চিন্তাশীল নরহরি বললে, ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ ও শিক্ষা দুই হয়।—তারপর—

"আচ্ছা হরিদাস (শিশুর নাম), তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি?"

হরিদাস বললে, "আমি চমা কাব!"

মা আপত্তি করলেন, তখন নরহরি বললে, "ওকে এই বেলা থেকে এইরকম করে অল্পে অল্পে মুখস্থ করিয়ে দেবো।"

মা তখন ছেলেকে নরহরির কবল এবং ব্যাকরণশিক্ষা থেকে উদ্ধার করে বললেন, "না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।"

এই হলো চিন্তাশীল নরহরির গল্প। বুঝতেই পারছ, এটি রবীন্দ্রনাথের "হাস্য-কৌতুক" থেকে নেওয়া। মজা এই যে সম্প্রতি শিশু-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে কয়েকটি চিন্তাশীল আধুনিক নরহরির আমদানী হয়েছে। এঁরা আবিষ্কার করেছেন যে করুণা, স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ, এ দিয়ে আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়া যায় না। এটা নাকি "চিরন্তনী (?) সত্য।" এঁরা ক্ষুণ্ণ হন যে শিশুপত্রিকাগুলিতে "একটা সত্য কথা, একটা স্পষ্ট কথা, একটা তিরস্কার বাঙ্গলার ছেলেমেয়েরা শুনতে পায় না।" ইঙ্গিত করা হোলো যে তিরস্কার করলে পাঠক সংখ্যা কমে যাবে এই কারণেই সম্পাদকেরা সত্য কথা বা স্পষ্ট কথা বলতে অথবা তিরস্কার করতে চান না।

আমি রংমশালের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ আংশিকভাবে মাথা পেতে নিচ্ছি। সত্য বা স্পষ্ট কথা মানেই যে তিরস্কার এ কথা না মানলেও আমরা স্বীকার কচ্ছি যে তিরস্কারের কাজটা আমরা পাঠশালার ভিতরে বা বাইরে যে সমস্ত গুরুমশাইরা আছেন তাঁদের জন্যই রেখে দিয়েছি। শিশুসাহিত্যের কাজ আলাদা। ছেলেমেয়েদের যে মনের রাজ্য আছে, যেখানে রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যাকে সোণার কাঠি দিয়ে জাগিয়ে রাক্ষসের হাত থেকে প্রত্যহ উদ্ধার করে, যেখানে আবোল-তাবোল কবিতার ছন্দে তাদের মন ও কল্পনা নাচতে থাকে, যেখানে শিক্ষার বিষয়কেও স্নেহের ভাষণে সঞ্জীবিত করে দেওয়া যায়, সেই কল্পনার রাজ্যেই রংমশালের স্থান। এখানে নরহরিদের স্থান নেই, স্থান নেই তাঁদেরও যাঁরা কেবল মাত্র তিরস্কারের বেশাতি করে বাহাদুরি নিতে চান। বাহাদুরি তাঁরা নিন আপত্তি নেই কিন্তু শিশুসাহিত্যের পরিকল্পনাকে তাঁরা যেন দেশের সামনে এনে শিশু জীবনকে মধুর করে তোলবার যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের সেই দায়িত্ব ক্ষুন্ন না করেন!

শিশু জীবনকে মধুর করে তোলবার এই যে মধুর দায়িত্ব এটাকে মেনে নিলে, পাঠক সংখ্যা কমে যাওয়ার যে ইঙ্গিত সেটাও স্বীকার করে নেওয়া যায়। এই ধরো স্কুলে তোমরা যাও পড়াশুনা করতে। সেখানে যদি হেডমাষ্টার মশাই পড়াশুনার বন্দোবস্ত না করে খালি

খেলা ধুলা থিয়েটার মিটিং'এর বন্দোবস্ত করেন, তা হলে তাঁর স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমে যেতে পারে ; কারণ যে স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না বা শিক্ষা পাবে না, অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের যে স্কুলে নিশ্চয় পাঠাতে চাইবেন না। ঠিক তেমনি, স্কুলের বাইরে এসে যদি তোমরা দাঁড়াও সেখানেও যদি দেখ সারি সারি গুরুমশাইরা চশমা চোখে দাঁড়িয়ে মিনিটে মিনিটে বলছেন, খবর্দ্দার !—আব্দার করলে, বলছেন, ন্যাকামী !—তাহলে তোমরা কি সে পথ দিয়ে যাবে ? যাঁরা বলেন, বাঙ্গলাদেশে ছেলেমেয়েদের উপর খবরদারী করবার লোকের অভাব হয়েছে, তাঁরা হয় বাঙ্গলার ছেলেমেয়েরা কী অভাব এবং তাড়নার মধ্যে মানুষ হচ্ছে জানেন না, কিংবা ঐ কথা বলে নিজেদেই অচরিতার্থ ইস্কুলমাষ্টারী মনোভাবের অথবা আত্মম্ভরিতার সার্থকতা খোঁজেন।

আসল কথা, শিক্ষার আসল রূপ এঁরা জানেন না। অভিধান বা Year Book মুখস্থ করলে শিক্ষা হয় না। জ্ঞানের সামঞ্জস্য না হলে শিক্ষা হয় না। সেই সামঞ্জস্য আনতে গেলে একটা ধারাবাহিকতা চাই। বায়স্কোপের ক্যামেরায় তোলা প্রত্যেক ছবিটিই আলাদা, পৃথক। কিন্তু সেই ছবিগুলি যখন পর পর পর্দ্দার উপর দিয়ে যেতে থাকে তখন ফুটে ওঠে একটা সম্পূর্ণ কাহিনী। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করেই শিক্ষার পাঠ্যবস্তু ঠিক হয়, নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত ; এইরূপ শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাড়িতে হওয়া সম্ভব নয় সেই কারণেই স্কুল দরকার। কিন্তু পাঠ্যবস্তুর বাইরেও যে আনন্দময় বিচিত্র জগৎ আছে সেই জগতের মধ্যেই পরিচয় করিয়ে দেবার ভার নেন সাহিত্যিক। সেখানে যেমন আছে কল্পনার স্থান, তেমনি আছে শিশুকে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে স্নেহের ভাষণে সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা। সে সত্য শুধু ভাব-বিলাস নয়, তার মধ্যে আছে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে ফুটিয়ে তোলা,তার মধ্যে আছে ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত, যে ইঙ্গিত গুরুমশাইর যষ্টি আস্ফালনের মধ্যে কোনও দিনই পাওয়া যায় নি বা যাবে না,—তার মধ্যে জেগে উঠবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিষ্ঠা ও শক্তির সাধনা। শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ, তাই তাকে শেখাতে হবে ছবির মধ্য দিয়ে। সেখানে তিরস্কার নেই, বেত্র আস্ফালন নেই, হয়ত বা স্পষ্টতাও নেই। সেখানে কল্পনা ও সত্য হাত ধরাধরি করে চলে। বাস্তবিক, এই দুইএর প্রভেদরেখা খুব সূক্ষ্ম। যিনি সত্যকারের শিক্ষক ও যিনি সত্যকারের সাহিত্যিক, তাঁদের কোনো প্রভেদ নাই, কারণ তাঁরা একাধারে শিক্ষক ও সাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যের বিপদ ঐ খানেই, কারণ সাহিত্যিক হিসাবে আসতে গিয়ে অনেক লেখকই আসেন শিক্ষকতা করতে, সাহিত্যিকের বেশ হয় একটা ছদ্মবেশ মাত্র। তাঁদের লেখা হয় বিফল। গল্প বলতে গিয়ে বলেন নীতিকথা, সত্য শেখাতে গিয়ে শেখান কতকগুলো নীরস সামঞ্জস্যবিহীন তথ্য। ভ্রমণ কাহিনী বলতে গিয়ে এঁরা শেখান জিয়োগ্রাফি, অভিধানের ভিতর দিয়ে এঁরা



দিতে চান জ্ঞান। কিছু ফিজিক্সের পাতা, কিছু কেমিষ্ট্রীর পাতা, কিছু য়্যাষ্ট্রনমির পাতা, কিছু ডাক্তারী, কিছু তিরস্কার—এইগুলি মিশিয়ে যে অপরূপ পদার্থটি তৈরী হোলো, একেই তাঁরা বলতে চান, আদর্শ শিশুপত্রিকা ! বিধাতাপুরুষ এই আদর্শ পত্রিকার হাত থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচান !

তবে একটা কথা মেনে নিতে আপত্তি নেই। স্নেহ এবং প্রশ্রয় এক জিনিষ নয়। আমি জানি না শিশু পত্রিকার সম্পাদকরা কতটা শিশুদের স্নেহ দেন, কতটা প্রশ্রয় দেন।

দাদামণি, দিদিভাইদের লেখা পড়ে যেটুকু জেনেছি তাতে পত্রিকা গুলি যে গ্রাহক গ্রাহিকাদের কোনোরূপ প্রশ্রয় দিচ্ছেন এ কথা মনে হয় নি। অন্যায়কে সমর্থন করাকেই প্রশ্রয় বলছি। তবে কোথায় যেন কোন প্রাথমিক বইতে পড়েছিলাম Boys love noise ; বড় খাঁটি কথা। আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের Hitler's Youth এ'পরিণত করতে চাইনা ; করুক না তারা একটু গোলমাল ; একটু আব্দার ; একটু দুষ্টুমী। দিক না তারা একটু প্রাণের পরিচয়। এই তো চাই। যে তাদের এই আব্দার, গোলমাল, দুষ্টুমী সহ্য করতে পারে না—শুধু তাই নয়, যে নিজেও তাদের সঙ্গে, তাদের দাদার মত, দিদির মত, ভাইর মত বোনের মত, মিশতে পারে না, সে যেন তাদের কাছে না আসে। দাদামণি, দিদিভাইদের ঐ খানেই প্রয়োজন, পত্রিকার সঙ্গে তার পাঠক পাঠিকাদের একটি মধুর ডিমোক্রেটিক সংযোগ স্থাপনের জন্য। এইটি বাংলার শিশু মাসিক পত্রিকার আগে ছিল না, এটিকে পত্রিকা পরিচালনার একটি নুতন আদর্শ বলে' ধরা যেতে পারে। 'রংমশাল'ই বাংলার শিশু পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথম এই ধারা আনে ; আনন্দের বিষয় যে অন্যান্য পত্রিকাগুলিও এই ধারা অনুসরণ করেছেন—এমন কি স্নেহভাজন বন্ধু আনন্দমেলার 'মৌমাছি' পর্য্যন্ত—যদিও লেখার আদর্শের তারতম্য আছে।

আজ এতকথা বললাম, তার কারণ আগেই বলেছি, রংমশালের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাক। তোমাদের জীবনে আসুক আলো ও আনন্দ। রংমশাল তোমাদের ছুটির কাগজ হোক।

হ্যাঁ, তোমরা অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছো রংমশাল চলবে কি না ? রংমশাল আফিসে যদি বোমা না পড়ে, রংমশাল নিশ্চয়ই চলবে।

তোমরা আমার নব-বর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবে।

# নিরুর স্বপ্নভঙ্গ!

শ্রীশঙ্কর দাশগুপ্ত

পড়ার তাড়া খেয়ে নিরু পালায় জলার ধারে—
বাবার কাছে মারের কথা ভাবছে বসে পাড়ে!
এমন সময়, ওরে বাবা, এলুম কোথায় আমি?
বুড়োর দাড়ির সাথে বাঁধা—কেমন করে' নামি?

ওই উপরে তাকিয়ে দ্যাখে, ব্যাঙ্ ধরেছে গান!
বাচ্চা পুঁটি ডিসে করে' ওই নিয়ে যায় পান!
কেউ বা চেঁচায়, সরবৎ কই? কেউ বা হাঁকে, চা?
বিয়ে-বাড়ীর বাজ্না বাজে—তেরে নেরে না!

ক'নে কোথায়?···জেগে দ্যাখে বাবা টানেন্ কান!—
"এর মধ্যেই ঢুল্ছিস্ যে? অঙ্কের বই আন্!"···

কনের কথায় কানের ব্যথায় এক হয়ে যায় যেই—
অঙ্কে আর আতঙ্কে তার স্বপ্ন ভাঙে সেই!!·····

---

## গল্প

# টপ্‌সীর শাস্তি

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাইজের দিন এগিয়ে আস্‌ছে। মাত্র আর দুদিন বাকী। মেয়েদের খুব ইচ্ছা না থাকলেও অনেক বারের মত এবারেও বড়লাট পত্নীই প্রাইজ দেবেন। তবে সভাপতির আসনে কোনও রাজ-কর্ম্মচারীকে এবার বলা হয় নি—বলা হয়েছে দেশের একজন কৃতী সুসন্তানকে। মেয়েরা গান বাজনা অভিনয় ইত্যাদির মোহড়া দিচ্ছে বারেবারে। কাকে কি পোষাক পর্‌তে হবে, কেমন করে কেশ বেশ বিন্যাস কর্‌তে হবে সব বলে দেওয়া হয়েছে। প্রাইজ যারা নেবে তারাও ঠিক করে নিয়েছে কি ধরণের পোষাক পর্‌বে—বাসন্তী রংএর জামা আর লাল জামদানী পাড় ঢাকাই শাড়ী। অন্য মেয়েরা সাদা ব্লাউজ, সাদা শাড়ী পর্‌বে ঠিক করেছে। কলেজ ক্লাস থেকে আরম্ভ করে বাচ্চা মেয়েরা পর্য্যন্ত শাড়ী পর্‌বে। বেশীদিনের কথা তো নয়, জালিয়ানওয়ালা বাগের বিশ্রী ব্যাপারটা হয়েছে, রবি ঠাকুর তাঁর "সার" উপাধি ছেড়েছেন, এবং অল্পদিন আগেই সদ্য কারামুক্তা আনি বেশান্ত কংগ্রেসের সভানেত্রীত্ব করেছেন। মেয়েরা তাই মেমসাহেবের কাছে দেশীয় পোষাক পরেই আসবে। এমন কি কোহেন মেয়ে দুটি, শিরিণ ভাট্টা, মারী ভিস্থজা শাড়ী পর্‌তে রাজী হয়েছে। শোভাদি' মণিকাদি, নতিদি সকলেরই শাড়ীর ব্যবস্থা কর্‌বেন। মুস্কিল হয়েছে লোটাদিকে নিয়ে। তিনি কিছুতেই শাড়ী পর্‌বেন না।

সন্ধ্যেবেলায় বোর্ডিংএর মেয়েদের মধ্যে ঐ আলোচনাই চল্‌ছিল। ষ্টেজ হবার প্ল্যাটফর্ম্মটার উপর পা ঝুলিয়ে বসে মণিকাদি বল্লেন, "লোটার পোষাকটা দেখেছো, হয়ে এসেছে যে! মা গো! কি বিশ্রী টেষ্ট।"

"কেন রে—বিশ্রী কেন? ও তো ফ্যাসনেবল পোষাকই পর্‌বে।"

"হ্যাঁ! ফ্যাসনেবল! ওর চেহারাটায় কি মানাবে না মানাবে, ওর জ্ঞান কি তা আছে?"

"বলই না মণিকাদি! কি রকম দেখ্‌লে?"

"ডীপ ব্লু রং এর মোটা সিল্কের সিঁটকে স্কার্ট—একেবারে স্কিম্পি—হাঁটুর ওপরে উঠ্‌বে সেটা, তাতে তিন রো আধ ইঞ্চি চওড়া লেসের ফ্রিল আছে—বডিটার উপরটা প্লেন ইয়োক নীচে প্লিট দিয়ে একটু 'ফুলনেস' আনা ভি গলায় দু রো ঐ লেস্ কনুই হাতার মাঝে তিন রো ঐ লেস্—মা গো! সে যে কি বিশ্রী কল্পনাও কর্‌তে পার্‌বি না--তারপর ওর ঐ রংএ ঐ নীল যা মানাবে, ছি।"

"আরে! সুষমা ওকে যে অমন সুন্দর শাড়ী খানা অফার কর্‌ল—তা ও নিতে রাজী হ'ল না এই ফ্রকের জন্যে?"

"আমাদের যে মাথা হেঁট হয়ে যাবে সে কথা ভাবছিস্? ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সামনে মাথা তুলে কোনও মেয়ে দাঁড়াতে পারবে?"

"ওকে সে কথা বল্লি না কেন? বুঝিয়ে বল্লে হয়তো—"

"রেখে দে! বুঝিয়ে বলতে যেন কসুর করা হয়েছে। ও বল্লে কি, আমরা তো আর ইউনিয়ানের মেম্বার না। তা ছাড়া ও সব স্বদেশী করা ওর পোষাবে না।"

নতিদি বলে উঠ্‌ল, "আমার একটা ডীপ ব্লু যর্বুটা বেনারসী আছে, সেটা অফার করে দেখা যাক।"

লোটাদির সেটা পছন্দ হ'ল কিন্তু সেটা সে প্রাইজে পরবে না বল্‌লে। সে বল্লে, "শুনছি, কুচবিহারের মহারাণী নাকি একদিন শীগ্‌গিরই আমাদের দেখতে আসবেন, সেই দিন দিও ভাই নতি তোমার শাড়িটা, আমি খুব থ্যাঙ্কফুলী অ্যাক্‌সেপ্ট করব। প্রাইজে হার একসেলেন্সীর সামনে আমি শাড়ী পরে বার হব না।"

"কেন, রেচেল, এটি, মারী, শিরিন এরা পরতে পারে আর তুমি পার না। জু ফিরিঙ্গী তারা—"

হ্যাঁ, ভাই, তারা শাড়ী পরলেও তারা যা তাই থাকবে, বাঙালী বা ইণ্ডিয়ান হবে না, তাই।"

"আর তুমি বুঝি ফ্রক পরে বিবি বনে যাবে—খাস বিলেতি বউ হবে—না?"

"কমলাদি ভয়ানক রেগে গিয়েছিল, সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "আর রংটা বদলাবে কি করে শুনি? ও মার্কোলাইজ্‌ড ওয়াক্স এর কর্ম্ম নয়—চামড়া তুলে বদলে আস্‌তে হবে জেনো।"

লোটাদি চটে বল্লে, "কি তোমরা আমায় ইন্‌সাল্ট করতে এসেছে? বেশ করব আমি ফ্রক পরব। সে আমার খুসী। আমার লিবার্টীতে তোমরা হস্তক্ষেপ করতে চাও কি অধিকারে শুনি? আমি কখ্‌খনো পরশু দিন শাড়ী পরব না। যাও! তোমরা যাও আমার কাছ থেকে, জ্বালাতন কোরো না! কি স্পর্দ্ধা তোমাদের।"

ওরা চলে এসে হাত নিংড়োতে আর কামড়াতে লাগল। কি করা যায়। উপায় তো কিছু দেখা যায় না। শোভাদি বল্ল, "সব মাটী হ'ল কমলা আর নতির ট্যাকট্‌লেস্‌নেসের দরুণ! এখন কি হবে? কি করা যায়?"

মণিকাদি বল্লে, "একমাত্র টপ্‌সী বাঁদরী যদি কোনও উপায় করতে পারে। ডাক তো ওদের দলটাকে।"

টপ্‌সী, পিকো, স্নুলু, বিলু সব এসে হাজির! কি করা যায়! গল্পের বইতে স্যাণ্ডব্যাগ দিয়ে ঘায়েল করার কথা শোনা যায়—তা বস্তাটা জুট্‌বে কোত্থেকে!

টপসী বল্লে, "আহা! ডিটেক্‌টিভ্ ষ্টোরিতে পড়নি যেন যে মোজার ভিতর বালী পুরে বা ভারী কিছু পুরে ঐ কাজটী করা যায়। সেটা কি সুবিধার হবে মণিকাদি? স্কুল থেকে হয়তো এক্সপেল্‌ড হয়ে যেতে পারি। মনে কর, হঠাৎ বেশী লেগে গেল।"

দুপুর বেলা সরবতে ঘুমের ওষুধ মিশ্রিত করা তাও বুদ্ধিমতীর কাজ নয়! রাত্তির বেলা ভেবে ঠিক করা যাবে। কাল ওরা বল্‌বে কিছু ওরা করতে পারবে কিনা!



পরদিন সকালে টপ্‌সী এসে বল্‌ল, সে ব্যবস্থা করতে পারবে মনে হচ্ছে, তবে বড় মেয়েদের যাদের উপর ভার আছে যে বোর্ডিংএর মেয়েদের সকলকে স্কুলবাড়ীতে প্রাইজের যায়গায় নিয়ে যাওয়া, খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা, তাঁদের কে টাইম দিতে হবে যে ২½টার মধ্যে সকলকে হাজির থাকতে হবে স্কুল বাড়ীতে আর টিফিনটা 'বড় হল' বা স্কুলের টিফিনরুমে সারতে হবে, বোর্ডিংএ ২½টার পর আর যাওয়া হবে না। টিচারদের আর মাসীমাদের রাজী করানোর ভার তাঁরা নিলে, টপ্‌সী বাকীটুকু করবে।

বিকালবেলা জানা গেল যে তা হবে কারণ দুপুরের টিফিন এর ব্যবস্থা বিশেষ কিছু নাই প্রাইজের পর ভাল করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। লোটাদি সকালের কাছ থেকে দূরে দূরে বেড়াচ্ছিলেন। সুষমাদি বলে একজন টীচার অল্পদিন হ'ল এসেছিলেন। ছেলেবেলায় ইনিও বার্ম্মায় অনেকদিন ছিলেন বলে লোটাদির সঙ্গে এঁর বেশ একটু ভাব দেখা যেতো; ইনিও সেটা লক্ষ্য করে বল্‌লেন, "লোটা তুমি এরকম 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে' চেহারা করে বেড়াচ্ছ কেন? কি হয়েছে তোমার?"

টপ্‌সী তাড়াতাড়ী এগিয়ে এসে বল্ল, "দেখুন না সুষমাদি, মণিকাদিদের আব্দারটা একবার! লোটাদি বেচারী একটা সুন্দর ফ্রক করিয়ে এনেছেন প্রাইজে পরবেন বলে তা তাঁকে পরতে দেওয়া হবে না—শাড়ী পরতে হবে! লোটাদি কি আমাদের মত ভেতো বাঙালী!"

লোটাদি কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "আমার ভয় করছে ড্রেসিং রুমে কাপড় পরতে যেতে। ওরা যদি কালী ঢেলে বা কিছু করে আমার অমন দামী ফ্রকটা নষ্ট করে দেয়।"

টপ্‌সী বল্লে, "আচ্ছা সুষমাদি! আপনাদের কারো কাছে উনি ফ্রকটা রাখতে পারেন না কি? সেখানেই পরবেন। আমাদের ঘরে নাই বা পরলেন—সত্যিই তো! মনে করুন, আমরা কেউ যদি ফ্রকটা নষ্ট-ই করে দি!"

"হাঁ, তা তোমার অসাধ্য কিছু নেই। দলটার সব্বাই তো পাকা ওস্তাদ! সুষমা দি! ওর ঐ সোনাহেন মুখটাই যে বেশী ভয়ের। আপনার ঘরেই আমি ফ্রকটা রাখি?"

সুষমাদি হেসে বল্লেন, "আচ্ছা! আচ্ছা! আমার ঘরেই তুমি কাপড় পোরো। তবে আমি কিন্তু আগেই এ বাড়ী চলে আস্‌ব, কাল প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার্সে আমাদের ১½টার সময় যেতে হবে। কাজেই তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। আসার সময় আমার ঘরটা বন্ধ করে আসতে কিন্তু ভুলো না।"

"ওহ্ থ্যাঙ্ক ইউ সুষমাদি! আপনি আমায় বাঁচালেন।" টপ্‌সী বল্লে, "ভাগ্যি আমি ছিলাম—তাই তো সাজ্জেস্যানটা দিলাম।"

"তুমি লক্ষ্মী ছাড়ীকেই তো আমার সব চেয়ে ভয়।"

"ফ্রকে কালীও ঢাল্‌ব না, কাঁচি দিয়েও কাট্‌ব না, আমি তেলাপোকা, ইঁদুর বা মোটর গাড়ী কিচ্ছুই নই। আমি মানুষই।" টপ্‌সী ঘাড় ঝাঁকিয়ে চলে এল। মণিকাদি তার একখানা হাত খপ্ করে ধরে বল্লে "তবে রে বাঁদরী! মণিকাদিদের আব্দারটা একবার দেখুন না?"

"আরে, হাত ছাড়ো না। ও না বল্লে কি চল্‌তো না কি! আমার উপর যা ভার দিয়েছো যদি না হয় তো বোলো।"

সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। ও বলে, "সরো তোমরা! লোটাদি ভয় পেয়ে যাবে। আমি বল্‌ছি শুনে রাখো—কেল্লা ফতে! আর কিছু আজ জানতে চেয়ো না।"

পরদিন সকাল থেকেই বোর্ডিংএ একটা কর্ম্মব্যস্ততা দেখা গেল। ১২টার মধ্যেই ড্রেসিং রুমে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। ১২½টার সময় দেখা গেল, লোটা বিছানার উপর শুয়ে আছে আর ওর মাথার কাছে বসে লেবু চুলের মধ্যে বিলি কেটে কেটে শুড়শুড়ি দিচ্ছে। লেবু মেয়েটী বেশী দিন এখানে আসে নি। ওর ফুলো ফুলো গাল আর হাসি হাসি মুখ দেখলেই মাঘমাসের কমলালেবুর কথা মনে পড়ে যেতো বলে ওর মামাবাবু ওকে লেবু বলে ডাকতেন। আসলে ওর নাম কমলা। কি আশ্চর্য্য! স্কুলের ছোট মেয়ের দল, মাঝারি মেয়ের দলও ওকে "লেবু" বলেই ডেকে ফেল্‌ল। লেবুর উপর ভার পড়েছে লোটাদির বিউটী স্লিপের আয়োজন করতে। সেই প্রবাদের ফর্টি উইঙ্কস্ ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। ঠিক পনেরো মিনিট পরে তাকে ডেকে দিতে হবে। না ডাকলে ক্ষতি কিছু বেশী নাই। সুষমাদি প্রিন্সিপ্যালের বাড়ী যাবার আগে ডেকে চাবী দিয়ে যাবেন নিশ্চয়।

পিকো একবার এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেল। "এই লেবু! তুই সাজবি না? বসে বসে চুলে বিলি দিলেই হয়ে যাবে?"

লেবুর গাল দুটোতে টোল খেয়ে গেল, ও বল্লে "পিকোদি, ভাই, আমি তো আর প্রাইজ পাব না, পার্টও নিই নি। আমার একটু দেরী হলেও ক্ষতি নেই। তা ছাড়া আমার চুল বাঁধা টাঁধা সারা এই দেখো। শাড়ীটা বদলিয়ে, সামান্য প্রসাধন না কি বল তোমরা? ঐটা করে নিলেই হবে।"

"লোটাদির তো সামান্য প্রসাধন নয়—লোটাদি, ও লোটাদি"—লোটাদি রেগে বল্ল "জ্বালাসনে পিকো। আমিও প্রাইজ পাব না—তার উপর ফ্রক পরার অপরাধে তোরা আমায় কনসার্টের দলেও নিস্ নি—যা, যা। একটু ঘুমোতে দে! আমার ভাবনা তোরা না করলেই বেশী ভাল।"

লোটা আরামে ঘুমায়! বারন্দায় সুষমাদির জুতার শব্দ পাওয়া যায়। লেবু আদর করে ডাকে, "লোটা দি, ও লোটাদি! জাগো রে।" লোটা উঠে বসতে না বসতে সুষমাদি এসে লেবুর হাতেই চাবীটা দিয়ে চলে যান। বলে যান, "এখন আর গড়িমসি না করে কাপড় চোপড় পর্‌তে যাও।"

লোটা তার ঘরের দিকে ছোটে। লেবু তার হাতে চাবী গুঁজে দেয়—"চাবী ফেলে যাচ্ছ কেন?" লেবু নীচে নেমে যায়, কাপড় বদলাবার জন্যে। লোটা সুষমাদির ঘরে ঢুকবার মিনিট দুতিন পরে ড্রেসিং রুম বন্ধ হবার ঘণ্টা পড়ে আর টপসীর গলা শোনা যায়, "এই লেবু! আজ বুঝি রস টস্ কর্‌বার যোগাড় করেচিস্। তোর শাড়ী নিয়ে আমি গ্রীনরুমে পাঠিয়েছি। ওখানে গিয়ে পরিস্।"

বোর্ডিং বাড়ী একেবারে চুপচাপ! লোটা সারামুখে ওয়াক্স মেখে গুণ্ গুণ্ করে গান কর্‌ছে, আর চুল আঁচড়াচ্ছে ড্রেসিং টেব্‌লের কাছে বসে। মুখে জয়ের তৃপ্তি ও আনন্দ! সুষমাদির বিছানার উপর ফ্রকটা ছড়িয়ে রেখেছে। দরজা ভিতর থেকে খিল দিয়ে দিয়েছে। দুষ্টুরা কেউ আসবে যে তার যো নাই।

সাড়া শব্দ কিছু নাই। বেড়াল গুলো শুদ্ধ স্কুল বাড়ীতে গিয়েছে যেন। খালি ঘরের পাশের



নীম গাছটার পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেন বাতাসের শির্ শির্ খস্ খস্ একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। লোটার কি! চারটের মধ্যে যায়গায় গিয়ে বসলেই হ'ল। দুটা বেজে গেছে। এখন ওয়্যাক্সটা ধুয়ে ফেলে ভ্যানিসিং ক্রীম মাখবে, তারপর রুজ, লিপষ্টিক পাউডার ইত্যাদি দিয়ে ওর মেক-আপ যা হবে তখন কমলার ওকে ঠাট্টা করা বার হবে! কমলার রংটাই বা কি? লোটার চেয়ে ময়লা তো-ই রীতিমত কালো বল্লেও চলে! তবু যদি গৌরী বা শোভার মত রং হ'ত। আজ লোটাকে ওদেরি মত ফর্সা দেখাবে—যদি না আর একটু বেশী দেখায়। তাই তো ঐ শেডের নীলটা নিয়েছে। কেন, বাবা! এ দেশেরই বৈষ্ণব কবিতাতে তো রাধার নীল শাড়ীর কত ব্যাখানাই না আছে।

লোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখে ক্রীম লাগায় রং লাগায়, ভুরুতে, চোখের পাতায় পেন্সিল ঘষে, পাউডার দেয়। স্কুল বাড়ীর ঘণ্টাগুলো আজ যেন বড় তাড়াতাড়ি বাজ্‌ছে। চুল বাঁধতে আর কর্সেট ঠিক কর্‌তেই আড়াইটা বাজল। হাত দুটোও তো ঘষে মেজে ঠিক কর্‌তে হবে। মোজায় কোনো জায়গায় ক্রিজ নেই তো। তারপর মুখ!

সব ঠিক ঠাক কর্‌তে ৩টা বেজে গেল। এখন লাষ্ট টাচেস্! কৈ, ওকে তো কিছুই বিশ্রী দেখাচ্ছে না। রংটা ওকে মানাবে না, না কি? এখন? লোটার না কি টেষ্ট নাই? ওহ, লোটা ডার্লিং, ইউ লুক সুইট। এখন সেই ব্লু ব্যাগটা।

ও কি দরজা খুল্‌ছে না কেন? ঝিরা কেউ বন্ধ করে গিয়েছে নাকি?—নাঃ, চাবীটা তো লোটার কাছে-ই। তবে হ'ল কি?

আধ ঘণ্টারও বেশী ধরে ধস্তাধস্তি করেও চাবী খুল্‌ল না। স্কুলবাড়ীর প্যাণ্ডেল থেকে ঘণ্টার শব্দ, গানের তান, ঘন ঘন করতালি ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। লোটা দরজায় ধাক্কা দেয়, জানালা দিয়ে ডাকে, "ও কৈলাসী, তারার মা, মানদা" কারো সাড়া পাওয়া যায় না। এমন কি বাথরুমের জানালা দিয়ে মালীর ঘরের যে টুকু দেখা যায় সেখান থেকে মালী বৌ এর পর্য্যন্ত সাড়া মিল্‌ল না। বামুন দিদিদেরও পর্য্যন্ত সাড়া শব্দ নাই। লোটা পাগলের মত ছুটোছুটি কর্‌তে লাগল। উপায় নেই; উপায় নেই! উঃ কি দুষ্টু এই মেয়েগুলো। লেবুকে সে দেখে নেবে। তার এই কাজ! নাঃ তার তো কোনও দোষ নেই, সে তো চাবী লোটার কাছেই দিয়েছে। তবে তালা বন্ধ কর্‌ল কে? দরজাটা হঠাৎ বেমোড়ে বন্ধ হয়ে যায় নি তো। দেখি হাঁটু দিয়ে ঠেলে, জোর করে টেনে।

ওমা! চুল টুল সব বিশ্রী হয়ে গেছে। দর দর ধারে ঘাম বেয়ে পড়ে ক্রীম, পাউডার রুজ মিলে একাকার হয়ে গেছে যে যায়গায় যায়গায়। দরজা খুল্‌লেও এখন দশ মিনিট অন্ততঃ লাগবে সব ঠিক করতে। ততক্ষণ প্রাইজ হয়ে যাবে। ও যে টেবলের কাছে দাঁড়িয়ে প্রাইজ এগোবার ভার সুষমাদি কাছ থেকে নিয়েছিল। উঃ কি হবে। নাঃ দরজা খুললো না!

লোটা বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। হায় ভগবান্, কি নিষ্ঠুর তুমি। স্বদেশী যারা করে তাদের হৃদয়ে দয়ামায়া বলে কোনও পদার্থ নাই গো! লোটা কি করেছে তোমাদের? একজনকে মতামতের স্বাধীনতা দিতে পার না তোমরা আবার স্বাধীনতার জন্য লড়াই কর। অল্ রট। উঃ এত দুঃখের মধ্যে রাগটাও কিছু কম হচ্ছে না। ঘন ঘন হাততালি পড়্‌ছে যে! নিশ্চয় প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, ঐ তো ছোট মেয়েরা এদিকে

এসে চেঁচাচ্ছে ; ঐ যে সুষমাদির গলা পাওয়া যাচ্ছে। আরে, আনন্দে ডগমগ হয়ে এত চেঁচাতে হয় না গো, মেয়েরা। লোকে নিন্দে কর্বে যে !

"সুষমা দি ! সুষমা দি !" লোটার নিজের কাণেই নিজের কান্নায় ভেজা গলার স্বর কেমন শোনায়।

সুষমা দি উপরের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কে, লোটা বস্ ? তুমি নীচে আসনি যে ?"

"আমায় কে জানি বন্ধ করে গিয়েছে। কিছুতেই বেরোতে পারি না।"

"—কি আশ্চর্য্য ! কি অন্যায়—সত্যিই তো ?"

সুষমা দি উপরে উঠে এসে অবাক হয়ে বলেন, "কই, দরজায় তো তালা লাগানো নাই। একটা কড়ায় যেমন ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিলাম তেমনিই তো আছে। হুড়কোটাও তো খোলা-ই। তুমি কি বল্‌ছ লোটা ?"

"আমি সত্যিই বল্‌ছি। এই দেখুন টানাটানি কর্‌তে গিয়ে আমার নতুন মোজায় গ্যাডার নেমেছে। এখন তা হলে কেউ খুলে দিয়ে গিয়েছে।" খোঁজ কর্‌তে কর্‌তে জানা গেল প্রাইজ নেবার একটু পরেই টপ্‌সীকে বোর্ডিংএর দিকে যেতে দেখেছিল দশরথ বেহারা। টপ্‌সীর ডাক পড়্‌ল।

"টপ্‌সী, তুমি লোটাকে ঘরে বন্ধ করেছিলে ?"

"হ্যাঁ"

"চাবী পেলে কোত্থেকে ?"

"অন্য একটা তালা এই তালার আংটায় আর ঐ কড়াটায় লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ওঁর বুদ্ধি থাকলে উনি হাত গলিয়ে ওর চাবী দিয়েই খুল্‌তে পার্‌তেন।"

"বটে ? তোমায় বন্ধ কর্‌তে কে হুকুম দিয়েছিল ?"

টপসী নিরুত্তর।

"চুপ করে রৈলে যে !"

"যদি ঠিক্ কথা বলি, আপনি 'ফাজিল' বলে বকবেন যে।"

প্রিন্সিপ্যালের ঠোঁটের কোণের হাসিটা জোর করে চেপেই তিনি বল্লেন, "ওঃ, তবু শুনি কথাটা ! কারণ না শুনেও তো তোমায় 'ফাজিল' বল্‌ছি।"

"তবে শুনুন ! আমার দেশ-প্রীতি আমাকে বাধ্য করেছিলো ওঁকে বন্ধ রাখতে।"

"ভাল কথা ! দেশপ্রেমিকরা অনেক দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা বরণ করেন তা তো জান ? তোমায়ও আজ তাই করতে হবে। আজকের সুখাদ্যগুলো থেকে তুমি বঞ্চিত হলে। আর ষ্টাডিরুমে বসে বসে তোমায় রবিবাবুর 'হে মোর চিত্ত'টা পাঁচবার লিখতে হবে। বেশ, এখন যাও সোজা ষ্টাডিরুমে, খাতা পেন্সিল বা কলম নিয়ে।

ষ্টাডিরুমে একটা আলো জ্বালিয়ে টপসী বসে বসে লিখছিল। উপরে বোর্ডিংএর মেয়েদের এবং স্কুল বাড়ীতে লাষ্ট ট্রিপের মেয়েদের কলরব শোনা যাচ্ছিল। টপসীর মুখখানা ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। খুব আস্তে আস্তে জুতোর হিলের শব্দ যাতে না হয় এরকম সাবধানে এসে ঢুকল এটি কোহেন। দরজার কাছ থেকে "সহ্ ক্যাচ টপসী" বলেই একটা পুঁটলি ছুড়ে মেরেই এটি অন্তর্দ্ধান



কর্‌ল। রুমালে বাঁধা গোটা দশ বারো চকোলেট এর সঙ্গে এক টুকরো কাগজে লেখা "ফ্রম ই, এম, আর অ্যাণ্ড এস উইথ মাচ লাভ।"

আবার খস খস শব্দ, লেবু এসে দুটো কমলালেবু গড়িয়ে দিয়ে গেল। তারপর খাতা খুঁজতে এলো পিকো—তার নাকি কি খাতা হারিয়ে গিয়েছে। খাতা খুঁজতে খুঁজতে বল্‌ল "এই যে। এই ডেস্কে রয়েছে। দ্যাখ, টপসী, তুই যাবার সময় এটা নিয়ে যাস্ আমার দরকার লাগবে—এই রাত্রেই।"

পিকো চলে গেলে টপসী সেই ডেস্ক তুলে দেখল, তাতে রয়েছে একটা আইসক্রীম, পাকা আনারসের মত সুন্দর ঢলঢলে রং। স্থলু এসে দিয়ে গেল খানিকটা কেক, বিলু ডালমোট। দেখতে দেখতে ওর দেহ ভরে উঠ্‌ল খাদ্য দ্রব্যে। ও আইস ক্রীমটা খেয়ে নিয়েছিল। মণিকাদিও আর একটা আইসক্রীম দিয়ে গেছেন।

হঠাৎ টিচার নলিনীদির গলা পাওয়া গেল। "এই আজ যে তোদের সকলেরই ষ্টাডি রুমে বড় দরকার পড়েছে দেখছি, কেন ? পালা এখান থেকে। লেখা হ'ল টপ্‌সী ?"

"হ্যাঁ এই দিচ্ছি, নলিনী দি।"

"আচ্ছা ঃ আজ তো তোমার শাস্তি। কাল ছুটী আছে, আমার আর স্থলেখার ঘরে কাল যেয়ো—চকোলেট, কেক আর ডালমোট কিছু পাবে। বেচারা ! আইসক্রীমটা এত ভালোবাসো, সেটা আর পাবে না। রাখা তো যায় না।"

টপ্‌সী অত্যন্ত বেচারী মুখ করে বল্ল, "নলিনীদি, আমি একটু পরে এখান থেকে যাবো—কেমন ?"

"ওঃ কাঁদবে বুঝি আইসক্রীমের শোকে ? আচ্ছা ! আমি তবে আসি।" পাঁচ মিনিট পরে দেখা গেল ডর্ম্মিটরিতে বসে লেবু, পিকো, স্থলু, বিলু ইত্যাদি দল নিয়ে টপ্‌সীদের ভোজ চল্‌ছে। আজ আর ভাত খাওয়া নাই।

---

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিটে লঙ্কার পোড়ো যকবাড়ির খালি কাছারীতে কালনেমী মামা, হেঁসেল ঘরটায় মহোদর মহোদরী আর পূজো-দালানটায় বেহ্ম রাক্ষস বেহ্ম রাক্ষসী মহোল্লাস মহোল্লাসী থাকেন !

ডাকে নাই তখন কাগ পক্ষী—
দুয়ারে ঘুমায় ডালকুত্তা দ্বাররক্ষী।

রাত অল্পমাত্র বাকি ; তখন মহোল্লাসী দাওয়ায় বসে বেলের পানা ছাঁকছেন, ব্রহ্মরাক্ষস আসন-পিঁড়ি হয়ে ব্রহ্মদেবের ফুট ধরেছেন গোটা গোটা কাটা কাটা একটানা সুরে—

সি—সী—বো—তো—ল—বি—ক্—কি—রী। পে—তো—ল—কা—সা,—বা—স—ন—কো—স—ন। ও—জো—ন—দ—রে—না—না—ধা—তুময়—ব—স্—তু,—পু—রা

ত—ন—কা—গ—জা—দী—ব—দ—ল—দী—তে—প্র—স্—তু—ত—আ—ছি—আ—নে—ন—ক—রে—ন—পুরাতন বর্জ্জন—নূতন অর্জ্জন……

এমন সময় সূর্পনখা দিদি ছাতের পর থেকে ডেকে বল্লেন—"ও মহোল্লাসী, হাঁড়ি, ফেলো হাঁড়ি ফেলো। গেরাম ঠাকুরের রামপাখীর মালসা ভোগ চাপাও নতুন মালসায়।"

চট্ বেদপাঠ বন্ধ করে মহোল্লাস বল্লেন—"কি হলোগো পিসি কেউ মরেছে নাকি?"

—"মেজদাদার দুই ছেলে যুদ্ধে পড়েছে!"

—"বল কি গো পিসোয়ঠাকরুন—"

—"আরে বলছি আর কি! একেবারে জোড়া মড়া হনুমান টেনে ফেলেছে পাঁচিল ডিঙিয়ে লঙ্কার বাজারে!"

—"কি সর্ব্বনাশ!" বলে কালনেমি মামা উঠোনে নেমে হাতে মুখে জল দেন আর বলেন—"প্রথম যুদ্ধেতে ঠেকা, ভাল না লক্ষণ।"

মহোল্লাসী বলছেন মহোল্লাসকে—"ওগো এ দেখি যে-সে রাম নয়।"

মহোল্লাস আকাশে চক্ষু তুলে গম্ভীরভাবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলছেন—"আমার বোধ হচ্ছে ইনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, নয় স্বয়ং নারায়ণ।" বলে ঢক্ ঢক্ করে বেলের পানাটুকু খেয়ে গুড়ুক ফুঁকতে বসলেন। কালনেমি মামা ছাতের ঘরে সূর্পনখার দিকে মুখ তুলে শুধোলেন—"আজ যুদ্ধে কে যাচ্ছে দিদি?"

—"কে জানে! যে যাবে সেই যাবে।" এই কথা হতে হতে রাত কাবার। সঙ্গে সঙ্গে মহোদরীর প্রবেশ—থান কাপড়, দেখা যায় না সিঁথেয় সিঁদুর আছে কি নেই, বাক্ পর্য্যন্ত ঘুমটো। মহোল্লাসী বলছেন—"ও মাসাস, তোমার একি বেশ! মহোদর মেসোর কিছু হয়েছে নাকি!"

—"বালাই, তার কি হবে, সে দিব্যি আছে।"

—"তবে যে হাত খালি করেছ দেখি?"

—"সে-ই বলে কয়ে এই সাজ ধরিয়েছে। বল্লে, মহোদর, এখন থেকে এই সাজ, উপবাস করতে অভ্যাস কর, নাহলে পরে হঠাৎ কষ্ট পাবে। রাজার খরচে কিছু থান কাপড় এই বেলা যোগাড় হয়ে থাক। কুম্ভ নিকুম্ভের যে দশা হয়েছে ঐ দশা আমারও হবে তো একদিন। রাবণ ছাড়বে না—ঠেলে পাঠাবেই আজ নয় কাল নর-বানরের যুদ্ধে।"

—"কি—মা—শ্—চ—র—য—ম্—ত—প্—পরং" বলে মহোল্লাস ধুঁয়া ছাড়তে মহোদর উপস্থিত কাছা গলায়।

—"মেসো মশায় তুমি যে কাছা পরেছো?"

—"অহোদর মরেছে!"

—"সে আবার কে, তার নামও তো শুনিনি।"

—"ভিন্ দেশে ছিল, সেখান থেকে কাল সত্বর এসেছে, না হলে আমারই যুদ্ধে যাবার পালা পড়েছিল। আজ এখন একমাসের মত নিশ্চিন্ত।" বলে মহোদর হেঁসেল ঘরে ঢুকতে যান, কালনেমি মামা ডেকে বল্লেন—"আজ কার পালা প'লো সন্ধ্যাকালে জানতে পারবেন।"

# দেশকথা

## মুইস

শ্রীমানসী আচার্য্য

অনেক অনেক দূরে উত্তর-আমেরিকার কোন এক গ্রামে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে বাস করত। তার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে দেশবিদেশ থেকে কত বিখ্যাত যোদ্ধা আর শিকারী আসত তাকে বিয়ে করতে। কিন্তু মেয়েটি ছিল ভারী অহঙ্কারী! বিয়ে করা তো দূরের কথা, সে তাদের দিকে ফিরেও চাইত না। মেয়েটির নাম মামৌ।

এই সব যোদ্ধাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ডেজেন। সে ঠিক করল, যে করেই হোক সে মামৌকে বিয়ে করবে। কেন না, তার মত ধনী আর সুপুরুষ তাদের মধ্যে আর একটিও ছিল না। তাই সে ভাবলে, মামৌ তাকে নিশ্চয়ই পছন্দ করবে।

কিন্তু মামৌ তাকে উত্তর করল, "আমি তোমায় বিয়ে করব না।" এবং অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে সে চলে গেল।

এখন হয়েছে কি, এই ব্যাপারে ডেজেন নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে, এর প্রতিশোধ সে নেবেই! সেই দিন থেকে সে না খেয়ে না ঘুমিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল। অবশেষে একটা চমৎকার বুদ্ধি তার মাথায় এল।

ছোট বেলায় ডেজেন কিছু যাদুবিদ্যা শিখেছিল। সে দেখল এই সুযোগ। তখুনি সে বন থেকে অনেক জন্তু জানোয়ার মেরে নিয়ে এল। তারপর সেগুলির হাড় আর কিছু তুষারের সাহায্যে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি মানুষের মূর্ত্তি তৈরী করে ফেল্লে!

ডেজেন সেই মূর্ত্তিটিকে পোষাক পরিয়ে তার হাতে তীর আর ধনুক আটকে দিল। মূর্ত্তিটির দিকে চেয়ে ডেজেনের চোখ একেবারে ঝল্‌সে যেতে লাগল। বাস্তবিক, এত রূপ সে তার জীবনে এই প্রথম দেখল।

অবশেষে সে তার যাদুর সাহায্যে তাতে প্রাণ দিল। দেখতে দেখতে মূর্ত্তিটি একেবারে সত্যিকারের মানুষের মত খেতে বেড়াতে আর কথা বলতে লাগল। কিন্তু হাজার হলেও সে তুষারের তৈরী বৈ ত আর কিছুই নয়। কাজেই রোদে আর আগুনের তাপে গলে যাবার ভয় ছিল তার যথেষ্টই।

যাই হোক্, সে তার নাম দিল মুইস। বন্ধুদের সে বল্লে, মুইস একজন নামজাদা যোদ্ধা আর অনেক দূর দেশ থেকে সে এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে।

তারপর একদিন ডেজেন মুইসকে নিয়ে মামৌর সঙ্গে দেখা করতে গেল। মামৌ তো মুইসকে দেখে তার রূপে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে মুইসকে নিয়ে গিয়ে আগুনের পাশে যেটি সব চাইতে ভাল আসন ছিল তাতে বসতে দিল। মুইস কিন্তু গলে যাওয়ার ভয়ে সেখানে না বসে অনেক দূরে গিয়ে বসল। তারপর ডেজেনের শিক্ষামত সে মামৌকে বিয়ে করতে চাইল।

মামৌ তখুনি রাজি হয়ে গেল। এ রকম একজন বীর আর সুপুরুষের স্ত্রী হবে ভাবতেই তার মন আনন্দে নেচে উঠল। "কিন্তু এখানে আমাদের বিয়ে হতে পারে না," মুইস বল্লে, "তোমাকে আমার সঙ্গে আমার দেশে যেতে হবে আর সেখানে আমাদের বিয়ে হবে। যদি তুমি প্রকৃতই আমাকে ভালবেসে থাক, তবে আমার জন্যে এ কষ্টটুকু তোমায় সইতেই হবে।"

"আমি যাবো।" মামৌ উত্তর করল।

"সে কিন্তু অনেক দূরের পথ," মুইস্ বল্লে, "কত নদী, কত পাহাড় পার হয়ে, তবে আমার দেশ। সেখানে অনেক বিপদ আর অনেক কষ্ট তোমায় সইতে হবে। আমার মনে হয়, তুমি তা পারবে না।"

"নিশ্চয়ই পারবো," সে বল্লে, "তোমার জন্যে আমি সব কিছুই সইব, সে যত বিপদই হোক আর যত দূরের পথই হোক্। আমায় তুমি সঙ্গে নাও, মুইস!"

সেই দিনই তারা রওনা হল। মুইস চলতে লাগল আগে আগে আর মামৌ তার পেছনে। রাস্তাটা এত খারাপ ছিল যে, মামৌর চলতে রীতিমত কষ্ট হতে লাগল। এখানে সেখানে উঁচু নীচু থাকার দরুণ সে ক্রমাগত হোঁচট খেতে লাগল, কাঁটা ঝোপে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। কত নদী, কত পাহাড় আর কত বন যে তাকে পার হতে হল তা বলে শেষ করা যায় না। এদিকে মুইস তার বড়ো বড়ো পা ফেলে হন্ হন্ করে ছুটে চলেছে। বেচারা মামৌকে একটু সাহায্য করা তো দূরে থাক্, সে তার দিকে একবার ফিরে চেয়েও দেখছো না যে, মামৌ ঠিক আসতে পারছে কি না।

ক্রমেই মামৌ পিছিয়ে পড়তে লাগল। অবশেষে সে দূ-রে ঝোপের মধ্যে মুইসের মিলিয়ে যাওয়া অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখতে পেল। তারা খুব ভোর থাকতেই রওনা হয়েছিল। ক্রমে বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে এল। এদিকে রোদের তাপে মুইসের তুষারের দেহ তখন গলতে সুরু করেছে।

ক্রমে সূর্য্য তাদের মাথার ওপর ঝল্মলিয়ে উঠল। মুইস বুঝতে পারলে যে, তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এসেছে। তার সুন্দর মুখখানাও গলে যেতে লাগল। কিন্তু তবুও সে ধৈর্য্য হারাল না।

শেষটায় তার হাত দু'খানাও তার শরীর থেকে খসে পড়ল। কিন্তু তবুও সে পথ



চলতে লাগল। তারপর যখন তার পা দু'খানাও গল্‌তে সুরু করল, তখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে জায়গাটি একটি ছোট পুকুরে পরিণত হল। তখন সেখানে কতগুলি জামা কাপড়, কিছু পালক আর একছড়া মুক্তোর মালা ছাড়া মুইসের আর কোন চিহ্নই রইল না।

এদিকে মামৌ তখন মুইসের নাগাল ধরবার জন্যে প্রাণপণে ছুট্‌ছিল। ক্রমে সে সেই পুকুরটির কাছে এসে পৌঁছুল। সেখানে সে মুইসের শেষ অবশিষ্ট জিনিষগুলি দেখতে পেল। তার আর বুঝতে বাকী রইল না।

মামৌ সেখানেই বসে কাঁদতে সুরু করে দিল। কেন না তার ধারণা ছিল নিশ্চয়ই কোন বন্য জন্তু মুইসকে খেয়ে ফেলেছে। বেচারা মামৌর সে কি দুরবস্থা! তার সমস্ত কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, চুলগুলি রুক্ষ, তার ওপর অনাহারে অনিদ্রায় তার সোনার রং একেবারে কালো হয়ে উঠেছে। যখন সে এইভাবে কাঁদছিল, তখন তার কানে ভেসে এল পাখীর কণ্ঠস্বর। তার মনে হল তারা যেন বলছে, "সে বেঁচে আছে। তুমি যার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলে সে হচ্ছে তুষারের তৈরী একটা নকল মানুষ। তুমি তোমার আসল মানুষকে অবহেলায় হারিয়েছ। একদিন সে তোমার কাছে নিজে এসেছিল কিন্তু তুমি তখন তোমার রূপের অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে তাকে উপেক্ষা করেছিল। আজ তাই তোমার এই শাস্তি।"

মামৌর মনে হল তারা তাকে বিদ্রূপ করছে। সে তার দুই হাতে কান চেপে ধরে পাগলের মত ছুটতে লাগল। প্রতি মুহূর্ত্তে সে তখন তার মৃত্যু কামনা করছিল। এদিকে ডেজেন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তিনদিন তিন রাত ধরে ক্রমাগত খোঁজার পর সে মামৌকে একটা গাছতলায় মরণাপন্ন অবস্থায় দেখতে পেল

ডেজেন তার কাছে গিয়ে তার শীর্ণ হাত দুখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে সহানুভূতির স্বরে বল্লে, "মুইসের মত আমার গলে যাওয়ার ভয় নেই, মামৌ! আমি হচ্ছি রক্তমাংসের তৈরী আসল মানুষ। তুমি যদি এখনও আমায় বিয়ে কর, তবে আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমায় আমি আমার প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব। তোমার জন্যে শিকার করে আনব, মাছ ধরব আর তুমি যা বলবে তাই করব। তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজি আছ?"

মামৌর তখন সমস্ত অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারলে যে অহঙ্কারের ফলেই তার আজ এই দুরবস্থা। সে তখুনি তার সম্মতি জানাল। তারপর সেই থেকে তারা সুখে দিন কাটাতে লাগল।.....

একটি বিদেশী গল্প

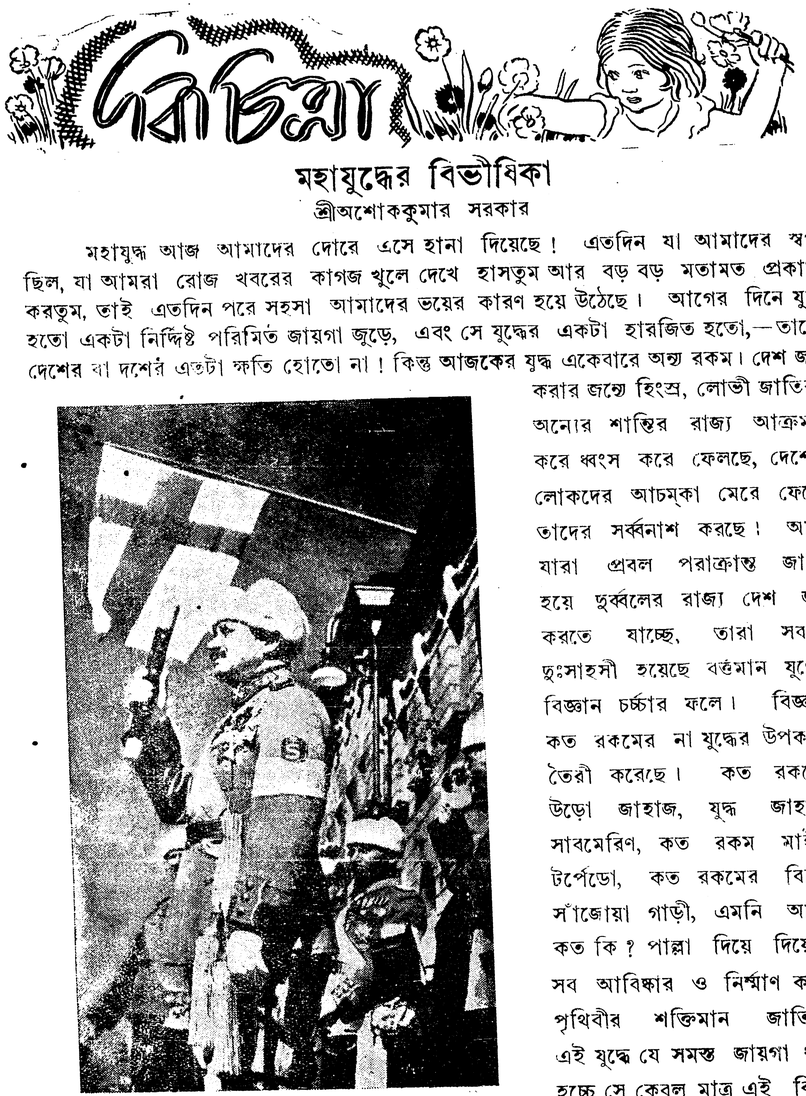

বিচিত্রা

# মহাযুদ্ধের বিভীষিকা

শ্রীঅশোককুমার সরকার

মহাযুদ্ধ আজ আমাদের দোরে এসে হানা দিয়েছে! এতদিন যা আমাদের স্বপ্ন ছিল, যা আমরা রোজ খবরের কাগজ খুলে দেখে হাসতুম আর বড় বড় মতামত প্রকাশ করতুম, তাই এতদিন পরে সহসা আমাদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। আগের দিনে যুদ্ধ হতো একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমিত জায়গা জুড়ে, এবং সে যুদ্ধের একটা হারজিত হতো,—তাতে দেশের বা দশের এতটা ক্ষতি হোতো না! কিন্তু আজকের যুদ্ধ একেবারে অন্য রকম। দেশ জয় করার জন্যে হিংস্র, লোভী জাতিরা অন্যের শান্তির রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলছে, দেশের লোকদের আচমকা মেরে ফেলে তাদের সর্ব্বনাশ করছে! আজ যারা প্রবল পরাক্রান্ত জাতি হয়ে দুর্ব্বলের রাজ্য দেশ জয় করতে যাচ্ছে, তারা সবাই দুঃসাহসী হয়েছে বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে। বিজ্ঞান কত রকমের না যুদ্ধের উপকরণ তৈরী করেছে। কত রকমের উড়ো জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিণ, কত রকম মাইন, টর্পেডো, কত রকমের বিচিত্র সাঁজোয়া গাড়ী, এমনি আরো কত কি? পাল্লা দিয়ে দিয়ে এ সব আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ করছে পৃথিবীর শক্তিমান জাতিরা। এই যুদ্ধে যে সমস্ত জায়গা ধ্বংস হচ্ছে সে কেবল মাত্র এই বিজ্ঞা-নের অন্যায় ব্যবহারের জন্যে।

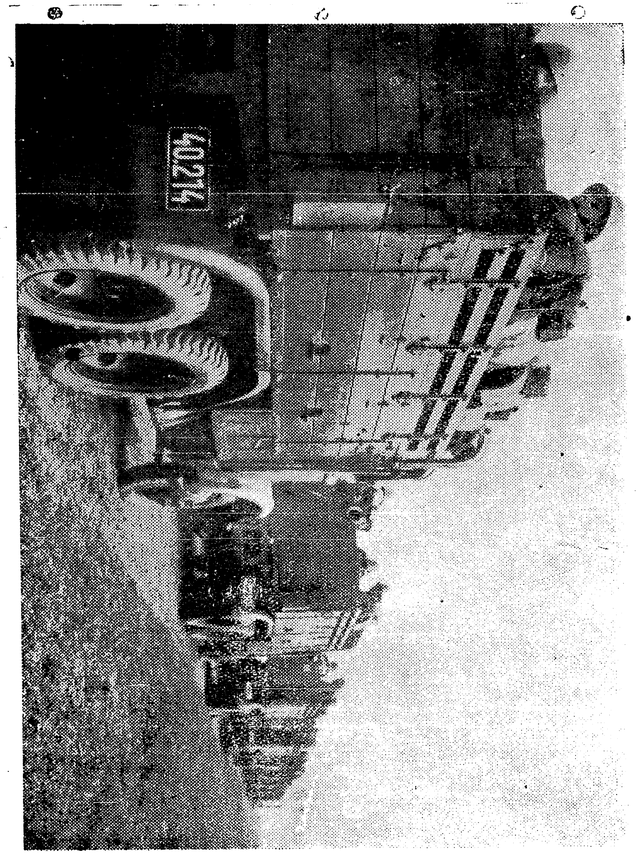



ম্যানার হাইম লাইনের স্রষ্টিকর্ত্তা সেনাপতি ম্যানার হাইম।






সাঁজোয়া গাড়ী সৈন্য ও রসদ নিয়ে চলেছে

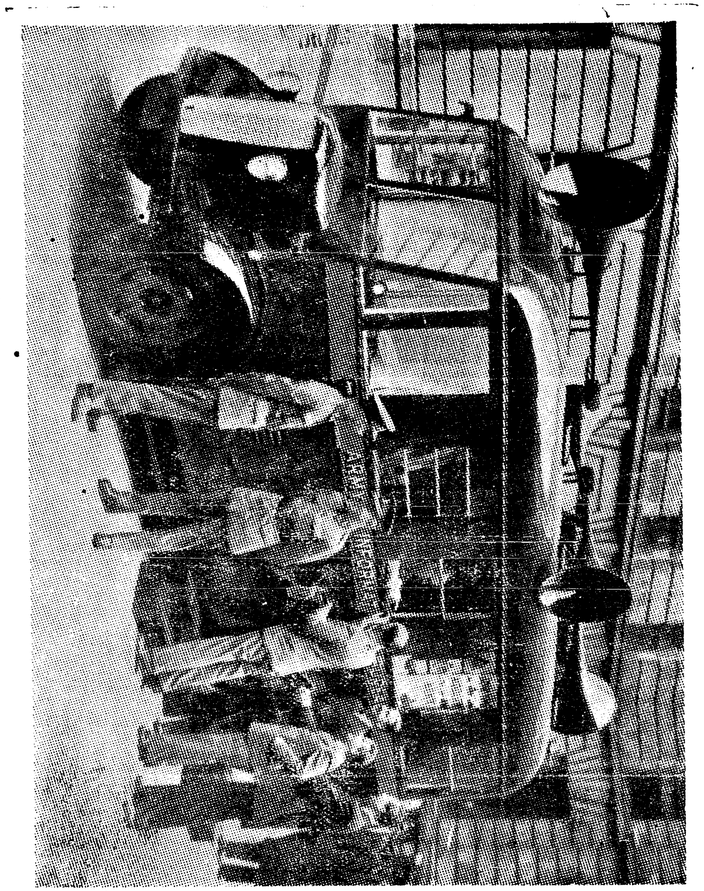

ব্রিটিশ বাহিনীর একটি "ইমারজেন্সি" কার



বিজ্ঞান আজকের দিনে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক সময় সাহায্য করছে বটে কিন্তু মন্দ লোকের পাল্লায় পড়ে সে আবার মন্দও করছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে সব চেয়ে মারাত্মক জিনিষ হচ্ছে, উড়ো জাহাজ থেকে বোমা ফেলে দেশের প্রধান প্রধান জায়গা ধ্বংস করে দিয়ে শত্রু সৈন্যকে কাবু করে ফেলা, তারপরে পশ্চাতে সুবিধে বুঝে প্যারাসুটে নেবে, সে জায়গা দখল করে নেওয়া। উড়ো জাহাজ যখন প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে একদিন এই যন্ত্র কুকার্য্যে ব্যবহৃত হবে? তা কেউ অনুমান করতে পারে নি,—তবে বর্ত্তমান যুগের লোকদের বুদ্ধির জোরে যা লোকে কল্পনা করতে পারে নি তাই সম্ভব হয়েছে। যে যুদ্ধে মানুষ মানুষকে হত্যা করবার জন্যে কতরকম অস্ত্র তৈরী করলে। বিমান থেকে বোমা ফেলে কত জায়গা ধ্বংস করা হচ্ছে তা তোমরা জানই। যেগুলো সব চেয়ে মারাত্মক, ইংরিজিতে তাদের বলে হাই এক্সপ্লোসিভ। এই বোমা পড়ে ৫০ ফুট নিয়ে একেবারে মাটীর তলে বসে যায়, আর এর থেকে যে সমস্ত মারাত্মক জিনিস ছিটকে বেরোয় সেগুলো প্রায় ৬০০০ হাজার মাইল বেগে ছোটে। আমাদের দেশে ঝড় ৪০০ মাইল বেগের বেশী হয় না সুতরাং সে বেগ বা গতি আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এর পরেই যে শ্রেণীর বোমা আছে, তাকে বলা হয়—ইনসিনডিয়ারী বোমা বা আগুণে বোমা। এও আবার এক ভীষণ জিনিষ। এই বোমা যেখানে পড়ে সেখানেই আগুন ধরে যায়। মনে কর তুমি ঘরের ভেতর রয়েছো আর তোমার ঘরের ছাতের ওপরেই একটা আগুণে বোমা পড়েছে!—তুমি বুঝতেও পারবে না! সেটা নিঃশব্দে ধরে উঠবে আর ঐ রকমভাবেই পুড়ে পুড়ে সেটা ছাতে আগুন ধরিয়ে দেবে এবং ফলে তোমার অজান্তেই অতবড় ছাত তোমার মাথার ওপর জ্বলে পড়বে। তারপরে Gas Bomb বা গ্যাস বোমা, এও বড় বিপজ্জনক জিনিষ! এ বোমা যেখানে পড়ে সেখানেই ফাটে কিন্তু লোকে তা বুঝতে পারে না, কারণ গ্যাস তো বায়ু কিনা? তাই গ্যাস জানা যায় না, লোকে সেখানে গিয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। এই গ্যাসও দশ বিশ রকমের আছে, একটার নাম মাষ্টার্ড গ্যাস, এ একটা ভীষণ জিনিষ। এই গ্যাস যার শরীরে লাগে, তাকে ২৭ ঘন্টার মধ্যে মরতে হবেই। যেখানে এটা প্রথম লাগে সেখানে ফোস্কা পড়ে আর সেই ফোস্কা পড়তে পড়তে সমস্ত শরীর পচে যায়।

তাহলে তোমরা বুঝতে পাচ্ছ কি ভীষণ কাণ্ড আজ এই পৃথিবীর বুকে চলেছে—এর যে কবে শেষ হবে তার কোন ঠিক নেই।

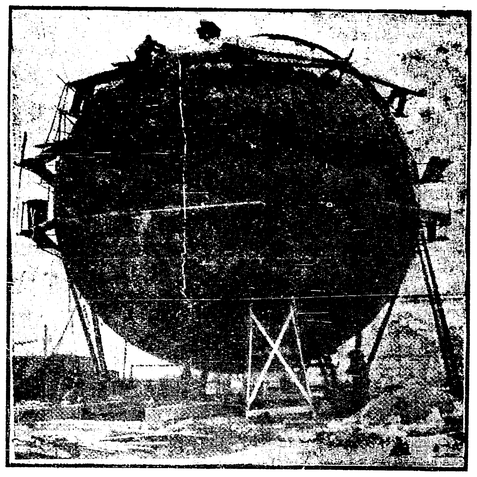

লণ্ডন সহরকে শত্রু বিমানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে বেলুন তৈরী হচ্ছে

"মানুষ যখন শান্তিতে থাকে তখন সেটা তার কাছে ভাল লাগে না, আবার অশান্তি এলেও ভাল লাগে না।" তবে আজ এই বিমান আক্রমণ থেকে মানুষ নানা কৌশল নানা উপায় উদ্ভাবন করেছে। ইংলণ্ডের উপর বেলুন ভাসিয়ে শত্রু বিমানের আক্রমণ থেকে ইংলণ্ডে আত্মরক্ষা করছে। এ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্‌ট্ কামান শত্রু বিমানদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। এয়ার-রেড আশ্রয়ে অনেক লোক প্রাণ রক্ষা করছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, মহা যুদ্ধের বিভীষিকা নানা ভাবে আজ পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াকে সমস্ত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

## তানসেনের গান কাহিনী

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষত্ব এই, যে এ দেশে কেউ নিজের নামটাকে অমর করে রাখতে চাইত না। যদিও এদেশে চিরদিন গানের চর্চ্চা হয়েছে তবুও আমরা বিশেষ কোনও হিন্দু গায়কের ইতিহাস জানিনা। মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে কোনও গায়কের নাম পাওয়া যায় না বললেও চলে।

এর আর একটা কারণ আছে। পুরাকালে হিন্দুদের ধারণা ছিল যে বড় গায়ক মাত্রেই নাকি দেবতাদের শিষ্য; কেউ শিবের কাছে, কেউ সরস্বতীর কাছে, কেউ বা অন্যান্য দেবতা



অথবা মুনি ঋষির কাছে গান শিখেছেন। কাজেই তাঁদের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও রকম ঔৎসুক্য তাদের মনে জাগত না।

বৈজু বাউরা, গোপাল নায়েক প্রভৃতি অনেক নামই আমরা শুনতে পাই, কিন্তু তাঁদের জীবন-কাহিনী বিশেষ কিছুই কারও জানা নাই।

মিঞা তানসেন সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর ঐতিহাসিকেরা দিয়ে থাকেন। "১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই কার্ত্তিক বিজয়নগরে তানসেনের জন্ম হয়।" প্রথমে তিনি হিন্দু ছিলেন; তাঁর আসল নাম তনু মিশ্র, পিতার নাম শিবচরণ মিশ্র। তানসেন ছেলেবেলায় লেখা পড়া কিছু করতেন না, গৃহ-পালিত পশুদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু তাঁর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। যে কোনও পশুর ডাক একবার মাত্র শুনেই তিনি তার হুবহু নকল করতে পারতেন।

বিখ্যাত গায়ক ও সাধক হরিদাস স্বামী শিষ্যদের নিয়ে একদা বৃন্দাবনে চলেছিলেন। পথিমধ্যে তনু মিশ্র বাঘের ডাক ডেকে তাঁদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন। কিছুমাত্র ভীত না হয়ে হরিদাস স্বামী শিষ্যদের বললেন যে ভয় পাবার কোনও কারণ নাই, ও ডাক বাঘের নয়, নিশ্চয় কোনও মানুষের। অনেক খোঁজের পরে অবশেষে একটি গাছের কোটরের মধ্যে তনুকে পাওয়া গেল। হরিদাস স্বামী তনুর সুন্দর চেহারা দেখে তাকে নিজের শিষ্য করে নিয়ে গান শেখাতে লাগলেন।

গান শিখে তানসেন রামচন্দ্র নামে এক রাজার আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর রচিত বহু গানে এই রাজার নামের উল্লেখ আছে। তানসেনের গানের খ্যাতি শুনে দিল্লীশ্বর আকবর রামচন্দ্রকে হুকুম করলেন তানসেনকে দিল্লী পাঠিয়ে দিতে—চোখের জলে রামচন্দ্র তানসেনকে বিদায় দিলেন।

দিল্লী এসে তানসেন প্রথমে সম্রাটের সভায় বসে গান গাইতে চাইতেন না। যখন একলা নির্জ্জনে বসে গান গাইতেন, আকবর লুকিয়ে তাঁর গান শুনতেন। সম্রাটের বহু অনুরোধে হয় ত কোনও কোনও দিন তানসেন সভায় গান গাইতেন, কিন্তু সে গান তেমন ভালো হত না। কেন এমন হয় সে কথা জিজ্ঞাসা করলে, তানসেন বলতেন, "সম্রাট্, যখন সভায় গান করি, তখন আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই গেয়ে থাকি, কিন্তু যখন একা বসে গাই, তখন সে কেবল ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য।"

আকবর একদিন নিজের কন্যাকে তানসেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তানসেন বাদ্‌শাহ দুহিতার রূপে মুগ্ধ হলেন, বাদ্‌শা-জাদীও তানসেনের গান শুনে তাঁর প্রতি আসক্তা হলেন। আকবর দুজনার বিবাহ দিয়ে দিলেন। সেইদিন থেকে তানসেন মুসলমান হলেন। তনু মিশ্র নামের পরিবর্ত্তে তাঁর নাম হল মিঞা তানসেন বা তানসেন।

সুরের ক্ষমতা সম্বন্ধে গায়কদের মধ্যে বহু গল্প প্রচলন আছে। কোনও সুরে মানুষকে সুখে বিহ্বল ক'রে তোলে, আবার কোনও সুরে তাকে যেন বেদনায় মুহ্যমান করে দেয়। কোনও সুরে উত্তেজনা আনে, কোনও সুরে ক্ষিপ্ত পশুকেও শান্ত করে।

সম্রাট্ আকবর শাহ শুনেছিলেন যে দীপকরাগ গান করলে আগুন জ্বলে উঠে। তিনি তানসেনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তানসেন বললেন যে সত্যই দীপক গানে আগুন জ্বলে। আকবরের হুকুম হ'ল দীপক গাইতে হবে—তিনি নিজের চোখে দেখবেন আগুন জ্বলে কি না। তানসেন বহু কাকুতি-মিনতি করলেন, দীপক গাইলে তাঁর প্রাণ-নাশ অবশ্যম্ভাবী - সে আগুন জ্বলে উঠলে, কারও ক্ষমতা নাই যে সে আগুন নিভাতে পারে। কিন্তু আকবর অটল—দীপক গান করতে হবেই।

তানসেন আর কি করেন, নিজের মেয়েটি অনেক দিন ধ'রে তাঁর কাছে গান শিখাছল, তাকেই বললেন যে দীপক গাইতে গাইতে যেমনই আগুন জ্বলে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে সে যেন "মল্লার" গান করে—প্রবল জলের ধারায় হয় ত আগুন নিভে যাবে।

মিঞা তানসেন গান ধরলেন, সভা শুদ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে গান শুনতে লাগল। ক্রমে তানসেন আত্মহারা হয়ে পড়লেন, সুরের ঘোরে যেন চেতনা বিলুপ্ত হল। হঠাৎ দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল; তানসেনকে ঘিরে আগুনের হাজার লোল শিখা নেচে উঠল—সভা নিস্তব্ধ, বিস্ময়ে কারও মুখে কথা নাই।

তানসেনের কন্যা পিতার কাছেই বসেছিলেন। আগুন জ্বলে ওঠা মাত্রই তিনি "মল্লার" আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু একে বালিকা, তাতে আবার পিতার মৃত্যু আশঙ্কায় তার মন বড় চঞ্চল—'মল্লার' আলাপ শুদ্ধ হল না। 'মল্লার' গান করতে গিয়ে বালিকা একটুখানি অন্যরকম একটি সুর সৃষ্টি করে ফেললে—সেইদিন থেকে সেই সুরের নাম হল "মিঞা-মল্লার"।

কিন্তু তানসেনের আগুন কিছুতেই নিভ্‌লো না। উন্মাদ হয়ে তিনি যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন—আর উঠলেন না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে তানসেন যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নি, আকবরের সভাতেই দীপকানলে তাঁর জীবন লীলা শেষ হয়েছিল।

গোয়ালিয়রে তানসেনের সমাধি আছে। আজও বহু গায়ক সেই সমাধি দর্শন করতে যান। তানসেনের সমাধির ওপরে একটি গাছ আছে, প্রবাদ যে সেই গাছের পাতা চিবিয়ে খেলে গায়কের কণ্ঠ সুমধুর হয়।

—()০()—

## শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### আমাদের বাঘা

হুস্ ক'রে পাতালের দিকে তলিয়ে গেলুম এবং তারপর আবার ভেসে উঠলুম—কেবল আমি নই, আমার সঙ্গে আর যারা বাঁধা ছিল তারাও ভেসে উঠল আমার সঙ্গেই। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবার উপায় নেই।

আচ্ছন্নের মত শুনতে পেলুম—কল্ কল্ কল্ কল্ ক'রে গভীর জলগর্জ্জন! কী তীব্র স্রোত—গতি তার প্রায় বন্যার মত! জল টলমল্ ক'রে হেল্‌ছে দুল্‌ছে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার ফুল ফুটিয়ে উপরে উঠছে নীচে নাম্‌ছে, ঘূর্ণিপাকে ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে এবং শতসহস্র বল্গমের ফলকের মতন চক্‌চকিয়ে ছুটে যাচ্ছে হু-হু ক'রে। সেই নিম্নমুখী গিরি-নদীর গতি অত্যন্ত দ্রুত ব'লে আমরা তৎক্ষণাৎ আবার ডুবে গেলুম না—টানের মুখে ভেসে চললুম খানিক দূর। এজন্যে বিস্মিত হলুম না। অতি বেগবতী নদী যে পাথরকেও খানিক দূর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, একথা সকলেই জানে।

তারপর আবার আমরা ডুবে গেলুম এবং জলের তলায় নিঃশ্বাস যখন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, নদী আবার আমাদের উপরে ভাসিয়ে তুলল।

এবার ভেসে উঠেই দেখি, ঠিক আমাদের পাশেই সাঁতার কাটছে বাঘা! এতক্ষণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। তুচ্ছ কুকুর ভেবে শত্রুরা হয় তাকে কিছু বলেনি, নয় সে নিরাপদ ব্যবধানে স'রে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছে। প্রভুভক্ত বাঘা এখন এসেছে আমাদের মৃত্যু-যাত্রার সাক্ষী হ'তে এবং হয়তো আমাদের সঙ্গেই মরতে।

যে কয় মুহূর্ত্ত ভেসে থাকি, এর মধ্যেই সুন্দরী পৃথিবীকে ভালো ক'রে শেষবার দেখে নি! সূর্য্যের উপরে ঐ সেই নীলাকাশের চন্দ্রাতপ, তীরে তীরে ঐ সেই পাখী-ডাকা সবুজ বনভূমি, দূরে কাছে ঐ সেই গিরিরাজ হিমালয়ের শুম্ভিত শৈল-তরঙ্গ! ভালো ক'রে আরো কিছু দেখতে না দেখতেই আবার ডুবে গেলুম—কিন্তু আবার ভেসে উঠলুম পর-মুহূর্ত্তেই। এবার মনে হ'ল, কে যেন আমাদের টেনে উপরে তুললে!

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, বাঘা প্রাণপণে আমাদের বাঁধন-দড়ী কামড়ে ধরেছে।

বাঘা আর দড়ী ছাড়লে না—আমরাও আর ডুবলুম না।

আমাদের পাঁচজনকে টেনে তোলবার শক্তি নিশ্চয়ই বাঘার নেই। কিন্তু প্রথমত, জলে গুরু ভারও হয় লঘু ভার, এবং দ্বিতীয়তঃ এই খরস্রোতা নদীর তীব্র টান আমাদের ভাসিয়ে রাখবার পক্ষে সাহায্য করলে যথেষ্টই।

বাঁধন-দড়ী কামড়ে ধ'রে বাঘা নদীর তীরের দিকে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্রোতের টানে তার চেষ্টা সফল হ'ল না। তবে সে কোনক্রমে জলের উপরে আমাদের ভাসিয়ে রাখলে। ধন্যবাদ, বাঘাকে ধন্যবাদ!

এতক্ষণ পরে কুমার কথা কইলে। বললে, "বিমল, বাঘা আজ যা' করলে, অন্য কুকুরে তা করতে পারত না। কিন্তু এভাবে বাঘা আর কতক্ষণ আমাদের ভাসিয়ে রাখবে? বাঘা জলচর জীব নয়, আর একটু পরেই সে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। তখন যে মরণ ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই?"

—"আমিও সেই কথাই ভাবছি কুমার!"

বিনয়বাবু বললেন, "শত্রুরা কি আমাদের দেখতে পাচ্ছে না?"

আমি বললুম, "তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি!"

কমল উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "দেখ, দেখ বিমলদা! বাঘার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। সে একটু একটু ক'রে আমাদের তীরের খানিকটা কাছে এনে ফেলেছে!"

কমলের উৎসাহ দেখে এত দুঃখেও আমার হাসি এল। আমাদের এই অবস্থায় তীরের খানিকটা কাছে আসা আর তীরে গিয়ে ওঠার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ!

এমন সময়ে এক অভাবিত কাণ্ড ঘটল। নদীর গতি হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে উঠল—বোধ হয় এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি নদীর তলাকার জমি সেখানে খুব বেশী ঢালু। যেদিকে চলেছি, সেইদিকেই ছিল আমার মাথা। তাই ওদিককার কিছুই এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলুম না। আচম্বিতে ঘূর্ণায়মান স্রোতের টানে আমাদের একসঙ্গে বাঁধা দেহগুলো উল্‌টে ঘুরে গেল—প্রচণ্ড বেগে খানিক দূর ভেসে গিয়েই দেখি, তীর একেবারে আমাদের খুব কাছে স'রে এসেছে!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমরা নদীর বাঁকে এসে পড়েছি—আমরা নদীর বাঁকে এসে পড়েছি!"

—সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই পেলুম এক বিষম আঘাত! অন্য সময় হ'লে সে আঘাতে রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়তুম, কিন্তু এখন আমরা অভিভূত হবারও অবকাশ পেলুম না—কারণ আমাদের দেহের উপরে লাগল কঠিন পাথুরে মাটির স্পর্শ! এ স্পর্শ যত কঠিনই হোক্—এটা যে স্নেহময়ী পৃথিবীর মাটির ছোঁয়া, এই আশ্চর্য্য অনুভূতিই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে উন্মত্ত আনন্দে!

আমরা ঠেকে গিয়েছি নদীর বাঁকে! কেবল তাই নয়, বাঁকের মুখে ছিল কি একটা জলজ লতা-পাতার ঘন জাল, আমাদের দেহগুলোকে সে যেন জীবন্তেরই মতন জড়িয়ে ধরলে! স্রোত আর আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারবে না!

রামহরি ব'লে উঠল, "জয় বাবা বিশ্বনাথ! একেই বলে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"



কমল বললে, "হায় রামহরি, তোমার কৃষ্ণ আমাদের রাখলেন বটে কিন্তু বাঁধনগুলো খুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন না কেন?"

বাঘা তখন গলা পর্য্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্‌র্‌-গর্‌র্‌ রবে গর্জ্জন সুরু করলে!

আমাদের পানে তাকিয়ে বাঘা এতটা চ'টে উঠল কেন?

পরমুহূর্ত্তেই এ প্রশ্নের উত্তর পেলুম!

হঠাৎ বাঘা আক্রমণ করলে আমাদের বাঁধন-দড়ীকে! এই দড়ীর উপরেই তার রাগ হয়েছে, সে বুঝতে পেরেছে এই দড়ীর বাঁধনই যত অনিষ্টের মূল!

কুমার তাকে উৎসাহ দিয়ে বারংবার বলতে লাগল, "আমার সোনার বাঘা! আমার বন্ধু বাঘা! আমার বাহাদুর বাঘা! কেটে দাও তো দড়ীগুলো—চট্‌পট্ কেটে দাও তো ভাই!"

উৎসাহ পেয়ে বাঘার আনন্দ আর ধরে না, জয়পতাকার মতন তার লাঙ্গুল জলের উপরে তুলে সে নাড়তে লাগল ঘন ঘন!

..... ..... .....

..... .....

.....

স্বাধীন, আমরা স্বাধীন! বাঘার দৌলতে আমরা জলে ডুবে মরিনি, বাঘার অনুগ্রহে ঘুচল আমাদের বন্ধন-দশা!

এতক্ষণ মাল্কান্ একটিমাত্র কথা কয় নি, সে হঠাৎ এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে দুইহাত বাড়িয়ে বাঘাকে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধ'রে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললে, "বন্ধু, আমার জীবনরক্ষক বন্ধু!"

রামহরি আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, "দেখছ কমলবাবু, কৃষ্ণ বাঁধন খুলে দিলেন কিনা? বাঘা যে কৃষ্ণেরই জীব!"

কুমার বললে, "ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে! দেখ বিমল, ছুন্-ছিউ চেয়েছিল আমাদের পাতালে পাঠাতে, কিন্তু আমরা এসে উঠেছি নদীর এপারে! আর সাঁকোর দরকার হ'ল না!"

আমি বললুম, "মাল্কান্, আমরা 'শা-লো-কা' মঠের কাছে এসে পড়েছি, নয়?"

—"হাঁ বাবুসাহেব, খুব কাছে।"

—"তাহ'লে আর দেরি নয়! ছুন্-ছিউ নদীর ওপারে সদলবলে সদর্পে বিচরণ করুক্, ইতিমধ্যে আমরা করব কার্য্যোদ্ধার!"

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

### গুপ্তগুহা

ইতিহাস-বিখ্যাত কপিশ-পাহাড়ের উপত্যকা! এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের পথের শেষে।

ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ! প্রাচীন মঠের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে—এমন একখানা ভাঙাচোরা ঘরও নেই, যার ভিতরে মাথা গোঁজা যায়। সম্রাট কণিষ্ক এখানে যে সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য

কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন, আজ তার কোন সৌন্দর্য্যই উপভোগ করবার উপায় নেই। অতীতের ঐশ্বর্য্য অতীতের আড়ালেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

মঠের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু অষ্টদন্ত তিনপদ কুবের-মূর্ত্তির কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বিনয়বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "আমি তো আগেই একথা বলেছিলুম! দ্বিতীয় শতাব্দীর কণিষ্ক আর বিশ শতাব্দীর আমরা! এর মধ্যে কত যুগ-যুগান্তর চ'লে গিয়েছে—কত দস্যু, কত লোভী এখানে এসে হানা দিয়েছে, গুপ্তধনের এক কণাও আর পাওয়া যাবে না!"

আমার মন মুষড়ে পড়ল। তাহলে এতদিন ধ'রে আমাদের এত আগ্রহ, এত চেষ্টা-শ্রম, এত বিপদ ভোগ সবই হ'ল ব্যর্থ?

মাল্কান বললে, "বাবুসাহেব, এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে আর একটা ধ্বংসস্তূপ আছে। তার ভেতরে একটা ভাঙা মূর্ত্তিও দেখেছিলুম ব'লে মনে হ'চ্ছে।"

কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়েই বললুম, "যখন এতদূর এসেছি তখন সেখানেও না-হয় যাচ্ছি। কিন্তু আর কোন আশা আছে ব'লে মনে হয় না।"

কুমার ও কমল প্রভৃতি একেবারে গুম্ মেরে গেল। মাল্কানের পিছনে পিছনে আবার আমরা এগিয়ে চললুম বটে, কিন্তু সে যেন নিতান্ত জীবন্মৃতের মতই।......

মিনিট-পনেরো পরে আমরা উপত্যকার শেষপ্রান্তে একটা জঙ্গল-ভরা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম সেখানেও প্রায় আশী ফুট জায়গা জুড়ে একটা ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেল।

পরীক্ষা ক'রে বুঝলুম, এক সময়ে সেখানে একটা মাঝারি আকারের মন্দির ছিল—এখন কোথাও প'ড়ে আছে রাশীকৃত পাথর, কোথাও বা খোদাই-করা থামের টুক্‌রো এবং কোথাও বা ভাঙা-চোরা মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

চারিদিক তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলুম। ধুক্‌ধুকির উপরকার লেখাটা বার বার স্মরণ করতে লাগলুম:—"শা-লো-কা: পশ্চিম দিক: ভাঙা মঠ: কুবের মূর্ত্তি: গুপ্তগুহা।"

আমরা আগে যে ধ্বংসস্তূপে গিয়েছিলুম হয়তো সেইখানেই ছিল প্রাচীন শা-লো-কা মঠ। তারপর আমরা পশ্চিম দিকেই এসেছি বটে এবং এখানেও পেয়েছি একটা মঠ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু কোথায় কুবের-মূর্ত্তি?

কুমার বললে, "হয়তো আগে এখানে কুবের-মূর্ত্তি ছিল, এখন সেটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু গুপ্ত-গুহাটাই বা কোথায়?"

এমন সময় বিনয়বাবু সাগ্রহে আমাদের নাম ধ'রে ডাক দিলেন—তিনি তখন এক জায়গায় হাঁটু গেড়ে ব'সে কি পরীক্ষা করছিলেন।

বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দেখলুম, সেখানে কোমর পর্য্যন্ত ভাঙা একটা মূর্ত্তি রয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় অটুট অবস্থায় তার উচ্চতা ছিল অন্তত বারো ফুট। মূর্ত্তির একখানা পা ভাঙা, তার তলায় রয়েছে একটা হাতখানেক উঁচু লম্বাটে বেদী।



বিনয়বাবু বেদীর উপরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। তারপরই লক্ষ্য করলুম, বেদীর উপরে মূর্ত্তির অটুট পায়ের পাশেই রয়েছে পরে পরে আরো দুখানা পায়ের চিহ্ন! পা-দুখানা অদৃশ্য হয়েছে বটে, কিন্তু পায়ের ছাপ এখনো বর্ত্তমান!

বিনয়বাবু বললেন, "বিমল, এই তোমাদের কুবের-মূর্ত্তি! কুশ্রী কুবেরের অষ্টদন্ত মুখ আর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি মহাকালের প্রহারে নষ্ট হয়ে গেছে,—প্রথম দৃষ্টিতে একখানার বেশী পদও নজরে পড়ে না বটে, কিন্তু পাথরের উপরে অন্য দুখানা পদের কিছু কিছু চিহ্ন আজও লুপ্ত হয়ে যায় নি। হ্যাঁ, এই তোমাদের তিনপদ কুবের-মূর্ত্তি! বোঝা যাচ্ছে, ধুক্‌ধুকিতে মিছে কথা লেখা নেই। কিন্তু গুপ্তগুহা কোথায়?"

কমল বললে, "সেটা যদি সহজে আবিষ্কার করা যেত, তাহ'লে তার নাম গুপ্তগুহা হ'ত না।"

কমল ঠিক বলেছে। কিন্তু কুবের-মূর্ত্তি যখন পেয়েছি, তখন ধুক্‌ধুকির লিখনকে আর অবিশ্বাস করা চলে না। নব-জাগ্রত উৎসাহে আমরা সকলে দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে গুহার সন্ধান করতে লাগলুম। জঙ্গল ভেঙে আনাচে-কানাচে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু গুহার কোন অস্তিত্বই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

সকলে আবার নিরাশ মনে ভাঙা কুবের-মূর্ত্তির পাশে এসে দাঁড়ালুম। ঘাটে এসে নৌকো ডুবল বোধ হয়।

কুমার বললে, "উপত্যকার শেষে ঐ যে পাহাড় রয়েছে, ওখানে গিয়ে একবার গুহার খোঁজ ক'রে দেখব নাকি?"

বিনয়বাবু বললেন, "আমার বিশ্বাস, গুহা যদি থাকে, এই কুবের-মূর্ত্তির কাছেই আছে। মন্দিরের সম্পত্তি মন্দিরের বাইরে থাকবে কেন?"

যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু বেদীর উপরে এই তো রয়েছে কুবের-মূর্ত্তি, তার আশপাশের অনেকখানি পর্য্যন্ত সমস্তটাই পাথর দিয়ে বাঁধানো—কারণ এটা হচ্ছে বিলুপ্ত মন্দিরের মেঝে। এখানে গুহা থাকবে কোথায়? খানিকক্ষণ ভেবেও কোন হদিস্ পাওয়া গেল না।

কুমার হঠাৎ কৌতুকচ্ছলে কুবেরের পা টেনে ধ'রে বললে, "হে কুবের, হে দেবতা! আমরা হচ্ছি টাকার—অর্থাৎ তোমার পরম ভক্ত! কোথায় তোমার ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে রেখেছ প্রভু, দেখিয়ে দাও—দেখিয়ে দাও!"

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, কুবের-মূর্ত্তি যেন ন'ড়ে উঠে ডানদিকে একটু স'রে গেল!

তাড়াতাড়ি মূর্ত্তির পায়ের তলায় হেঁট হয়ে প'ড়ে দেখি, ধূলিধূসরিত বেদীর উপরে আধইঞ্চি চওড়া একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখা! মূর্ত্তিটা যে একটু স'রে গেছে, আর তার নীচেকার পরিষ্কার অংশটুকু বেরিয়ে পড়েছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, "কুমার, কমল, রামহরি! এস, আমরা সবাই মিলে মূর্ত্তিটাকে বাঁ-দিক থেকে ঠেলা দি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মূর্ত্তির ভেতরে কোন রহস্য আছে!"

সকলে মিলে যেমন ঠেলা দেওয়া, ভাঙা মূর্ত্তিটা হড়্‌হড় ক'রে প্রায় হাত-দুয়েক স'রে গিয়ে আবার অটল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল!

অবাক বিস্ময়ে দেখলুম, মূর্ত্তির তলদেশেই আত্মপ্রকাশ করেছে একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত এবং তার ভিতরে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে একসার সংকীর্ণ সিঁড়ি! এই তাহ'লে গুপ্তগুহা?

কুমার আনন্দে মেতে ব'লে উঠল, "আজ দেখছি আমাদের উপরে সব দেবতারই অসীম দয়া। রামহরির কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ বাঁচালেন; আর পাথরের কুবের আমাদের সামনে খুলে দিলেন তাঁর রত্ন-ভাণ্ডারের গুপ্তদ্বার! এখন দেখা যাক্, ভাণ্ডার পূর্ণ কিনা!" ব'লেই সে গর্ত্তের ভিতরে পা বাড়িয়ে দিলে।

রামহরি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, "ওগো কুমারবাবু, কোথা যাও? এখানে যক্ষের ভয় আছে, সে-কথা কি ভুলে গেছ?"

আমি বললুম, "থামো রামহরি, বাজে বোকো না! প্রায় দু-হাজার বছর ধ'রে বেঁচে আছে, এমন ভূতের গল্প কোনদিন শুনিনি। বেঁচে থাকলেও সে এত বুড়ো হয়ে গেছে যে, আমাদের দুটো ঘুসিও সইতে পারবে না! চল সবাই গুহার মধ্যে!" (আগামীবারে সমাপ্য)

## নববর্ষ

শ্রীলীনা দত্ত গুপ্তা

শেষ চৈত্রের শেষ লগ্নটী ফুরিয়ে এল—
ম্লান হেসে ঐ শুক তারাটিও বিদায় মাগে।
পূর্ব্ব আকাশে ঝলকে আলোক উদ্ভাসিয়া—
নবীন ঊষায় উদিল তপন অরুণ রাগে।
সুরভিত ফুল দোলে লীলায়িত ছন্দভরে—
নবীন বরষে জানায় প্রণতি জানায় হর্ষ।
বিহগ নিচয় গাহে বন্দনা মধুর শিষে—
আগমনে তব হোক মঙ্গল হে নব বর্ষ।

হে নব বর্ষ, সুস্বাগত—জানাই নতি—
জ্বেলে আন তুমি মঙ্গলময় আলোক শিখা।
পুরাতন যত মলিন কালিমা মুছায়ে দিয়ে—
জ্বলুক তোমার অমলিন করে দীপ্ত লিখা।
রণদেবতার রোষ-বহ্নিতে জ্বলিছে দেশ—
হুঙ্কারে তার বসুমতী আজি কম্পমান।
হে নব বর্ষ—আগমনে তব শান্ত হোক—
বোমারু বিমান, টর্পেডো আর মেসিন গান।

---

১

## ঘুমিয়ে-পড়া

শ্রীঅপর্ণা সেন

অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। এখনো চাঁদের আলো আকাশ থেকে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি, শুধু ভোরের অস্পষ্ট আভাষে তার মুখ একটু ফ্যাকাশে। ভোর হবার আগের সেই মদির মুহূর্ত্তটি! এই অপরূপ স্তব্ধতা এখনো ভাঙ্গেনি বাস ও ট্রামের সম্মিলিত ঐক্যতানে। নর্দ্দমা ধোওয়ার বুরুষের একঘেয়ে ঘস্‌ঘস্ শব্দও শোনা যাচ্ছে না। পাখীর ডানাঝাড়ার একটুখানি মৃদুশব্দ ঘুম পাড়ানি গানের মত কানে আসছে, আর দু'একটা আধজাগা কাকের অস্ফুট ডাক।

কালো পিচঢালা চকচকে রাস্তা বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র রাক্ষসের নিষ্ঠুর নিষ্পীড়নে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আছে। তার মায়ের দেওয়া রাঙা বসনখানি কোথায় হারিয়েছে? বুক চিরে তার চলে গেছে সেই সভ্যতারই দু'টি কঠিন লৌহ বাহু! যতদূর চোখ চলে যায়, দেখা যাচ্ছে শুধু তাদেরই সর্পিল আলিঙ্গন। রাস্তার একদিকে পিঠকুঁজো বিকৃত ইলেকট্রিকের আলোগুলো তাদের পায়ের তলায় গোল গোল আলো ফেলে নিরপেক্ষ দর্শকের মত দাঁড়িয়ে আছে। আর অন্যদিকে প্রায়ান্ধকারে গ্যাসের আলোরা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে দেখছে—দেখছে তারা নিঃশব্দে, রাত্রির এই করুণ ট্র্যাজেডি!

অমিতার ঘরের পর্দ্দাগুলোও ভোরের স্তব্ধতায় নিশ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে আছে। অমিতা তার লেপের কুণ্ডলী থেকে একবার চোখ মেলে তাকালো। একবার পাশ ফিরলো লেপটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে, আবার এ পাশে ফিরলো, হাত পা গুলো টান্ করলো, চোখটা একবার ভালো করে বুজলে, তারপর লেপের খোলস ফেলে দিয়ে উঠে বসলো। সতৃষ্ণ নয়নে একবার বিছানার গরম বুকের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ভাবলে বোধ হয় আর একটুক্ষণ শোওয়া যায় কি না।

নাঃ, আর চলবে না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো—সাড়ীটা খুলে পড়েছে পায়ের তলায়, যেন ঘুমটাকেও অমনি করে ফেলে দিতে চায়। অত্যন্ত অলস ও অনিচ্ছুক হাতে সে কাপড়টাকে জড়িয়ে নিলে গায়ে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালালো। ঘোমটা-পরা আলো বন্ধুর হাতের ছোঁয়ায় সন্তর্পণে হেসে উঠলো।

টেবিলের ওপর এলো মেলো ছড়ান গাদা খানিক খাতা বই, দুটো আধভাঙা পেন্‌সিল, একটা দাড়ি কামাবার ( অবিশ্যি অমিতা দাড়ি কামায় না বুঝতেই পারছো ) ব্লেড। কলমটা একটা বই থেকে উঁকি মারছে, বোধ হয় সেটা পেজমার্ক স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে! একটা

কাঁচের নীল-পাড়-দেওয়া ছোট প্লেটে চিনাবাদামের খোসা, আচারের ছিব্‌ড়ে আর খানিকটা নুন পড়ে রয়েছে। একটা ছবির প্যাড্ খোলা পড়ে, তাতে গ্রেটা গার্ব্বো, অশোককুমার কাননবালার দলেরা আন্তর্জ্জাতিক গ্রুপ করেছে। সামনেই একটা ক্যালেণ্ডার, তার একটা তারিখ বেশ ভালো করে মার্ক করা, যে দিনগুলো কেটে গেছে সেগুলোকে ক্রস করা হয়েছে কালির মোটা দাগ দিয়ে। দাগ দেওয়া তারিখটা আসতে ক'দিন বাকি আছে একবার ক্যালেণ্ডারের দিকে দেখলেই বোঝা যাবে। ক্যালেণ্ডারের হুকে একটা তেলচিটে ট্যাসেলও ঝুলছে।

অমিতা আস্তে আস্তে চেয়ারটা টেনে বসলো। চোখে তার ঘণীভূত হয়ে আছে রাজ্যের অসন্তোষ। কলমের পেজমার্ক দেওয়া বইটা টেনে সে পাতাটা উল্টোলে, দেখলে কতটা পড়া হয়েছে, দু'চারবার বিড়বিড় করলে, এটাও গতবছরে এসেছে আবার এবছরেও আসবে নাকি? "To flatter those we do not know is not easy task; But to flatter our intimate acquaintances, all whose foibles are strongly in our eye is drudgery insupportable" ইন্‌সাপোটেবল, দুটো 'টি' আছে, ড্রাজারি ডি, জি। ঐ যাঃ ফয়েবল্‌স্ মানে আবার ভুলে গেছি! মার্জ্জিনে যে অরুন্ধতী মানেটা লিখে দিয়েছিল ক্লাসে, সেই যে যেদিন মিস্ বোস্ সেন্‌টেন্স করতে দিয়েছিলেন? কিন্তু ওর হাতের যা ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা, কি লিখেছে পড়তে পারা যাচ্ছে না—চোখটাও জড়িয়ে আসছে। এ লাইনটা এক্সপ্ল্যানেশন আসবে বোধ হয়, নোটের খাতাটা কোথায় আত্মগোপন করল? ওই যে সবুজ বাঁধান খাতারি তলায়; না এটা ত অঙ্কর ক্লাস ওয়ার্ক। জ্বালাতন! তার চেয়ে ইতিহাস পড়া যাক্। দেখিত আকবরের 'কংকোয়েষ্টস্' মনে আছে কি না, প্রথমে মালব গণ্ডোয়ানা—উঃ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—চিতোর; কমলাদেবী গুজরাট্ পনেরোশো বাহাত্তর, ভুল হচ্ছে নাকি?—কমলার নীলসাড়ীটা বেশ কিন্তু একটা ওরকম কিনলে হয়।—আবার বিড়বিড় করে চললো রণথম্বোর হামির দেব, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কি হল আজ হোপলেশ। অমিতা মাথাটা একবার জোরে ঝাকুনী দিলে, চোখটা একবার রগড়ালে, বেনীটা আলগা হয়ে দুলছিল সেটাকে আঁট করে বাঁধলো। কিছুতেই কিছু নয়, মুখ না ধুলে আর চলবে না আবার সেই অনিচ্ছুক গতিতে উঠলো সে। ছোট বোনটা কি আরামেই না ঘুমোচ্ছে, আলো জ্বলছে একটু ইয়ে নেই, কুম্ভকর্ণ একেবারে। পরীক্ষার জ্বালা নেই, বেশ আছে। বড় হয়ে যে ছাই কি হয়, জড়াও একটা লম্বা সাড়ী, তারপর এ কোরনা সে কোরনা, বকুনী আর রাত জেগে পড়া।

দড়াম করে দরজাটা খুলে ঘর থেকে সে বেরিয়ে এলো। কি অন্ধকার বারাণ্ডা, সাঁ করে বাথরুমে ঢুকেই সে আলো জ্বালিয়ে দিলে। বাথরুম নয়তো দার্জ্জিলিং, জলও তেমনি



ঠাণ্ডা, মুখ ধোবে কি করে? বাথরুমটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল যে!! জল থেকে সুরু করে সবাই কি ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে???

অমিতা আবার চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল, যে চোখে অভিযোগও নেই অসন্তোষও নেই, আছে শুধু বিস্ময়; কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না।

সাতটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। জানলার ফাঁক দিয়ে একটুখানি রোদ্দুর তার খাটের কাছে এসে হাসিমুখে বলছে—Good morning, dear!

অমিতা এবার সত্যি সত্যিই উঠে বসেছে!

—ষোলো—
শিশিরের উদ্ধার

শিশির রুদ্ধঘরে খানিকক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। ক্ষোভ হবারই কথা। নষ্টরত্ন স্বহস্তে লাভ করে', অভাবিত পুনরুদ্ধারের পরে, আবার যদি তা সেই হাত থেকেই লোপ পায়—হাতে হাতেই লোপাট্ হয় তাহলে কার না ক্ষোভ হবে? এবং কেবল খোয়া যাওয়াই নয়, তারপরে এই সব খোয়ার! শিশির অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়ে।

বিচলিত হয়ে ঘরটার চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জানালার বাইরে গিয়ে মুখ বাড়ায়। এদিকে ওদিকে উঁকি ঝুঁকি মারে, কই একজন কুকুরেরও তো ল্যাজ দেখা যায় না! গ্র্যাণ্ড মামার স্রেফ্ ধাপ্পা নয় তো? হ্যাঁ, খেতে না পেলে ওরা বসে' থাক্‌বার পাত্র নাকি! খাবার সন্ধানে নিশ্চয়ই পাড়া বেড়াতে গেছে।

এ হেন সুবর্ণ-সুযোগ—পরিত্রাণের এই অর্দ্ধোদয়যোগ উপেক্ষা করবার নয়! শিশির সেই ঝোলানো দড়ি ধরে' ঝুলন যাত্রা করে' বেরিয়ে পড়তে চায়। মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা

করাও বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে না। গ্র্যাণ্ডমামার দেওয়া দুর্ল্লভ ডিম তিনটে, সার্টের তিন পকেটে না পুরে, দড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নাম্‌তে থাকে।

প্রায় ধরাতলে গিয়ে পৌঁছায় আর কি, অবতীর্ণ হয় হয়, এমন সময়ে কোথ্‌থেকে গন্ধ পেয়ে ডালকুত্তার দল হৈ হৈ করে' ছুটে আসে।

"ঐ রে! ঐ ঐ!" তাদের ঘেউ ঘেউ-এর মধ্যে ঐ একটি কথাই শোনা যায়। একবাক্যে অভ্যর্থনা করে' আসে ওরা।

শিশির আর মাটিতে পা দেয় না, ত্রিশঙ্কুরের মতো শূন্য মার্গে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, তর্‌তর্ করে' দড়ি ধরে আবার সে রুদ্ধ ঘরে এসে ওঠে। বাব্‌বা, কক্ষচ্যুত হওয়া কি সোজা? কেন যে চন্দ্র সূর্য্যরা কক্ষভ্রষ্ট হতে চায় না এক্ষণে বোঝা গেল! আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি।

শিশির ভাব্‌ল, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিলির উদ্দেশে একখানা চিঠি লেখে! লিলি সেই চিঠি পেয়ে, পত্রপাঠ, যে করেই হোক্ তাকে এসে উদ্ধার করবে।

পকেট থেকে কাগজ পেন্‌সিল বার করে' চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল শিশির। একটু না ভাবতেই, সাঙ্কেতিক একটা ভাষাও আবিস্কার করা তার পক্ষে কঠিন হোলো না—

AE CTT AE TKNR MAK DB—

পত্রবাহক, সে যে মিঞাই হোক্, তার নির্দ্দেশের জন্যে এইটুকু মাত্র লিখে—লিলিকে সে লিখ্‌ল ঃ

AKNA SA J KEY BPD—HAVE READ—AME KEY R BALL BOW—COST-A BHA TK AC—AKN SO-SA—

দরজার ওধারে কী যেন খুট্ করল! শিশির কান খাড়া করল—সে নিজে উৎকর্ণ হোলো বটে কিন্তু তার লেখনী দাঁড়াল না—OK—KLO—OKLO ODK—?

এতখানি লিখে শিশির পড়বার চেষ্টা করে। একী রকম সাঙ্কেতিক ভাষা—এযে একেবারে জলের মত গড় গড় করে' পড়া যাচ্ছে; বুঝতে একটুও দেরি লাগে না। কিন্তু—কিন্তু লিলি বুঝতে পারলে হয়! তাকে আবার বোঝাবার জন্যে শিশিরকে গিয়ে না পড়ে দিতে হয়।

শিশির আদ্যোপান্ত পড়ল ঃ

এই চিঠিটি এই ঠিকানার মেয়েকে দিবি—

এখেনে এসে যে কী বিপদে—পড়েছি—আমি কী আর বলবো—কষ্টে বেচে টিকে আছি—এখেনে এসো—এসে—ও কে? কে এলো?—ও কে এলো ওদিকে?



এই পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে ঃ এর পরে, আর মনে তখন থেকে যে সব ভাবের উদয় হচ্ছে, সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে তার আবেগ প্রকাশ করতে হলে রীতিমত বেগ পেতে হয়। পেন্‌সিল্ থামিয়ে গালে হাত দিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে শিশির।

মাথা ঘামাতে ঘামাতে তার মনে হোলো—ঘর্ম্মবিন্দুর মতই ভাবনাটা ফুটে উঠ্‌ল——ভাষায় এলেই বা কি? না হয় ভাষায় কুলিয়ে ওঠাই গেল, কিন্তু সেই চিঠি—তার সেই সঙ্কেতধ্বনি—লিলির উপকূলে পৌঁছে দিচ্চে কে? আশে পাশে বাধিত করা তেমন বাধ্য গোছের ব্যক্তি কই? থাক্‌বার মধ্যে তো কতিপয় কুকুর,—কুকুরের ল্যাজে বেঁধে খবর পাঠানো চলে, এই ধরণের একটা কাহিনী পর্ব্ব তার কানে গেলেও এসব কুকুরের সম্বন্ধে সে কথা ভাবতেই পারা যায় না। না, ল্যাজ এদের থাক্‌লেও, এরা সে-কুকুরই নয়!

অগত্যা, চিঠি লেখা ফেলে, পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে, অন্য পথে মুক্তির উপায় সে খুঁজতে লাগ্‌ল।

আতিপাতি করে' চারি ধারে তাকিয়ে, ঘরের এক কোণে, ছোট্ট এক কুলুঙ্গিতে হিমানীর শিশির মত কী একটা তার চোখে পড়ল। হাতিয়ে নিয়ে দ্যাখে—হিমানীর শিশিই বটে, কিন্তু হিমানী নেই—থাক্‌লেও এ সময়ে নিজের মুখে চূণকাম করার তার উৎসাহ হোতো কি না সন্দেহ! বরং তার গর্ভে যে বস্তুটী দেখা গেল তার বর্ণ-পরিচয়ে যে কথা বলে তস্য গন্ধ-বিবরণীতেও ঠিক সেই কথাটিরই—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁচচো—সাক্ষ্য দ্যায়। তার নাক জড়িয়ে, তিনজনের মুখেই এক বিজ্ঞাপন—নস্যি ছাড়া আর কিছু নয়!

গ্র্যাণ্ড মামার সবই গ্র্যাণ্ড! যেমন পেল্লায় শরীর—তেম্‌নি পেরকাণ্ড নাক—আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তেম্‌নি একখানা নস্যির ডিবে! তিনজনাই যারপর নাই—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাচ্‌চো—নাকের জলে একশা হয়ে হাত পা মাথা নেড়ে হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাচচো!

হাঁচতে হাঁচতে, মাথা পরিষ্কার হয়ে, তার বুদ্ধি খুলে যায়! এই ত! স্বহস্তেই তো! নিজের সমুদ্ধারের যৎপরোনাস্তি সরল পথ! এই হিমানী মার্কা বৃহৎ ডিবিয়ার ভেতরেই তো সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করছে তার মুক্তির উপায়! এতক্ষণ কি তার নাকের মধ্যে সেঁধয়নি?……

পকেট থেকে রুমাল বের করে' পরিষ্কার করে' মুখ মুছে তাতে বেশ ভালো করে এপিঠে ওপিঠে ওতোপ্রোতো করে' নস্যি মাখিয়ে জানালা গলিয়ে ডালকুত্তাদের সম্মুখে ফেলে দিল শিশির। একে এই ডালকুত্তা তারা গন্ধর্ব্বশ্রেণীর, তার ওপরে গতকাল থেকে বুভুক্ষু—রুমাল পতনের সাথে সাথেই ওদের একজন এসে শুঁকে দেখেছে। আর—আর যেই না শোঁকা—অম্‌নি—অম্‌নি না—

যা একখানা জিনিষ হোলো তাকে অকথ্য না বলে' উপায় নেই। কুকুরের হাঁচি মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার বর্ণনার ভাষা নেই।

দেখ্‌তে না দেখ্‌তে প্রত্যেকেই সেই রুমালটা এসে শুঁকেচে—

আর তার ফলে যে অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য—অশ্রুতপূর্ব্ব কোরাস্—পরমাশ্চর্য্য কাণ্ড সুরু হয়ে গেছে তা বিশদ করে' বলার পক্ষে বাহুল্য মাত্র!

নস্যি-বোঝাই সেই রাম ডিবে পকেটফাই করে' শিশির তর্ তর্ বেগে দড়ি বেয়ে নেমে যায় এবার!

সেই অধঃপতিত রুমালটি হস্তগত করে'—বিদায়চ্ছলে সেই ডালকুত্তাদের মুখের ওপর সেটি নাড়তে নাড়তে—যদি বা তাদের কেউ ওই রকম ব্যতিব্যস্ত অবস্থাতেই মরীয়া হয়ে ভুলবশে তাড়া করে' আসে তাহলে তক্ষুনি তার মুখের ওপর সঙ্গে সঙ্গে নেড়ে দেবে তার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়েই—সেই সমবেত ঐক্যতান ভেদ করে' শিশির সীমান্ত প্রদেশ পার হয়।

কিন্তু না, কুকুরা তাড়া করে না, নিজেদের অন্তর্গত তাড়নাতেই তারা অস্থির হয়ে থাকে—ভেতরের আবেগে এত কাবু যে তাদের বুলি পর্য্যন্ত বেরয় না।

তাদের হাঁচাহাঁচি নাচানাচির ভেতর দিয়ে সহাস্যবদনে শিশির চলে যায়।

তারা অশ্রুপ্লুত লোচনে চেয়ে থাকে ...

## —সতের—

### 'একজনকে রোস্‌ট্ করব একজনকে টোস্‌ট্ করব।'

সেখান থেকে শিশির একছুটে একেবারে মাতুল সমীপে।

"এই নাও মামা, তোমার হারানো ধন! গ্র্যাণ্ডমামার কবল থেকে আমি উদ্ধার করে' এনেছি—সাত রাজার ঐশ্বর্য্য এক মাণিক!"

এই বলে' একটা ডিম্বাকৃতি রত্ন মামার কোলের ওপরে ফেলে দ্যায়।

মামা বিস্ময় বিহ্বল হয়ে রত্নটিকে—দুটি রত্নকেই এক দৃষ্টে দ্যাখেন!

"য়্যাঁ, আন্‌লি? আন্‌তে পার্‌লি তুই!" তাঁর বাক্‌স্ফুর্ত্তি হয়ে বেরয়ঃ "ধন্যি ছেলে তুই, সত্যি!"

"এখন নগদ কিছু টাকা দাও তো আমায়! সাইকেলওলাকে মিটিয়ে দিয়ে আসি। তার ভাড়াকরা সাইকেলটা গ্র্যাণ্ডমামার আস্তানায় খুইয়ে এসেছি।"

মামা সে-কথায় কান দ্যান্ না—তাঁর কানেই যায় না সে কথা। তিনি সেই অপূর্ব্ব



ঐশ্বর্য্যটিকে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, লক্ষ্য করেন—আর তাঁর পর্য্যবেক্ষনের ফাঁকে ফাঁকে শিশিরকে চকিতের জন্যে নিরীক্ষণ করে' নেন।

"সাইকেলওলাটাকে ঠিকানা দিয়ে দাও না! সেই লোক পাঠিয়ে উদ্ধার করে' আন্‌বে।" লিলি পরামর্শ দ্যায়ঃ "তোমার নিজের যেতে চক্ষুলজ্জা হয় আমিই না হয় একটা পোস্‌ট্‌কার্ডে লিখে ফেলে দিচ্ছি। গ্র্যাণ্ডমামা বাড়ীর ছক্ কেটে পথ বাৎলে দিলেই হবে।"

"তাই দেতো ভাই!" শিশিরের ঘাড় থেকে যেন সাইকেলের পাহাড় নেমে যায়। সে আরামের নিশ্বাস ছাড়েঃ "তোর বুদ্ধি খুব! সত্যি লিলি!"

দাদার কাছে,—বিশেষতঃ বিশল্যকরনী উদ্ধার-করে' আনা এরকম বীরোচিত দাদার কাছ থেকে এহেন সার্টিফিকেট লাভ করে' এক গাল হেসে লিলি তক্ষুনি তক্ষুনি চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ছেড়ে দিয়ে আসতে যায়।

মামা স্থাবর রত্নটিকে ট্যাঁকস্থ করে' হন্ হন্ করে' দরদালানে পায়চারি করতে থাকেন—আর এক কোণে দাঁড় করানো শিশিরের দিকে—তাঁর অস্থাবর রত্নটির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকান্। যে রকম লোলুপ নেত্রে দৃক্‌পাৎ করেন তাতে মনে হয়, সম্ভব হলে সমাদরের আতিশয্যে তাকেও ট্যাঁকস্থ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু অতো বড় ধাড়ী ছেলেকে ট্যাঁকে আনা দূরে থাক্—কায়দা করে' কোলে করাই হয়ত কঠিন!

তিনি হন্ হন্ করে' ঘুর্‌পাক্ খান্—আর ঝন্ ঝন্ করে' নতুন টাকার মত কথার টুক্‌রো তাঁর মুখ থেকে খসে পড়েঃ

"উঃ! এই মাণিকটা! কত দাম এর কে জানে। হয়ত বারো লাখ্—কিম্বা সাত লাখ সাতাত্তর হাজারই হবে হয়ত! এক ক্রোড় হলেই বা আশ্চর্য্য কি! এই দিয়ে বোধ হয় একটা জমিদারি কেনা যায়। কিন্তু—কিন্তু—যদি এর দাম দশ বিশ ক্রোড় হয়ে পড়ে—তাহলে—?"

এই সদ্যোজাত সমস্যা আর শিশিরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান্ঃ "তাহলে? তাহলে কি?"

প্রশ্নাঘাতে শিশিরকেই জর্জ্জরিত করতে চান্।

"তাহলে? তাহলে গোটা আসামটাকেই আমরা কিনে নেব। মায় ধুব্‌রি গোয়ালপাড়া গৌহাটি শিলং শিলেট শিলচর লামডিং নওগাঁ শিলঘাট্ জোরহাট্ শিবসাগর তেজপুর তিনসুকিয়া ডিগ্‌রয়্ সব সমেত।"

"সারা আসামটাকেই এই ট্যাঁকে?" প্রস্তাবটা যেন ব্রজেশ্বরকে ধাক্কা মারে—এতদূর—এতখানি তিনি ভেবে দ্যাখেন নি। কিন্তু ভেবে দেখে—আসামের মানচিত্র ভেবে ভেবে আর দেখে দেখে—মনশ্চক্ষু দিয়ে দেখেই প্রস্তাবটা তাঁর মনে লাগে। শিশিরের কথাটা তাঁর

মনঃপূত হয়—তিনি সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ঃ "গোটা আসামটাই এই ট্যাঁকের আসামী ? তা—তা মন্দ কি ?"

"মন্দ কি ?" শিশিরেরও কথাটা খুব মন্দ লাগে না !

পুলকের আধিক্যতায় ব্রজেশ্বর শিশিরকে দুহাতে উঁচু করে' তুলে ধরেন ঃ "ভ্যালা মোর ভাগ্‌নে !" তুলে ধরে' গদ্‌গদ দৃষ্টিতে তাকান ঃ "এমন চমৎকার ভাগনে প্রায় দেখা যায় না !"

বাহুগ্রস্ত শিশির লজ্জায় আর আনন্দে বিগলিত হয়ে ধড়ফড় করে—মামার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মাটিতে পা দিতে পারলেই বাঁচে !

মামা কিন্তু সহজে ছাড়েন না—ভাগ্‌নে আর ভাগ্‌নের প্রতি স্নেহ—দুই তখন তাঁর মাথায় উঠেছে। শিশিরের এহেন মাতুল ভক্তির পরাকাষ্ঠার প্রতিদান দেবার তাঁর বাসনা হয়।

"নাঃ, সামান্য মৌখিক আদরে এই উপকারের ঋণ শোধ হবার নয়। এর সমুচিত প্রতিদান দিতে হবে। ভাগ্‌নেরা যে মামাকে ভালোবাস্‌তে পারে—এতদূর ভালোবাসতে পারে আমি তো জানতুম না !" ব্রজেশ্বরের চোখের কোনে শিশির বিন্দুরা দেখা দেয়।

শিশিরের জামার হাতায় চোখ মুছে তিনি বলেন ঃ "আয় ! লিলিটা গেল কোথায় ? সেও আসুক।"

লিলি ততক্ষণে তার বক্তব্য ডাকবাক্সে পরিত্যাগ করে' ফিরেছে, মামার হাঁকে এসে হাজির হয় তক্ষুনি।

"লিলিও আমার খুব চমৎকার মেয়ে !" মামার স্নিগ্ধ কণ্ঠ বেয়ে স্নেহের ঝর্‌ণা নেমে আসে। দুজনকে সমাদর করে' নিজের ঘরে তিনি নিয়ে যান্।

"বোস্, এই খাটের ওপরে বোস্ তোরা। ততক্ষণ বোস্।"

তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে যান্—তারপরে কি মনে করে' ফের ফিরে এসে—ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শেকল তুলে দ্যান্।

"বেশি দেরি হবে না, আমি এলুম বলে' এই।" এই বলে' বোধ হয় সান্ত্বনা দানের ছলেই বাহির থেকে পুনরায় বলেন ঃ

"ভয় খাস্‌নে ! ভয়ের কি আছে ? তোদের একজনকে রোস্ট্ করব—আরেক জনকে— ?"

আরেকজনকে কি করা যায়, কিভাবে আপ্যায়িত করা যায়—কোন্ সুখাদ্যে পরিণত করতে পারলে বেশী সুস্বাদু হয়—একটু ভেবে ঠোঁট চেটে নিয়ে তিনি জানান ঃ "আরেক জনকে টোস্ট করা যাক্ ? কেমন, টোস্ট্‌ই তো ভালো—তাই না ?" (ক্রমশঃ)

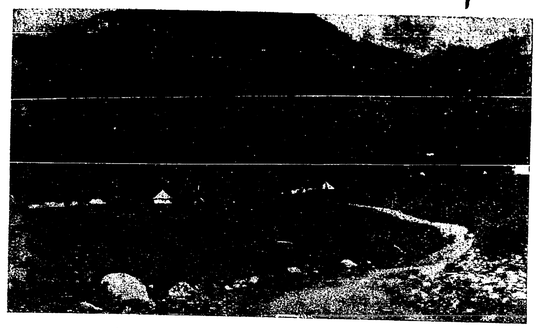

# হিমপ্রবাহে হিমালয়

শ্রীধরণী সেন

হিমালয়ে লিডার উপত্যকা

এক সময়ে উত্তর-ভারতে বিশেষ করে কাশ্মীর প্রদেশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, এমন কি এই প্রদেশের সীমান্ত ছাড়িয়েও বহুদূর পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এক বিরাট হিমপ্রবাহ দেখা দিয়েছিল। সে আজ অনেক হাজার বছর আগের কথা। ভারতবর্ষে যে প্রাচীন প্রস্তর যুগ সুদীর্ঘকাল সময় জুড়ে ছিল, যখন মানুষেরা আজকের মানুষের মত দেখতে ছিল না, যখন তারা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো আর শিকার করে বেড়াত, সেই সময়ে হিমালয়ের ওপর থেকে নীচে উপত্যকায় একবার নয়, বার বার হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে নেমে এসেছিল। প্রস্তর যুগের সমসাময়িক সেই যুগ ছিল তুষার-যুগ। কাশ্মীর হিমালয়ে অধুনালুপ্ত সেই প্রাগৈতিহাসিক হিমপ্রবাহের অনেক আশ্চর্য্য নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের অনেক প্রদেশ আজও হিমপ্রবাহ থেকে রেহাই পাইনি বটে এবং আজও অনেক গ্লেসিয়ার্স তার বিরাট দেহ বিস্তার করে পড়ে আছে দেখতে পাওয়া যায়।

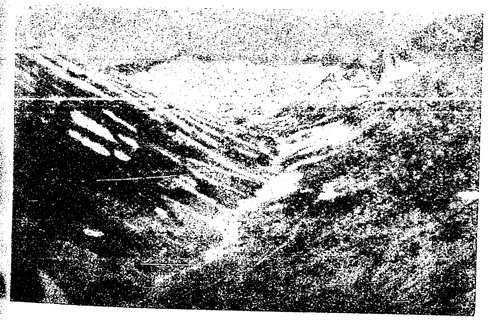

২নং চিত্র—ইউ-উপত্যকায় অমরনাথের পথ

হিমপ্রবাহ থেকে মুক্ত হিমালয়ের অনেক প্রদেশে আজও সেই অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক হিমপ্রবাহের নানা নিদর্শন মেলে। শ্রীনগর থেকে ৬০ মাইল দূরে পাহালগাম, পাহালগাম থেকে ২৭ মাইল উত্তর-পূর্বে অমরনাথ গুহার পথে বিস্তৃত ইউ-উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। এই উপত্যকাগুলি সাধারণ নদীর

উপত্যকার মত নয়, এদের চেহারা অনেকটা ইংরাজি 'ইউ'র ( U ) মত দেখতে, নীচের তল গোলাকার দুধারে বিস্তৃত। হিমালয়ের এই অদ্ভুত উপত্যকাগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই গ্লেসিয়ারের দল। অমরনাথের পথে যেতে যেতে যে ইউ-উপত্যকাগুলি দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করে ছিলাম, তার দু'-একটি ছবি এখানে উপহার দিলাম। দু'নম্বর যে ছবিটি রয়েছে সেই ছবির ডানদিকের অংশে একটি ছোট পায়ে চলার

৩নং চিত্র—ইউ-উপত্যকায় তুষার

পথ দেখতে পাবে—এই পথ হ'ল অমরনাথ গুহা যাবার পথ।

হিমবাহ যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামতে থাকে ( গতি খুব মন্থর ), তখন তার সঙ্ঘর্ষণের ফলে হিমবাহ তার গতিপথের পাথর ভেঙে গুঁড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এই সমস্ত নানা বিচিত্র আকারের পাথরখণ্ড, কাঁকর ও নানা জিনিষ হিমবাহের আশেপাশে সামনে নীচে জমতে থাকে। নীচের দিকে এসে হিমবাহ গলে গেলে এই ভগ্নশেষ অবশিষ্টগুলি পড়ে থাকে—একেই বলে গ্রাবরেখা বা মোরেইন্। সেই অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক হিমপ্রবাহ যার কথা আগেই বলেছি, সেই হিমপ্রবাহের সৃষ্ট নানারকমের গ্রাবরেখা আজও কাশ্মীরে দেখা যায়। আজ সে সব জায়গাগুলিতে আর হিমবাহ নেই কিন্তু তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই গ্রাবরেখাগুলি তার সাক্ষী হয়ে আছে। ক্রমশঃ এই গ্রাবরেখাগুলি সুন্দর ময়দানে বা মার্গে পরিণত হয় এবং তার ওপর ঘাস ছোট ছোট গাছপালা জন্মায়। শ্রীনগরের কাছে

৪নং চিত্র—শেষনাগ



গুলমার্গ গুলমার্গের কাছে খিলানমার্গ এমনি এক একটি গ্রাবরেখা মনোরম একটি ময়দানের মত। আজ গুলমার্গে কত কুঠীর ঘরবাড়ী হোটেল তৈরী হয়েছে। শীতের সময় এ জায়গাটা এমন তুষারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে তখন আর কেউ সেখানে থাকতে পারে না।

কাশ্মীরে হিমপ্রবাহের এই চিহ্নগুলি ছাড়াও পাহাড়ী পাথরের মেঝেতে নানারকম বিচিত্র আকারের দাগ আঁচর গর্ত্তকাটা দেখতে পাওয়া যায়। পাথরের মেঝে কোথাও আবার এত মসৃনও যে মনে হয় কোন যাদুকর এসে যেন পালিস করে দিয়েছে। এই যাদুকর আর কেউ নয়, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার। পাথরের মেঝেতে ঐ গর্ত্ত আঁচর দাগ কাটাও এই গ্লেসিয়ারেরই কীর্ত্তি। তার আসা যাওয়ার পথকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য সে তার অমর কীর্ত্তিকাহিনী পাথরে খোদাই করে গিয়েছে।

অমরনাথ যাবার পথে প্রায় বারো হাজার ফিট উঁচুতে ভাবজান বলে একটি জায়গার কাছে একটি সুন্দর হ্রদ দেখতে পাওয়া যায়, এই হ্রদটির নাম শেষনাগ। এর জল দেখতে ঘন সবুজ। ঘন সবুজ জলে সাদা সাদা হিমশৈল বা বরফখণ্ড ভাসতে দেখা যায়। আর চারিদিকে এই হ্রদকে ঘিরে পাহারা দিচ্চে তুষার ঢাকা চুড়ো-বাঁধা উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি।

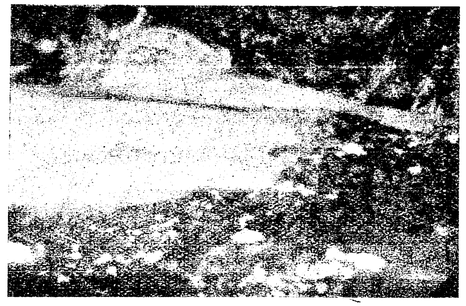

৫নং চিত্র—অমরনাথজী

এই হ্রদটিও সম্ভবতঃ সৃষ্টি হয়েছে হিমবাহের দ্বারা। জায়গাটি ভারী সুন্দর ও কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন। একটা চাপা রহস্য যেন জায়গাটি জুড়ে আছে। লোকে বলে এখানে জোরে কথা বললে নাকি চারিদিকে অদৃশ্য মেঘ ডেকে ওঠে, কুয়াসা ছিঁড়ে নাকি বৃষ্টি নামে আর ওপর থেকে সহস্র পাথরের টুকরো সশব্দে নীচে গড়িয়ে আসে। বলা বাহুল্য আমরা এই রহস্যময় জায়গার অধিষ্ঠাত্রী অদৃশ্য দেবতা বা দানবকে কিছুমাত্র বিরক্ত না করে নিঃশব্দে আমাদের কাজ শেষ করেছিলাম। একটি রাত আমরা এখানে ছিলাম, সে রাতের কথা আমরা কখনও ভুলবো না। শেষনাগের যে ছবিটি আমরা তুলেছিলাম সেটি তোমাদের জন্য এখানে দিলাম।

এমনি করে নানা বৈচিত্রের মধ্যে দিয়ে হিমপ্রবাহে প্রকৃতির নানা বিস্ময় দেখতে দেখতে আমরা আমাদের গন্তব্যপথ অমরনাথ গুহায় একদিন পৌছলাম। অমরনাথগুহাটি একটি

প্রকাণ্ড গুহা এবং পাহাড়টি নামও অমরনাথ। এই গুহায় শুভ্র তুষারের পোষাক পরে বিরাট শিবলিঙ্গ আমরা দেখলাম। সমস্তটাই চাপ সাদা বরফের তৈরী। তোমাদের দর্শনের জন্য অমরনাথের একটি ছবি আমরা দিলাম। কত যাত্রী কত দূর দূর দেশ থেকে কত কষ্ট সহ্য করে এই অমরনাথ দর্শনে আসেন। পথে আমরা প্রায়ই দু'টি একটি যাত্রীদলের দেখা পেয়েছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় একটিও বাঙ্গালীর মুখ আমরা দেখতে পাইনি। তুষারাবৃত এই পাহাড়টি, পাহাড়ের এই প্রকাণ্ড গুহাটি আর গুহার ভেতর ধবধবে সাদা বরফ-পোষাকী অমরনাথজী দর্শন করে আমরা যেন আমাদের জীবন সার্থক করলাম। একটি আরো আশ্চর্য্য বিষয় এখানে বলবার আছে, মাঝে মাঝে এই গুহার ছাতে পায়রা দেখতে পাওয়া যায়। এরা যে কোত্থেকে আসে আর কোথায় যে আবার উড়ে যায় কেউ বলতে পারে না। তীর্থকামী যাত্রীদের বিশ্বাস যদি এই পায়রা দেখতে পাওয়া যায়—তীর্থভ্রমণ নাকি সফল হয়। আমরা যখন গুহায় পৌঁছলাম—তখন একদল এই পাহাড়ী পায়রার দেখা পেয়েছিলাম। তাহলে আমাদের ভ্রমণ সফল হয়েছে বলতে হবে।

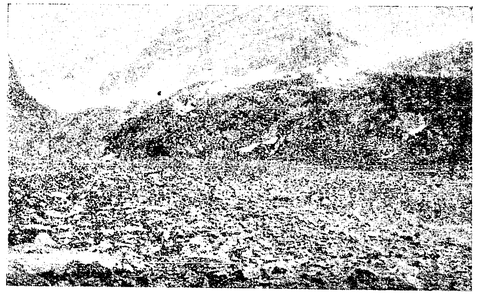

৬নং চিত্র—কোলাহাই পর্ব্বত ও হিমবাহ

পাহালগাম থেকে একদিকে যেমন লিডার উপত্যকা (পশ্চিম লিডার নদী) ধরে অমরনাথ গুহায় পৌঁছান যায় তেমনি আর একটি লিডার উপত্যকা (পূবের লিডার নদী) ধরে পাহালগামের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কোলাহাই হিমবাহ বা কোলাহাই গ্লেসিয়ায় পৌঁছান যায়। সেই রাস্তার বর্ণনা করতে গেলে রংমশালের অনেক পাতা লেগে যাবে কাজেই সে চেষ্টা এখানে করছি না আর সে দৃশ্যও এমনি অসম্ভব সুন্দর যা ভাষায় বর্ণনা করাও দুঃসাধ্য। কোথাও সুগন্ধী পাইন-বনের সারি, কোথাও কুলকুল রবে পাহাড়ী ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে, কোথায় বিস্তীর্ণ তৃণময় ময়দান, কোথাও দিকবিদিক তুষারাবৃত দৃশ্যসার আর কোথাও হিমবাহ আনিত সহস্র সহস্র বিরাট গোলাকার স্তূপাকৃতি প্রস্তরখণ্ড, দেখলে মনে হয়, যেন এই মাত্র একটা প্রলয় হয়ে গিয়েছে। শান্ত অশান্ত প্রকৃতির সহস্ররূপ এই রাস্তায় চোখে পড়ে, কে তার বর্ণনা দেবে? তাই আমি এখানে এই পথের শেষের আমাদের গন্তব্য কেবল কোলাহাই হিমবাহটির কথা কিছু বলব। নীচে এই হিমবাহটির দুটি ছবি



তোমাদের দিলাম। কথার চেয়ে ছবি মুখর। ৬নং চিত্রটি সুবিরাট হিমবাহটির ওপরের ছাতের একটি অংশের ছবি। হিমবাহটি এগার হাজার ফিট উঁচু, এর পেছনে সুউচ্চ কোলাহাই পর্ব্বত-চূড়া (প্রায় আঠার হাজার ফিট)। এই বিরাট হিমবাহের সমস্ত দেহটাই কুচকুচে কালো বরফ চাপের তৈরী। এর দেহের ওপর কোথাও ছড়িয়ে কোথাও একেবারে গেঁথে আছে নানা আকারের নানা পাথর খণ্ড। সমস্ত জিনিষটা খুব মৃদুভাবে থরথর করে কাঁপছে, এর ওপর দাঁড়িয়ে স্বস্তি হয় না, মনে একটা কেমন অজানা ভয় জাগে। মাঝে মাঝে গভীর ফাটল দেখা যায় সে ফাটল পড়লে আর রক্ষা নেই। আমরা সাবধানে পা টিপে টিপে ওপরে উঠে ছবি নিয়ে তেমনি ধীরে ধীরে নেমে এলাম। ৭নং চিত্রটি এই হিমবাহের আর একটি অংশ সামনের অংশের ছবি। এটাকে হিমবাহের শুঁড় (Snout) বলে। এই শুঁড়ের নীচে একটা গুহা বা পকেট থেকে সাদা খরস্রোতা একটি নদীর উৎপত্তি হয়েছে দেখা যাচ্ছে—এই নদীটিই হল আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত লিডার নদী। হিমবাহটি নীচে গলে গলে এর জলের সৃষ্টি করছে। ছবিতে নদীটির যে সাদা রঙটি দেখতে পাচ্ছ এটা শুধু ফেনার জন্য হচ্ছে তা নয়। হিমবাহের চাপে ও ঘর্ষনের ফলে পাথরের টুকরো ঠিক যাঁতা ভাঙ্গার মত সাদা ময়দার মত গুঁড়িয়ে যায় এবং সেই সাদা ময়দাকারে পাথরের গুঁড়ো জলের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় নদীর জল দুধের মত সাদা দেখায়।

৭নং চিত্র—কোলাহাই হিমবাহের শুঁড়—১ম দৃশ্য

হিমাবাহের এই শুঁড়ের সামনে কিছু দূরে আমরা তাঁবু ফেলে একরাত ছিলাম। সে সময়কার একটি ঘটনা বলছি: সমস্ত দিন টো টো করে ঘুরে আর ছবি তুলে খুব তাড়াতাড়ি যেন কতকটা অকালে সন্ধ্যে হয়ে গেল। পাহাড়ের চুড়োয় সূর্য্যের লাল আলো কিছুক্ষণ খেলা করে বিদেয় নিলে আর নিমেষে যেন অন্ধকার নেমে এলো। অভ্যেস বসে মনে হতে লাগল অন্য দেশে এখনও দিনের কাজ শেষ হয়নি, ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলা করছে। কিন্তু এখানে? এখানে প্রকৃতির খেয়ালের ব্যবস্থা একটু বিচিত্র। জায়গাটা একটা সরু উপত্যকার মত, একটা গলির মত বললেও চলে—দুদিকে আকাশ ছোঁয়া কালো পাহাড় পৃথিবী থেকে যেন একে কোন মতলবে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। যা হোক সঙ্গে সঙ্গে আমরা

খাওয়া দাওয়া সেরে আমাদের তাঁবুতে আশ্রয় নিয়ে ভালো করে এঁটে বন্ধ করে দিলাম। কারণ বাইরে এখানে দু'টো ভীষণ জিনিষ হানা দেয়। হিমালয়ের ভীষণ লাল ভাল্লুক আর হিমালয়ের ভীষণ শীত। কাছাকাছি বেশ দশ বারো মাইল লোকের গতাগম্য এমন কি বাস বসতিও নেই।

…তখন ক'টা রাত্রি জানিনা--হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে চম্‌কে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই নিশুতি রাতে এই খাস্ সয়তানদের আস্তানায় হঠাৎ এত জোর একটা শব্দে বুঝে দেখ আমাদের মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল। চেঁচিয়ে পাশের তাঁবুতে আমাদের কুলিদের হাঁক দিলাম—ব্যাপার কি? তারাও জেগে পড়েছে, কিন্তু উত্তর দিলে দু'রকম। একজন বল্লে—ভাল্লুকের ডাক; আর একজন বল্লে—বর্ষা নামবে, মেঘের ডাক। ভাল্লুকের ডাকে ভয় নেই কারণ তাঁবুর ভেতর চারদিক ঢাকাঢুকি দিয়ে আমরা একরকম নিরাপদেই আছি। কিন্তু মেঘের ডাক? যদি এই রাতে এই আঁধারে, এই শীতে, এই জনহীন পাহাড়তলীতে যদি প্রবল বৃষ্টি নামে তা হলে আর আমাদের দেখতে হবে না—সবশুদ্ধ ভাসিয়ে ধুইয়ে মুছে একেবারে আমাদের তাঁবুশুদ্ধ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দেবে। এর ওপর সামনের ঐ কালো বিশাল বপু গ্লেসিয়ার নিঃশব্দে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। ভাবনায় অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। পরে কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাও জানি না।… যখন ঘুম ভাঙ্গল সে কালরাত্রি আর নেই, ভোরের মিষ্টি আলো আমাদের গুডমর্ণিং করলে।

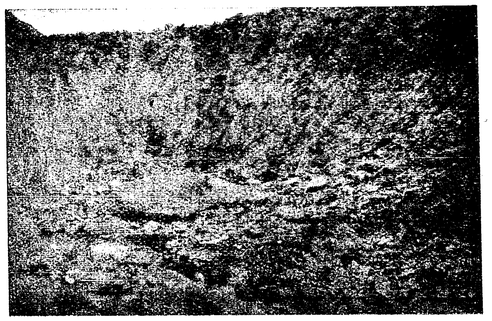

৮নং চিত্র— কোলাহাই হিমবাহের শুঁড়—২য় দৃশ্য

কালকের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে কোলাহাই হিমবাহের সামনে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। হিমবাহের সামনেটা অর্থাৎ শুঁড়ের জায়গাটার একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে। ওপর থেকে নীচে অবধি তার একটা প্রকাণ্ড অংশ একেবারে ভেঙ্গে ধ্বসে নীচে এসে চারিদিক টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। Landslide হলে অনেকটা যে অবস্থা হয়, সেরকম আর কি। তাতেই হিমবাহের শুঁড়ের চেহারা রাতারাতি বদলে গিয়েছে। এবার বুঝলাম রাত্রে সশব্দে এই কাণ্ডটি ঘটেছিল, এরই গর্জ্জন আমরা শুনেছিলাম। এই অবস্থায় হিমবাহটির আমরা একটি ছবি নিলাম। এখন এই ছবিটি ও ৭নং ছবিটি তুলনা করে দেখ। একই জায়গায় ক্যামেরা বসিয়ে তোলা একই জিনিষের দুটি চেহারা।



কোলাহাই হিমবাহকে যতটা আমরা যবুথবু ভেবেছিলাম, দেখছি তা মোটেই নয়। এ থেকে প্রমাণ হয়, হিমবাহ কখনও স্থির নয়, এদের একটা গতি আছে, সে যত মন্থরই হোক। এই গতির জন্য ও সামনের অংশ গলে যাওয়ায় এই কাণ্ড ঘটেছে।

কাশ্মীরের এই যে নানা প্রাকৃতিক রূপ ও দৃশ্য এদের নিজের চোখে না দেখলে সত্যি বোঝা যায় না। হিমালয়ের সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর জায়গাতেই এদের গোপন বাসস্থান। শ্রীনগরে বাবু হয়ে বসে থেকে দূর্বীন দিয়ে এদের দেখা যায় না। ঝিলামের বুকে নৌকো বিহার কালে রঙীন কল্পনাতেও সেগুলো ধরা দেয় না। তাই ওসব ফেলে, পিঠে বোঁচকা নিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে লম্বা লম্বা পাহাড়ী রাস্তা তুষারাবৃত পথঘাট না পার হয়ে চললে কাশ্মীরের আসল অনাবিস্কৃত সৌন্দর্য্য মানুষের চোখে পড়ে না।

বিস্মৃত-প্রায় সেই প্রাগৈতিহাসিক তুষার যুগে এমনি শত শত হিমবাহ সৃষ্টি হয়েছিল —শত শত বাহু বিস্তার করে আশে পাশের সামনের নীচের সব কিছু ভেঙ্গে চুরে একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তার রাস্তা তৈরী করে হিমালয় থেকে তারা নেমে আসতো। এই সহস্র ধারায় হিমপ্রবাহ এক বছর দু' বছর বিশ বছর নয়, সহস্র সহস্র বছর ধরে পৃথিবীর বুকে তাদের লীলাখেলা করে ছিল। আজকের উত্তর পৃথিবীর এই নতুন পটভূমি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের হিমপ্রবাহের অপরূপ রচনা। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর বুকে থেকে এরা দূরে সরে যায়, পৃথিবী আবার ঝলমলিয়ে হেসে ওঠে, শীতের সে নির্ম্মম প্রকোপ আর থাকে না। ক্রমে পৃথিবীর বুকে তৃণভূমি জেগে উঠল, ফলফুলে শষ্যে পৃথিবী শ্যামল সুন্দর হয়ে উঠল। কিন্তু আজও হিমালয় প্রদেশ থেকে হিমপ্রবাহের সে কীর্ত্তিকলাপ একেবারে মুছে যায়নি, আজও হিমালয় তার স্মৃতিচিহ্নগুলি বুকে করে আছে। আর ক্ষুদে মানুষ? ক্ষুদে মানুষ জানে না পৃথিবীর সেই প্রলয়ের প্রারম্ভে, হিমপ্রবাহের সঙ্গে পৃথিবী পৃষ্ঠে যে আবহাওয়ার পত্তন, যে আশ্চর্য্য পটভূমির রচনা সুরু হয়েছিল, সেই রহস্যময় যুগসন্ধিতে সেই মহাপ্রলয়ের মাঝে স্বর্গ থেকে যে আলোকছটা পৃথিবী স্পর্শ করেছিল, ক্ষুদে মানুষ জানে না, সেই এক রহস্যময় মহালগ্নেই তার জন্ম হয়েছিল।

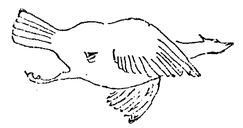

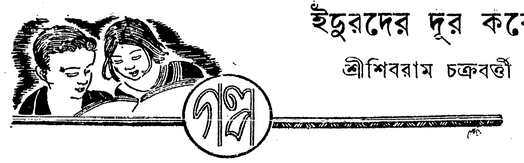


# ইঁদুরদের দূর করো

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

আমার জীবন স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন-করা একটি পৃষ্ঠা—এক ছিন্নপত্রের কাহিনী এখানে বল্‌ব। আমার জীবন স্মৃতির সঙ্গে এই ছিন্নপত্রটি বিজড়িত।

সবে ইস্কুল ছেড়ে মফস্বলের এক কলেজে ঢুকেছি—হোস্‌টেলে থাকি। এক এক ঘরে চারজন ছ'জন আটজনের সীট্‌। সীটের পাশেই পড়ার টেবিল। আর টেবিলের ওপরে আমাদের বইগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো, কিম্বা এখানে ওখানে পুঁজি করা। অথচ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত, আমাদের কাছে পড়ার বইয়ের কী মর্য্যাদাই না ছিল! ইস্কুলে পড়তে, ছোট্ট টেবিলের ওপরে, আমাদের বইগুলি, মলাটের ওপর খবরের কাগজের মোড়ক জড়ানো, সুসজ্জিত হয়ে শোভা বিস্তার কর্‌ছে, এখনো মনে পড়ে। কেউ যদি তখন খবর-কাগজের বদলে, দেয়াল-ক্যালেণ্ডারের বাতিল করা পাতায় পড়ার বই মুড়তে পেয়েছে তার সৌভাগ্যকে আমরা অকপটে ঈর্ষা করেছি। কিছুদিন আগেও, বইয়ের চেয়ে তার জড়োয়া গয়নার দামই বোধ হয় বেশি ছিল। অবশ্যি বইয়ের খাতিরেই—কিন্তু এখন? এখন মলাট দূরে থাক্‌, বইয়ে পর্য্যন্ত ভ্রুক্ষেপ করার আমাদের সময় নেই। বইয়ের চেয়ে তার নোটের দামই এখন বেশি আমাদের কাছে।

কিন্তু সে কথা নয়, সে দুঃখ জানিয়ে কি হবে, পুঁথিপত্র থেকে এখন আমাদের গল্পের ছিন্নপত্রে যাওয়া যাক্‌—

একদিন সকালে, আমার ছোট্ট টেবিলটার ওপর ঝুঁকে—আগের রাত্রে যে এক্‌ষ্ট্রা-টা কিছুতেই মেলাতে পারিনি তাই নিয়ে কাতর হয়ে রয়েছি এমন সময়ে—

ঢং ঢং—ঢ্যাং ঢং—ঢ ঢা ঢং……

সকাল সাতটা না বাজ্‌তেই খাবারের ঘণ্টা?

তবু, খাবারের ঘণ্টা হচ্ছে খাবারের ঘণ্টা—তা ভোর ছ'টাতেই হোক্‌, বা দিনে ছবার করেই হোক্‌—কিম্বা দিন ভোরই হতে থাক্‌! তাকে grudge করবার--গ্রাহ্য না করবার আমাদের ক্ষমতা নেই। কেননা, আমাদের পেটে খিদের ঘণ্টা সব সময়েই বাজ্‌ছে।

ঘণ্টাধ্বনি কানের ভেতর দিয়ে মরমে ভালো করে' প্রবেশ করতে না করতেই, সব ছেলে আমরা, সোরগোল করে' হোস্‌টেলের হেঁসেল ঘরে গিয়ে হাজির।

কিন্তু না, দুঃখের বিষয়, খাবার ঘণ্টা নয়!

হোস্‌টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিজের কি এক দরকার পড়েছে তাই তিনি ঘণ্টার মারফতে এইভাবে আমাদের উদ্দেশে হাঁক ডাক ছেড়েচেন। সেই কারণেই এই এক চিঠিতেই সকলের নিমন্ত্রণ!



খাবারের ঘণ্টা নয়—বরং খাবারের দিকে ঘণ্টা। ভারী দমে গেলুম। ভোগ নেই কিছু নেই, তেমন ঘণ্টাকর্ণপূজায় আমাদের উৎসাহ নেই—সার্ব্বজনীন হলেও না। ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। বেয়ারিং পোস্‌টে ফের যে নিজের বিছানায় ফিরে আস্‌ব—যথাস্থানে ফেরৎ হয়ে চিৎপাত হয়ে যে মনের দুঃখ-লাঘব করব তারও যো নেই—ঠিকানা বদ্‌লি হয়ে ক্ষুণ্ণমনে সবাইকে সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে গিয়ে জমা হতে হোলো।

"দেখেচ? দেখেচ কাণ্ডখানা? ইঁদুরের বাঁদ্‌রামিটা দেখেচ একবার?—"

যাবামাত্রই, এই প্রশ্ন মুখে করে' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এবং বল্‌তে না বল্‌তে, ইঁদুরে-কুরে-খাওয়া, প্রায় সাড়ে তিনভাঁগ সাবড়ে দেয়া, একখানা খামের চিঠি আমাদের সবার চোখের সাম্‌নে তুলে ধরলেন তিনি।

"দেখেচ! চিঠিখানার কিছু রাখেনি! হাড় পাঁজরা ঝর্‌ঝরে করে' দিয়েচে! আগাপাশতলা সব খতম! দ্যাখো দেখি একবার! চেয়ে দ্যাখো!"

আমরা, রবীন্দ্রনাথের কৃত নয়, ইঁদুরদের কাণ্ড—সেই ছিন্নপত্র—উক্ত দুষ্কৃতকর্ম্ম দুচক্ষে নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখলাম। আহত খামখানাকে, যথাসাধ্য দুঃখের ভাণ করে' দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"আমার বাড়ীর চিঠি! পারিবারিক চিঠি আমার। ভয়ঙ্কর জরুরি চিঠি! এখনো এর জবাব দেয়া হয় নি—দ্যাখো তো কীকাণ্ড!"

"খারাপ! খুবই খারাপ!" আমাদের মধ্যে থেকে মনিটার বলে' উঠ্‌ল প্রথম: "ইঁদুরদের এ খুব অন্যায় কাজ একথা আমি বল্‌তে বাধ্য।"

"ইঁদুরদের এটা উচিত হয়নি।" আমিও না বলে' থাক্‌তে পারিনে: "খামটার ওপরে কি 'প্রাইভেট' বলে' কিছু লেখা ছিল না সার্?"

"থাক্‌লেই বা কি? কি তাতে? ইঁদুররা কি প্রাইভেট, পার্‌সনাল, এসব কিছু মানে নাকি?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় ভারী খাপ্‌পা হয়ে উঠ্‌লেন: "তারা কি ইংরেজি পড়তে পারে? না, পড়লে বুঝতে পারে? মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে ওরা?"

"ওর কথা ধরবেন না সার্। ও নেহাৎ ছেলে মানুষ।" বল্লে মনিটার।

"হায় হায়! এখন আমি কী যে করি। কি করে' এর উত্তর দিই! কী যে জবাব দেবার ছিল, চিঠিটার বিন্দু বিসর্গ কিছুই আমার মনে নেই—কিছু মনে পড়ছে না! চিঠিটার ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে গেছি কেবল,—প্রকাণ্ড একটা কেনাকাটার তালিকা ছিল এইটুকুই শুধু স্মরণে আছে!"

ইঁদুরদের অমানুষিক আচরণে, ইতর প্রাণীসুলভ নিতান্ত অভদ্রতায়, এমনই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই কাতর হয়ে পড়েন যে মর্ম্মাহত সমস্ত ছেলের সমবেদনা, আমার সহানুভূতি, মনিটারের সান্ত্বনা কিছুই তাঁকে শান্ত করতে পারে না।

বিস্তর হাহুতাশের পর অবশেষে তিনি ব্যক্ত করেন—"কিন্তু বারম্বার এরকম হলে তো চল্‌বে না। জরুরি চিঠিপত্র সব আমার! ইঁদুরদের তাড়াবার তোমরা ব্যবস্থা করো!—"

এতদিন আমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রুদ্র মূর্ত্তিই দেখে এসেছি, তাঁর বীরোচিত হাবভাব দেখতেই

অভ্যস্ত ছিলাম, সামান্য একটা পত্রের বিরহে তাঁর যাবতীয় বীরত্ব যে এভাবে খসে পড়বে, সমস্তটা এতখানি করুণ হয়ে দেখা দেবে তা কে ভাবতে পেরেছিল ?

কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর বীর-রস ফিরে আসতে থাকে—হঠাৎ তিনি ভয়ঙ্কর চোট্‌পাট্ করে' ওঠেন :

—"না—না–না! ওসব কথা শুন্‌ছিনে! ইঁদুরদের দূর করো। এক্ষুনি তাড়াও ওদের। মেরে ধরে যেমন করে' পারো ভাগাও। আগে ওরা বিদেয় নেবে তারপরে আমি জলগ্রহণ করব।"

মনিটারকে লক্ষ্য করে' কেবল এই হুকুম্‌ই নয়, একটা হুম্‌কিও তিনি পরিত্যাগ করলেন।

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—কি করে' ওদের তাড়াব ?" মনিটার ভারী কিন্তু-কিন্তু হয়ে পড়ে।

"নোটিশবোর্ডে একটা নোটিশ্ লটকে দিলে হয় না ?" কে একজন বলে' ওঠে আমাদের ভেতর থেকে।

"তাছাড়া, তাড়ালে কি ওরা যাবে ? মানে, মানে—তাড়ানো কি যাবে ওদের ?"

মনিটার আম্‌তা আম্‌তা করে' বলবার চেষ্টা পায়। ওর মনের সংশয় ওর চোখে মুখে আর প্রত্যেক কথায় ফুটে উঠ্‌তে থাকে।

"মানে মানে না যায়, অপমান করে' তাড়াও।" আমি বাৎলাই। 'ছেলেমানুষ' বলার—মনিটারের ছেলেমানুষির প্রতিশোধ নিই।

মনিটার আমার দিকে কটকট করে তাকায়।

"হ্যাঁ, আমারও সেই কথা! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় সায় দ্যান্: "সহজে না যায়, উত্তম মধ্যম দিয়ে যেমন করে পারে দূর করো! হ্যাঁঃ, ওদের আবার মান অপমান!"

"দেখুন, ইঁদুরদের আমরা যতই ডিস্‌লাইক্ করিনে কেন, ওরা হয়তো আমাদের ততটা অপছন্দ নাও করতে পারে—"

মনিটার্ ওঁকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করে : "আমরা দূর করতে চাইলেও ওরা হয়তো আমাদের ছেড়ে যেতে চাইবে না। কারণ,—কারণ—"

"কারণ ওদের তো হোস্‌টেলে থাকা-খাওয়ার খরচা দিতে হয় না।" কারণটা কোন্-একটি ছেলে ভিড়ের ভেতর থেকে বিশদ করে' দ্যায়।

"আর অখাদ্য খেয়েও ওরা টিকে থাকতে পারে।" আমি বলে' উঠি।

"ওসব আমি জানিনে! হয় ইঁদুরদের তাড়াও যেমন করে পারো—নয়তো তোমার মনিটারি গেল!"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ এই শব্দভেদী বাণ ছেড়ে—মনিটারের মর্ম্মভেদ করে', ছিন্নপত্র হাতে, প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে রওনা দিলেন।—

আর আমরা সবাই খুসিতে টইটুম্বুর হয়ে উঠ্‌লাম। এই ছেলেটির মনিটারির ওপরে আমরা সবাই হাড়ে হাড়ে চটা ছিলাম। খারাপ খাওয়াতে এরকম ওস্তাদ্ আর দুটি ছিল না। অখাদ্য তবু বা কোনোরকমে সওয়া যায়, কিন্তু তার ওপরে—তারও ওপরে—বোঝার উপরন্তু শাকের আঁটিটির মতো—হোস্‌টেলের ডিউ আদায় করতে যা জোর জুলুম লাগাতো তা অসহ্য। সারা মাস ধরে' এক ঘ্যাঁট চচ্চড়ির গাদা আর সারা মাস ধরে একই তাগাদা—খেয়ে খেয়ে আমরা তো অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। যাক্, ইঁদুর আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—এবার এই দুই জবরদস্তের পাল্লায় পড়ে হতভাগ্য খুব জব্দ হবে, ভেবে আমাদের এমন আনন্দ হোলো যে কী বল্‌ব!



অসহায় দৃষ্টিতে মনিটার একবার আমাদের সবাকার দিকে তাকালো। তারপর সকাতর কণ্ঠে বল্লে : ইঁদুর তাড়াতে হলে কি করে' থাকো তোমরা ?"

"কিচ্ছু করি না।" আমরা একবাক্যে বলে' দিই। "তাছাড়া, সে মাথা ব্যথা তো আমাদের নয় ; তোমার।"

"হুঁ, হয়েছে!—' বড়দরের আবিষ্কারকের মত মুখখানা করে মনিটার অকস্মাৎ লাফিয়ে ওঠে : "ইঁদুরধরা কল। জাঁতিকল যার নাম!—তাই! তাইতো দরকার! এক্ষুনি বাজারে গিয়ে আমি কিনে আন্‌ছি গোটাকতক।

এই বলে ভুরু কঁচকে, আমাদের দিকে দু চোখের দারুণ অগ্নিবাণ হেনে, হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল মনিটার।

সেই সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যের মুখে এক বোঝা জাঁতিকল ঘাড়ে করে মনিটার ফিরে এল। এক আধটা নয়, আটচল্লিশটা জাতিকল, কেবল বাজারে কুলোয়নি, বাড়ী বাড়ী ঘুরে যোগাড় করতে হয়েছে। ইঁদুরদের বজ্জাতির বিরুদ্ধে মনিটারের এবার সশস্ত্র অভিযান।

জাঁতিকলগুলোর মাথায় ছোট ছোট চালের পুটুলির নিমন্ত্রণপত্র লাগিয়ে এখানে ওখানে সেখানে—স্থানে অস্থানে চারধারে সে চারিয়ে দিল। ইঁদুরদের জন্য ওৎ পেতে রাখ্‌ল সব জায়গায়। এমন সব জায়গায়, যেখানে কোনো ভবঘুরে ইঁদুরও ভুলেও কখনো পা বাড়ায় না। আর পা বাড়ালেও—এই সব পাতানো সম্পর্কে—এই ধরণের ফাঁদে পদদান করবে কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। বরং, আজকালকার চালাক্ চতুর যত ইঁদুর—এসব সেকেলে ব্যবহারে—চটে যদি নাও যায়, একটু মুচকি হেসেই চলে যাবে, এই আমার বিশ্বাস।

আমাদের মণিটার কিন্তু খুব সিরিয়স্। এই সব ক্রিয়াকাণ্ড সেরে, ইঁদুর পড়ার প্রতীক্ষায়, সে উৎসুক—একাগ্র—উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না। খানিক পরেই ধারালো একটা তার-স্বর চারিধার বিদীর্ণ করে' ছুটে এল। কিন্তু, কোনো ইঁদুরের কণ্ঠনিসৃত নয়, স্বয়ং আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের।

মণিটার ইঁদুর-তাড়াবার কী যেন সব করেছে তাঁর কানে গেছ্‌ল, তারফলে কতগুলি ইঁদুর এতক্ষণে বিদূরিত হোলো জানবার জন্যে তাঁর তর্ সইছিল না। মণিটারের সঙ্গে সাক্ষাতের লালসায় দোতলা থেকে তর্ তর্ করে তিনি নামছিলেন, এমন সময়ে সিঁড়ির ধাপে, লুক্কায়িত ভাবে অপেক্ষমান একটা জাঁতিকলে পা আটে্‌কে যাওয়াতেই এই আর্ত্তনাদ! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-নির্গত এই তীব্র নিনাদ!

মনিটারের প্রথম শিকার—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তিন তিনটে পায়ের আঙুল!

"কী কাণ্ড! উঃ কি কাণ্ড!"—চেঁচিয়ে হোস্‌টেল ফাটিয়ে, মনিটারকে সামনে পেয়ে তেলে বেগুনে তিনি জ্বলে উঠলেন : "এই তোমার কীর্ত্তি! এই তোমার ইঁদুর তাড়ানো? কী সব মারাত্মক

যন্ত্র!—এক্ষুনি এইসব যন্ত্রণা এখান থেকে খেদিয়ে দাও! হোস্‌টেলের কোথাও যেন এসব যন্ত্রপাতি না থাকে। নইলে তোমার মনিটারি তো গেলই, তুমিও গেলে! ইঁদুর তাড়াতে না পারি, তোমাকে আমি তাড়াবো।"

জাঁতিকলটাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পা থেকে ছাড়িয়ে এনে নিঃশব্দ অধোমুখে মনিটার যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছল। তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আর সেই যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চূড়ান্ত কথাটি বলে দিয়ে বিক্ষত আঙুল তিনটি সযত্নে ধারণ করে'—তখনো তারা একেবারে পদচ্যুত হয়নি—ঠায় এক পায় দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ না মনিটার তার সমস্ত ভয়াবহ কলকৌশল কুড়িয়ে বাড়িয়ে হোস্‌টেলের ত্রিসীমার বাইরে একেবারে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করে' ফিরে এল, ততক্ষণ সিঁড়ির সেই ধাপ্‌টি থেকে আর এক পাও তিনি নড়লেন না।

জাঁতিকলরা চলে গেল কিন্তু ইঁদুরজাতি গেল না—মনিটারের মুরুব্বিগিরি এদিকে যায় যায়! কী করে বেচারী! তক্ষুনি আবার সে বাজারের দিকে রওনা দিল। সেই রাত্রেই নিয়ে এল একগাদা ইঁদুর মারা বিষ—আর দ্বিগুণ উৎসাহে তাই সে ছড়িয়ে দিল হোস্‌টেলের দিগ্বিদিকে।

"এত গন্ধ কেন?" পরদিন সকালে তদারকে এসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে: "এমন বিচ্ছিরি গন্ধ কিসের!"

"মনিটারের গন্ধ সার্।" আমরা বল্লাম।

"মনিটারের গন্ধ? তার মানে?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। বোধ হয় তাঁর নিজের নাকের ওপরেও অবিশ্বাস জন্মে যায়।

"আজ্ঞে, মনিটারের নিজের গন্ধ না।" আমাকেই তাঁর নাসিকা-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দিতে হয়: "ইঁদুর-তাড়ানের জন্যে চার ধারে কী সব ছড়িয়েচে তারই সৌরভ!"

"সৌরভ! ছি—ছি—ছি!" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একবাক্যে ছি ছি করতে লাগলেন: "ভারী বিচ্ছিরি তোমাদের রুচি। নাক বলে' কিছু কি নেই তোমাদের? কোথায় গেল সে অপদার্থটা?—"

হাঁক্ ডাক্ পড়তেই 'সে' এসে হাজির।

"কী এসব ছড়িয়েচ? দুর্গন্ধে আমার গা বমি বমি করছে। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল বলে'। এক্ষুনি এই সব গন্ধমাদন এখান থেকে হটাও।" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গলায় করাত: "তারপরে অন্যকথা।"

"কি করে' হটাবো সার্?" কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্ল মনিটার: "এতো জাঁতিকল না যে সরিয়ে ফেল্‌ব। ইঁদুর মারা বিষ! ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, লেপ্‌টে সেঁটে গেছে চারধারে—একে এখন তুলি কি করে'?"

"এম্‌নি না ওঠে, না উঠ্‌তে চায় যদি—তুমি চেটে সাবাড় করো! অতশত আমি জানিনে!" এই বলে' চটে মটে, চাট্‌বার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে, নাকে রুমাল চেপে চলে গেলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

জনমজুর ডাকিয়ে চারশো বাল্‌তি জল ঢেলে সমস্ত দিন হন্তদন্ত হয়ে হোস্‌টেল সাফ্ করতে হোলো মনিটারকে। একদিনের এই পরিশ্রমেই আধখানা হয়ে গেল বেচারা!



ইঁদুর-মারা বিষ দূরীভূত হোলো। আমরা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলুম।

ইঁদুররা কি করে' এতক্ষণ কাটিয়েছে ওরাই জানে, কিন্তু কাল রাত থেকে রুদ্ধ নিশ্বাসে বাস করে' কী কষ্টই যে গেছে আমাদের, ভাবতেও—উঃ!

মনিটার কিন্তু বেপরোয়া। যে করেই হোক, ইঁদুর তাড়িয়ে তার মনিটারি বজায় রাখ্‌বেই—মরীয়া আর নাছোড়বান্দা! তৃতীয় দিনে বাজারে গিয়ে, সে একটা বেড়াল পাক্‌ড়ে নিয়ে এল। মিশ্‌মিশে কালো বেড়াল। "এইবার জব্দ হবে ইঁদুর!" মনিটারের চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি দেখা যায়: "এই বেড়ালেই ওদের জলযোগ করে' ফিনিশ্ করবে।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁদুরদের পিক্‌নিক্ করার দিকে বেড়ালটির তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ইঁদুরের চেয়ে রান্নাঘরের মাছের দিকেই ওর বেশি আগ্রহ প্রকাশ পেল।

এমন কি, তার ফিনিশিং টাচ্ দিতেও সে দ্বিধা করল না। খোদ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পাত থেকেই মাছের মুড়োটা থাবা মেরে তুলে নিয়ে সট্‌কান্ দিল একদিন!—

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কঠোর মন্তব্যে মনিটারের কুরুচির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করলেন—নেড়ে ছেলের বেড়াল পোষার সখ দ্যাখো! এসব মামার বাড়ীর আব্‌দার এখানে শোভা পায় না, স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিলেন। এবং বেড়ালটার প্রতি কেবলমাত্র কটাক্ষ করলেন, তার বেশি আর কিছু করলেন না। করবার ছিলও না কিছু, কেননা, নাগালের বাইরে গিয়েই মুড়োটাকে গালের ভেতরে নেবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত ছিল।

কিন্তু যেদিন রাত্রে, অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে বেড়ালটার তিনি ল্যাজ মাড়িয়ে দিলেন আর বেড়ালটা খ্যাঁক্ করে' তাঁকে আঁচড়ে কাম্‌ড়ে একশা করল সেদিন আর রক্ষা থাক্‌ল না!

সারা হোস্‌টেলময় সমস্ত রাত তিনি দাপাদাপি করে' বেড়ালেন।—"কী সর্ব্বনাশ, দ্যাখো দিকি! বেড়ালে কাম্‌ড়ালে কী হয় কে বল্‌বে! কুকুরে কাম্‌ড়ালে তো জলাতঙ্ক হয়, ইঁদুরে কাম্‌ড়ালে র‍্যাট ফিভার হয়ে যায়—এখন বেড়ালের কামড়ের ফলে—কি জানি কী যে হবে!—" এই কামড় কতদূর যে গড়াতে পারে ভেবে ভেবে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন।

"হয়তো স্থলাতঙ্ক হতে পারে সার্।" ওরকম ব্যাকুলতা দেখে, তাঁর দুর্ভাবনা দূর করার মানসেই সান্ত্বনাচ্ছলে আমি বলি।

"ম্যাঁ? কি বল্লে? স্থলাতঙ্ক? তাহলেই তো গেছি! বেড়াল্ কামড়ানোয় স্থলাতঙ্ক হয় না কি? কী সর্ব্বনাশ! তাহলে কোন্‌স্থলে গিয়ে বাঁচবো? এবার আমি মরলুম—সত্যিই মারা গেলুম এবার। এই মনিটারের বোকামির জন্যেই এইভাবে বেঘোরে আমাকে মরতে হোলো!"

মনিটার যতই তাঁকে বোঝায় বেড়ালে কাম্‌ড়ালে কিস্‌সু হয় না, সমস্ত কেবল আমার চালাকি, ততই তিনি আরো ক্ষেপে ক্ষেপে ওঠেন:

"হ্যাঁ, কিস্‌সু হয় না! হয় না! তোমার মাথা! তুমি জানো! তুমি জানো সব! ফের যদি তোমার ঐ ইষ্টুপিট বেড়ালকে এই হোস্‌টেলে দেখি তাহলে আমি দেখে নেব! এতই যদি তোমায় বেড়াল পোষায় বাতিক, নিজের বাড়ী নিয়ে সখ্ মেটাতে পারো বাপু!"

এ পর্য্যন্ত মনিটার কোনো রকমে সয়েছিল—এত লাঞ্ছনাতেও কিছু বলে নি, কিন্তু সখের খাতিরে ওর বেড়াল পোষার বাতিক এই অভিযোগে এমন ও শক্ পেল যে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল। আর সহ্য করতে না পেরে, এক গদাঘাতে, সাম্নের মুক্ত দ্বার-পথে বেড়ালটাকে বিবাগী করে' দিল। টি-এম্-ও করে' দিল তৎক্ষণাৎ।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, পেছনের দরজা দিয়ে ফিরে এল বেড়ালটা!

মনিটার এবার ওকে করায়ত্ত করে' ক্রিকেটবলের মতো হাঁক্ড়ে ফের আবার বার করে' দিল। এবং পুনরায় সে ঘুরে এল—এবার জানালা দিয়ে।

মনিটার তার দিকে তাক্ করে' বই খাতা ছুঁড়ে লাগায় আর সেও যার পা সাম্নে পায় আঁচড়ে কাম্ড়ে তার শোধ তোলে। এইভাবে সে একবার খোদ্ প্রিন্সিপালের পা সম্মুখে পেয়ে গেল—এমন হৈ-চৈ-কাণ্ডটা কিসের এই খোঁজ নিতেই তিনি আস্ছিলেন—এখন নিজের পায়েই তার পরিচয় পেয়ে, লেটেস্ট নিউজ্ বহন করে' বিরক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন। যাবার সময়ে শাসিয়ে গেলেন, কাল্কেই তিনি রাষ্টিকেট করে' ছাড়বেন।

তারপর সত্যিই যেন স্থলাতঙ্ক এসে গেল! বেড়ালতো ক্ষেপে ছিলই, মনিটারও ক্ষেপে গেল যেন। প্রিন্সিপাল পরিষ্কার করে' বলে না গেলেও, বেড়াল যে নয়, ওর বরাতেই যে উক্ত রাজটীকা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, কেমন করে' যেন ওর ধারণা হয়ে গেছল। চেঁচিয়ে মেচিয়ে তুল্তামাল্ করে' তীরবেগে বেরিয়ে গেল মনিটার।

তারপর, বহুক্ষণ বাদে, টল্তে টল্তে, কোথথেকে এক খেঁকি কুকুর নিয়ে এসে হাজির হলো সে।

"কই, কোথায় গেল অপয়া বেড়ালটা?" এসেই, চোখ মুখ পাকিয়ে, চারধারে সে খোঁজ করতে থাকে।

এরপর থেকে ঘটনার গতি দ্রুতবেগে ধাবিত হোলো। এবং বেড়ালটাও। কুকুরের আভাস দেখবামাত্রই সে উধাও হশেছিল। আর বেড়ালের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পলকের মধ্যে, ইঁদুররা সদল-বলে ফিরে এল আবার। প্রকাশ্যভাবেই তারা পায়চারি করতে সুরু কর্ল—কুকুরটার চোখের সামনেই অসঙ্কোচে এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল! এবং সেই খেঁকি কুকুরটা ইতিমধ্যে কোনো কাজ না পেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অন্য পায়ে কাম্ড়ে দিয়েছে, খাবার ঘরের বাসনপত্র ভেঙে চুরে তছনছ করে' একাকার করেছে আর রান্নাঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উড়ে ঠাকুরকে, (কুকুরের ধমক্ শোনবামাত্রই তো সে উড়ে দৌড়!) পেয়ারা গাছের মগডালে তুলে রেখে এসেছে।

এবং দুর্ঘটনার ওপর দুর্ঘটনা! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দুর্দ্দশা টের পেয়ে,—বেড়ালের কামড়ের পরে কুকুরের কাম্ড়ানির কথা তাঁর কানে যেতেই,—স্বয়ং প্রিন্সিপাল্ মণিটারকে পরদিবসে রাষ্টিকেট করার বাসনা আপাতত মুল্তুবি রেখে, চাক্রিতে ইস্তফা দিয়ে তল্পি তল্পা গুটিয়ে সেই দণ্ডেই সরে পড়েছেন শোনা গেল।

আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও, এক পায়ে বেড়ালের, অন্য পায়ে কুকুরের দংশন চিহ্ন ধারণ করে, অনন্যোপায় হয়ে প্রিন্সিপালের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না স্থির করেচেন। তাঁর পোটলা পুঁটলি



বাঁধাই কেবল বাকী! আর মণিটার? তার কোনো পাত্তা নেই! খুব সম্ভব, কুকুরকে নিষ্কাশিত করার মৎলবে, হাতী কিনে আনবার জন্যেই সে বাজারের দিকে ধাওয়া করেছে এবার। অন্ততঃ, আমার তো তাই ধারণা!

আমরা বিছানার ওপর টেবিল খাড়া করে' যে যার ছোট্ট টেবিলের ওপরে চেপে কম্পান্বিত কলেবরে দাঁড়িয়ে আছি!

এদিকে ইঁদুররাও সগৌরবে ফ্লের আনাচে কানাচে সর্ব্বত্র ঘুর্ ঘুর্ সুরু করে' দিয়েচে! কোনো দিকে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

আর এধারে কুকুরের লম্ফ ঝম্প দ্যাখে কে!

---

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুধিবায় সুচারুরূপে করাতে হলে ১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কন্ট্রাকটার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

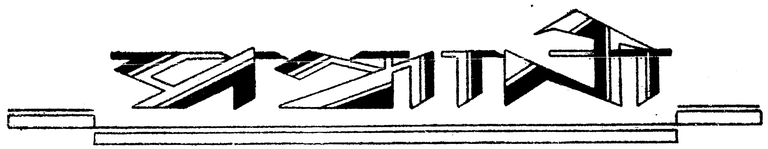

## নূতন বছর

চৈত্র রজনীর অন্ধকারে ১৩৪৮ সাল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিদায় নিয়ে গেল, সঙ্গে নিয়ে আমাদের সারা বছরের সঞ্চিত ক্লান্তি আর অবসাদ।

১৩৪৯! দুর্য্যোগ এবং ঝঞ্ঝার মধ্যে হল ১৩৪৯এর আবির্ভাব। আবার সুরু হবে নূতন করে পথচলা নূতন আশায় নূতন উদ্যমে। নূতন কাজ সুরু হয় সব দেশেই নানান মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বছরের প্রথম দিনটিও তাই আরম্ভ হয় উৎসবে এবং আনন্দে। তোমরাও হয়ত উঠেছ ভোরের আবছা অন্ধকারে, স্নান করে নূতন কাপড় পরে হয়ত জড়িয়েছে মাথায় আধফোটা বেলফুলের মালা, কেউবা নিয়েছ হাতে একটি গন্ধরাজের কুঁড়ি, কারুর বা ছাদের উপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসেছে সঙ্গীতের আসর—গানের রসে মনকে স্নিগ্ধ করে নিয়ে সুর হবে দিনের কাজ। এত গেল নববর্ষের উৎসবের আধুনিক সংস্করণ! আর বাদের বাড়ী ঠাকুরমা দিদিমার যুগ তারা—? তারা সব চলেছে গঙ্গাস্নানে, ফিরে এসে সাজি ভরে ফুল বিল্বপত্র নিয়ে হবে নানান রকম অনুষ্ঠান, কেউবা আরম্ভ করবে পুণ্যিপুকুর কেউবা শিলশিলাটন ব্রত। আর ছেলেদের জন্যে মায়ের তদারকে রান্নাঘরে চলেছে বিরাট ব্যাপার—পায়েস পরমান্নের আয়োজন। শেষেরটা সব দেশেই নববর্ষের উৎসবে দেখতে পাওয়া যায়।

ঘর থেকে এসো রাস্তায়—যেখানেও আজ উৎসবের আয়োজন সেই উৎসবের আভা আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় ম্লান হলেও মিলিয়ে যায় নি। দোকানগুলো আজ আর নীরস বেচাকেনার জায়গা নয়, গতবছরের হিসাব নিকাশ মিটিয়ে আজ সেখানে নূতন খাতার উৎসব, শুভেচ্ছা এবং হৃদ্যতার বিনিময়! সহরের কোলাহল ছাড়িয়ে, মাঠ পার হয়ে নদীর ধার দিয়ে চলো গ্রামের প্রান্তে; নববর্ষের প্রারম্ভে নির্জ্জীব গ্রামও নূতন সম্ভাবনায় সজীব হয়ে উঠেছে, বসেছে মস্ত বড় মেলা, লোকজনের কোলাহল, নাগরদোলা, ভানুমতীর খেলা, হাসি আর গান।

১লা বৈশাখ নববর্ষের প্রথম তারিখ। শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই ১লা বৈশাখের দিনটিতে নানা রকম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেলা মন্দির দর্শন, পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান, পিতৃপুরুষকে জলদান আমাদের দেশের নববর্ষের উৎসবের বৈশিষ্ট্য। নববর্ষের শুভদিনটিতে আমরা ভুলিনা মন্দিরে প্রিয়পরিজনদের মঙ্গল কামনায় পূজা দিতে আর ভুলি না যাঁরা এই জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করতে।



আমাদের দেশে কিন্তু নববর্ষের দিন ছোট ছেলে মেয়েদের নিজস্ব কোন উৎসব নেই।—বিলেতে ছোটছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে গান করতে করতে নববর্ষের দিন (১লা জানুয়ারী) একটা ঘোড়ার মাথার খুলিকে সাজিয়ে বাড়ী বাড়ী নিয়ে ঘোরে। সঙ্গে থাকে তিনটি কাঠির পা করা, মাথায় পাতা আর গমের শীষ দিয়ে ঢাকা ময়দার গুঁড়ো (বরফের প্রতীক) ছড়ান কমলা লেবু কিংবা আপেল। ইটালির ছেলে মেয়েরাও নববর্ষের দিন খুব মজা করে। ওদের ধারণা নূতন বছরে প্রথম যে জলটি তোলা হয় তার একটি বিশেষ গুণ থাকে। ওদের দেশের ছেলেরা তাই নববর্ষের দিন কূয়ার ধারে বসে থাকে। মেয়েরা জল আনতে এলে পুরস্কার স্বরূপ কিছু না দিলে জল নিতে পায় না।

ফ্রান্স জার্ম্মাণী বেলজিয়ম প্রভৃতি ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশেই নাচগান পানোৎসবের দ্বারা নববর্ষকে আহ্বান করা হয়। স্পেনে আতসবাজী পোড়ান ও দীপালী উৎসবের একটী বিশেষ অঙ্গ। চীনদেশেও নববর্ষের দিন এই বাজীপোড়ানর, প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। পারস্য দেশের 'নওরোজের' কথা তোমরা অনেকেই জান। তেরোদিন ধরে এই উৎসব চলে ও সহরের বাহিরে বনভোজন হয়।

তিব্বতে নববর্ষের উৎসবে নাচই প্রধান অঙ্গ। মুখোস নৃত্য, কঙ্কাল নৃত্য ও পিশাচ নৃত্য ইত্যাদি বিচিত্র রকমের নাচের কথা শোনা যায়। উৎসবের শেষে আবার দলাইলামার পোষাক শোভাযাত্রা করে নিয়ে একটি সিংহাসনে রাখা হয়। সিংহাসনের সামনে রকমারী খাবার জিনিষ থাকে সেগুলি সকলে লুঠপাট করে কাড়াকাড়ি করে নেয়। উৎসবশেষে আবার একটি নাচ হয়।

সর্ব্বজাতির মধ্যে লাঠি ও ঘণ্টা দিয়ে নববর্ষকে আহ্বান করার প্রথা দেখা যায়; যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে ত লাঠি নিয়ে গিয়ে তাকে সবাই জাগিয়ে তবে ছাড়বে।

নববর্ষ যাতে সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ হয় ও শান্তি ও কল্যাণময় হয়, তার জন্যও বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান হয়। স্কটল্যাণ্ডে অমঙ্গল দূর করবার জন্য একটি ধুমায়িত ঝাউগাছের শাখা ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়ে আনা হয়। প্রথম আগন্তুক নববর্ষের দিন শূন্যহাতে গেলে নাকি গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। গ্রীসের অধিবাসীরা জলপাই গাছের ডাল দিয়ে পরস্পরের দেহ স্পর্শ করে সুখ সৌভাগ্য আহ্বান করে। রুমানিয়াতে ভুট্টার দানা গায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার রেওয়াজ দেখা যায়। লিথুয়ানিয়াতে নববর্ষের দিনে তিনখানি রুটি একসঙ্গে একটি বাটির নীচে চেপে রাখা হয়। রুটির আকার দেখে বছর ভালো যাবে কি মন্দ যাবে ঠিক করা হয়। চীনারা মধ্যরাত্রে ঘরের দরজায় দ্বার দেবতার ছবি বা মন্ত্র লেখা কাগজ আটকে দেয়। জাপানে নববর্ষে সমস্ত দোকানের সামনেই খড়ের দড়ি ও ঝাঁটা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ইউক্রেইণে কৃষকেরা টেবিলের উপর গমের গুচ্ছে একটি পিঠে লুকিয়ে রাখে। খাবার টেবিলে অতিথিরা বসলে গৃহস্বামী মঞ্জরীগুচ্ছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখা যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। সবাই 'না' বলার পর সকলে ওই পিঠেটি খেয়ে ফেলে। এতে নাকি ক্ষেত্রের শস্য খুব ভাল হয়। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার কোন কোন জায়গায় কৃষকেরা আবার আস্তাবলে ও গোলাঘরে গন্ধদ্রব্য পোড়ায় ও তীর্থ জল ছিটায়। ইহুদীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে মধুর মধ্যে রুটি ডুবিয়ে পরমেশ্বরের নিকট বৎসরের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করে। বেলজিয়মে ছোট ছোট ছেলেরা ঘরের চাবিগুলো হস্তগত করতে চেষ্টা করে যদি বাড়ীর যদি কোন বয়স্ক লোক ঘরে থাকেন ত তাকে বন্ধ করে দেয়। নববর্ষের দিন যদি ভাঁড়ার ঘরে

যথেষ্ট খাবার না থাকে তাহলে নাকি সারা বছরই খাবার জিনিষের অভাব হয়। এই সংস্কার থেকেই সম্ভবতঃ নববর্ষদিনে প্রত্যেক দেশেই খাবারের বিশেষ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

নূতন বছরে উৎসব করবার রীতি কবে থেকে যে সুরু হয়েছে, তা সঠিক বলা যায় না। হাজার হাজার বছর আগে লোকে নূতন বছর আসা দেখবার জন্য রাত জেগে থাকত। নূতন বছর যে চিরকাল একদিনেই হচ্ছে তাও নয়। ইজিপ্টে আগে আগষ্টের শেষে বছর আরম্ভ হ'ত। জুলিয়াস সীজারের রাজত্বের আগে পর্য্যন্ত রোমদেশে মার্চ্চমাসেই ছিল বছরের প্রথম মাস। ইংলণ্ডেও ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের আগে পর্য্যন্ত ১লা জানুয়ারীর বদলে ২৫শে মার্চ্চ বসন্ত ঋতুর সময় নববর্ষ সুরু হ'ত। আমাদের দেশেও পূর্ব্বকালে অগ্রহায়ণ মাস থেকে নূতন বছরের আরম্ভ ধরা হ'ত; কৃষিজীবীদের পক্ষে ওই সময় থেকেই বৎসর গণনা করা সুবিধার ছিল আর সেই জন্যই বৎসরের প্রথম মাস অগ্রহায়ণ এই নাম হয়। এই সময় এখনো নবান্ন উৎসব হয়। সম্ভবতঃ আমাদের দেশে এই নবান্ন উৎসব থেকে, এবং ইয়োরোপে শীতের জড়তার মুক্তি জনিত আনন্দ থেকে, নববর্ষের উৎসবের জন্ম হয়।

# চলন্তিকা

## জীবন্ত সমাধি—

বছর পনের আগে একজন মিশর দেশীয় ফকির হামিদ বে তিন ঘণ্টার জন্য স্বেচ্ছায় কবরস্থ হয়ে সমস্ত ইউরোপকে স্তম্ভিত করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি একজন যোগী ব্রহ্মচারী রামস্বরূপ কাশীতে স্বেচ্ছায় জীবন্ত অবস্থায় ছয়মাস কালব্যাপী মাটির নীচে কবরস্থ ছিলেন। মাটির নীচে এই কবর চারিদিক থেকে বন্ধ করা হয়েছিল এবং যোগী রামস্বরূপ কবরে প্রবেশ করবার আগে জনসাধারণ ও পুলিস কবরটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। গত বছর ২৫শে সেপ্টেম্বর যোগী রামস্বরূপ কাশির জনসাধারণের সামনে এই কবরে প্রবেশ করেন। ছয় মাস তাঁর সাড়াশব্দ ছিল না। ২১শে মার্চ্চ ১৯৪২ সালে কবরটি বহু পরিশ্রমের পর খোলা হয় ও যোগীকে শায়িত কিন্তু জীবন্ত অবস্থাতেই দেখা যায়। তিনি হাত তুলে ইঙ্গিতে জানান যে তিনি জীবিতই ও জাগ্রতই আছেন। কবরস্থ হবার আগেও যেমন তাঁর চেহারা ছিল, ছয়মাস কবরস্থ হয়েও তার শরীরের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। কেবল তাঁর পরণের কাপড় কিছু কিছু নষ্ট হয়েছে ও তাঁর দেহে কোন কোন অংশে উই পোকা বাসা বেঁধেছে। হাজার হাজার লোক এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত ও অভিভূত হয়েছিল। ব্রহ্মচারী রামস্বরূপের এই ছয়মাস কাল জীবন্ত সমাধি অবস্থায় কিরূপে মৃত্যু জয় করলেন, ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে কি বলেন তার অপেক্ষায় আমরা রইলাম।



## হকি-লীগ প্রতিযোগিতা—

বহুদিন ধরে জল্পনা কল্পনা চলছিল এ বৎসর কোন্ দল হকি চ্যাম্পিয়ান হবে। যাক্—গত ৫ই এপ্রিলের খেলায় কে হকি-লীগ চ্যাম্পিয়ান তা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এইদিন রেঞ্জার্স দল রেলওয়ে দলের কাছে হেরে গেল ও পোর্ট কমিশনার্স দল বি জি প্রেসকে চার গোলে পরাজিত করলে। পোর্ট কমিশনার্স ২৭ পয়েণ্ট লাভ করে হকি চ্যাম্পিয়ান হলেন। ২৬ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন মিলিটারী মেডিক্যালস্ দল। এই দলটি এবার খুব ভাল খেলেছে। গত বছরের লীগ জয়ী পুলিশ দল এবার কিছুই সুবিধে করতে পারেনি। পোর্ট কমিশনার্স দলই এবার শ্রেষ্ঠ দল ছিল। এই দলে পাঞ্জাবের দুইজন বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন—চিরঞ্জীব ও কাপুর। এ ছাড়া প্রসিদ্ধ গোলকীপার এ্যালেন ছিলেন এই দলে! বোধ হয় সমস্ত ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ গোলকীপার ইনি। বলতে গেলে এঁরই সাহায্যে পোর্ট কমিশনার্স চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে! গত বছর যখন পোর্ট কমিশনার্স লীগে চতুর্থ হয়েছিল তখন কেউ ভাবতে পারেনি যে এই দল ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়ন হবে।

বাইটন হকি খেলা সবেমাত্র সুরু হয়েছে। মোহনবাগান দল এর মধ্যেই হেরে গেল। আগামী মাসে বাইটন খেলা সম্বন্ধে আমরা বলতে পারব।

## ভারত আক্রমণ—

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সবাই বলতো, ভারত থেকে যুদ্ধ এখনও দূরে, কেউ বড় জোর বলতো যুদ্ধ ভারতের দোরে। আজ আর সে সব কথা বলবার জো নেই। যেদিন কলম্বো ও ত্রিঙ্কোমালীতে বোমাবর্ষণ হ'ল তখন মনে কে ভেবেছিল এবার আর বোমা থেকে ভারতের মুক্তি নেই। হ'লও তাই, ভিজাগাপটম্ ও কোকনদে শত্রু হানা দিয়ে বোমাবর্ষণ করল। ক্ষতি কিছু হোক বা না হোক, বোমা পড়াটাই হল প্রকাণ্ড খবর। এবং এবার আমাদের সকলকেই সত্যিই বিপদের জন্য সাহসে তৈরী হয়ে থাকতে হবে। ভারত-আক্রমণ বেশ জোর সুরু হয়েছে বলতে পারা যায়। বঙ্গোপসাগরে শত্রু জাহাজ ও এরোপ্লেন হানা দিচ্ছে। কয়েকটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ শত্রু বিমান ও টর্পেডোতে জলমগ্ন হয়েছে এবং কয়েকটি বাণিজ্য জাহাজও জলমগ্ন হয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ভারতের যুদ্ধ নির্ম্মম ভাবে সুরু হয়েছে। এর কিছু দিন আগে এক রাতে কলকাতায় বিপদের আশঙ্কা জানিয়ে সাইরেন বেজেছিল। তখন পূর্ণিমা রাত ছিল। পূর্ণিমায় কলকাতা সহর প্রায় দিনের মতই স্পষ্ট। ভবিষ্যতে এই পূর্ণিমা রাতের সুবিধে নিয়ে কলকাতায় শত্রুর বিমান আক্রমণ কিছুই আশ্চর্য্যের হবে না। কলকাতায় জনসাধারণকে নানাভাবে সাবধান করা হয়েছে ও কলকাতা রক্ষা কল্পে নানা আয়োজন ও ব্যবস্থা হয়েছে।

## চুটকি খবর—

এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে বলে যে খবরটি প্রচারিত হয়েছিল, সে খবরটি নাকি সত্য নয় বলে পুনঃ প্রচারিত হয়েছে।

লণ্ডন থেকে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড্ ক্রিপ্‌স্ দিল্লীতে এসেছিলেন। তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে গিয়েছেন। তিনি যে কাজ নিয়ে এসেছিলেন তা'তে তিনি সফল হ'ন নি। ভারতবর্ষকে এক 'নতুন ধরণের' স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব নিয়ে তিনি এসেছিলেন। ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ইংরাজদের তৈরী 'নতুন ধরণের' স্বাধীনতার প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করেছে।

বার্ম্মার যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই।

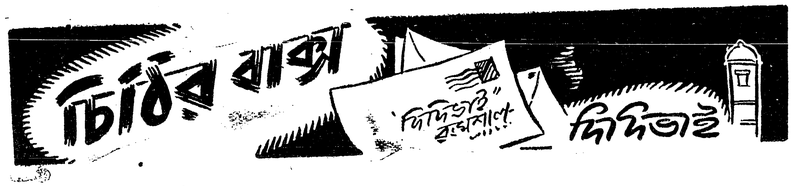


**রংমশালের প্রিয় ভাই-বোনেরা আমার—**

একটি বছর দেখতে দেখতে অতীত হ'লো, নতুন বছর এলো। বিগত বছরে আমরা অনেক কিছু করবার আশা করেছিলাম। তোমাদের আরো আনন্দ দেবার, তোমাদের মনকে আরো উজ্জ্বল করে তোল্‌বার পরিকল্পনা আমাদের ছিল। আমাদের সে-সব আশা, সে-সব পরিকল্পনা পূর্ণভাবে সার্থক না হলেও একেবারে ব্যর্থ হয় নি, এতো তোমরা জানো। রংমশাল তোমাদের আনন্দ দিতে পেরেছে একথা তোমাদের কাছ থেকে জান্‌তে পেরে এই দুঃসহতম দিনেও আশায় আমরা বুক বেঁধেছি—তৃপ্তি পেয়েছি। ত্রুটি যে ছিল আমাদের অনেক তা আমরা অস্বীকার করি না—আমরা জানি—যে ত্রুটি আমাদের অনিচ্ছাকৃত, সে ত্রুটির জন্য তোমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখ্‌বে না। তবু বলি, গত বছরের সব ত্রুটি বিচ্যুতি তোমরা ক্ষমা করে নিও।

জীর্ণ মুমূর্ষু পৃথিবীর ওপর নতুন বছরের নতুন আলো এসে পড়েছে। এ আলো কি পৃথিবীর এই সংঘাতের ও অবিশ্বাসের অন্ধকার দূর করে দেবে? সমস্ত পৃথিবী আজ বিপন্ন; ভারতবর্ষের ওপরেও মেঘ ঘনঘোরে করেছে। বাংলাদেশের চারিদিকে ভীত সন্ত্রস্ত জনতার পদধ্বনি, সবার মুখে নিরাশার বেদনার ও আঘাতের মসী চিহ্ন। জগতে আস্‌ছে বিপুল পরিবর্ত্তন। এ পরিবর্ত্তন হয়তো সমস্ত জগতের চেহারাটা বদ্‌লে দেবে। এই



পরিবর্ত্তনের জন্য পৃথিবীর অগ্নি পরীক্ষা সুরু হয়েছে। আমরা যে দেশে আছি—তা পৃথিবীর বাইরে নয়, তাই আমাদের মনও এই অগ্নি পরীক্ষার ভয় চকিত ও ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি। কিন্তু তোমাদের মনে রাখ্‌তে হবে সব জিনিষই গ্রহণ করতে গেলে তার উপযুক্ত দাম দিতে হয়—আমরা সে মূল্য দিতে বিরত থাক্‌বো? গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে নগরে ভীত-চকিত পদে পালিয়ে বেড়ালেই কি বিপদ-মুক্ত হতে আমরা পারবো? তোমরা যেখানেই যাও না কেন, যেখানেই থাক না কেন—বিপদকে ঠিক বিপদ হিসাবে গ্রহণ করবার স্পর্দ্ধা রেখো, এড়িয়ে গেলেই বেঁচে থাকা যাবে না! সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে দল গঠন করো প্রতি পল্লীতে গ্রামে নগরে। এসব সঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য হবে সমষ্টিগত সেবা সাহায্য ও ঘরে বাইরের যাবতীয় উৎপাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। নিজের পল্লী, নিজের গ্রাম—নিজের দেশ সেবা করার শুভক্ষণ এসেছে। এ শুভক্ষণ ব্যর্থ হতে দিও না। নিজেদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করো। ঘরের ও বাইরের উৎপাত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার সনাতন অস্ত্র লাঠি তোমাদের প্রত্যেকের হাতে উঠুক। শুধু বাহু নয়, মনও বলিষ্ঠ করতে হবে। নববর্ষের অভয় মন্ত্রের সেই দীক্ষা নাও।

নতুন বছরের নতুন আলোর দিকে তাকিয়ে তোমাদের কথা ভাব্‌ছি। ভাব্‌ছি কবে তোমরা আলোর দীপ্তি নিয়ে এমনি করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে? কবে তোমরা বৃহতের দিকে সুন্দরের দিকে এগিয়ে যাবে। কবে জাগ্‌বে স্বাধীন ভারতের মিলিত ভারতের স্বাধীন ছেলে মেয়ের দল? আমি স্বপ্ন দেখি—তোমরা চলেছ এগিয়ে ভারতের অগণিত কিশোর কিশোরী—বলদৃপ্ত জয়দীপ্ত তোমাদের মন। দৃঢ় পদক্ষেপে চলেছ এগিয়ে, সামনে উড়ছে তোমাদের কিশোর পতাকা। তোমাদের যাত্রাপথের দু'ধারে তোমরা ভালকথা ভাল কাজ ভালবাসার বীজ ছড়িয়ে চলেছ এই আশায় যে পৃথিবী আবার সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে, সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বে।

কোলকাতা সহরের নির্জ্জন কোণে বসে তোমাদের সেই আনন্দ অভিযানের স্বপ্ন-চিত্র আঁক্‌ছি। নতুন বছরের নতুন আলোর আশীর্ব্বাণী তোমরা লাভ করো—

এবার এসো তোমাদের চিঠি পত্রের জবাবগুলো—

**অমিয়কুমার ঘোষাল, রংপুর।** তোমার চিঠি পেলাম। তোমার রংমশাল রীতিমত যাবে। যা শুনেছ তা বাজে কথা—তোমাদের রংমশাল তোমাদের সকলের কাছে যাচ্ছে এবং নিয়মিত যাবেও—প্রবাসে রংমশাল তোমাকে ও তোমার বন্ধুদের আনন্দ দিচ্ছে জেনে খুসী হলাম খুব। **গিরীন্দ্রনাথ রায়, নৈহাটি।** রংমশালের নতুন কার্য্যালয় হয়েছে টালিগঞ্জে—রংমশালে সে-কথা জানানো হয়েছে এবং ঠিকানা দেওয়া হয়েছে দেখোনি? তোমার প্রশ্ন গুলোর প্রথমটির উত্তর আমার জানা নেই। দ্বিতীয়টির উত্তর—জার্ম্মানীতে রাজা উজির কেউ নেই, এক-নায়কত্ব সেখানে, খোদ-কর্ত্তা হলেন হের হিট্‌লার—ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী পেঁতা আর জাপানের—তোজো। তৃতীয়টির উত্তর—আয়তন অনুযায়ী ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারে। তবে ৫০০ গজের ভেতরে পড়লে অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়। **নৃপেন্দ্রনাথ দাস, বাঁকুড়া।** আমি তোমাদের প্রত্যেকের কথা প্রতিদিন মনে করি—হাতে লেখা পত্রিকা চালাচ্ছো, ভাল কথা। আমার গল্প প্রবন্ধ? তাহলে আরো ১৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে কারণ তোমাদের জন্য গল্প কবিতায় আমাকে নতুন করে হাতে খড়ি দিতে হবে। **লালমোহন ভট্টাচার্য্য, কালিখাই।** ব্যস্ত থাকায় তোমার লেখনী বন্ধু পাঠান হয় নি, রাগ করো না যেন।

লেখনী বন্ধু পাঠাচ্ছি—স্থান পরিবর্ত্তন ও বর্ত্তমানের বিপ্লবের জন্য যে দেরী হচ্ছে তার জন্য না রাগ করে একটু অপেক্ষা করো! **সতীনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটি**। না, তোমাকে ভুলে যাই নি। এতদিন চিঠি দাও নি কেন! তোমার পাঠানো ডাক-টিকিট পেয়েছি লেখনী বন্ধু পাঠিয়ে দেবো। **মনিমালা, পাটনা** কলিকাতা পলাতকা তুমি। রবীন্দ্র স্মৃতি পদক তোমার কথা মতো, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো—আমি কোলকাতায় আছি। **অমিতরঞ্জন রায়চৌধুরী কলিকাতা**। তোমার চিঠি মন দিয়ে পড়েছি—এবং তোমার অভিযোগ পরিচালক মহাশয়কে জানিয়েছি। এ মাসে তাঁর লেখা 'রংমশালের আদর্শ' পড়ে দেখো—সব বুঝ্‌তে পারবে। পুরানো গল্প বলে যা অভিযোগ করেছ তা অমূলক। একই লেখা বিভিন্ন জায়গায় ছাপান নিন্দনীয়; কিন্তু একই বিদেশী গল্প বিভিন্ন লেখক অনুবাদ করে যদি বিভিন্ন জায়গায় ছাপান, তাতে নিন্দা করবার বা পুরানো বলে উড়িয়ে দেবার মতো স্পর্দ্ধা কারো থাকা উচিত নয়। গর্কির মাদার এ দেশে বিভিন্ন লেখক অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন—কি তা পুরানো বলে উড়িয়ে দিতে পারবে? যোগ্য অনুবাদকের হাতে পড়লে অনুবাদ সুন্দর হয়ে উঠে—এই সৌন্দর্য্যের দিক থেকে এসবগুলো বিচার করতে হয়। চিঠির বাক্স সম্বন্ধে তোমার মতামত জেনে খুসী হলাম। চিঠির বাক্সে তোমাদের সকলের চিঠির উত্তর দেবার মতো প্রতি মাসে যা লিখি তা চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে পড়ো—আর কি বল্‌বো। **হৃষিকেশ দে, শ্রীহট্ট**। অনেকদিন তোমার চিঠি পেয়ে ভাল লাগ্‌লো। তোমরা যারা পুরানো তারা মাঝে মাঝে দেখা দাও হঠাৎ। তোমার কথা পরিচালক দহাশয়কে জানিয়েছি। উপন্যাস গুলোর কী ব্যবস্থা হয় দেখো। **অরুণকুমার গুপ্ত, গৈলা**। তোমাকে সাদরে রংমশাল দলে টেনে নিলাম। লেখনী বন্ধু পাঠিয়ে দেবো—তোমাদের যদি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকে, কোন সমস্যা থাকে, তাহলে আমায় জানাতে পারো, সম্ভব হলে আমি উত্তর দিই। তোমাদের ভেতরে সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের বন্ধুত্ব ও সখ্যতা বাড়াবার জন্য চিঠির বাক্সর অস্তিত্ব। **বরুণ রায়, জঙ্গীপুর** সম্পাদক মহাশয়কে তোমার অনুরোধ মতো ঐ ধরনের উপন্যাস লেখ্‌বার জন্য অনুরোধ করবো। পরিচালক মহাশয়কে তোমার কথা বলেছি। এ মাসে তাঁর লেখা রংমশালের আদর্শ টা পড়ে দেখো—তাহলে সব কিছুর উত্তর পাবে। আমার নিজের দায়িত্বর কথা আমি অন্তরে অনুভব করি। জাতিকে বড় করে তুল্‌তে গেলে আগে মন আর মস্তিষ্ককে দৃঢ় ও বড় করে তোলা দরকার। তোমাদের সকলের কাছে মাসে একটি বার আসি। দিনান্তে একবার, অন্ততঃ সপ্তাহে একবার তোমাদের কাছে আস্‌তে পারলে, তোমাদের চেয়ে আমি বেশী খুসী হতাম। একবার মাত্র আঘাত করে কোন জিনিষ গড়া যায় না, কোন জিনিসকে ইচ্ছামত রূপ দিতে গেলে, তার ওপর অবিরত আঘাত করে যেতে হয়। আমার যা করার যা দেবার যা বলার তা বলি, তোমরা যদি একান্ত বিশ্বাস, ভরে তা গ্রহণ করতে!

নব বর্ষের শুভাশীষ তোমাদের সকলকে আবার জানালাম।

তোমাদের—

দিদিভাই

# সম্পাদকের লিখন

নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসন্ধ্যা। তেতালার উপরকার ছাদে ব'সে আছি নীরবে।

রক্তাক্ত পূর্ব্বাচল। উষার শুভ্র আসনে তরুণ রক্তরেখা দেখে গাছে গাছে বাসায় বাসায় পাখীর দল বুঝে নিলে, এসেছে তাদের গান গাইবার সময়। গান জাগল দিকে দিকে। গঙ্গার ওপার থেকেও ভেসে আসছে গানের তান।

এখনো ভোরের আলো স্পষ্ট ও কঠোর হয় নি। একটি জ্বল্‌জ্বলে বড় তারা এখনো টানেনি মুখে ঘোমটা। ভজন গাইছে কে গঙ্গার ঘাটে ব'সে। তীরের উপরে ধীরে ধীরে উঠে এলেন এক সদ্যস্নাতা নারী—ঠিক যেন কোন শ্বেতবসনা আলুলকুন্তলা দেবীমূর্ত্তি।

রাতের স্বপন মাখা প্রথম দিবালোকের স্বচ্ছ ছায়া-মায়ার ভিতর দিয়ে উচ্ছল আনন্দে বয়ে চলেছে মধুরভাষিণী গঙ্গার লীলা চঞ্চল ধারা। ওপারে দূরে শ্যামবনরেখার উপরে আব্‌ছা-আব্‌ছা দেখা যাচ্ছে বেলুড়-মঠের গুম্বজ—যেন রূপকথার কোন কল্পপুরীর চূড়া আঁকা রয়েছে নীলাকাশের গায়ে।

চারিদিকে কি শান্তির ছবি! এখনো জনতা জাগেনি। আকাশ ও পৃথিবী যেন মনে-মনে করছে ধ্যানের মন্ত্রপাঠ।

রক্তাক্ত পূর্ব্বাচল। ও হচ্ছে ফুটন্ত বিশ্ব-কুসুমের নব-অরুণ-হাসি, ওর মধ্যে কঠিন মাটির হিংস্র পশুত্বের স্মৃতি নেই।

কিন্তু আজ এই নববর্ষের প্রথম প্রভাতে ঐ রক্তাক্ত পূর্ব্বাচল থেকে আমার বুকের মধ্যে ছুটে এসে ধাক্কা মারলে পৃথিবীব্যাপী বিরাট এক রক্তসাগরের নিষ্ঠুর তরঙ্গ! চোখের সুমুখে ডুবে গেল যেন আকাশ, বাতাস, পাখীর গান, গঙ্গার ঘাট, ভক্তের ভজন, দেবীমূর্ত্তি, রূপকথার কল্পপুরী!

আমার চর্ম্মচক্ষু দেখছে আজ শান্তির ছবি। চর্ম্মচক্ষু কি পঙ্গু, তার দৃষ্টিসীমা কি সংকীর্ণ! অথচ এই মুহূর্ত্তেই রক্তস্নান করতে করতে সমগ্র ধরণী করছে বিশ্বব্যাপী মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ! লক্ষ লক্ষ নতুন-খোঁড়া কবরে কবরে পৃথিবীর বুক হয়েছে ক্ষতবিক্ষত, রক্তপিচ্ছল পথে-বিপথে পিশাচের মত ছুটছে উঠছে পড়ছে চীৎকার করছে মানুষের শত্রু, মানুষ! শান্তিমন্ত্রদাতা বুদ্ধ ও খৃষ্টের পূজকরা প্রত্যহ করছে হাজার হাজার নরহত্যা!

নববর্ষের আসরে প্রাচীন সূর্য্য ঐ চোখ মেলে তাকালে। ঐ সূর্য্যই একদিন চোখ মেলেছিল কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে, বিলুপ্ত ট্রয়-নগরের শিয়রে, ইস্‌সাস, পাণিপথ, আঙ্গোরা ও অষ্টার্লিট্‌জ্‌ রণক্ষেত্রে। কিন্তু আজ্‌কের মতন বীভৎস ও কল্পনাতীত নরহত্যা সে আর কোনদিন দেখে নি।

আজ আর নববর্ষের কোন বাণীই মনে আসছে না। কারণ রক্তাক্ত পূর্ব্বাচলের আড়াল থেকে শুনতে পাচ্ছি রক্তময়ী ধরিত্রীর মৃত্যু-ক্রন্দন। ইতি

তোমাদের—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

## যক্ষপতির রত্নপুরী ( গল্পের পূর্ব্বাংশ )

### ( নূতন গ্রাহক গ্রাহিকাদের জন্য )

এক চীনে হোটেলে বিমল ও কুমার খানা খেতে গিয়েছিল—সেইখান থেকেই এই গল্পের সূত্রপাত। এক চীনে সেখানে খুন হয়, সে মারা যাবার আগে বিমলকে তার গলার লকেটটা দিয়ে বলে লুকিয়ে রাখতে। আরো বলে, ছুন-ছিউ তাকে মেরেছে গুপ্তধন হাতাবার জন্য। গুপ্তধন কোথায়? কি-পিন যেও সেখানে পাবে, বলে লোকটি মারা পড়ল। লকেট বা ধুকধুকির ওপর খোদাই করা এক মূর্ত্তি আর ধুকধুকির ভেতর ভাঁজ করা কাগজে সাঙ্কেতিক লেখা। এর রহস্য উদ্ধার করতে বিমল বিনয়বাবুর সাহায্য চাইল। বিনয়বাবু জ্ঞানসমুদ্রের ডুবুরি, জীবন্ত অভিধান। তিনি লেখার অর্থ করে বললেন—"শালোকা পশ্চিম দিক ঃ ভাঙ্গা মঠ ঃ কুবের মূর্ত্তি ঃ গুপ্তগুহা! শালোকা হল উত্তর-পূর্ব্ব আফগানিস্থান বা আধুনিক কাফ্রিস্থান। বিমল ও কুমার যাবার জন্য ব্যগ্র হল—পথপ্রদর্শক হবেন বিনয়বাবু। এরপরে অতর্কিতে ছুন-ছিউর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—তার রিভলবারের সামনে তারা আটক পড়ল। কিন্তু রামহরির কৌশলে ছুন-ছিউ ধরা পড়ল ও বিমলরা মুক্তি পেল। কিন্তু শেষে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছুন-ছিউ পালাল। বিমলরা কাফ্রিস্থানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার মতলব ভাঁজতে লাগল। কিন্তু একদিন জানালার সার্সি' ভেঙ্গে এক পাথরের টুকরোর সঙ্গে এক চিঠি তাদের সামনে পড়ল—তাতে ছুন-ছিউ লিখেছে, লকেট ফিরিয়ে না দিলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। ছুন-ছিউকে অগ্রাহ্য করে ওরা যাত্রা করল। কিন্তু ট্রেণে এ্যাক্সিডেণ্ট—বিমলদের ওপর ছুন-ছিউর দলের আক্রমণ সুরু হল। বিমলরাও বন্দুক ছুড়ে জবাব দিলে। ছুন-ছিউর দল সরে পড়ল। ট্রেণ ভারতের পশ্চিম-সীমান্তর দিকে এগিয়ে চলল। নানা জায়গা পার হয়ে অবশেষে তারা চিত্রল রাজ্যে পৌছল। চিত্রল পার হয়ে তারা এসে পৌছল কাফ্রিস্থানে। এইখানে গুমলী নামে এক বিধবা স্ত্রীলোকের আতিথ্য তারা গ্রহণ করলে। একদিন হঠাৎ গুমলি খবর দিলে বার্মুক অর্থাৎ গ্রামের সর্দ্দার দুটো চীনেম্যানের সঙ্গে বসে এক জায়গায় চুপি চুপি কি কথা বলছিল। তারপর বার্মুক তার সঙ্গে দেখা করে বলেছে, বাবুদের খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতে পারলে তাকে পাঁচশ টাকা বকসিস্ দেবে। গুমলী বললে,—আপনারা ভয় পাবেন না ওদের জব্দ করছি, সদর-দরজা রাতে খোলা রাখবো। আমার বিশ্বাসী গরক, বাচিক, কারুক ও মাক্কানকে খবর দিয়েছি।···রাতে বিমলরাও তৈরী হ'ল। অন্ধকারে শত্রুদের আবির্ভাব হ'ল ও দুপক্ষে গোলাগুলি চলল। কিন্তু শত্রুরা দলভারী হয়ে এসে বাড়ী প্রায় ঘেরাও করে ফেললে। খিড়কী দিয়ে মাক্কানকে সঙ্গে নিয়ে বিমলরা সরে পড়ল। শত্রু-পক্ষ ওদের পিছু নিল কিন্তু পথে যেতে যেতে এক ভীষণ দুর্ঘটনা। যেতে যেতে তারা এক ভয়াবহ শব্দ শুনতে পেল। মাক্কান বললে—পাহাড় ধ্বসে নেমে আসছে এই পথ দিয়েই। তারা জিনিষপত্র বন্দুক সব ফেলে কোন গতিকে এক গুহায় আশ্রয় নিলে। পাহাড়-ধ্বসা মৃত্যুর বন্যার মত চারিদিক কাঁপিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। বিমলরা রক্ষা পেল কিন্তু শত্রুরা হয়ত সব ধ্বংস হয়েছে। তারা আবার এগুতে লাগল—মাক্কান বলেছে পাহাড়ের নীচে কাছেই একটি নদী আছে—তার ওপারে কিছু পথ দূর গেলেই তারা সেই মঠে পৌছবে। কিন্তু নদীর ধারে পৌছতেই হঠাৎ তারা শুনলে পেছন থেকে কে বললে—সবাই মাথার উপর হাত তোলো। চমকে ফিরে বিমলরা দেখে ছুন-ছিউ আর দুজন চীনে ও দু'জন কাফির, সকলের হাতেই বন্দুক। ছুন-ছিউ বললে—বাবুরা যদি বাঁচতে চাও তো লকেটখানা ফিরিয়ে দাও। বিমল বললে লকেট তাদের কাছে নেই। লকেট বিমল কলকাতা রেখে এসেছে আর তার লিখনটুকু আছে তার স্মৃতির ভাণ্ডারে। ছুন-ছিউ তখন তার সঙ্গীদের সাহায্যে বিমল, কুমার, বিনয়বাবু, রামহরি মাক্কান এদের একসঙ্গে অষ্টে পৃষ্ঠে বেধে ফেললে। ছুন-ছিউ বললে, শেষবারের মত বলছি—বল লকেট কোথায় রেখেছ? বিমল বললে, জ্বালাতন কোরো না ছুন-ছিউ, লকেট আমার কাছে নেই। তখন ছুন-ছিউর দল তাদের শূন্যে তুলে নদীর জলে ফেলে দিলে। বিমলরা সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল পাতালের শীতল অন্ধকারে।···

[ বিমলের ডায়েরী থেকে গল্পটি নেওয়া, গল্পের বক্তা বিমল নিজে ]

'যক্ষপতির রত্নপুরী'র পরবর্ত্তী অংশ এই মাসের রংমশালের ২৭ পৃষ্ঠা থেকে পড়ে যাও ॥

## —নূতন ধাঁধা—

নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হ'ল, প্রশ্নগুলির উত্তরও দেওয়া হ'ল। এখন তোমাকে বলতে হবে কোন্ প্রশ্নের কোন্ উত্তরটি ঠিক। প্রশ্ন ও উত্তরের নম্বরগুলি দেবে।

প্রশ্ন ঃ—(১) রামু স্যাকরা কি চায়? (২) চুংকিং কোথায়? (৩) ডোডো কি?
(৪) গান্ধীর কিসে আগ্রহ? (৫) পেঙ্গুইন কি? (৬) আব্‌লুস্ কি?
(৭) হরেন কিছু চায়, না চায়না? (৮) সে যা বলছে কি?
(৯) রাম নাম কি? (১০) চন্দন কি? (১১) তেড়েঙফেড়েঙচুং কি বা কোথায়? (১২) সেগুন কি? (১৩) ওকাপি কি?

উত্তর—(১) কাঠ (২) সত্য (৩) কিছু না (৪) এক রকম জন্তু (৫) চায়না
(৬) এক রকম পাখি যা আর পাওয়া যায় না। (৭) জানি না (৮) বায়না
(৯) চীনে ( ০) বৃক্ষ (১১) সত্য (১২) পূজার ব্যবহার হয়
(১৩) এক রকম পাখি যা উড়তে পারে না।

**সকলেই যোগ দাও—**

## নূতন প্রতিযোগিতা

### ( গ্রাহক গ্রাহিকাদের জন্য )

**এবারকার নতুন প্রতিযোগিতার বিষয় ঃ—ছোট-গল্প।**

তোমরা সকলেই গল্প শুনতে, গল্প পড়তে, গল্প বলতে ও গল্প লিখতে ভালবাসো। তাই এবার তোমাদের জন্য ছোট-গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হ'ল।

গল্পটি ছোটর মধ্যে সুন্দর হওয়া চাই। ফুল স্কেপ সাইজের কাগজের **চারপাতার** বেশী বড় হবে না এবং কাগজের **একদিকে** লিখতে হবে। নীচের **কুপনটি** ভর্ত্তি করে কেটে নিয়ে গল্পের সঙ্গে রংমশাল অফিস ( প্রতিযোগিতা বিভাগ ) ৯১।১১এ, টালিগঞ্জ রোড কলিকাতা এই ঠিকানায় **১৫ই জৈষ্ঠ্যের** মধ্যে পাঠাতে হবে।

দু'টি পুরস্কার থাকবে, একটি ছোটদের, একটি বড়দের।

কুপন

নাম..... } গ্রাহক নং.....
ঠিকানা..... } বয়স.....

গল্পটি.....'র নিজের লেখা—

অভিভাবকের স্বাক্ষর,

তারিখ ..... .....

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

বড় হীরকের ওপরে ৩টি ছোট হীরে, বাঁ পাশে ৩টি, ডানপাসেও ৩টি হীরে,
এবং নীচে ১৯টি হীরে।

## উত্তরদাতাদের নাম

যাদের উত্তর নির্ভুল হয়েছে :—

দেবেন্দ্র নাথ দাস, জামসেদপুর ; কানু, দানু, শিবু, অলি, রেবা, খুকু, পুরুলিয়া ; অমিত রঞ্জন রায় চৌধুরী, কাটোয়া ; শিশির, অমিয়, অরুণ, মীরা, বাবু, দীপু, মাতু, মান্তু, বৌদি, ও দিদি, গৈলী ; সীতানাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটী ; বাপ্পা রায়, নোয়াখালী ; গীতা ও মায়া দে, কটক ; বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, মোগলসরাই ; খুকু, কলিকাতা ; দি দি, দাদা, সেজদা, মেজদি, ছোটদি, ও জয়ন্তি সেন, আটালিয়া ; উষা ও সাবিত্রী প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, পাটনা ; সুনীল কুমার ও অতুল চন্দ্র সিদ্ধান্ত, রাজসাহী ; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর ; কুমারী, রেখা, নন্দী, সীলেট ; মন্তু, উলিপুর।

রংমশাল কার্য্যালয়ের ঠিকানার একটি ছবি দেওয়া হল :—

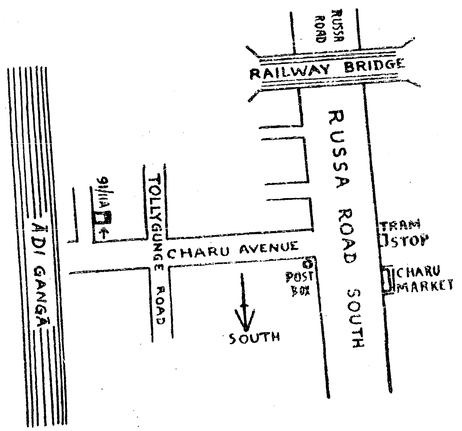




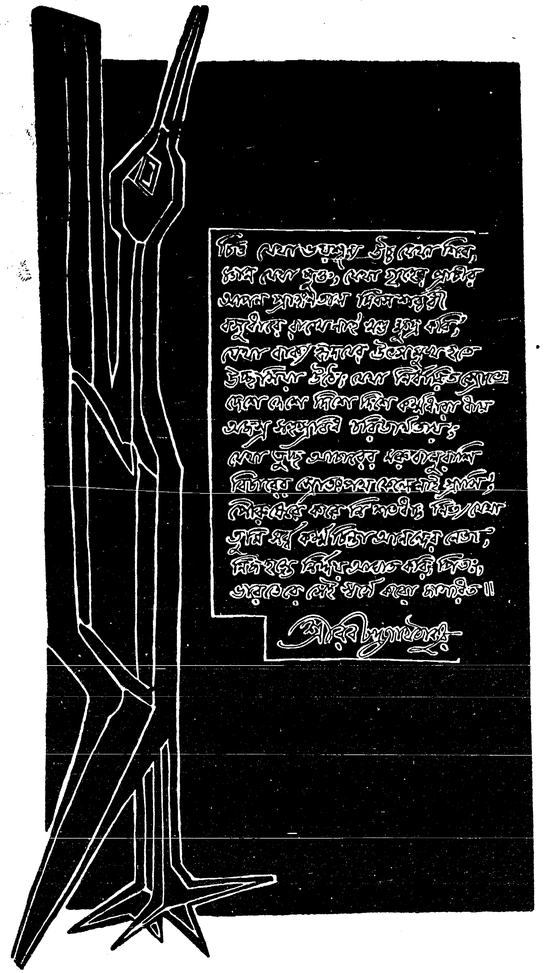


"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির"

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিচিত্রিত প্রতিলিপি

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

রংমশাল

সপ্তম বর্ষ
২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ
১৩৪৯

## সম্পাদকের লিখন

এক পঁচিশে বৈশাখের কথা।

কালির-রেখায়-আঁকা বাংলার নদ-নদী, বন-উপবন, গ্রাম-নগরের উপরে রূপোলী আলোর তুলি বুলিয়ে নীলাকাশ চাঁদের তিলক পরেছিল অনেক রাতে।

এবং চাঁদের তিলক মুছতে না মুছতেই উদয়াচলে উষার চোখে জেগেছিল ভোরের স্বপন।

কচি কচি আমের বুকে কাঁচা সবুজ খুঁজছে পরিপূর্ণতার ভাষা। নতুন বেল-যূথার অফুট কুঁড়ি খুঁজছে যৌবন-জাগানো গন্ধ। শত শত সরোবরে লক্ষ লক্ষ কমল-কোরক খুঁজছে ফুল-ফোটানো গুঞ্জন-ছন্দ।

বাংলার দুর্ব্বাদলশ্যাম মাটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "চারিদিকে চলছে খোঁজাখুঁজির বিচিত্র লীলা। ওগো আকাশ, ওগো বাতাস, এই পরম অন্বেষণকে সার্থক ক'রে তুলবেন কোন্ সে দেবতা?"

BLEED THROUGH.

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃপুর থেকে বাণী ভেসে এল—"পৃথিবীর এই পরম অন্বেষণের মহাকাব্য রচনা করবার ভাষা দেবতার মুখে নেই।"

—"তবে সে কোথায়, সে কোথায় ?"

—"তোমারই কোলে। এ হচ্ছে আজ্‌কের পঁচিশে বৈশাখের দান।"

বাংলার মাটি সবিস্ময়ে দেখলে, তার কোলে বিরাজ করছে সূর্য্যের মতন জ্যোতির্ম্ময় শিশু। তার প্রথম ক্রন্দনের ছন্দেই বেজে উঠল বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-বীণা।

বাংলার মাটি আদর ক'রে সেই জ্যোতির্ম্ময় শিশুর নাম রাখলে, রবি।

বন্ধুগণ, এই অপূর্ব্ব শিশুকে বাংলার মাটির কোলে তুলে দিয়ে পঁচিশে বৈশাখ পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই পবিত্র দিনটি কথা মনে হ'লেই তোমরা প্রণাম কোরো।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যাকালে চাঁইবুড়ো জোড়া-পেঁপে তলায় মহাবীরের পুঁথি খুলে বল্লেন—

সাজরে সাজ, বলে লঙ্কেশ্বর,
জাগা কুম্ভকর্ণে, জাগা সত্বর।
মকরাক্ষ ধূম্রাক্ষের হইল পতন,
প্রহস্ত হইল হত, গত অকম্পন।
তরণী সেনটারে পাঠালাম ঠেলে,
কাটামুণ্ড রামনাম বলে অক্কা পেলে।
কুম্ভকর্ণে জাগাও নয়-বাধিবে অনর্থ,
অতিকায় গেল সম্প্রতি সব দেখি ব্যর্থ।
কুম্ভ-নিকুম্ভ গেছে শুনলে হয় কানে,
এক গ্রাসে খেয়ে ফেলবে লক্ষণে আর রামে—
সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্বুবান হনুমানে।"

তখন রাবণের মাতামহ বলছে—"বাপা, কুম্ভকর্ণের জাগতে আর তো একমাস, এখন তাকে জাগালে অকালে কালগ্রাসে পড়ে যদি যায়, তখন ? আমার মতে, কোন গতিতে আর একটা মাস যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখা, তারপর একদিনে সব শেষ করে দেওয়া যাবে।" রাবণ বল্লেন—"জানি আমি অকালে জাগালে প্রাণের ভয় আছে। কিন্তু আজ যদি লঙ্কা মজে নর বানরের হাতে, তখন সে জেগে করবে কি ? তখন হয়ত বলে বসবে, কেন জাগাওনি সময় থাকতে !

কে জানে নরবানর দুর্জ্জয় এমন—
কুম্ভকর্ণে জাগাতে আজই কর যতন,
মার ধর যা করে পার কর সচেতন।

ছ'মাস না খেয়ে আছে, খিদের চোটে হাঁ হাঁ করবে, পুত্রশোকে গর্জ্জাতে থাকবে, সেই সময় ছেড়ে দেওয়া যাবে রণক্ষেত্রে। আর দেখতে হবে না, একগ্রাসে নরবানর কুল—টোপা কুলের মতো টপাটপ্ নিঃশেষে নির্ম্মূল। বসে যাক আরামে সবাই রাক্ষস বংশ বৃদ্ধি করতে।

মহোদরের ভাবনা ভাবতে হবে না, এক লঙ্কা আর লঙ্কেশ্বর বাঁচলেই এখন বাপ পিতামহের নাম থাকে !"—এই বলে রাবণ সভা ত্যাগ। দৌড়ালো রাক্ষস সব কুম্ভকর্ণের কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ করতে, কেউ বা তামাসা দেখতে।

নিকষি বুড়ি কাঁদতে থাকলো গুমরে বন্ধ ঘরে—

"ভাই নয়রে রাবণ চণ্ডাল সহোদর,
কাঁচা নিদ্রা ভাঙায়ে ভেয়ে পাঠায় যমঘর !"

ফুটে বলতে পারে না মনের কথা পাছে রাবণের কানে যায় !

ফুটে বলবার দরকার হল না, বড় বৌ মন্দোদরী মনের ভাবটি রাবণের কানে তুলে দিলেন।—'মা যাই বলুন যখন লঙ্কা নিয়ে কথা তখন আমার কাছে—

না মাতা না বন্ধু না সহোদর
এক লঙ্কা লঙ্কার প্রজা আর লঙ্কেশ্বর।'

মন্দোদরীও তেমনি মেয়ে, সোজা জবাব দিলেন—"সীতা তো তোমার প্রজাও নয় তোমার বঁধুও নয়। এমন বিপদে তাকেই বা হয় যমের হাতে নয় রামের হাতে দেওয়া তো রাজধর্ম্ম।"

—"তুমি স্ত্রীলোক, তুমি বুঝবে কি ? এর মধ্যে রাজনীতির কথা রয়েছে। সীতা দেওয়াও যা আমার দশটা মাথা কেটে দেওয়াও তা। রাক্ষস রাজার প্রজার সবার মান বলে তো একটা পদার্থ আছে !"

"মটুক গেছে দশ মাথার বানরের খপ্পরে পড়ে, এখন নরের হাতে পড়ে দশটা মাথা না যায় !" বলে মন্দোদরী চোখে আঁচল দিয়ে শ্বাশুড়ীর ঘরে গিয়ে কাঁদতে থাকলেন। শ্বাশুড়ী বৌকে বোঝান—

"না কান্দ না কান্দ বৌ মন কর স্থির,
বেঁচে বর্ত্তে থাক তোমার ইন্দ্রজিত বীর !
বেঁচে থাক বিভীষণ আমার কোলের ছেলে,
আহা কুম্ভকর্ণ ফিরবে না আর অকাল যুদ্ধে গেলে !
একে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা, তাতে কাচ্ছা বাচ্ছার শোক,
ওমা কি করি কি করি বলনা তোরা পাড়ার লোক !"

এই বলে বুড়ি মন্দোদরীর কোলে ঢলে পড়লো দাঁতি লেগে।

এই বলে চাঁই বুড়ো পুঁথি বন্দ করে ছাতি বগলে ভটচায্যি পাড়ার মুখো হলেন।

# পরিত্যক্ত জল্‌সা

গল্প

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"হরিনাথবাবু ক্ষেপেছেন আবার !" ফিস্‌ফিসিয়ে বল্লেন—সেকেন্ পণ্ডিত।

হরিনাথবাবু আমাদের ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার—এবং হেড্‌মাষ্টারের পক্ষে যতদূর ভালো হওয়া সম্ভব তিনি তার অত্যুজ্জল উদাহরণ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি ছেলেদের শাসন করতে জানেন না। অবশ্যি আর যারই হোক্ এটা আমাদের দুঃখের বিষয় নয়। তবে ছাত্রদের তাড়না করবার প্রেরণা নেই বলে' আর সব মাষ্টাররা আপ্‌সোস্ করেন। আপ্‌সোস্ করেন আর নিস্‌পিস্ করতে থাকেন, এমন কি, এ স্কুলে আর মাষ্টারি করে' কী লাভ, এমন কথাও সময়ে-অসময়ে তাঁদের মুখে শোনা যায়।

এবার, কলকাতার শিক্ষক সম্মেলনের ফেরতা, হরিনাথবাবু নতুন এক আইডিয়া মাথায় করে' এসেছেন। তাঁর মতে, আইডিয়া আর সব মাষ্টারের মতে—নতুন আরেক খেয়াল। তাঁর ধারণায়, ছেলেদের জীবনে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের উৎসাহ জড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যে মাঝে মাঝে এক আধটা জলসা হওয়া দরকার।

সেকেন্ পণ্ডিত বলেছেন—"এটাও তাঁর সেই ব্যাট্‌বল্ খেলার মত হবে।'

হ্যাঁ, এর আগের বারে তিনি ক্রিকেটের আইডিয়া নিয়ে ফিরে ছিলেন। ঠিক মাথায় করে' নয়, কিম্বা মাথায় করে' বল্লেই বোধ হয় ঠিক হয়। এক রাজ্যের উইকেট্, বল্, ব্যাট্, পায়ে বাঁধা প্যাড ইত্যাদির বোঝা নিয়ে তিনি যখন ফিরলেন, তখন বলতে কি, আমাদের বেশ উৎসাহ হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল বল্‌গুলো এক মণ করে ভারী, ছুড়তে ছুড়তে হাত ব্যথা হয়ে যায় আর তিন দিন ধরে সেই ব্যথা জমে থাকে আর যতই কায়দা করে ছোড়াছুড়ি করো না কেন, উইকেটের এক মাইলের ভেতর দিয়ে কিছুতেই তারা যাবার পাত্র না, তখন আমাদের উৎসাহ জল হয়ে গেল। তার ওপরে আবার ব্যাটের দুর্ব্ব্যবহার আছে, একজন ব্যাট্‌কীপার—ব্যাট্‌কীপার ছাড়া আর কী বলা যায় ?—কখনো ওদের ব্যাট্ দিয়ে তো একখানা বল্‌ও ঠুক্‌ঠাক্ করতে দেখা যায় নি—হ্যাঁ, একদিন একজন ব্যাট্‌কীপার্ করল কি, একটা আগন্তুক বল্‌কে হাঁক্‌ড়াতে না গিয়ে—বল্ তার দেড়

মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছিল—নিজের মাথায় ব্যাট মেরে বস্‌ল। নিজের কপালে ব্যাটাঘাতেও তেমন কিছু ক্ষতি হোতো না, সে কর্‌ল কি, ঘুর্‌তির মুখে, সেই ব্যাট্ দিয়েই উইকেট্ কীপারের এক পাশের এক গাদা দাঁত খসিয়ে ফেল্‌ল। আমরা খুব চটে গেলাম। চট্ বই তো, হেড্‌মাষ্টার মশাই হাতে না মেরে এই ভাবে ব্যাট্‌বলের সাহায্যে আমাদের দুরস্ত করছেন! উইকেট্ আর ব্যাট্‌কীপার দুজন সেই যে শয্যা নিল আর তারা উঠ্‌ল না। ক্রিস্‌মাসের ছুটি পর্য্যন্ত তারা পাল্লা দিয়ে বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলে, তারপর তারা সেই ক্রিকেটের দৌলতেই ক্লাস্ প্রমোশন আদায় করে (আফ্‌টার্ অল্ ইট্ ওয়াজ্ নট্ ক্রিকেট্!) —রুগ্ন শয্যা পরিত্যাগ করে' লাফাতে লাফাতে বাড়ী চলে গেল। ফিরে এল ছুটি খতম্ করে, নতুন বছরে—এসেই তারা ফের ক্রিকেট খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্রিকেট তখন কোথায়? আমরা ব্যাট্, বল্, পায়ে বাঁধা প্যাডের বালিশ সব সমেত—(মাথায় যখন বল্‌রা ব্যাট্‌রা এসে লেগে থাকে তখন পায়ে বালিশ জড়িয়ে ফল?—হতে হলে আপাদমস্তক বালিশ বন্দী হতে হয়)—সর্ব্বসমেত পদ্মার গর্ভে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেচি। বাস্তবিক্, ক্রিকেটকে, তারা দুজন ছাড়া আমরা কেউই যখন ঠিক মত ব্যবহার করতে পারলুম না—ক্রিকেট নিজে থেকেও আমাদের কারো যখন কাজে লাগ্‌ল না—আর কোনো কারুকার্য্যই হোলো না ওকে দিয়ে—তখন আর অনর্থক গায়ের ব্যথা বাড়িয়ে লাভ?

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কি মনে হয় জানেন?" হেড্‌মাষ্টার মশাই অন্যান্য মাষ্টারদের ডেকে জানালেন: "এই রকম প্রায়শঃ জল্‌সার দ্বারা কেবল যে ছেলেদের জীবনে উদ্দীপনা বাড়ানো হবে তাই নয়, এতে করে' পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রর সম্বন্ধ আরো মধুরতর হয়ে উঠ্‌বে। তাদের অন্তরঙ্গতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।"

এই ছোট্ট বক্তৃতাটি দেবার পরই তিনি আমাদের তাক্ করে' একটা প্রশ্ন ছুঁড়লেন—"এখন তোমরা কি করতে পারো বলো দেখি?"

আমরা এতক্ষণ ধরে' একজোট্ হয়ে তাঁর মুখ থেকে জল্‌সার ব্যাপারটা কি জেনে নেবার চেষ্টা কর্‌ছিলাম—জল্‌সা হলেও জলের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই এমন কি জলযোগের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কোনো—না-থিয়েটার না-যাত্রা না-ভোজবাজি—অথচ সব কিছুর গর্‌মিল্ এই বিষয়টা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে বিশদ হয়ে আসছিল তখন।

"আমি হয়ত গান গাইতে পারি।" সাহস করে' বল্লাম আমি।

"আমরাও সেই ভয়ই করছিলাম।" বল্লেন হরিনাথবাবু: "বেশ তুমিই তাহলে এই সমস্ত কাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা হলে। তোমাকেই মনিটার ক'রে দিলুম। তুমি যখন গান গাইতে পারো তখন সব পারবে।"



তারপর তিনি আমাদের বাদবাকীদের প্রতি দৃক্‌পাত করতে লাগলেন। "কী, তোমাদের কেউ হারমণিয়ম্ বাজাতে জানো নাকি?"

"আমি একটা টেনিস্‌বল্ আমার দাড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখ্‌তে পারি সার্।" বল্ল ফটিক: "হাত দিয়ে ছোঁয়া নেই, কিছু না, ভারী শক্ত।"

"আমি হারমোনিয়ম বাজাতে জানিনে বটে, তবে বাজালে বাজাতে পারি।" প্রেমাংশু বল্ল।

"কী বাজাবে?" হেড্‌মাষ্টার মশাই আগ্রহান্বিত হলেন: "কোনো গৎ টৎ জানা আছে তোমার? কন্‌সার্টের মত একটা কিছু না হলে জল্‌সা জম্‌বে কেন?"

"হ্যাঁ, গৎ জানি বই কি সার্!" প্রেমাংশু অম্লানবদনে জানাল। 'আকাশের চাঁদ ছিলরে'!—এই গৎটাই আমি বাজাব।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলেন হরিনাথবাবু। "ঐটেই কেন?"

"কেননা এই গৎটাই আমি কেবল জানি।" বল্ল প্রেমাংশু: "এ ছাড়া আর কোনো গৎই আমার জানা নেই।"

"ওকে ওইটেই বাজাতে দিন্ সার্। ও বেশ ভালোই বাজাতে পারবে।" ফটিক বল্ল সাগ্রহে: "ও কালো ঘর গুলোও বাজাতে পারে আমি দেখেছি। কালো ঘর বাজানো খুব কঠিন।"

ছোট্ট মুকুল, এক পাশ থেকে বলে' উঠ্‌ল হঠাৎ: "আমি বেশ ভালো হাঁস ডাক্‌তে পারি।"

"দেখাও আমাদের"—হুকুম্ করলেন হেড্‌মাষ্টার।

মুকুল একে ছোটো তার ওপরে একটু লাজুক, সহসা এই আক্রমণে অতি বিব্রত হয়ে পড়ল। কোনো শিল্পীকে যদি তড়িঘড়ি তার শিল্পসাধনার পরিচয় দিতে—তার নিজ নৈপুণ্য প্রকট করতে বলা হয়, যত বড়ই শিল্পীই হোক্ না কেন, স্বভাবতঃই একটু না ঘাব্‌ড়ে গিয়ে পারবে না।

মুকুল হাঁস ডাক্‌তে ইতস্ততঃ করে।

"কই, তোমার হাঁসের ডাক শুনি।" হেড্‌মাষ্টার মশাইও নাছোড়বান্দা।

"প্যাঁক্—প্যাঁক্—প্যাঁক্"—ডাকল মুকুল।

"তোমার হাঁসের বাদ্যি থামাও।" ভ্রূকুঞ্চিত করে' বল্লেন হেড্‌মাষ্টার।

যাই হোক্, কোনো রকমে একটা প্রোগ্রাম্ তো খাড়া করা গেল—

## ফাজিলাবাদ ইস্কুলের ছেলেদের

**—জলসা—**

হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের ঃ বক্তৃতা
শ্রীমান্ মুকুল মৈত্র ঃ হাঁসের ডাক
হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের ঃ বক্তৃতা
প্রেমাংশুর হারমোনিয়াম্ কন্সার্ট্ ঃ
( 'আকাশের চাঁদ ছিল রে!' )
ফটিক চন্দ্রের ঃ ম্যাজিক
( হাতের ছোঁয়া নেই, কিছু না, ভারী শক্ত )
—ইন্টার্ভ্যাল্—
প্রেমাংশুর হারমোনিয়ম্—সঙ্গীত
( 'আকাশের চাঁদ ছিল রে' ! )
শ্রীমান্ মুকুল মৈত্র ঃ—আরো হাঁসের ডাক
হেড্মাষ্টার মহাশয়ের বক্তৃতা
বন্দে মাতরম্

মনিটার হিসেবে জল্সার উদ্যোগ আয়োজনের সব ভার আমার ঘাড়েই পড়ল। আমাদের ছোট্ট টাউনের একমাত্র সিনেমা হাউসটি আমি ভাড়া করে ফেল্লাম। কিন্তু মুকুল বল্লে, "এই ছোট্ট 'হলে' আমাদের সবাইকে আঁট্বে না সার্।"

মুকুল অবিশ্যি খুব ছোট্ট আর আমি নিশ্চয়ই খুব বড়ো, ফাস্ট্ ক্লাসেই পড়ি যখন, তবু মুকুলের এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধনের সারাংশে মনিটারির আত্মপ্রসাদে আমি আপ্যায়িত হয়ে গেলাম। কিন্তু ও-ছাড়াও, মুকুলের মন্তব্য অন্য দিক দিয়েও সারগর্ভ বই কি! ঠিক কথাই বলেছে ও, কিন্তু সারা টাউনে এই একটি মাত্র পাব্লিক্ হল্—অথচ এর মধ্যে ইস্কুলের আদ্ধেক ছেলেকেও ধরানো যাবে কিনা সন্দেহ।

সমস্যাটা হেড্মাষ্টার মশায়ের কাছে এনে উপস্থিত করা হোলো।

তিনি বল্লেন ঃ "তাতে কি হয়েছে? জল্সা তা বলে' বন্ধ করা যায় না। আদ্ধেক ছেলেই দেখ্বে—কি করা যাবে? কারা দেখ্বে, তারা নিজেরাই লটারি করে' ঠিক করুক্।"

এ অবস্থা ছেলেদের খুব মনঃপূত হোলো। ছেলেরা লটারী করতে যেমন ভালোবাসে তেমন আর কিছু না। ফুট্বলের টস্-উইনিং সাইড্ থেকে সব কিছুই তারা করে' ঠিক ঠাক করতে চায়।



অবশেষে সেই জল্সা-রজনী এল। প্রত্যেকেই উৎসাহে অধীর। ফটিকচন্দ্র তার বল্-ক্রীড়া নিখুঁৎ করবার আয়োজনে চোখ খইয়ে ফেল্ছে। সন্ধ্যে থেকেই সে এই শেষ-চেষ্টায় লেগেছে। মুকুল ষ্টেজের পেছনে গিয়ে নেপথ্য থেকে হংসধ্বনির রিহার্সাল্ দিচ্ছিল। আর প্রেমাংশু এদিকে হারমোনিয়ম নিয়ে ( সাদা কালো সব ঘরেই সে হাত চালাতে ওস্তাদ্ ) ক্ষেপে উঠেছিল—'আকাশের চাঁদের' ভেতর থেকে সে এমন সব অদ্ভুত সুর বার করে' এনেছে যা সে কোনোদিন পারবে বলে' আশা করতে পারেনি। সিনেমার সমস্ত চল্তি সুরকে সে ওই একটা গতের মধ্যে একাধিক্রমে এবং যুগপৎ আন্তে পেরেছে।

সবাই কৌতূহলে, উদ্দীপ্ত, হেড্মাষ্টার মশাইও কিছু কম যান্ না—কিন্তু দর্শকদের মধ্যে কেমন যেন আগ্রহের অভাব! কি রকম যেন মনমরা-মনমরা ভাব! এমন একখানা জল্সা—এখানে এই শতাব্দীতে এই গ্রামে—তার সঙ্গে জলযোগের কোনো সম্পর্ক নাই বা থাকল, তা বলে' ছেলেদের স্বাভাবিক লালসা লোপ পাবে তাই বা কেমন?

ছেলেরা ম্রিয়মাণ মুখে একে একে সিনেমা 'হলে' ঢুক্ছিল। তাদের হৈ হুল্লোড় কিচ্ছু নেই, টিকেট্ করে সিনেমা দেখার সময়ে অন্ততঃ যেটা দেখা যায় তার একশ ভাগের এক ভাগও এই বিনে পয়সার জল্সার ভাগ্যে নেই দেখা যাচ্ছে।

ব্যাপার কি, আমি জান্তে উদ্গ্রীব হলাম।

হেড্মাষ্টার মশায়ের দৃষ্টি খুব যে সুতীক্ষ্ণ তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর নজরেও কেমন যেন এটা ঠেকছিল। তিনি মুখে কিছু বল্ছিলেন না বটে, কিন্তু একটা প্রশ্ন পত্র চোখে নিয়ে ঘুর ছিলেন। অবশেষে সেকেন্ পণ্ডিতকে সাম্নে পেয়ে তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না।

"কী হয়েছে মশাই? ছেলেরা সব মুখ কালো কালো করে' আস্ছে কেন? লটারীতে কোনো গোলমাল—?"

"কিছু না। গোলমাল কি হবে? লটারীতে গোলমালের কি আছে?"

"যাক্, তবু ভালো।" দিল্দরিয়া একখানা হাসিতে হরিনাথবাবুর সারা মুখ ভরে গেল ঃ "লটারীতে কোনো ত্রুটি হয়নি যে ভালো তবু। আপনার ওপর যখন লটারীর ভার দিয়েছিলাম তখনই জানি সুষ্ঠুভাবে ওটা আপনি সুসম্পন্ন করতে পারবেন। যাক্, কতগুলো ছেলে লটারী জিতেছে দেখা যাক্।"

"উঁহু, একটু ভুল করছেন আপনি।" হেড্মাষ্টারের কানে কানে ফিস্ ফিস্ করলেন সেকেন্ পণ্ডিত, সে ফিস্ফিসানি আমার কান অবধি এসে পৌঁছল। "এর মধ্যে লটারী-জেতারা কেউ নেই। তারা সবাই হোস্টেলে এখন পিক্নিক্ করছে। এরা লটারী হারার দল।"

সব রং দেওয়া হয়েছিল অদৃশ্য আলোতে যা চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে। বৈদ্যুতিক তার ছিল না সে সহরে অথচ কেমন আলো বিকীরণ কচ্ছিল তার রাস্তা-ঘাট ও ঘরবাড়ী রাত্রির অন্ধকার নামলে! সাঁতারুদের স্নানের টুপীগুলি এমনভাবে রং করা হয়েছিল যে, অন্ধকারেও সেগুলি দূর থেকে বেশ দেখাচ্ছিল।

অনেক রকমের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দেখা যায় আজকাল! অদৃশ্য আলোর বিজ্ঞাপনও তার মধ্যে একটা। এক রকমের আলো আছে যা দিনের আলোয় দেখা যায়, একরকম আবার রাত্রি বেলায় অন্ধকারে ফুটে ওঠে তার অন্য আর এক রকম রং। এই রং দিয়ে বিজ্ঞাপন লেখা হয়! এক রকমের বিজ্ঞাপন শুধু রাত্রেই পড়া যায়। কতকগুলি রং আছে যা কেবল দিনের আলোয় দেখা যায়। আর এক রকমের রং আছে যা দিনের আলোয় ও রাত্রির অন্ধকারে সমানভাবে দেখা যায়। আবার আর এক রকমের আলো আছে, যা শুধু অদৃশ্য-আলোতেই উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে,—অন্য আলোতে সেগুলি দেখা যায় না। এই তিন রকমের রংএর সংমিশ্রণে একটা অদ্ভুত ধরণের রং তৈরী হ'তে পারে।

এক ধরণের কার্পেট ও গালিচা তৈরী হ'চ্ছে এমন জিনিষের আঁশ দিয়ে যা কেবল অদৃশ্য আলোতেই দীপ্তিমান হয়। অন্ধকার ঘরের অন্য আসবাব পত্র কিছুই দেখা যাবে না, কেবল কার্পেটটিই অদৃশ্য-আলোর রশ্মিতে আপনা আপনি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে। সাধারণ পোষাক প'রে ঐ গালিচার উপর অন্ধকার ঘরে যদি কেউ দাঁড়ায়, ম্যাজিকের মত তাকে দেখা যাবে না; কিন্তু কোনও বিশেষ রং মুখে বা হাতে লাগালে বা বিশেষ কোনও সুঁতো দিয়ে তৈরী মোজা পরলে সেটা দেখা যাবে।

এই অদৃশ্য-আলো দিয়ে ফটো তুলে আবার বড় বড় জাল-জুয়াজুরীও ধরা হয়। একবার কোনও ব্যক্তি তাঁর পুত্র কন্যা না থাকায় অপর এক ব্যক্তিকে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে দিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর একটি পুত্র হ'ল। তখন তিনি পুত্রের নামে আবার নতুন একটা উইল ক'রে কিছুকাল পরে মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তি নোটিশ দিল ঐ নাবালক ছেলেটিকে তার বাড়ীঘর ছেড়ে দিতে। ছেলেটি আদালতে তার উইল দাখিল করল; কিন্তু করলে কি হবে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ঐ ব্যক্তির উইলটার তারিখ র'য়েছে ছেলেটিকে উইল ক'রে দেওয়ার তারিখের অনেক পরে! অতএব সম্পত্তির ন্যায্য মালীক সেই নাবালককে এখন তার বিধবা মায়ের হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়ে!

আদালত ঘরে লোকের ভীড় খুব। সকলেরই মনে একটা উৎকণ্ঠা এবং বিষন্নভাব—পিতার সম্পত্তি পুত্রে পাবে না, পাবে গিয়ে অন্য একজন! ঐ ব্যক্তি আবার সেই সম্পত্তির লোভে টাকা পয়সা খরচ করে এনেছে বড় ব্যারিষ্টার। আইনের সূক্ষ্ম বিচার শুনছে সবাই, কিন্তু মনের-বিচারে সায় দিচ্ছে না কারও। আহা! বেচারী নাবালক ছেলেটি!



কিন্তু এমন সময়ে বেগুণী পারের ফটো সব সত্য প্রকাশ ক'রে দিল। দেখা গেল, ঐ ব্যক্তি ফন্দী ক'রে তার উইলের আসল তারিখটা বেশ ক'রে মুছে ফেলে দিয়ে তার যায়গায় বসিয়ে নিয়েছে একটা নতুন তারিখ!

সাধারণ ফটোতে কিন্তু এ জিনিষটি ধরা পড়বে না। এই বেগুণীপারের আলোটি—যত কৌশল ক'রেই কোন কিছু মুছে ফেলা যাক্, ঠিক তার ছবি তুলে দেবে! এই অদৃশ্য আলোতেই কোনও নতুন জিনিষের সঙ্গে পুরাতন জিনিষের পার্থক্য বেশ ধরা পড়ে।

স্যাম হিবেন এই অদৃশ্য আলোর অন্যতম আবিষ্কর্ত্তা। ছেলেবেলায় তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে গিয়ে কোনও একটা প্রাণীর প্রস্তরীভূত অস্থি খেলনা হিসাবে কিনে আনেন। অনেকদিন পরে হঠাৎ কি ভাবে অন্ধকার ঘরে ঐ পাথরটি বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। এর থেকে প্রমাণ হল, অনেকদিন অতীত হ'য়ে গেলেও ঐ পাথরটি তার অদৃশ্য আলোতে প্রতিফলিত হওয়ার ক্ষমতা হারায় নি।

হল্যাণ্ডে হীরক বাছবার জন্যেও এই অদৃশ্য আলো ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কোন্‌টা কোথাকার হীরক তা এতে ধরা পড়ে। কোন হীরক বেশ উজ্জ্বল আলো দেয়, কোনটি বা দেয় নিষ্প্রভ জ্যোতি। নেকলেশের হীরকগুলো এইভাবে পরীক্ষা করা হয়। মণি, মুক্তা, হাতীর দাঁত প্রভৃতিও কৃত্রিম কি অকৃত্রিম ধরা পড়ে এই আলোতে।

একটা খনিতে অনেক রকমের ধাতু থাকে—তার কতক বা বাজে ধাতু আবার কতক বা বহুমূল্য। এই অদৃশ্য আলোর সাহায্যে ধাতুর বংশ মর্য্যাদা স্থির ক'রে তবে খনির কাজে বহু অর্থ ঢালা হয়।

কেবল ধাতু-দ্রব্যই বা কেন,—মাখন, ডিম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুলিরও ভাল-মন্দ ধরা পড়ে এই অদৃশ্য আলোকে। খাঁটি মাখন অদৃশ্য-আলোতে হল্‌দে দেখায়। টাটকা ডিম দেখায় লাল এবং পচা ডিম থেকে আসে মেটে রং।

সম্প্রতি কলকাতায় যে ব্ল্যাক-আউট হ'চ্ছে তাতে রাস্তার আলো সম্পূর্ণ নিবিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কারণ, ক্রমে ক্রমে সইয়ে না নিলে তাতে বিপদ হ'তে পারে অনেক। এই অদৃশ্য-আলো কিন্তু আমাদের এদিকে প্রচলিত হ'লে সুবিধা হ'ত অনেক।

আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, এর পর এমন কালী দিয়ে বইপত্র ছাপান হবে, যা প'ড়তে, দৃষ্টিশক্তি যাদের কম, তাদের মোটেই কষ্ট হবে না। অদৃশ্য আলোয় অন্ধকার ঘরেও সে অক্ষরগুলি নিজে থেকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে! ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ঘরে ব'সে অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাস খেলতে পারব!

---

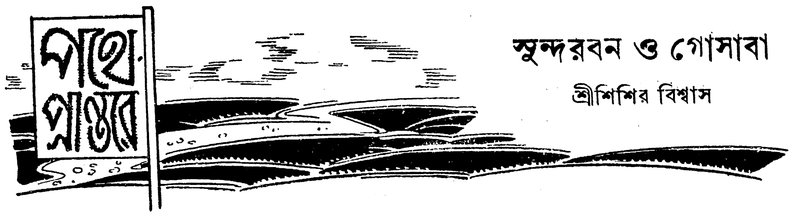


# সুন্দরবন ও গোসাবা

শ্রীশিশির বিশ্বাস

সুন্দরবনের নাম শোনেনি এরকম খুব কম ছেলেমেয়েই আছে। সুন্দরবনের বাঘ পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল্ বেঙ্গল টাইগার। আমরা কিন্তু বাঘ শিকার করতে যাইনি, গিয়েছিলুম গোসাবা ও সুন্দরবনকে চাক্ষুষ দেখতে। সুন্দরি গাছ থেকে সুন্দরবনের নাম হয়েছে, নিশ্চয় তোমরা জানো।

আমরা যে যার তল্পিতল্পা গুছিয়ে শিয়ালদহে বেলেঘাটা ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে উঠলুম। তারপর দেড় ঘণ্টার পর ক্যানিং থেকে ষ্টীমারে যখন 'গোসাবায়' পৌছলাম, তখন বিকাল সাড়ে পাঁচটা। গোসাবা থেকে সুন্দরবন মাত্র দশ মাইল। গোসাবার পর লোকের আর বসতি নেই, তাই এখানেই আমাদের আস্তানা। আমরা গোসাবার 'রুরাল্ রিকনসট্রাক্সন্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ এর অতিথি হয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য ইন্‌ষ্টিটিউট্ সদরে welcome টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ও নিজেরা ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হাত মুখ ধুয়ে চা-ডিম-বিস্কুট দ্বারা জলযোগের পর ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রদের সঙ্গে গল্প আলাপ সুরু হ'ল। আমরা আকুল আগ্রহে সুন্দরবনের সব রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে লাগলুম। তারপর সব ঠিক হ'ল একটু ঘুরে আসা যাক্। আমাদের ভাগ্য ভাল, সেদিন ছিল হাটের দিন। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে এখানে হাট বসে। হাট দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়লাম আর চমকপ্রদ কাহিনী শুন্‌তে লাগলাম। বেশ বড় হাট বসেছে। প্রায় সমস্ত রকম জিনিষ পাওয়া যায়—অবশ্যি যা সাধারণতঃ গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয়। এখানে যে এক টাকার 'নোট' চলে—সে নোটের নাম স্যার ড্যানিয়েল্ হ্যামিল্‌টন্ নোট (Sir Daniel Hamilton note) —এ নোট্ এই ষ্টেট্ ছাড়া বাইরে চল্‌বে না। ষ্টেটের নাম Sir Daniel Hamilton's State, ষ্টেটের পরিমাণ ৭৫ হাজার একার ( acre ) মাইল। তার মধ্যে ৬০ হাজার একার মাইল নাকি কৃষিকার্য্য ও লোকদের আবাসে পরিণত হয়েছে, বাকি এখনও জঙ্গল। লোকের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার ( পরে ওখানকার লোকের মুখেই শোনা )। এই ষ্টেটটি প্রতিষ্ঠা করেছেন হ্যামিলটন সাহেব।

হঠাৎ এক মজার জিনিষ লক্ষ্য করলাম হাটে—যারা মধু গুড় প্রভৃতি বিক্রি করছিল,—তাদের কা'রও হাত কাটা, কা'রও গালের খানিকটা কুঁচ্‌কে সেলাই করা, কারও আবার পা কাটা! কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করলাম কারণ। তারা বল্‌লে, সুন্দরবনের মধু বিখ্যাত মধু—



এক একটা মৌচাকে আধমণ—ত্রিশ সের পর্য্যন্ত মধু পাওয়া যায়! মধুর লোভে তারা দলবদ্ধ হয়ে মৌমাছিদের অন্ধ অনুসরণ করে—এমন কি ৪।৫ মাইল জঙ্গলের মধ্যে ঢুক্‌তে হয়। সেই সময় ব্যাঘ্র মহারাজ সুযোগ পেয়েই সদ্ব্যবহার করতে ভোলেন্ না। ওরা বললে, ওরা যত লোক্ একসঙ্গে যায়—তারা সব ফেরে না—যদিও বা ফেরে অক্ষতদেহে কখনই নয়। বললে, বাঘ চকিতের মধ্যে হল্‌দে কাপড়ের মত দলের মাঝে পড়েই উধাও। তবে দলবদ্ধ হয়ে হাতে আগুন কানাস্তারা প্রভৃতি থাক্‌লে আস্‌তে সাহস করে না। ওদের কাহিনী শুনে আমাদের যে একটু মনটা কুঁচ্‌কে গিয়েছিল তা নয়, তবে কেউ ভাষায় প্রকাশ করেনি—ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ওখান থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে গল্প গুজোব আর গান বাজনার আসর বসলো। তারপর যে যার বিছানায় গা ঢেলে দিল। খুব ভোরে উঠেই চা ডিম খেয়ে সকলেই প্রস্তুত। সুন্দরবনে যেতে হবে। সকালে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন্‌ও লেডি হ্যামিল্‌টনের সঙ্গে দেখা। আমাদের 'গুড্ মরনিং' জানালেন। আমরাও তা জানিয়ে বললাম, আজই সুন্দরবন যাচ্ছি। দুজনেই বারণ করলেন যাতে আমরা বেশী ভেতরে না যাই, তারপর সুন্দরবনের অনেক কাহিনী বললেন। বেলা ১০টার সময় সাহেবের লঞ্চে করে আমরা যাত্রা করলুম্। আমাদের সঙ্গে ছিল একজন শিকারী। যেতে যেতে তিনি চারটে গুলি ছুঁড়লেন পাখী মারবার জন্যে। কিন্তু সব কটাই অক্ষত দেহে পাখীদের বিদায় দিল। তিনি যে কি রকম শিকারী তা আমাদের আর জান্‌তে বাকী রইল না।

সত্যি ভারী সুন্দর লাগছিল আমাদের যেতে। দুদিকে ঘন অরণ্য -মাঝে আমাদের লঞ্চ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হু হু করে এগিয়ে চলেছে। আমাদের লঞ্চ বিদ্যাধরী নদী দিয়ে যাচ্ছিল। লঞ্চের ভেতর চলেছে গল্প, ওপরে চলেছে গান। তারপর লঞ্চ গিয়ে থাম্‌ল সুন্দর বনের ধারে। মধ্যে মধ্যে খালকাটা—শুন্‌লাম্ শিকারীরা এখানে লঞ্চ রেখে এখান থেকে বাঘ মারে—বাঘ যখন জল খেতে আসে ঘাটে! আমরা একে একে সবাই নাবলাম্—আগে আগে সেই শিকারী।—আরে, একি কাণ্ড আমরা ঘাট থেকে হাত দশ বার এগিয়েছি—পেলাম্ বাঘের যাবার টাট্‌কা দাগ্—আর ঠিক আগে আগেই হরিণের পায়ের ছাপ্। শিকারী বল্‌ল আজ ভোর রাত্রেই কিম্বা কাল রাত্রেই বাঘ হরিণকে তাড়া করেছিল। ঘাটে জল খেতেও আসতে পারে। দুটো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ও করল। আমাদের প্রাণ তখন যে যার মুঠোর মতো ধরেছি। এ রকম সুন্দর শিকারী যিনি পাখী মারতে..... তার উপর কালকের হাটে সেই গল্প শোনার ওপর বাঘের টাট্‌কা পায়ের ছাপ।

এদিকের সুন্দরবন ছোট ছোট গাছে ভর্ত্তি। বড় গাছ ভেতর দিকে, তাই এখন চোখে পড়ল না। যতই ভেতরে এগোচ্ছি ততই বন গভীর হয়ে যাচ্ছে। ধারটা যেমন কাদায় ভর্ত্তি—ভেতর তেমনি শুক্‌নো আর গাছ পালায় ভর্ত্তি—আমরা মাইল খানেক প্রায়ই

এগিয়েছিলুম্ শুধু আগাছা আর ছোট ছোট গাছ, হাঁটাও অসুবিধে হয়ে পড়ল। আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু শিকারীকে আমরা বাক্যবানে এ রকম বিদ্ধ করেছিলুম যে সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে একটী কিছু শিকার করবেই। আমরা লঞ্চে বসে আবার খাওয়া সারলাম্—মুড়ি—ডিম—পাঁপড় ভাজা বেশ মজা করে সবাই খেলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে শিকারী ফিরে এলো—কাপড় হাঁটুর ওপর, হাঁটু অবধি কাদা—হাতে বন্দুক। এসে গুম্ হয়ে বসে রইল—বোধ হয় কলকাতাবাসীদের শিকারটা দেখাতে না পেরে দুঃখে কিম্বা রাগে। ফিরে স্নান করে খাওয়া দাওয়া সেরে কেউ কেউ শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ গল্প করতে লাগল। বিকেল বেলায় চা খেয়ে আমরা ইনষ্টিটিউটের ছাত্রদের সঙ্গে 'ভলি বল' খেললাম্—অবশ্যি ওরাই জিতল্।

এই ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য কৃষিশিক্ষা—খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র—বোর্ডিং আছে। আমাদের জন্য একটা পাকা বাড়ী ওঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই ইন্ষ্টিটিউটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও ছাত্রদের মধুর ব্যবহারে আমরা সত্যই খুশী হয়েছিলুম। আজ রাত্রেও পূর্ব্ব রাত্রের মতই—গান বাজনা চলল—অবশ্যি খাওয়া দাওয়ার আগেই। তার পরদিন সকালে আমরা ভোরবেলা সূর্য্যোদয় দেখলাম।—ওঃ···কি চমৎকার সে দৃশ্য! সকালে আমরা গ্রাম দেখ্‌তে বেরুলাম। দেখলাম এম-ই স্কুল—কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্কুলগৃহ—দেখলাম তাঁতের সরঞ্জাম্—ছেলেরা কাপড় বুনেছে। দেখলাম ধানের আড়ৎ, তেলের কল। শাকসবজী জমি—ছেলেরা নিজহাতে সব করছে—সমস্তই নিজের নিজের হাতে, কি সুন্দর! সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম—শুনলাম এখানে কেউ নাকি বেকার নয়, কেউ চুপ করে বসে থাকে না। গ্রামবাসীদের মিষ্ট আলাপে আমরা যে সবাই সন্তুষ্ট হয়েছিলুম্ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ধারণা করতেই পারিনি যে এত সুন্দর গ্রাম হ'তে পারে। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়, ব্যাঙ্ক্—স্কুল—কৃষিশালা—টিউব্ ওয়েল সবই আছে। সবার উপর এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব জিনিষ যে প্রথমেই লোককে আকৃষ্ট করে এই দিকে—হয়ত বা সাহেবের ষ্টেট্ বলেই এত সুন্দর ব্যবস্থা। তার পরদিন ভোরবেলাই আমাদের ফিরতে হবে—মনটা কেমন করে উঠ্‌ল। আসতেই হবে, কারণ ক'দিন অতিথি হয়ে থাকা যায়! আসবার দিন সকালে সবাই গোজগাছ হয়ে নিলুম্। চা খেয়েই ষ্টীমারে উঠলুম—সত্যি বিদায় দিতে ইনষ্টিটিউটের ছাত্রদের যেন মন চাইছিল না—কি করুণ চাহনি সব। আবার আসবার জন্য অনুরোধ করল। এই কয়দিনে যেন আপনার করে নিয়েছিল। আসবার সময় আমরা প্রত্যেকেই এখানকার স্মৃতি রক্ষার্থে এক একটা জিনিষ কিনলুম। কেউ কিনলো—'Tea-table-Cover', কেউ জামার কাপড়—সব এখানকার দেশী সুতোয় তৈরী অথচ দামে খুব সস্তা। আমরা আসবার সময় ধন্যবাদ আর 'থ্রি চিয়ার্স্ ফর্ লেডি আর লর্ড হ্যামিল্‌টন' দিলুম। সাহেবও আমাদের থ্রি চিয়ার্স্ দিলেন—হু হু শব্দে ষ্টীমার এগিয়ে চললো—যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ওঁরা ঘাট থেকে রুমাল নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন।···

তোমরা যদি কখনও সুযোগ পাও, বিশেষতঃ যারা কখনও গ্রামে যাওনি—এইখানে যাবার চেষ্টা করো—দেখবে একটি "আদর্শ গ্রামের" প্রতিচ্ছবি!

# ভগবানের চাবুক

( ঐতিহাসিক উপন্যাস )

নাদির সা আসছেন, ভারত-লুণ্ঠন করতে। দিগ্বিজয়ী নাদির সা—মহাবীর, মহালোভী, মহা-নিষ্ঠুর!

দুর্ব্বল, হৃতগৌরব ভারত-সম্রাট মহম্মদ সা, দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে ব'সে থরহরি কম্পমান! নাদির সাহের নিকটে দূত পাঠিয়ে তিনি দয়া প্রার্থনা করলেন সকাতরে।

নাদির সাহের এই বাণী নিয়ে দূত ফিরে এল: "আমি করুণার অবতার নই। যুগে যুগে এক-একটা জাতির পাপকে দণ্ড দেবার জন্যে ভগবান চাবুকের ব্যবস্থা করেন। আমি হচ্ছি সেই ভগবানের চাবুক!"

তরবারি ও অগ্নি নিয়ে হুনরাজ আটিলা এক সময়ে য়ুরোপকে ছারখার ক'রে দিয়েছিলেন। তাই ভগবানের চাবুক ( scourge of God ) বলতে য়ুরোপ আজও বোঝে আটিলাকে।

কিন্তু নাদির সা ও আটিলাও যাঁর কাছে ম্লান হয়ে যান, এমন এক ভগবানের চাবুকের কাহিনী আজ আমি তোমাদের কাছে আরম্ভ করতে চাই। এ হচ্ছে অত্যাশ্চর্য্য সত্যিকার অ্যাড্‌ভেঞ্চার।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

# ভগবানের চাবুক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

## প্রথম অধ্যায়

### গোড়াপত্তন

আফগানিস্থানের উত্তরে তুর্কীস্থান। সেইখানে আছে সমরখন্দ্ নগর। এই সমরখন্দ কেবল প্রাচীন গৌরবের জন্যে নয়—আর এক কারণেও চিরস্মরণীয় হ'তে পারে।

পৃথিবীতে তিনজন দিগ্বিজয়ীর তুলনা নেই। খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, ত্রয়োদশ শতাব্দীর জেঙ্গীজ্ খাঁ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৈমুর লং।

জুলিয়াস সিজার, হানিবল ও নেপোলিয়ন প্রভৃতিও প্রথম শ্রেণীর দিগ্বিজয়ী বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তিন বীরের কীর্ত্তিকলাপ তাঁদের চেয়ে ঢের বেশী অসাধারণ ও বিস্ময়কর।

আলেকজাণ্ডার, জেঙ্গীজ ও তৈমুর—এই তিনজনের সঙ্গেই সমরখন্দ্ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিল এবং ঐ তিন দিগ্বিজয়ীই সমরখন্দ্ থেকে যাত্রা করেছিলেন ভারতবর্ষের দিকে। বেশ বোঝা যায়, সেকালে সোনার ভারতে পদার্পণ করতে না পারলে কেহই নিজের দিগ্বিজয়-কার্য্য সম্পূর্ণ হ'ল ব'লে মনে করতেন না।

আর কেবল সেকালেই বা বলি কেন, সর্ব্বকালেই ভারত দিগ্বিজয়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপোলিয়নও আসতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের দিকে। আজ্কের হিটলারও তাই চান, জাপানীদেরও প্রাণের সাধ তাই। দিগ্বিজয়ীদের ভারত-লুণ্ঠনের পথ সর্ব্বাগ্রে খুলে দিয়েছিলেন বোধ হয় পারস্য-সম্রাট প্রথম দরিয়াস।

কিছু-কম ছয়শত বৎসর আগে এক মহাবীর ব'সেছিলেন সমরখন্দের সিংহাসনে। কিন্তু কেবল সেই ক্ষুদ্র সিংহাসনে তাঁর স্থান সংকুলান হ'ল না, তিনি চাইলেন পৃথিবীর রাজতক্ত। পৃথিবীপতি হবার জন্যে তিনি বার বার রণক্ষেত্রে ছুটে গেলেন এবং প্রত্যেক বারই ফিরে এলেন রক্তাক্ত বিজয়ীরূপে! তাঁর সাম্রাজ্যের দুই সীমানা হ'ল য়ুরোপের মস্কো এবং ভারতের দিল্লী! স্পেন, ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের রাজারা তাঁর মন রাখবার ও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন ক'রে নিরাপদ হবার জন্যে দূত ও নানা উপঢৌকন পাঠাতে

লাগলেন। তিনি সে-সব রাজাকে নগণ্য মনে ক'রে খাপ থেকে তরোয়াল খুললেন না, তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভয় নেই, সমুদ্রে খালি বড় মাছই থাকে না, ছোট মাছরাও থাকে।" মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি স্তিমিত দৃষ্টি তুলে দেখলেন, পৃথিবীতে তখনো তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আছে মাত্র একজন—মহাচীনের অধিপতি! এটা তাঁর সহ্য হ'ল না—ঊনসত্তর বৎসর বয়সে তরবারি হাতে নিয়ে ধরলেন তিনি চীনের পথ। কিন্তু চীনের ছিল পুণ্যের জোর—'ভগবানের চাবুক' ফিরিয়ে নিলেন ভগবান স্বয়ং!

এই বিচিত্র দিগ্বিজয়ীকে ইতিহাস তৈমুর লং ব'লে জানে। এঁরই বংশধর বাবর ভারতে এসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মোগল-রাজবংশ।

তৈমুরের বংশধরদের মোগল বলা হয় বটে, কিন্তু এখানে একটু গোলমাল আছে। উত্তর-এসিয়া থেকে যুগে যুগে যাযাবর-জাতীয় যে সব যোদ্ধা পঙ্গপালের মতন ভারতে, চীনদেশে, পারস্যে ও য়ুরোপের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কোন নির্দ্দিষ্ট নামে তাদের পরিচিত করা সহজ নয়। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস তাদের ডেকেছেন, 'সিথিয়ান' ব'লে, রোম্যানরা তাদের 'হুন' নামে ডেকেছে এবং চীনারা ডেকেছে Hiung-nu নামে। জেঙ্গীজ খাঁ যখন ঐ যাযাবরদের এনে এক পতাকার তলায় দাঁড় করান, তখন তাদের মধ্যে ছিল মাঞ্চু, তাতার, মোগল প্রভৃতি বহু জাতির লোক। পরে জেঙ্গীজের মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে গণ্য হয়ে ঐ নানাজাতির লোককে এক 'মোগল' নামেই ডাকা হ'ত। আসলে তৈমুরকে কেউ বলেন তাতার, কেউ বলেন তুর্কী।

সমরখন্দ্ নগরের কাছে ওক্‌গাছের অরণ্য। তারপর এক গিরিসঙ্কট—দুই দিকে তার ছয়শত ফুট উঁচু লাল বালি-পাথরের দেওয়াল। স্থানীয় লোকরা একে "লৌহ-দ্বার" ব'লে ডাকে এবং এর ভিতর দিয়ে দুটির বেশী উট পাশাপাশি যেতে পারে না। এখানে বর্ষা-দণ্ডের উপরে ভর্ দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় রৌদ্র্যদগ্ধ তামাটে বর্ণের দীর্ঘদেহ প্রহরীরা।

এই পথ দিয়ে খানিকদূর অগ্রসর হ'লে একটি পাহাড়ে-ঘেরা তরুশ্যামল ক্ষেত্রের উপরে এসে পড়া যায়। সেখানে আছে একটি নগর, নাম তার "সবুজ সহর"। তার চারিদিকে খাল কাটা। কাবুলী ডুমুর ও খুবানী গাছের সারির উপরে দেখা যায় সাদা সাদা গুম্বজ বা মসজিদের বুরুজ।

১৩৩৫ (মতান্তরে ১৩৩৬) খৃষ্টাব্দে এই সবুজ সহরে তৈমুরের জন্ম।

যাত্রীর দল আসে আর চ'লে যায় সবুজ সহরের ভিতর দিয়ে—মুখে তাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধের গল্প। এই গল্প শুনতে শুনতে তৈমুর বেড়ে উঠতে লাগলেন। তৈমুর মাতৃহারা হন



অল্প বয়সেই। তাঁর বাবা ছিলেন বার্লাস্ গোষ্ঠীর তাতার জাতীয় সর্দ্দার, কিন্তু কোন গ্রাম বা দুর্গ তাঁর দখলে ছিল না। তাঁর নাম তারাগাই। তিনি সংসারে উদাসীন ব্যক্তি, সর্ব্বদাই তীর্থভ্রমণ ও ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত। টাকাকড়ি তাঁর ছিলও না, টাকা রোজগারের চেষ্টাও তিনি করতেন না।

তৈমুর বাজপাখী, কুকুর আর সমবয়সী সঙ্গীদের নিয়ে পথে পথে খেলা ক'রে বেড়ান। পথ দিয়ে চ'লে যায় দলে দলে পারসী, আরবী, ইহুদী ও হিন্দু সওদাগর কেউ ঘোড়ায় চ'ড়ে, কেউ উটের পিঠে, কেউ পদব্রজে,—পণ্য তাদের কিংখাব, রেশম বা কার্পেট। তাদের দলে গিয়ে ভিড়ে তৈমুর বাইরের জগতের খবর শোনেন।

তারাগাই বলেন, "বাছা তৈমুর, এই পৃথিবীটা হচ্ছে সাপ আর বিছা ভরা সোনার পাত্রের মত। এর প্রতি আমার কোন মায়া নেই।"

এ-সব কথা তৈমুরের মনকে স্পর্শ করে না।

তিনি ভালোবাসেন দাবা ও পোলো খেলতে এবং বনে বনে শিকার করতে! অল্পস্বল্প কোরাণ মুখস্থ করেছিলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়া খুব বেশী শেখেন নি! তিনি জানতেন তাতারদের ধর্ম্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা, তাদের আভিজাত্য হচ্ছে তরবারির আভিজাত্য।

সবুজ সহরের বার্লাস তাতাররা তখনও নিজেদের অতীতকে ভোলে নি। জেঙ্গীজ্ খাঁ তাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন। তাতাররা জানে একদিন তারা পৃথিবী জয় করেছিল।

তাদের মধ্যে যাদের সহরের মধ্যে বাড়ী আছে, তারাও বাস করে তাঁবুর ভিতরে। আজও তারা যাযাবর ধর্ম্ম ছাড়তে পারে নি, বলে "কাপুরুষরাই দুর্গ তৈরি করে লুকোবার জন্যে।"

তাদের আজানুলম্বিত বাহু, মোটা মোটা দেহের হাড়, দাড়ী-গোঁপ ভরা মুখ—তারা সাধ্যমত চেষ্টা করে, ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে যাতে না মাটিতে নামতে হয়। যখন পায়ে হাঁটে, চলে নবাবী চালে এবং কারুকে দেখে ফিরে বা স'রে দাঁড়ায় না।

পদব্রজে তারা বাঘ শিকার করতে যায় এবং লড়ায়ে যায় হাসতে হাসতে। তাদের দলে এমন লোক খুব কম, যাদের দেহে নেই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। তাদের মধ্যে এমন লোকও খুব কম, ছাদের তলায় বিছানায় শুয়ে বরণ করে যারা মৃত্যুকে। ডোরা-কাটা রেশমী জামার তলায় পরে তারা ইস্পাতের বর্ম্ম। যুদ্ধের সুযোগ না পেলে তারা সুখী হয় না। একদিকে তারা যেমন মুক্তহস্ত ও অতিথিপরায়ণ, অন্যদিকে তেমনি গোঁয়ার ও নিষ্ঠুর।

বাবার মুখে তৈমুর শুনলেন, "বৎস, জেঙ্গীজ খাঁ যখন পৃথিবী জয় করলেন, তখন তাঁর ছেলে চাগাতাই পেলেন আমাদের এ-অঞ্চলের শাসন-ভার। কিন্তু আজ চাগাতাইয়ের বংশ-ধারা বিলাসের স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছেন আর রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়েছেন তাঁর আমীর কাজ্‌গান।"

আমীর কাজ্‌গানের নাম সকলের মুখে মুখে। তাতাররা দলে দলে যায় কাজ্‌গানের ফৌযে ভর্ত্তি হবার জন্যে।

তৈমুর এখন প্রথম যৌবনে পা দিয়েছেন। এই বয়সেই তাঁর দেহ হয়ে উঠেছে যেমন সুন্দর ও সুগঠন, তেমনি বৃহৎ ও বলিষ্ঠ। তীক্ষ্ণনেত্র, কঠিন-চরিত্র। তিনি কথা কন কম, তাঁর কণ্ঠস্বর সুগম্ভীর ও মর্ম্মভেদী। হাসি-ঠাট্টার ধারও মাড়ান না।

কোন বলবান তাতার-যুবকও যে-ধনুকের ছিলা মাত্র বুক পর্য্যন্ত টানতে পারে, তৈমুর সেই ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করেন কাণ পর্য্যন্ত। তরবারি-ক্রীড়ায় তাঁর জুড়ী মেলা ভার।

পুত্রের ভাবভঙ্গি-ব্যবহারে যোদ্ধার পূর্ণ-লক্ষণ দেখে পিতা তারাগাই ছেলেকে পরামর্শ দিলেন, আমীর কাজ্‌গানের সভায় যাবার জন্যে। পিতার পরামর্শের মধ্যে ভাগ্যদেবীর আহ্বান শুনে তৈমুর রাজসভার দিকে যাত্রা করলেন।

তাঁর জীবনের আসল অ্যাডভেঞ্চার আরম্ভ হ'ল।

(ক্রমশঃ)

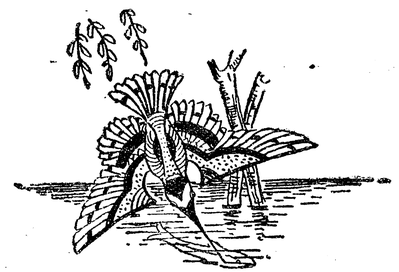

# লাল বুঝাক্কড়

## ( হিন্দুস্থানী উপকথা )

শ্রীইন্দিরা গুপ্ত

গোরক্ষপুর জেলা। সেখানে 'কাহার্‌বা' নামে ছোট্ট একটি গ্রাম। শ'খানেক লোকের বাস, সকলেই চাষ বাস করে, মানে একেবারেই চাষাভুষো। বুদ্ধি সুদ্ধির ধার কেউ ধারে না। সকালে উঠেই একটি 'দতুয়ান' নিয়ে মাঠে যায়, পরে 'চাবেনা' দিয়ে জলযোগ সেরে, ক্ষেতের কাজ। রাতে বাড়ী এসে 'রহর কী ডাল' সংযোগে দিস্তে খানেক 'লিট্টি' খেয়ে, গাঢ় ঘুম! রাজনীতি বা সমাজনীতির বালাই নেই সুতরাং ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে না।

বিপদ আপদ হলে বা দায়ে ঘায়ে পড়লে 'লাল বুঝাক্কড়' নামে আছেন এক জ্ঞানী, তিনিই পরামর্শ দিয়ে উদ্ধার করেন। এখন হয়েছে কি—এক চাঁদিনী রাতে যূথভ্রষ্ট এক ভাবুক হাতী আনমনা হয়ে একদিন কাহার্‌বা গাঁয়ে এসে পড়ে। পরে, চমক ভাঙ্গতেই হাতী তো ছুটে নিকটস্থ জঙ্গল লক্ষ্য করে পালিয়ে গেল। কিন্তু পদ চিহ্ন লুকোতে পারল না, মেঠো-পথ হস্তী-পদ চিহ্নে চিত্রিত হয়ে গেল।

সকালে যথা নিয়মে মাঠে এসে প্রথমে শিউ শরণের চোখে পড়ে। অবাক কাণ্ড! এ কী জানোওয়ার রে বাবা, যার পায়ের ছাপ এত বড়! সে তাড়াতাড়ী তার 'চাচাত' ভাই ভৈরোঁকে হেঁকে ডেকে ব্যাপারটা দেখাল। ভৈরোঁ ডাক দেয় 'ফুফুত' ভগ্নীপতি চন্দুকে, সে আবার তার 'খালা' লছমনকে ডাকে—লছমন তার 'নানা' রামরূপকে ডেকে দেখায়। মীমাংসা কিছুই হয় না, কেবল এ ডাকে ওকে ও ডাকে তাকে আর সবাই মিলে গুল্‌তুনী করে।

শেষে মুস্কিল-আসান লাল বুঝাক্কড়ের কথা ঝাঁউশু বুড়োর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কয়েক জন ছুটে গিয়ে পণ্ডিত মশাইকে পাঁজাকোলা করে অকুস্থলে হাজির করল।

একজন সম্মান করে চ্যাটাই একখানা পেতে দেয়, অন্য জন তাড়াতাড়ি একটা হুঁকা সামনে ধরে। তামাকে দুটো সুখ টান দিয়ে একটু সুস্থির হয়ে লাল বুঝাক্কড় ঘটনাটা জানতে চা'ন। চাষারা গোলমাল করে সেই পদচিহ্নের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লাল বুঝাক্কড় অভিনিবেশ সহকারে চিহ্নটি কয়েক মিনিট পর্য্যবেক্ষণ করেই প্রথমে হাহা করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে পরক্ষণেই বিকট সুরে কাঁদতে সুরু করে দিলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত চাষাকুল আরোই অভিভূত হয়ে পড়ে। গণপত নামে একটি ছোক্‌রা, সাহসী বলে তার খ্যাতি ছিল। সে এগিয়ে এসে বলে, "গোড়্‌ লাগি মহারাজ জী! এ দাগটি বা কিসের আর আপনি কেনই বা হাসলেন, কাঁদলেনই বা কেন?"

পণ্ডিতজী তখন উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'হাসলুম এই জন্য যে এই তুচ্ছ ব্যাপারটা তাও তোরা বুঝতে পারলি না, আর আমি ম'লে তোদের কি দশা যে হবে তাই ভেবেই কান্না চাপতে পারিনি।

বয়ো বৃদ্ধগণ শ্রদ্ধাপ্লুত ভাবে বাষ্পাকুল নয়নে ধরা ধরা গলায় বলে, 'ইয়ে বাত্‌তো সহী হায়! কিন্তু প্রভু, কিসের দাগ ইটি দয়া করে বলুন।'

পণ্ডিত বল্লেন—'আরে মূর্খগণ, তবে অবহিত হ'।—

লাল বুঝাক্কড় বুঝ গিয়া ঔর না বুঝা কোই
পয়ের মে চাক্কি বাঁধ্‌কে হর্‌ণা কুদা হোই।'

অর্থাৎ—

'লাল পণ্ডিত ব্যাপার বুঝিল কেহ বুঝিল না আর।
পায়ে বেঁধে জাঁতা হরিণ নাচিল ছাপটি পড়িল তার॥"

## দুই ভূত

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ( নূতন গ্রাহক )

সোমবার ভোরবেলা ঠিক সাড়ে পাঁচটায়
দুই ভূত নাচে জানি ন্যাড়া বেল গাছটায়।
সাদা ভূত কালো ভূত নাচে রোজ সোমবার,
কত নাচে তারা কভু দ্যায় নাকো গোনবার।
একদিন সাদা বলে, আয় কালো গাই গান
আমি যদি ছাড়ি গলা তুই দিস্ ঠিক তান।
দুই ভূত গান ধরে, চাঁটি মারে তবলায়;
ফোঁস ফোঁস করে শেষে যেন সাপ ছোবলায়।
সেই গানে ঝড় আসে ভাঙে সব ছড় দাড়,
গাছপালা ভেঙে পড়ে বনময় হুড়হাড়,
তারপর সোমবার এলো ভোর পাঁচটায়—
নাচিল না কেহ আর ন্যাড়া বেল গাছটায়।

——

—আঠারো—
'মামা, তোমার মনে এই ছিল?'

মামার বাণী শুনে শিশির হক্‌চকিয়ে যায়। শিশিরের সারা গা শির্‌শির্ করে ওঠে।

"আমাদের জন্যে রোস্‌ট্ আর টোস্‌ট্ আন্‌তে গেল মামা, তাই না?" জিজ্ঞেস করে লিলি—"আমার ভাগে খালি যদি টোস্‌ট্ পড়ে দাদা, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। রোস্‌ট্ আর টোস্‌ট্ আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে' খাবো, কেমন?"

লিলির নিমন্ত্রণে শিশিরের উৎসাহ দেখা যায় না—সে শুধু বলে: "আমাদের আর খেতে হবে না। মামাই সার্‌বে।"

"মামা একাই সমস্তটা খাবে? সবখানি রোস্‌ট্ আর—?"

পুনশ্চ যোগ করে' সংক্ষেপেই শিশির জানিয়ে দ্যায়: "উঁহু; মামাই খাবে আমাদের।"

"আমাদের খাবে—আমাদের? য়্যাঁ?" বিষয়টা ভালো করে' বোধগম্য হবার সাথেই লিলি ককিয়ে ওঠে।

"তাহলে শুন্‌লি কি তবে? তারই বন্দোবস্ত করতে গেল, বলে গেল কি? দরজায় শেকল এঁটে গেছে দেখ্‌ছিস্ নে?"

তাই তো—তাইই তো! মামার বিবৃতির সঙ্গে কার্য্যকলাপ জড়িয়ে দেখ্‌লে তাই মনে হয়! আর সেই সঙ্গে মামার প্রাচীন ইতিহাস—মামার পূর্ব্ব জীবনের ভ্রমণবৃত্তান্ত—সেই অখাদ্য নরখাদককে খাদ্য করার লালায়িত কাহিনী স্মরণ করে' মিলিয়ে নিলে এছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

গ্র্যাণ্ড মামাকে পারা গেছল—মামার মামাকে হয়ত পারা যায়—সে তো আর সাক্ষাৎ মামা নয়—কিন্তু এই নিজের মামার স্নেহের ক্ষুধা থেকে নিজেদের বাঁচানো কি করে সম্ভব শিশির ভাববার চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে মুষ্‌ড়ে পড়ে। লিলি তো খাটে শুয়ে পড়েছে। ভয়ে হাতে পায়ে খিল্ লেগে গেছে তার—মুখে তার কথা নেই।

"ভয় কি, আমি ঠিক উদ্ধার করব।" মনে মনে দমে গেলেও লিলিকে সে দম দ্যায়—তার প্রাণে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করে:

"আমার একার হলে কথা ছিল না। আমি না হয় মামার পেটে চলে যেতে পারতুম—হাস্‌তে হাস্‌তেই চলে যেতুম! লোকে পরের জন্যে প্রাণ দ্যায়—মামাতো আর কিছু পর নয়! বধকেতু কার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল? নিজের অস্থিমজ্জা মাংস দিয়ে অতিথি সৎকার করতে সে কুণ্ঠিত

হয়নি—দাতাকর্ণের গল্পে পড়েছিস্ তো? বৃষকেতু কি আস্ত একটা বৃষ ছিল—গোরু ছিল একটা? আদৌ না। ঠিক কাজই করেছিল সে।"

"দাতাকর্ণ পড়েছি।" লিলি ঘাড় নেড়ে জানায়।

"হ্যাঁ, কর্ণের মতো দাতা নেই। আগে পরের কথায় কান দিলেই, পরে নির্ঘাৎ প্রাণ দিতে হয়। এইজন্যেই পরের কথায় কর্ণদান করা নিষেধ। মামার কথা শুনে এঘরে না এলে তো আমাদের এই ফাঁদে পড়তে হোতো না! কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—সেকথা যাক্। আমি তো একা নই—একা হলে মরতে আমার বাধা ছিল না, তুই আছিস্ যে! যে করেই হোক্, ছোট বোনকে আমার বাঁচাতে হবে।" দাদার আশ্বাসে, ভয়ানক ভরসা পেয়ে, লিলি এতক্ষণে উঠে বসে। ওই ছোট্ট দাদাটির ওপর তার অগাধ আস্থা।

"কি করবে ভেবেচ?" সাগ্রহে সে জান্‌তে চায়

"দেখি কি করা যায়। মামাকে বলে' কয়ে দেখি—তোকে ছেড়ে দ্যায় যদি। আমারই আধখানা রোস্‌ট্ আর আধখানা টোস্‌ট্ করে'—আমার ওপর দিয়েই যদি চুকে যায়।"

"না—না—না!" লিলি বলে' ওঠে: "তা হয় না।"

"কেন হয় না, শুনি? একটা মামা, একলা মামা—কত খাবে?"

"উঁহু, তাহলে আমি বাদ যেতে রাজি নই।" লিলি ঘোরতর আপত্তি জানায়—শিশির যদি না বাঁচে তাহলে সেও সহমরণে যাবে। মামার উদর পথে সে তার দাদার সহযাত্রী।

"আমি তোকে এই দুটো দিয়ে দেব।" শিশির লিলিকে ডিম দুটো দেখায়—"এর একটা তোর, একটা আমার,—গ্র্যাণ্ডমামা দিয়েছে আমারটাও তোকে দিয়ে দেব। তুই দেশে গিয়ে এই বেচে খুব বড় লোক হতে পারবি, কতো যে চকোলেট কিনতে পারবি তার ইয়ত্তা নেই। আর ঘর ভর্ত্তি চীনে বাদাম!"

শিশির লিলিকে লোভ দেখায়।

"না না—সে হয় না।" লিলি তথাপি ঘাড় নাড়ে।

"তাহলে তো ভারী মুস্কিল হোলো! দুজনকেই দেখ্‌চি উদ্ধার করতে হবে আমায়। ভারী শক্ত কিন্তু।"

শক্ত তো বটেই—শিশির ঘাড় হেঁট্ করে' ভাবে। একজনকে বাদ দেয়ানো যেত—কিন্তু দুজনকে বর্‌বাদ্ করতে মামাকে রাজি করানো যাবে কিনা সন্দেহ।

লিলির সহসা কৌতূহল হয়: "মামা হঠাৎ আমাদের খেতে চাইছে কেন? আমরা কি করেছি?

"বাঃ, মামার ধনরত্ন উদ্ধার করে' এনে দিলুম যে!"

"সে তো ভালোই করলুম মামার।"

"ভালোই তো! মামাও তো সেটা ভালো ভাবেই নিয়েছে। আর তাতেই আমাদের কাল হোলো! মামা আমাকে ভালোবেসে ফেলল যে! আমার খাতিরে তোকেও ভালোবাস্‌ল আবার কি না!"



লিলি শিউরে ওঠে—ষ্টেশন থেকে তাদের নিয়ে আসার সময়ে মামার গল্প তার মনে পড়ে। ব্রজেশ্বরের অভিধানে—সেই নরখাদক গলাধঃকরণের পর—সেই বন ভোজনের পর থেকে—ভালোবাসার একটি মাত্র অর্থ! যাকে ভালবাসো তাকে ভালো জায়গায় বাসা দাও! আর হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে উদরের মতো এত উপাদেয় স্থল আর কোথায়?

ঘি গলবার কলকলধ্বনি ওদের কানে আসে। খড়খড়ি ফাঁক্ করে' সন্তর্পণে দ্যাখে, এর মধ্যেই মামা ইঁটের পাঁজা সাজিয়ে, দরজার একটু দূরেই প্রকাণ্ড একটা উনুন খাড়া করেছে। আর সেই উনুনের মাথায় পেল্লায় এক কড়াই—! এইমাত্র তলাকার শুক্‌নো কাঠে আগুণ ধরানো হয়েছে—এধারেও দাউ দাউ করে' উঠেচে আর ওধারেও কড়াইয়ের ওপরে ঘি কল্‌কল্ করতে লেগে গেছে।

উনুনের এক পাশে স্তূপীকৃত কাঠ—আর তিনটে ঘিয়ের ক্যানাস্তারা খালি! এর মধ্যেই মামা ইঁটে আর কাঠে, আগুণে আর ঘৃতাহুতিতে তাঁর দক্ষযজ্ঞ অনেকখানি এগিয়ে ফেলেচেন!

দৃশ্য দেখে তো শিশিরদের চোখ ছানাবড়া!

"হায় মামা, তোমার মনে শেষে এই ছিল," দীর্ঘ-নিশ্বাসের সাথে সাথে লিলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়: "তুমি যে আমাদের হাড় মাস ভাজাভাজা করবে, ভাবতেও পারিনি!"

## —উনিশ—

## প্রাণ নিয়ে টানাটানি লেন্

ঘি যতই কল্‌কল্ করে, লিলির চোখ ততই ছলছল করে। শিশির বলে: "ঘিটা ভালো নয়—শ্রীঘৃত নয়—বিশ্রী ঘি!

লিলি কোনো জবাব দ্যায় না।

"চর্ব্বির ভ্যাজাল আছে, গন্ধে টের পাচ্ছিস্ নে?" শিশির পুনরপি বলে।

জাল দেয়ার সাথে সাথেই জালিয়াতি জানা গেছল্—দুর্গন্ধে মাত করে' দিয়েছিল চারধার। কিন্তু চর্ব্বির ভ্যাজাল্ থাক্‌লেই বা কি, খাঁটি ঘিয়ের তুলনায় তার ভাজবার ক্ষমতা কি কিছু কম? হাড়-মাস ভাজা ভাজায় সেই বা কম যায় কিসে? আর চর্ব্বির ভর্জ্জিত হলেই বা মামার চর্ব্বিত চর্ব্বণের পক্ষে অসুবিধে কোথায়? বড় জোর ব্রজেশ্বরের অম্বল হতে পারে—গলা জ্বালা পেটের অসুখ অবধিত গড়াতে পারে হয়ত—কিন্তু তাতে আর গর্ হজম্ হওয়াদের কী সান্ত্বনা!

লিলি চুপ্‌টি করে' থাকে। ঘিসের বিষয়ে কেন যে অত খুঁৎখুতে হতে হবে সে ভেবে পায় পায় না।

"মামা তো কই এখনো কাট্‌ছে না আমাদের?"

শিশির একটু যেন ব্যস্তই হয়ে ওঠে: "আস্তই চাপিয়ে দেবে নাকি?"

"আস্তে আস্তেই টের পাবে।" লিলি বলে: দাদার এত ব্যগ্রতা তার ভালো লাগে না।

"কাটাকুটিই করুক্ কি আগুনেই চাপাক্, দরজাটা একবার খুল্‌লে হয়।" শিশির বলে: একটা মৎলব এঁটে রেখেছি।"

"কী মৎলব!" লিলির এবার আগ্রহ দেখা যায়।

আমার কাছে সেই প্ল্যান্‌খানা রয়েছে কি না! মামাকে একটু ধাপ্‌পা মারতে হবে। মামাকে বল্‌তে হবে যে এই রত্নটি তো কেবল নমুনা মাত্র! এরকম আরো বিস্তর সেই গুপ্তকক্ষে লুকানো রয়েছে। এই প্ল্যান্ ধরে' খুঁজে পেতে বার করতে হবে। এই না শুন্‌লে মামা নিশ্চয়ই লোভে পড়ে তক্ষনি সেই ঘরে খুঁজতে যাবে—আমাদের রান্নাবান্না আপাতত স্থগিত রেখেই চলে যাবে। আর আমরা সেই ফাঁকে—"

"বুঝেচি।" বাধা দিয়ে লিলি বলে' ওঠে: "কিন্তু মামা ভারী হুঁসিয়ার, এমন তৈরি রোস্ট ফেলে নেখে—বেগুনী ফুলুরির ফলার ফেলে—"

"আরে, ভোজনের আগে দক্ষিণা পেলে কে না খুসি হয়? মামা তো মামা! দেখিস্ না কেমন দৌড় মারে—দেখিস্ তখন!"

মামার আগমনের প্রত্যাশায়—দ্বারোদ্ঘাটনের অপেক্ষায়—গ্রাণ্ড মামার ফেরৎ দেয়া প্ল্যান্ খানা পকেট থেকে বার করে শিশির। প্ল্যান্‌টার পেছনে—অপর দিকে—এ আবার কিসের খস্‌ড়া? আরেক খানা নক্সা-মতো দেখা যাচ্ছে যে! এ আবার আরেক কোন্ গুপ্ত কক্ষের হদিশ?

শিশির বিস্মিত হয়ে নতুন নক্সাটার ওপরে চোখ বুলোয়। যে ঘরে তারা বন্দী রয়েছে, অনেকটা সেই ঘরের ছক্ মতন যেন। ছকের নির্দ্দেশ মত অনুধাবণ করে'—ঘরের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি গিয়ে—ঘরের একটা কোণে গিয়ে তারা হাজির হয়।

সেখানে কোন ঠেসা হয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে শিশির ঘা লাগায়।

অবাক্ কাণ্ড! ঘা মার্‌তেই জায়গাটা যেন নড়তে থাকে—তারপর আস্তে আস্তে সর্‌তে সর্‌তে অনেকখানি ফাঁক হয়ে যায়, সাম্‌নে একটা সুড়ঙ্গের মত ফাঁকি বেরিয়ে পড়ে।

"টেবিলের ওপর থেকে মামার টর্চ্চ্‌টা নিয়ে আয় তো লিলি!"

গুহার মধ্যে আলো ফেল্‌তেই যত দূর স্পষ্ট হয় তাতে সুরঙ্গ বলেই সন্দেহ হয় বটে! কিন্তু সুরঙ্গরূপী এই সন্দেহকে অনুসরণ করে এগুনো যায় কিনা—এ পথ গেছে কোন্ খানে?—ইহাই প্রশ্ন!

সুঙ্গটা যেমন নোংরা তেম্‌নি আবার সন্দেহবাদী—কিন্তু যতই বিশ্রী হোক্, বিশ্রী ঘিয়ের পথ পরিত্যাগ করতে হলে এ ছাড়া সম্প্রতি অন্য পথ আর নেই, এই ভেবে টর্চ্চ্ হাতে, ওরা সুরঙ্গ পথে পা বাড়ায়।

সুরঙ্গটা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নেমে গেছে। কোন রকমে ঘাড় হেঁট করে' অধোবদনে নামা চলে। শিশির যায় আগে আগে—লিলির হাত ধরে'। যতই এগোয়, বিচ্ছিরি সোদা সোদা গন্ধ ওদের নাকে এসে কাম্‌ড়াতে থাকে।

খানিক দূর এগুতেই সিঁড়ি কাঁপ্‌তে থাকে—ইটের গাঁথ্‌নি হলেও পুরণো পচা সিঁড়ি তাদের গায়ের ভারই যেন টাল্ খায়। সাম্‌নে পেছনে এধার ওধার থেকে এক আধ খানা ইঁট খসে পড়ে।



"এই! পা টিপে টিপে হাঁট্‌ছিস্ কি? তাড়াতাড়ি আয়? চারধার কাঁপছে, দেখ্‌ছিস্ না!" শিশির তাড়া লাগায় লিলিকে।

"ভূমিকম্প নাকি দাদা?" লিলি ভয় খেয়ে যায়। সুরঙ্গটা ওদের পিছু পিছু পড়তে পড়তে—ধরাশায়ী হতে হতে আস্‌ছে বলে' মনে হয়।

"তাহলেই তো হয়েছে। সুরঙ্গের মধ্যেই ইঁদুর মরা হতে হবে।" সুরঙ্গের পেছনের পথ অবরুদ্ধ—তাদের অনুসরণ করে' বুজে এসেছে—ক্রমশই বুজে আস্‌চে। টর্চ্চ ফেলেই দেখতে পায় ওরা। লিলিকে আত্মসাৎ করে' শিশির তাড়াতাড়ি পা চালায়।

সুরঙ্গ পথের গোটা কয়েক বাঁক্ ঘুরে, নীচের তলে নেমে, নালার মতন একটা প্রণালীর ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে ওরা বেরিয়ে আসে। বাইরের আলোতে বেরিয়ে হাঁপ্ ছাড়ে!

এ কি! সত্যিই তো প্রকাণ্ড অত বড় বাড়ীটা অমন করে' কাঁপ্‌ছে কেন? পায়ের মাটি স্থির অথচ—ভূমিকম্প তো নয়! কম্পান্বিত বাড়ীর থেকে সভয়ে ওরা সরে এসে দূরে এসে দাঁড়ায়।

দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সমস্ত বাড়ীটা হুড়মুড় করে' হৈ চৈ করে' ভেঙে পড়ে—ইঁটে কাঠে কড়ি বরগায় পুঞ্জীভূত হয়ে বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

## —কুড়ি—

### বিনা টিকিটের যাত্রী

"বাড়ীটা ভারী ভয়াবহ, কেন যে সে বর্ম্মিজটা মামাকে একথা বলেছিল বোঝা যাচ্ছে বেশ এখন"—শিশির বলে।

"তুমিও তো বলেছিলে বাড়ীটার চালচলন ভালো নয়"—লিলিও বাৎলায়।

"বলে ছিলাম কিনা? প্রথম দর্শনেই বলে দিয়েছিলাম।" শিশির নিজের কথার প্রমাণ লাভ করে' পুলকিত হয়: "দেখ্‌লিত চালচলনাটো? আরেকটু হলে আমাদের ঘাড়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর কি! নিজের চোখেই তো দেখ্‌লি!"

"হুঁ। এ রকম গায়ে-পড়া বাড়ী ভালো না।" লিলি মুখ ব্যাঁকায়।

"কিন্তু মামা? মামা যে ঘিয়ের কড়াই নিয়ে ওর মধ্যেই থেকে গেলরে!" শিশির হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে: "চাপা পড়ে রইল যে! মামাকে তো উদ্ধার করতে হয়।"

"কিন্তু মামা যদি আবার খেতে চায়?" লিলি ভীত হয়ে ওঠে।

"সে তখন দেখা যাবে। আগে ত মামাকে বাঁচাই।"

শিশির এক একখানা করে ইঁট সরাতে আরম্ভ করে। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রায় নব্বই আশী খানা ইঁট সরিয়ে ফ্যালে—লিলিও তার সহযোগিতায় এগোয়—কিন্তু দুজনে মিলে উঠে পড়ে লাগলেও সে আর কথানা ইঁট! পর্ব্বত প্রমাণ ইটের পুঁজি তখনো তাদের সাম্‌নে স্তূপাকার! ধরাশায়ী অট্টালিকার নিঃশব্দ অট্টহাসির আকর্ণ বিস্তারের সাম্‌নে তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আরো খান দশেক ইঁট হটিয়ে শিশির হাঁফ্ ছাড়েঃ "এক শতাব্দীতে কি পেরে উঠ্‌ব? এই সব ইঁট ঠাঁই নাড়া করতেই কলিযুগের বাকী কটা দিন কেটে যাবে।"

"মাগো! কম কি ইঁট!" লিলিও যোগ দ্যায়ঃ "এই কথানা নাড়তেই আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেল!" লিলি নিজের ফোস্‌কানো হাতে ফুঁ দিতে দিতে বলে।—খান্ ত্রিশেক সে নড়িয়েছিল—কিন্তু তাই নড়াতেই তার নড়াতে ব্যথা হয়েছে।

"তাহালে—তহেলে আর কী হবে!" শিশির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেঃ "এক একখানা করে ইঁট সরিয়ে মামার কাছ অবধি গিয়ে পৌঁছতেই আমাদের চুল দাড়ি সব পেকে যাবে। আমরা বুড়ো হয়ে যাব।"

দাড়ি পাকার কথায় লিলির আপত্তি করার ছিল, শিশিরের দাড়িই হয়নি—এবং লিলির—লিলিরও না হলেও—লিলির কোনো দিনই হবে না। কিন্তু বুড়ো হয়ে যাবার কথায় প্রতিবাদ করার কিছু নেই—ওটা পাকা কথা। লিলিকে কাজেই চেপে যেতে হয়।

"আর ততদিনে কি ওই ইষ্টক সমাধির মধ্যে মামা বেঁচে থাক্‌বে?" শিশির নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেঃ "আমার তো বিশ্বাস হয় না।"

"এতক্ষণই বেঁচে আছে কিনা কে জানে!" লিলি সদুত্তর দ্যায়ঃ "মামা ছাতু হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়। ছাত চাপা পড়লে ছাতু না হয়ে যায় না।"

"তাহলে তো হয়েই গেছে! তবে তো বৃথা চেষ্টা তাহলে আর একাজে হস্তক্ষেপ করা কেন?" শিশির ইটের পিঠ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

"মামার কোনো দোষ ছিল না। সেই বুনো জংলীটাই অনর্থক মামার পেটে গিয়ে মামার স্বভাব বিগ্‌ড়ে দিয়ে ছিল। সেই যত নষ্টের গোড়া।"

এতক্ষণে লিলির মুখে তবু একটু মামার গুণকীর্ত্তন শোনা যায়। পরলোকগত মাতুলের জন্যে শোক প্রকাশের সুযোগ পায় সে।

"হুঁ। মামা-লোকটা ভালোই ছিল। দোষে গুণে মানুষ।" শিশিরও মামার জন্য আপ্‌সোস্ করেঃ "মামা হলে কি হবে, ভালোবাস্‌তে জান্‌ত!"

"ভয়ানক।" বল্‌তে না বল্‌তে লিলির চোখ মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে আসেঃ "এখানে আর দাঁড়িয়ো না দাদা! আমার ভারী কান্না পাচ্ছে।"

"চল্ আমরা এখান থেকে চলে যাই। এই মৌলমীন্ থেকেই চলে যাব। এখানে আর কি জন্যে? আজই যে জাহাজ ছাড়বে তাইতে চেপে বাড়ীর দিকে পাড়ি দিই চ।"

জাহাজঘাটার দিকে ওরা পা চালায়। লোকের মুখে মুখে পথের বার্ত্তা নিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলে।

"বাঘকে কেন যে মামা বলে এতদিনে জান্‌লাম।" যেতে যেতে জানায় শিশিরঃ "আমাদের মামাকে দেখেই জানা গেল। কিন্তু যাই বল লিলি, মামার মতই মামা ছিল আমাদের। অমন বাঘা মামা প্রায় হয় না।"



মামার গৌরবে শিশির গর্ব্ব বোধ করে।

"তা ঠিক।" লিলিও গর্ব্বিত হয়ঃ "কিন্তু আবার চাঁদকেও তো মামা বলে' থাকে।"

"সে তোদের বেলা। যে মামা আমাদের ভাগ্‌নেদের বেলা বাঘা মামা, কেবল আমাদের তাড়া করে' ফেরে, সেই মামাই আবার তোদের ভাগ্‌নিদের বেলায় চাঁদা মামা—কথায় কথায় কেবল চাঁদা দ্যায়।"

লিলি সলজ্জ হয়ে চুপ করে' থাকে। ভাগ্‌নি-সুলভ অভিজ্ঞতায় এ কথা অস্বীকার করতে করতে পারে না।

"কিন্তু আমাদের এই মামার বেলা সে কথা বলা যায় না।" শিশির বুক ঠুকে মামার পক্ষ সমর্থন করেঃ "আমাদের মামাকে অমন পক্ষপাতী বল্‌তে পারবে না কেউ। একদম এক চোখোপানা ছিল না—দুজনকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছে। তাই নারে লিলি?"

এ কথাও অস্বীকার করা কঠিন। মামার সমদৃষ্টির কথা মনে পড়তেই লিলি শিউরে ওঠে।

জাহাজঘাটায় গিয়ে জানা যায়, রেঙ্গুনের জাহাজ তক্ষুনি ছাড়বে। টেনাসেরিম্ থেকে আসা জাহাজ, সেখান থেকে ছেড়ে, রেঙ্গুন, একীয়াব্, চট্টগ্রাম হয়ে সরাসরি কলকাতায় গিয়ে পৌঁছবে।

টিকিট করার সময় ছিল না—জাহাজের পাটাতন ওঠা ছিল—ছুটোছুটি করে' গিয়ে ওরা উঠে পড়ে। ওরাও ওঠে, পাটাতনও ওঠানো হয়। জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ দিয়ে ছেড়ে দেয়।

জাহাজের টিকিট্ চেকার যাত্রীদের টিকিটের খোঁজ নিয়ে ফিরছিল। ঘুরতে ঘুরতে শিশিরদেরও কাছে আসে—তাড়াতাড়িতে টিকিট্ করা হয়নি—জানাতে বাধ্য হয় শিশির। তাছাড়া—টিকিট্ কেনার টাকাও তো তাদের কাছে ছিল না।

"য়্যাঁ? একি তোমরা সরকারী রেলগাড়ী পেয়েছ নাকি, যে বিনা টিকিটে লম্বা দেবে?" ব্যাপার দেখে জাহাজের কর্ম্মচারীটির যেন আক্কেল গুড়ুম্ হয়ে যায়।

শিশির হাতের আংটি খুলে দ্যায়ঃ "এতে আমাদের টিকিট্ হয় না? কলকাতা পর্য্যন্ত টিকিট্?"

"এতেও যদি না হয় আমার সোনার দুল্ আছে।" লিলি কানের দুল নেড়ে বলে। বল্‌তে গিয়ে দুলের দোল্‌না লেগে ওর সোনালী মুখ লাল হয়ে ওঠে।

—শেষ—

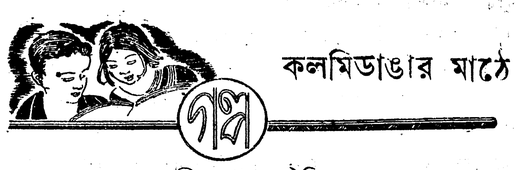

# কলমিডাঙার মাঠে

শ্রীঅশোক ভৌমিক

ছোট্ট সুটকেশটিতে মা সব নিজের হাতে গুছিয়ে দিলেন। ফ্লাস্কে করে চা, তার সঙ্গে দিলেন লুচি, সন্দেশ, ফল মিষ্টি. আর মোহন কাল রাত্রে মা-কে বলেছিল—'মা, তুমি কাল খাবার সাজিয়ে দেবে যখন, সঙ্গে দুটো পানও সেজে দিও, এ্যাঁ? ষ্টিমারে ব'সে খাবো।' তখন মা ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—'পান খেয়ে ঠোঁট লাল করতে হবে না এইটুকু ছেলের।' মোহন মুখ গোমরা ক'রে ছিল। কিন্তু আজ দেখা গেল মিষ্টির পাশে বাক্সটির এককোণে দুটি পান সাজা রয়েছে।

পথে অবশ্য দোকান পড়ে অনেক, ষ্টিমারেও পাওয়া যায় খাবার, কিন্তু সময়টা ভালো নয়, বাজে জিনিষ খেয়ে কলেরা ধরুক আর কি! তাই মা ছোট্ট সুটকেশটিতে খাবারগুলো বেশ ভালো ক'রে বাঁধা ছাঁদা ক'রে সাজিয়ে দিলেন। ষ্টিমারে বসে মোহন খাবে সেই বিকেল পাঁচটায়।

তিন ক্রোশ পথ মোহনের একলা হাঁটতে হবে, তবে সে পাবে ষ্টিমার ঘাট। ষ্টিমারে চার ঘণ্টার যাত্রা। তারপর বনগাঁর কালো মাটিতে পা দিয়ে স্কুলবোর্ডিং। কতো ছেলে সেখানে। কতো কথাবার্ত্তা, হাসিগল্প ···কিন্তু সব সময় ভালো লাগে না—বাবা-মা'র কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে অনু, খুকু, তিপু, অসীমের কথা। তাইতো যখনি ছুটি পায় মোহন, ছুটে আসে এই গ্রামে। যে কোন মুহূর্ত্তে সে খালি হাতেই চলে আসতে পারে—এই তো পথ!

দুপুরবেলায় খেয়ে দেয়ে সুটকেশ হাতে মোহন ষ্টিমারঘাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। চৈত্র-বেলার রোদ ধূ-ধূ করছে মাথার 'পরে। রাস্তাতেই মেলে অনেক চেনা জায়গা, এখানে কাঁটাল বন, এখানে বেতে ঝোপ। আর মাঝে মাঝে পায় শিউলি গাছের ক্ষীণছায়া। কিন্তু এই উদাস-করা প্রখর রৌদ্রতাপের নীচে চলতে চলতে কান্না আসে তার—এই দুপুরে সেই সব স্মৃতি ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়—আরো ছোটো বেলায় শিউলিগাছের নীচে, যখন সিঁদুরে আলোর ঘোমটা টেনে ঊষা মায়ের মতন তাদের গ্রামে এসে সব দাঁড়িয়েছে, সেই সময় সে এসে কোঁচড় ভরে কুড়োতো ঝরা শিউলি। পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার আগে কাসুন্দ লুকিয়ে এনে বেতের ফলের সঙ্গে মেখে খেত এই ঝোপের আড়ালে, সে আর তিপু।



একলা চলেছে মোহন। কান্না আসবে না তার? গ্রামের পথে হাঁটেনা একটাও লোক! ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে একটা শনে ছাওয়া ঘর, তারও দরজা বন্ধ। সব থেকে দুরন্ত ছেলেটিও বুঝি ঝিমিয়ে পড়েছে গুটোনো বিছানায় মাথা রেখে। একটাও লোক নেই। অনেকদূর হেঁটে এসেছে সে। আগিয়ে আছে কলমিডাঙার মাঠ—সে বড় নির্জ্জন জায়গা।

মোহন সামনে চেয়ে দেখলো একটা ধূলার আবর্ত্ত উঠেছে। ক্রমে সেই আবর্ত্তের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো টুং টুং করতে করতে একটা গরুর গাড়ি। গাড়ি কাছে আসতেই মোহন রাস্তার একপাশে চুপ ক'রে দাঁড়ালো। দেখলো গাড়ি বোঝাই করে বিছানাপত্তর শুদ্ধ মেয়েরা আসছে। সঙ্গে তাদের কতক ছোটো ছোটো ছেলেরা আছে। হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। একজন বৃদ্ধা মহিলা মোহনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কার ছেলে গো তুমি?' মোহন জবাব দিলো। তিনি মোহনকে জানেন। বললেন, 'ও তুমি' ঘোষবাড়ির ছেলে?'

তাঁরা আসছেন সোহাগপুর থেকে। ঐদিকটায় কলেরার মড়ক লেগেছে। বাড়ির পুরুষেরা আসবে পরে। যাচ্ছেন করুণা চাটুর্য্যের বাড়ি। করুণা বাবুর স্ত্রীর বোন হ'ন তিনি। এই গ্রামে আরো ক'বার এসেছেন। বললেন—'তা যাচ্ছ যাও। কিন্তু সাবধান, শুনেছি কলমিডাঙার কাছাকাছিও আরম্ভ হয়ে গেছে।'

মোহনের বুকটা ছ্যাঁক্ করে উঠলো। কলমিডাঙায় মড়ক লেগেছে—কলেরার মড়ক? সেখানের লোকজন কি সব পালিয়েছে? ষ্টিমারঘাটের পথে এ-গ্রাম পেরিয়ে তাকে যেতে হবে। রইলো ঘরবাড়ি, আসবাবপত্তর, দলে দলে লোকেরা গরুবলদ নিয়ে কতোদূরে কোন্ আত্মীয় অনাত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। মনে ফুটে উঠলো গাঁয়ের রিক্ত শ্মশানমূর্ত্তির ছবি। স্তব্ধ দুপুরবেলা; জনহীন গ্রাম। কলেরায় যারা মারা গেছে, তারা যদি সব পথের পাশের দেবদারু গাছের মতো লম্বালম্বা শীর্ণ কঙ্কাল নিয়ে মোহনের সামনে এসে দাঁড়ায়? যে-গ্রামে ভরা দুপুরেও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই, সেখানে এমন তো নিশ্চয়ই হ'তে পারে!

ভাবতে ভাবতে মোহন এগোলো। অনেকদূর এসে সে পথের পাশে কতকগুলি বাড়ি দেখতে পেল। মোহনের মনে হোলো কোনো বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে কাউকে ডেকে একবার কলেরার ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করে যাবে। একটা বাড়ীর সামনের বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী ফটকটা খুলে সে ভেতরে ঢুকলো। দরজার সামনে এসে খানিকক্ষণ সে চুপ ক'রে দাঁড়ালো। শুনতে চেষ্টা করলো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা কারো। কিন্তু, না। দরজাটা ধাক্কা দিয়েই দেখে তা ভেতর থেকে খোলা।

বিস্মিত হোলো মোহন।

—'বাড়িতে আছেন কেউ ?'

উত্তর নেই। নিঝুম একেবারে। মোহন পা টিপেটিপে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কেউ নিশ্চয়ই আছে এই বাড়ির মধ্যে তার মনে হ'তে লাগলো। হয়তো সে খুব ক্লান্ত, হয়তো বিছানায় শায়িত পীড়িত সে এক্‌লা রয়ে গেছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে এসেছে তার। একটু জল দেবে এমন লোক নেই। প্রতি ঘরে উঁকি মারলো মোহন, কিন্তু কেউ নেই— জিনিসপত্তর সব আছে, শুধু মানুষ নেই। সমস্ত ঘরগুলোর কোণে-কোণে, দেওয়ালে, মেঝেতে কেমন যেন একটু ছায়া-ছায়া। ভীষণ সন্দেহ উঁকি মারলো মোহনের মনে। তা হলে? সব মানুষজন কি এ গ্রাম থেকে পালিয়েছে—নাকি সব মরে গেছে? সমস্ত শরীর মোহনের রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তা হলে ?

—'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ'—

যাক্ ! তবু ভাল, একটা কুকুর আছে। ভেতরের বারান্দায় পা দিয়েই তার মন আশায় ভরে উঠলো। স্তব্ধ আবহাওয়ায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, এক ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছিল এ-বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে। এইবারে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডাকলো, —'আয় আয়—'

বারান্দার একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা শীর্ণ কুকুর ছিল ব'সে। ডাক শুনতে পেয়ে মোহনের পিছন-পিছন কুকুরটা বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে মোহনের বারে বারে গা কাঁপে। গা কাঁপে তার আশেপাশের বাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে। কোনো বাড়ির দরজাজানালা সব বন্ধ —কোনো বাড়ির দরজা হাট ক'রে খোলা। হন্ হন্ ক'রে মোহন হাঁটে। যখন আশঙ্কায় সমস্ত শরীর তার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, একটু নীচু হ'য়ে সে কুকুটার মাথার রাখে তার স্নেহ শীতল হাত। মৃতপ্রায় কুকুরটাকে দেখে মোহনের মন করুণায় ভরে ওঠে। এ'কে সে কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে পারে না—তার একমাত্র সঙ্গী, তার ভরসা।

ক্রমে এলো কলমিডাঙার বিখ্যাত মাঠ—দূর থেকে দেখা যেতে লাগলো পাংশুটে ঘাসের কার্পেট দিগদিগন্ত ছাওয়া। তারই মাঝ দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথটি মিলেছে গিয়ে নীল—নীল...একী ? আকাশের কোণ কালো হয়ে গেছে ! অসংখ্য টুকরো টুকরো মেঘ জমায়েৎ হয়ে বিশাল ব্যাপ্তিলাভ করছে। দিগন্তবিসারী মাঠের দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হোলো মোহনের—যেন চোখে তার রঙীন চশমা। কাচের মধ্য দিয়ে সে তাকালো সামনে আর দেখলো খররৌদ্র মুহূর্ত্তে স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। সূর্য্য দপ্ করে নিব্‌লো আর মৃত সাদাটে মাঠের 'পরে থম্‌থম্ করতে লাগলো কাজল ছায়া।

যদি বৃষ্টি নামে ?

মোহন আরো জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলো ! কুকুরটা পিছিয়ে পড়ছে বারে



বারে। মোহন থামে—আবার চলে। মাঠের মাঝখানে পুরানো মন্দিরটায় তার পৌঁছানো চাই। পুরানো ছোটো মন্দির। কোন্ কাল থেকে পূজাপার্ব্বন উঠে গেছে ঠিকানা নেই তার। শুধু আজও যখন কলমিডাঙার মাঠের মধ্যে দিয়ে পথিক হাঁটে, এইখানে একটু থেমে সে জিরিয়ে নেয়। মাথার ওপর থেকে বাঁচায় রোদ আর বৃষ্টি।

মন্দিরে উঠে মোহন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। হুড়মুড় করে সমস্ত আকাশে তোলপাড় করতে লাগলো মেঘ, তীক্ষ্ণ দাঁত বের ক'রে চমকালো বিদ্যুৎ। আর সমস্ত মাঠ জুড়ে বিপুল প্লাবনে অজস্র ধারায় নামলো বৃষ্টি। মোহন বসে পড়লো। এ বৃষ্টির আর থামবার আশা নেই ; সে ষ্টিমার ঘাটেও পৌঁছতে পারবে না। এই মন্দিরেই সমস্ত রাতটা কাটাতে হবে। সমস্ত রাত এই নির্জ্জন মন্দিরে ? কুকুরটাকে একেবারে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরলো সে। ঝড়ের রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে যেমন ক'রে মা-কে জড়িয়ে ধরে শিশু। যতদূর দৃষ্টি চলে—শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। চতুর্দ্দিকে অবলুণ্ঠিত বর্ষাধারা দোল খাচ্ছে বাতাসে।

অগত্যা সুটকেশটি খুলে খাবারগুলো বের করলো সে। বের করলো চায়ের ফ্লাস্ক, লেজ নাড়তে নাড়তে কুকুরটা বসলো তার সামনে। মোহন একটু ক'রে খায় আর দূরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে খাবারগুলি। কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে সেগুলি খায়, কিঁউ কিঁউ শব্দ করে। না, একে বাস্তবিক কিছুতেই মোহন ছেড়ে দিতে পারবে না। বোর্ডিংএ নিয়ে যাবে, যত্ন করবে, দু'বেলা সঙ্গে ক'রে বেড়াবে।

সন্ধ্যার ছায়া নামলো। চুপ ক'রে ব'সে আছে মোহন আর তার পাশে কুকুর। জনহীন শূন্যপ্রান্তরের মধ্যে তারা শুধু দু'টি। কুকুরটা তার সামনে গুটি মেরে শুলো, থাবাটা তার মুখের সামনে ধ'রে।...ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে আর আতঙ্ক ছেয়ে আসছে মোহনের মনে। এই মাঠটার শেষেই আছে একটা আশ্রম—সন্ন্যাসীরা থাকেন। এক ছুটে চলে যাবে নাকি মোহন সেখানে ? কিন্তু সে কতো দূর ! আশ্রমেও বোধ হয় কেউ নেই, সব পালিয়েছে। যদি ঠিক এই সময়.. তার শরীরটা ছম্ ছম্ করতে লাগলো—কলমিডাঙায় যত লোক কলেরায় মারা গেছে, তারা সব যদি এই মন্দিরটার দিকে আসতে থাকে ? যদি...ভাবতে ভাবতে সে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে দেখলো, সে ঘুমোয় নি। থাবার ওপর মুখটা রেখে তার ছোটো ছোটো লাল চোখ দুটো খুলে মোহনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মোহন চোখ ফেরাতে পারলো না—আগুনের গুলির মতো দুটো চোখ তা'কে নিষ্পলক দেখছে। সমস্ত রোমগুলি মোহনের খাড়া হয়ে উঠলো। চকিতে তার মনে হোলো, সেই নিঝুম বাড়িটা থেকে সে যাকে সঙ্গে ক'রে এনেছে সে কুকুর নয়—কলেরার একটা মড়া, কুকুরের বেশে তার পিছু পিছু এসেছে। সে মোহনকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।...ঐ তার থাবাটি এগিয়ে

আসছে, কুকুরটা উঠে আসছে তার দিকে·· মোহন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এক লাফ দিয়ে ছুটলো—কুকুরটাও ছুটে আসছে।—ছুট—ছুট—ছুট—সমস্ত মাঠ ভরে বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝড়েতে দুলছে বৃষ্টির আঁচল দিগন্ত থেকে দিগন্ত—তারই মধ্য দিয়ে মোহন ছুটে চলেছে—দূরে একটা আলো ঝাপসা চাঁদের মতো নড়ছে যেন—শুধু এইটুকু জানে সে—তারপর কী হোলো তার জ্ঞান নেই।···

যখন সে চোখ মেলে চাইল, দেখলো ভোর হয়েছে। আশ্রমের বারান্দায় একটা চৌকিতে সে শুয়ে। একটি লোক তার মাথায় হাত রেখে চুপ ক'রে ব'সে আছে। আর কুকুরটা তার খাটের নীচে ব'সে লেজ নাড়ছে। লোকটি তার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো।

—'কেমন আছ?'

—'কেমন ক'রে এলাম আমি এখানে?'

—'এইখানেই তো তুমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলে। মনে নেই তোমার।'

—'আর কুকুরটা?'

—'সে তোমার পাশেই কিঁউ কিঁউ করে কাঁদছিল। তার ডাকেই তো আমি দরজা খুলে বাইরে এসে তোমাকে দেখতে পাই।'

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে ১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাকটার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### গুপ্তধন

সিঁড়ির পরেই মাটির তলায় মস্ত একটি ঘর—তার চারিদিকে পাথরের দেওয়াল। সে ঘরে অন্তত দু'শো লোকের স্থান-সংকুলান হ'তে পারে।

আমাদের সমস্ত মোটঘাট চুলোর দোরে পাঠিয়েছে ধ্বসে যাওয়া পাহাড় এবং আমাদের সঙ্গে যা-কিছু ছিল সমস্ত কেড়ে কুড়ে নিয়েছে ছুন্‌ছিউর দলবল। কেবল কমলের কাছে ছিল ছোট একটি পকেট-টর্চ্চ, নদির জলও তার শক্তিক্ষয় ক'রতে পারেনি।

সেইটেই চারিদিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিরেট অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে দেখলুম, সেই প্রশস্ত গুহাগৃহের একদিকে রয়েছে তিনটে বড় বড় পাথরের সিন্ধুক—পুরাকালের ঐ রকম সিন্ধুক আমি কোন কোন যাদুঘরে দেখেছি। প্রত্যেক সিন্ধুক প্রায় দু-হাত করে উঁচু ও চওড়া এবং পাঁচ হাত করে লম্বা। তার এক-একটার মধ্যে অনায়াসেই এক একজন লম্বা চওড়া মানুষ শুয়ে থাকতে পারে।

রামহরি প্রথমটা ভুতের ভয়ে জড়োসড়ো হয়েছিল। এখন সিন্ধুক দেখে সমস্ত ভয় ভুলে তাড়াতাড়ি একটার ডালা তুলে ফেললে। অন্য দুটোর ডালা তুললে কুমার ও কমল।

তিনটে সিন্ধুকের ভিতরই পাওয়া গেল কেবল ছোট-বড়-মাঝারি থালা ও অন্যান্য পাত্র।

বিনয়বাবু দু-চারখানা থালা পরীক্ষা ক'রে বললেন, "অনেক কালের জিনিষ, বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে এগুলো সোনার বাসন। নইলে এত সাবধানে গুপ্তগুহায় লুকিয়ে রাখা হত না।"

কমল চমৎকৃত স্বরে বললে, "এত সোনার বাসন-কোশন! না জানি এর দাম কত!"

বিনয়বাবু বললেন, "অনেক। এইগুলো বেচলেই আমরা লক্ষপতি হ'তে পারি! কিন্তু কেবল সোনার বাসন কেন কমল, পরিব্রাজক হুয়েন্ সাংয়ের কথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে এখানে আরো অনেক ধনরত্ন আছে!"

বিনয়বাবুর কথা শুনতে শুনতে আমি 'টর্চ্চে'র আলোটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে ফেলতেই দেখি, ঘরের আর এক কোণে সাজানো রয়েছে সারে সারে বড় বড় ঘড়া!

সবাই ছুটে সেইদিকে গেলুম। গুণে দেখলুম, প্রত্যেক সারে রয়েছে চারটে ক'রে ঘড়া—এমনি পাঁচ সারে মোট কুড়িটা ঘড়া!

ব্যগ্র হস্তে সবাই ঘড়াগুলো তুলে পরিক্ষা করতে লাগলুম। প্রথম তিন সারের প্রত্যেক ঘড়াই খালি। চতুর্থ সারের দুটো ঘড়া খালি ও দুটো ঘড়া তুলেই বোঝা গেল, তাদের মধ্যে কিছু আছে—সে দুটো রীতিমত ভারি!

আমি ও কুমার দুটো ঘড়াই তুলে মেঝের উপরে উপুড় ক'রে দিলুম ঝন্-ঝন্ ঝন্-ঝন্ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি গোল গোল চাক্তি!

একটা চাক্তি তুলে নিয়েই দেখি, মোহর! অনেক কালের পুরানো মোহর—খুব-সম্ভব দু-হাজার বছর আগেকার!

পঞ্চম সারের প্রথম ও দ্বিতীয়-ঘড়া মোহরে মোহরে পরিপূর্ণ!

তৃতীয় ঘড়া থেকে বেরুলো যেন হুড়-হুড় ক'রে মুক্তা আর মুক্তার স্রোত! কোন মুক্তাই ছোট নয়; অনেক মুক্তাই পায়রার ডিমের মত বড়! মেঝের উপরে মুক্তার স্তূপ! এত মুক্তা জীবনে এক জায়গায় দেখি নি!

চতুর্থ বা শেষ কলস মেঝের উপরে সৃষ্টি করলে রত্নের স্তূপ! তার মধ্যে না আছে কি—হীরা, চুণী, পান্না, পোখরাজ, পদ্মরাগ মণি—কত আর নাম করব? 'টর্চ্চে'র আলোতে সেই সব অপূর্ব্ব রত্ন জ্বল্-জ্বল্ ক'রে জ্বলতে লাগল!

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আত্মহারার মতন দাড়িয়ে আছি, হঠাৎ বাঘা চাপা গলায় গর্জ্জন ক'রে উঠল!

পর-মুহূর্ত্তে শুনলুম কাদের কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ! কারা যেন খট্-খট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে!

কে ওরা? আবার ছুন-ছিউর দল নাকি?

কিন্তু ভাববারও সময় নেই—আমরা নিরস্ত্র!

বললুম, "শীগ্‌গীর ঘরের ওদিকে চল! ঐ বড় বড় সিন্ধুকের পিছনে!"

সিন্ধুকের আড়ালে হুম্‌ড়ী খেয়ে আমরা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রইলুম! সমস্ত ঘর আলোয় আলোয় উজ্জল হয়ে উঠল! তা মশাল কিংবা লণ্ঠনের আলো, উঁকি মেরে দেখবার ভরসা হ'ল না।



পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম, ঘরের ভিতরে ঢুকল সাত-আটজন লোক!

একজন ভাঙা হিন্দী ভাষায় বললে, "বার্মুক্, তুমি ঠিক বলেছ! গুহার দরজা যখন খোলা, তখন সেই হতভাগা বাঙালীরা বেঁচে আছে—হ্যাঁ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে! আশ্চর্য্য!"

—"ছুন্-ছিউ সাহেব, আমার চোখ ভুল দেখে না! আমি দূর থেকে চকিতের মত দেখেছি, একটা পাহাড়ের আড়ালে তারা মিলিয়ে গেল!"

—"কিন্তু বদমাইসগুলো গেল কোথায়? আমাদের সাড়া পেয়ে কোথায় তারা গা-ঢাকা দিলে? গুহার ভেতরটা ভালো ক'রে খুঁজে দেখ!"

দুই-তিনজনের পায়ের শব্দ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল! বুঝলুম, আর রক্ষা নাই! স্থির করলুম, শুধু-হাতেই লড়তে লড়তে মরব,—আত্ম সমর্পণ করব না কিছুতেই।

হঠাৎ বার্মুক্‌ই বোধ হয় বললে, "ছুন্-ছিউ সাহেব! দেখ, দেখ, ওদিকে জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে কী ওগুলো?"

যেদিকে কলসগুলো ছিল সকলে সেই দিকেই দ্রুতপদে ছুটে গেল—তারপর বিস্ময়পূর্ণ চীৎকার!

বার্মুক্ চেঁচিয়ে উঠল, "আল্লা, আল্লা! এ যে হীরা, মুক্তা, পান্না!"

তারপরেই গুহায় নামবার সিঁড়ির উপরে শোনা গেল, আবার অনেক লোকের পায়ের শব্দ! নিশ্চয় গুহার ভিতরে আনন্দ-কলরব শুনে শত্রুদের দলের আরো অনেক লোক নীচে নেমে আসছে! আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায়ই নাই!

নূতন পায়ের শব্দগুলো এল ঘরের ভিতরে! পর মুহূর্ত্তে ছুন্-ছিউয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে জাগল ভীষণ গর্জ্জন এবং তারপরই বন্দুকের পর বন্দুকের কানফাটা আওয়াজে সেই বদ্ধ গুহাগৃহের ভিতরটা হয়ে উঠল ভয়াবহ! সঙ্গে সঙ্গে নানা কণ্ঠের অভিশাপ ও আর্ত্তনাদ, ধুপ্-ধাপ ক'রে দেহ পতনের শব্দ! মনে হ'ল কারা যেন কাদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধও করছে!

এ আবার কী কাণ্ড? কারা লড়ছে কাদের সঙ্গে? গুপ্তধনের লোভে শত্রুরা কি নিজেদের মধ্যেই মারামারি-হানাহানি লাগিয়ে দিয়েছে? দেখবার জন্যে মনের ভিতরে জাগল বিষম কৌতূহল, কিন্তু মুখ বাড়াতে গিয়ে যদি শেষটা ধরা প'ড়ে যাই, সেই ভয়ে দমন করলুম সমস্ত কৌতূহল!

মিনিট-পাঁচেক ধ'রে চল্‌ল্ হুলুস্থুলু কাণ্ড! তারপর বন্দুকের চীৎকার থামল—কেবল একাধিক কণ্ঠের আর্ত্তনাদে সারা ঘরটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

কাফির ভাষায় কে একজন বললে, "কৈ বাবুরা তো এখানে নেই! মাল্কানও নেই।"

সিন্ধুকের পিছন থেকে এক লাফে দাড়িয়ে উঠে মাক্কান্ আনন্দ-বিহ্বলস্বরে বললে, "বাচিক্! কারুক্! গরক্! তোমরা?"

—"আরে, আরে, এই যে মাক্কান্! বাবুরা কোথায়?"

মাক্কান আমাদের ডেকে বললে, "বাবু সাহেব, বাবু সাহেব! আর ভয় নেই! আমাদের বন্ধুরা এসেছে!"

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাচিকদের মশালের আলোকে এমন এক বিষম রক্তরাঙা দৃশ্য দেখলুম যে, আমাদের কারুর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না।

সিঁড়ির দিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাচিক্, কারুক্ ও গরক্ এবং তাদের আরো বিশ বাইশজন সঙ্গী— অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। ঘরের মেঝের উপরে এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে অনেকগুলো মানুষের দেহ—তাদের কেউ একেবারে নিস্পন্দ এবং কেউ বা করছে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্! ভূপতিত দেহের সংখ্যা এগারো—তার মধ্যে ছুন্-ছিউর দলের লোক ছিল সাতজন। সমস্ত দেহের চারি পাশ দিয়ে বইছে যেন রক্তের নদী—সে রক্ত-বিভীষিকা দেখে শিউরে উঠে কমল দুই হাতে চোখ ঢেকে অবশ হয়ে আবার ব'সে পড়ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "বাচিক্, তোমরা কি করে এখানে এলে?"

বাচিক্ সেলাম ক'রে বললে, "গুম্‌লী-বিবির হুকুমে বাবু সাহেব।"

—"তার মানে?"

—"গুম্‌লী-বিবি হুকুম দিয়েছে, যেমন করে হোক্ সয়তানদের হাত থেকে বাবুসাহেবদের উদ্ধার করবার জন্যে। আপনারা কোন পথে কোথায় আসবেন আমরা জানতুম, তাই প্রস্তুত হয়েই দলবল নিয়ে এইদিকে ছুটে এসেছি!"

তখন আমার মনে পড়ল, আমরা যখন বিদায় নি, গুম্‌লী বলেছিল, "আপনারা আমার অতিথি, কিন্তু আপনাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ ক'রে আনলুম আমিই। ..... কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখবেন বাবুজী, গুম্‌লীর দৃষ্টি রইল আপনাদেরই ওপরে!"

গুম্‌লী নিজের কথা রেখেছে। নইলে আমাদের মৃত দেহগুলো সকলের অজান্তে এই অন্ধকার গুপ্তগুহার মধ্যেই মাংসহীন কঙ্কালে পরিণত হ'ত। গুম্‌লীর উদ্দেশে করলুম মনে মনে নমস্কার—মহিয়সী নারী!

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, রত্নস্তূপের উপরে এলিয়ে পড়ে রয়েছে দুরাত্মা ছুন্-ছিউর রক্তাক্ত মৃত দেহ! তার দুদিকে ছড়িয়ে পড়া দুই হাতের এক মুঠার ভিতরে মুক্তারাশি, এবং আর এক মুঠার মধ্যে হীরা চুনী পান্না! তার দুই চক্ষু ও মুখবিবর খোলা—স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মৌন ভাষায় সে যেন বলতে চায়—'বাঙালীবাবু, আমারই জয় জয় কার! গুপ্তধন লুণ্ঠন করব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—গুপ্তধন নিয়েই চল্‌লুম আমি পৃথিবী ছেড়ে!

—শেষ—

## কবিতা

### অস্তরবি জন্মদিনে লহ নমস্কার

শ্রীঅমিয়কুমার বসু

কোন্ দূর শতাব্দীর শুভ এক পঁচিশে বৈশাখ
জীবনের গতিপথে তোমারে সে দিয়েছিল ডাক।
সেদিনের মাধুরিমা নবরূপে মহিমা সঞ্চারি'
ছুটেছিলো চারিদিকে সুবাসেতে সুরভিত করি.
বাধাহীন যৌবনের স্বপ্নময় কল্পনাতে কবি
এঁকেছিল চিত্তে তব প্রকৃতির শুভ এক ছবি।

তারপর বার্দ্ধক্যের মধুগন্ধি জয়মাল্যখানি
সত্যশিব সুন্দরের 'গীতালি'তে দিয়েছিল বাণী।
হিংসা দ্বেষে কলুষিত অবজ্ঞাত ধরণীর মাঝে
সুমহান্ বিশ্বপ্রীতি জাগায়েছ অভিনব সাজে।

কে বলে মরেছ তুমি? কোথা তব শান্তিপারাবার?
শোকার্ত্ত ধরণী মাঝে কবিগুরু আসিবে না আর?
'রক্তকরবী'র ব্যথা 'মুক্তধারা' স্মরিবে না কবি
লীলায়িত তুলিকাতে আঁকিবে না 'ফাল্গুনী'র ছবি?
তোমার 'সোণার তরী' 'খেয়া' তব ভিড়িবে কোথায়?
'পূরবী'র সুর হারা—'বাঁশরী' সে বৃথা কাঁদে হায়!
'বলাকা'র ক্লান্ত পাখা—শোকানলে দগ্ধ বনবাণী
'শ্যামলী'র তপ্ত বুকে সহসা কে বজ্র গেল হানি।
নিজহাতে গড়া তব শান্তিমাখা 'শান্তিনিকেতন'
হয়েছে বিষাদ ম্লান—মৌন হের উটজ অঙ্গন।
অস্তসিন্ধু কুল হ'তে ফিরে এস তুমি এসময়
সৃষ্টির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মাগি মোরা তোমার উদয়।

# চলন্তিকা

## ২৫শে বৈশাখ ঃ

২৫শে বৈশাখ !. পৃথিবীর এক চিরস্মরণীয় পুণ্যময় দিন। এই শুভদিনে বাংলার আকাশে এক মহাসূর্য্যের আবির্ভাব হয়েছিল। মহামানব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র ভারত পরম শ্রদ্ধাচিত্তে এই দিনটি পূজা করেছে। বিগত ২৫শে বৈশাখে তাঁর জীবন্ত মূর্ত্তির পূজা হয়েছিল, আজকের ২৫শে বৈশাখ শূন্য, দেউল দেবতা নেই। কিন্তু আমরা জানি, সেই অলক্ষ্য স্বর্গধাম থেকে তিনি প্রসন্ন চিত্তে আমাদের পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ করে আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ করছেন।

## ভূপ্রদক্ষিণকারী সাইক্লিষ্টদল ঃ

তিনজন ভারতীয় সাইক্লিষ্টস্—কেকি খারাস, রতন স্রফ্ ও রোস্তম গান্ধী সারা পৃথিবী প্রায় ৫৫,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করে দীর্ঘ ন'বছর পরে বোম্বাই প্রত্যাগমন করেছেন। বোম্বাই সহর তাঁদের বিপুল অভ্যর্থনা করেছেন। তাঁদের সম্মানের জন্য এক মিছিল বার করা হয়। বহু সাইকেল, মোটার সাইকেল ও মোটার গাড়ী যোগ দিয়ে এক জম্‌কালো মিছিল সৃষ্টি করেছিল—এই মিছিলের মধ্যস্থলে পুষ্পমাল্য শোভিত তিন বিজয়ী সাইক্লিষ্টস্ বিরাট জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করেছিলেন।

## বাইটন হকি প্রতিযোগিতা ঃ

রেঞ্জার্স দল বি এন আর ( বি ) হকি দলকে ৬-০ পরাজিত করে ফ্যাইনালে উঠলেন. অপর দিকে বি এন আর ( এ ) দল মিলিটারী মেডিক্যালসকে পরাজিত করে ফ্যাইনালে উঠলেন। ফ্যাইনাল খেলায় রেঞ্জার্স ২-০ বি এন আর কে হারিয়ে দিয়ে বাইটন কাপ জয়ী হলেন। বাইটন খেলায় রেঞ্জার্স দলের রেকর্ড খুব ভাল ; ১৮৯৫ ও ৯৬ সালে ( তখন এদের নাম ছিল ন্যাভাল্ ভলান্টিয়ার এ সি ) ও ১৮৯৯, ১৯১১, ১৯১৩, ১৯১৭ ও ১৯৩৪ সালে এই দল বাইটন কাপ পেয়েছিল। এদের তুলনায় বি এন আর দলের নামডাক অনেক কম হলেও তারা দু'বার বাইটন পেয়েছিল, একবার ১৯৩৭ সালে ও একবার ১৯৩৯ সালে।



## বেঙ্গল টাইম বনাম ষ্টাণ্ডার্ড টাইম

বেঙ্গল টাইম এ যখন আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে এসেছি তখন হঠাৎ সরকারী হুকুম জারী হ'ল, ১লা জ্যৈষ্ঠ ( ১৫ই মে ) থেকে বেঙ্গল টাইম অচল, ষ্টাণ্ডার্ড টাইম চালু। অর্থাৎ সময় যেমন হঠাৎ ৩৬ মিনিট এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ এক ঘণ্টা পেছিয়ে দেওয়া হ'ল। ফলে ক্যালক্যাটা টাইম একেবারেই মারা পড়ল। আর আমরাও নিদারুণ পেছিয়ে পড়লাম। এই হুকুম জারী হয়েছে সমর বিভাগের কর্ত্তাদের নির্দ্দেশে—তাঁদের মতে যুদ্ধ বিষয়ক গতাগম্যের সময় সুবিধার জন্য ভারতবর্ষে একটা মাত্র বড় ঘড়িই চলবে আর এই ঘড়ির কাঁটা ষ্টাণ্ডার্ড টাইম অনুযায়ী চালান হবে। ভৌগলিক বা বৈজ্ঞানিক মতে কিন্তু একটা ষ্টাণ্ডার্ড সময় অচল কারণ ঘড়ির আসল কাঁটা মানুষের হুকুমমত চলে না, সূর্য্যের পরিস্থিতি অনুযায়ী তার কাঁটা চলে। ভারতের সব প্রদেশে এক সময় সূর্য্যোদয় হয় না—তার বিভিন্ন সময় আছে। ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী তাই দেশ বিদেশে সময়ের ব্যবধান হয়। আশা করা যাক নিকট ভবিষ্যতে আবার আমরা কলকাতার নিজস্ব সময় ফিরে পাবো। সময় নিয়ে এই যে আগেপিছু করা হল এর হিসেবও একদিন করে নিতে হবে।

## যুদ্ধ-বার্ত্তা

এবারকার যুদ্ধের হিসেব নিকেশ হারজিতের ঠিকানা রাখা বেশ শক্ত ব্যাপার। কখন্ কোথায় যে কি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। বর্ম্মার যুদ্ধে চীন, ভারতীয় ও ইংরেজ সৈন্যসামন্ত মৃত্যুপণ যুদ্ধ করে চলেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাপানীরা ক্রমশঃ একটার পর একটা এলাকা করতলগত করে চলেছে। মান্দালয়, লাসিয়ো প্রভৃতি জায়গা জাপানীরা সাময়িকভাবে অধিকার করেছে, চীনে সৈন্যরা তাদের পরিবেষ্টিত করবার চেষ্টা করছে। আকিয়াব অধিকার করে জাপানীরা চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ করেছে। বাংলাদেশে এই প্রথম বোমাবর্ষণ হ'ল! ওদিকে ফরাসী দ্বীপ ম্যাডাগ্যাসকার ইংরেজ-আমেরিকা দখল করে খুব বুদ্ধি ও বীরত্বের নমুনা দেখিয়েছে। নইলে হয়ত এর সিঙ্গাপুরের অবস্থা হোত। প্রশান্ত মহাসাগরে কোরাল সমুদ্রের যুদ্ধেও আমেরিকা জয়ী হয়েছে, প্রকাশ, জাপানীরা এখানে খুব ক্ষতিগ্রস্থ ও জব্দ হয়েছে। এদিকের বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের তুলনায় ইউরোপের যুদ্ধ ঢিমে তালে চলেছে। রাশিয়া আজও বিজয়ী!

## লীগ-খেলা

কলিকাতায় লীগ ফুটবল খেলাগুলি আরম্ভ হয়েছে। এরার মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়া ভারতীয় দলগুলির মধ্যে খেলোয়াড়দের বেশ অদল বদল হয়েছে। মহামেডান স্পোর্টিংএর দল গতবারের মতই প্রায় আছে। মোহনবাগানে অনেক তরুণ খেলোয়াড়দের আমদানি

হয়েছে এবং মোহন বাগান লীগ খেলা বেশ উৎসাহে ও ভালোভাবেই আরম্ভ করেছে। এ পর্য্যন্ত চারটি খেলায় চারটিতেই তাদের জিৎ হয়েছে। প্রথম খেলায় মহামেডান্‌স্ ভবানীপুরের সঙ্গে ড্র করেছে, তাদের খেলা তেমন জমেনি। ইষ্টবেঙ্গল, ভবানীপুর, এরিয়ান, কালিঘাট দলগুলিও আশা নিয়ে খেলা সুরু করেছে। সিভিলিয়ান দলগুলি এবার খুব সুবিধের নয়—তাদের ভালো ভালো খেলোয়াড়রা বেশীর ভাগই অনুপস্থিত, অনেকে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। মিলিটারীর দল একটিও নেই। কাজেই সেদিক দিয়ে খেলার মাঠে সেই পরিচিত হৈ হৈ ও উত্তেজনা এবার আর দেখা যাবে না। দু'একটা ভালো মিলিটারী দলের বিপক্ষে না পড়লে বাঙ্গালীরাও যেন ভাল খেলা দেখাতে পারে না।

## ছোট গল্প পুরস্কার প্রতিযোগিতা

বৈশাখের ছোট-গল্প প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ১৫ই জ্যৈষ্ঠর পরিবর্ত্তে ২০শে জ্যৈষ্ঠ করা হ'ল। যারা এখনও যোগ দাও নি, তারা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে ভুলো না।

—আগামী আষাঢ়ের রংমশালে—
বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি অদ্ভুত আশ্চর্য্য অধ্যায়
—সুরু হবে—
শ্রীপরিমল গোস্বামীর
—আষাঢ়ে দেশে—




### রংমশালের ভাই বোনেরা

আজকে তোমাদের সামনে যাঁকে এনে উপস্থিত করছি সমস্ত জগৎ তাঁর কাছে এসে হাজির হয়েছে—তাঁর নিকেতনে। কে তিনি বলো তো? সমস্ত পৃথিবীতে এঁর মত মানুষ আর হয় হয়নি—ছিল না, থাকবেও না। তাঁর সৌন্দর্য্যে অন্তরের বিপুল ঐশ্বর্য্যে তিনি সমস্ত পৃথিবীর গুরু হয়ে ছিলেন। এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব এ পৃথিবীতে কদাচিৎ ঘটে।

কে ইনি বলতে পারো তোমরা?

তিনি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলেন—সে সময় কেমন ভাবে তাঁকে কাটাতে হতো তা তাঁর নিজের ভাষায় তোমাদের বলি :—

"সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা! সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো পরানো, সাজানো শোয়ানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই। আহারে আমাদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মান হানির সম্ভবনা। বয়েস দশের কোঠা পার হইবার পূর্ব্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপর আর একটা সাদা জামাই ছিল যথেষ্ট।......আমাদের চটি জুতা একজোড়া থাকিত কিন্তু পা দু'টো যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতা চালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।... এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে, কোথায় তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজেই কিছুই পাই নাই।..... আমাদের এক চাকর ছিল তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল......। সে আমায় একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত—গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধি দৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম এই জন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।"

## বিতর্ক আসর

মেদিনীপুরের বিমল কুমার প্রশ্ন তুলেছে "যুদ্ধের পক্ষপাতী না শান্তির ?" এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে একটা বিতর্কের আসর জমাতে চাই। 'শান্তি না যুদ্ধ' কিসের পক্ষপাতী তুমি ? এ বিষয়ে যাদের রচনা শ্রেষ্ঠ হবে—তা স্থান লাভ করবে রংমশালে। আশাকরি এ নিয়ে তোমরা চিন্তা করে লিখে পাঠাবে। লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ ৪৯।

এবার চিঠির বাক্স খুলি :—

**সুধীর ও প্রবীর ঘোষ** ( উড়িষ্যা ) তোমাদের প্রশ্নগুলো ভাল লাগলো। জবাব দিলাম মন দিয়ে পড়ো—দেশকে এবং জাতিকে ভাবের দিক থেকে বড় কর্ম্মে উদ্দীপ্ত করবার জন্য যুগে যুগে কবি ও সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাব হয়। দেশ যখন চরম নির্য্যাতনের পথ বেয়ে চলে, জাতি যখন নানা ভারে মুমূর্ষু ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন দেশ ও জাতির মর্ম্ম বেদনা যারা বিশ্বের কাছে পৌছে দেবার ভার নিয়ে কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতির মুক্তি সাধনার ইতিহাস খুলে দেখো, দেখবে মুক্তি যজ্ঞের হোতো হলেন কবি ও সাহিত্যিক। দেশের কর্ম্মীর কাণে উৎসাহের বাণী, কর্ম্মের বাণী দিয়ে জনসাধারণের মনে চেতনা আনেন কবি, আর কর্ম্মী সে উৎসাহ বাণী পেয়ে কর্ম্মে উদ্দীপ্ত হয়ে অসাধ্য সাধন করেন। আমাদের দেশে এই চেতনা বোধ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি কিন্তু তাঁর সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি আমাদের জাতীয় কবি। মুক্তি পণ আন্দোলনে তাঁর দান কী অপরিমেয় তা বড় হলে বুঝতে পারবে রাশিয়া সমস্ত জগতের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছে তার কারণ সে দেশ মানুষকে মানুষের কাছে থেকে সরিয়ে রাখেনি, মানুষকে মানুষের কাছে ছোট রাখেনি। সে দেশ মানুষকে মানুষের অত্যন্ত কাছে এনেছে, সব মানুষকে মানুষের অধিকার দিয়েছে। পৃথিবীতে এই একমাত্র দেশ যেখানে মানুষ সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়ে শুধু মানুষ এই পরিচয় দিয়ে জগতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ সে দেশ একদিন অন্ধ কুসংস্কারে ভরা ছিল। জারের রাশিয়া মানুষকে মেসিন বলে মনে করেছিল। জারের অত্যাচারে দেশ ও জাতি জর্জ্জরিত হয়ে উঠলো। এই মৃত্যুম্লান জাতির মৃত্যুশীতল বুকে প্রাণের প্রদীপ শিখা জ্বালাবার জন্য এলো কর্ম্মীরা জাতিকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়ে। এলো কবি, এলো লেখক জাতির এই মুক্তি পণ যজ্ঞে প্রধান হোতা হয়ে, এলো-জাতির মৃত্যু ম্লান মুখে প্রাণের প্রতিচ্ছবি জ্বালাতে। তরোয়ালের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো লেখনী, জনসাধারণের মর্ম্ম বেদনা প্রকাশের পথ পেলো।..... তারপর এলো মহাবিপ্লব। ঝড়ো হাওয়ায় জীর্ণ পাতার মত সমস্ত দীনতা অত্যাচার অসাম্য গেল উড়ে ! সমস্ত জীর্ণতার, সমস্ত অসুন্দরের মাঝে জাতি ও দেশ জাগলো, নতুন চোখে চাইলো।



**অসিতরঞ্জন রায়চৌধুরী** ( কাটোয়া ) দুঃখিত হয়েছ আমার উত্তরে কিন্তু দুঃখ দেবার জন্য আমি তো লিখিনি। সাধারণ ভাবে তোমার অভিযোগের উত্তরে ওকথা জানিয়াছিলাম। হ্যাঁ তুমি নিশ্চয় গল্প কবিতার লিষ্ট পাঠিও, আমরা তদন্ত করে দেখবো, কোন কোন মাসে ছাপা হয়েছে তা যদি জানাও তাহলে বড় ভাল হয়। বৈশাখের রংমশাল তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে আমারও ভাল লাগলো। তোমাদের সকলের এবং বাংলার সব ছেলে মেয়েদের আমরা এটুকু জানিয়েছি—রংমশাল শুধু ব্যবসার খাতিরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় না। রংমশাল চায় বাংলার ছেলেমেয়েদের জীবনে আনন্দ স্পর্শ দিতে, অবসর সময়ে তাদের চিত্ত বিনোদন করতে। তোমাদের সহানুভূতি ও সাহায্য তোমাদের রংমশালকে আরো সুন্দর করে তুলবে। প্রশ্নোত্তর বিভাগ আবার শীগ্‌গীরই বসবে। **অসীম দেব গোস্বামী** ( ভবানীপুর ) স্বনামধন্য লেখক পরিমল গোস্বামী বড়দের জন্য অনেক লিখেছেন। বড়দের সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন আছে, এবার কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য কলম ধরেছেন। তাঁর চমকপ্রদ কিশোর উপন্যাস 'আষাঢ়ে দেশে' আগামী আষাঢ় মাস থেকে সুরু হচ্ছে। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাগজ রংমশাল' একথা তুমি লিখেছ। পড়ে হাসলাম—পৃথিবীর পরিধি ও বিস্তৃতি যে অনেক—তার ভিতরে রংমশালের জায়গা কই ? তোমাদের মনের জগতে রংমশালেরও স্থান যে অনেকখানি তা কাউকে বলে দিতে হবে না। তুমি যদি লিখতে কিশোর জগতের শ্রেষ্ঠ কাগজ রংমশাল তাহলে সমর্থন করতাম। **মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত** ( ঢাকা ) এই মাস থেকে তোমাদের সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নূতন উপন্যাস 'ভগবানের চাবুক' সুরু হচ্ছে। **সত্যব্রত বসু** ( হাওড়া ) তোমার নববর্ষের প্রীতি তোমার ভাইবোনদের জানালাম। মনে ধৈর্য্য ও আশা রেখো—অন্ধকার দূরে যাবে। আমরা সে আশায় এই অন্ধকারে তাকিয়ে আছি একটু আলোকের জন্য। **অমিয়া** ( পুরুলিয়া ) নববর্ষের প্রণাম ও ফুল পেয়েছি। ফুলগুলি তোমার মনের প্রীতি বহন করে এনেছে। **শৈলেন্দ্রকুমার দে** ( গৌহাটি ) তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—ভবিষ্যতে লিখবেন। তিনি এখন কোলকাতার বাইরে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে : গেষ্টাপো—হিটলারের গুপ্তচর বাহিনী। এই গুপ্তচর বাহিনীর অধিষ্ঠান জার্ম্মানীতে। গেষ্টাপোর নায়ক হচ্ছেন হিমলার। তোমার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব - জল জলই—বিভিন্ন দেশের মানুষরা তাকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে। আর যা শুনেছ তা ভুল। **মীরা রায়** ( মোরাদাবাদ ) তুমি কোলকাতা পলাতকা ? এখানে আমাদের একই ভাবে দিন কাটছে। ইন্দিরাদি ভাবী গৃহিনীর বৈঠকে তোমার ফরমাস নিয়ে হাজির হবেন—কিন্তু তিনি বলছিলেন—কি চেয়েছ—ব্লাউজের ডিজাইন- না এমব্রয়ডারী ? ভাল করে তাঁকে জানিও। ব্লাউজের ডিজাইন ঐভাবে দেওয়া এখন বোধ হয় একটু মুস্কিল হবে। দূরে থেকে মন খারাপ করোনা, ভাল করে লেখাপড়া

BLEED THROUGH.

করো। বিপর্য্যয় তো চিরকাল থাকবে না। মেঘ-ঢাকা দিনের মত ক্ষণিক দুর্য্যোগ কেটে যাবে—এ আশা মনে রেখো। কেয়া, বুন্নু, খোকাকে আমার কথা বলো। **অধীর রঞ্জন দাস** ( বরিশাল ) ইংরাজীতে নাম সই করা বাংলায় লেখা চিঠি পেলাম। অহেতুক ইংরাজী প্রীতি কেন? বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালায় নাম স্বাক্ষর করো। এতে আমি মোটেই খুসী হই না জানো? তুমি নতুন, তাই লেখনী বন্ধু সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ—তিন পয়সার ডাক টিকিট পাঠিয়ে বয়স, কোন ক্লাসে পড়ো ইত্যাদি জানালে বন্ধু পাঠান হবে। রংমশালের প্রথম গ্রাহক প্রদীপ সেন এবং গ্রাহিকাদ্বয় জয়শ্রী, মঞ্জুশ্রী। **বিমলকুমার দত্ত ( মেদিনীপুর )** তোমার পত্রের সারাংশ পরিচালক মহাশয় ও সম্পাদক মহাশয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। সত্যিই, সম্পাদক মহাশয়ের লেখা বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সবাই ভালবাসে। তোমার বোনের নাম একই গ্রাহক নম্বর ভুক্ত করতে পারো। যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর আগামী সংখ্যায় বিতর্কিকাতেই পাবে। **শ্রীমান বরুণ রায়**—তোমার চিঠির উত্তর পরিচালক মশাই নিজে দিয়েছেন, আশা করি পেয়েছ।

**বিনীতা ঘোষ** ( রাঁচী ), **মঞ্জু ঘোষ** ( রাঁচী ), **দেবেন্দ্রনাথ দাস** ( জামসেদপুর ), **সাধনা ও রেণু** ( চট্টগ্রাম ), জয়ন্তী সেন (আথালিয়া), **জ্যোতির্ম্ময় দাস** (তেলিনী পাড়া) তোমাদের চিঠি পেয়েছি। সকলে আমার শুভেচ্ছা নিও। ইতি তোমাদের

দিদিভাই

যে সব গ্রাহকগ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করেছেন কিন্তু আমাদের জানাতে পারেন নি এবং যাঁদের ভি-পি Unclaimed হয়ে ফিরে এসেছে, তাঁরা যেন আমাদের অবিলম্বে জানান। দরকার হলে বৈশাখের রংমশাল বুক পোষ্টে আমরা পাঠিয়ে দেব। তাঁরা অনুগ্রহ করে চাঁদা মণি-অডারে পাঠিয়ে দিলে আর কোন অসুবিধে থাকবে না।

মোহনবাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড় ও বিখ্যাত ফুটবলার
**কে ভট্টাচার্য্য** ( হাবুলবাবু )
আগামী রংমশালে তোমাদের জন্য খেলার মাঠের সব খবর দেবেন।

**নির্ভুল উত্তরগুলি বাহির করো ঃ**

প্রঃ—ক) আলপাকা কি?
উঃ—(১) এক রকম রঙ্
(২) দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ
(৩) বৃক্ষ বিশেষ
(৪) পেরুর জঙ্গলের পতঙ্গ
(৫) দক্ষিণ আমেরিকার জন্তু বিশেষ

প্রঃ—(খ) হিন্দ্‌কী কি?
উঃ—(১) যারা পাঞ্জাবী ভাষা বলে
(২) আফ্‌গানিস্থানের একটি দেশ
(৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক জাতি
(৪) আফ্‌গানিস্থানবাসী ক্ষত্রিশ্রেণীর হিন্দু
(৫) কাশ্মীরের একটি ফল

প্রঃ—(গ) হাফিজ্‌ কে বা কি?
উঃ—(১) উর্দ্দু কাব্যগ্রন্থ
(২) বেলুচিস্থানের পার্ব্বত্য দেশ
(৩) যে কোরান্ কণ্ঠস্থ করেছে
(৪) পারসীক কবি ও লেখক
(৫) মুসলমান ফকির

প্রঃ—(ঘ) ভূতপত্রীর দেশের লেখক কে?
উঃ—(১) সুকুমার রায় চৌধুরী
(২) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৩) দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
(৪) কুলদারঞ্জন রায়
(৫) জসিম্ উদ্দিন

প্রঃ—(ঙ) হনোলুলু কোথায়?
উঃ—(১) কাল্পনিক দেশ
(২) দক্ষিণ মহাসাগরীয় দ্বীপ বিশেষ
(৩) মালয়ের নিকটবর্ত্তী উপদ্বীপ
(৪) হাওয়াই দ্বীপের রাজধানী
(৫) চীনের বন্দর বিশেষ

আগামী মাস থেকে—
**কে ভট্টাচার্য্য**
মোহনবাগানের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় ও সর্ব্বজনপ্রিয় ফুটবলার রংমশালে '**ছুটির ঘণ্টা**' বিভাগে তোমাদের জন্য খেলাধূলার বিষয় লিখিবেন।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) রামু স্যাকরা কি চায়—বায়না (৮)। (২) চুংকিং কোথায়—চীনে (৯)। (৩) ডোডো কি—পাখী যা আর পাওয়া যায় না (৬)। (৪) গান্ধীর কিসে আগ্রহ—সত্য (২) বা (১১)। (৫) পেঙ্গুইন কি—পাখী যা উড়তে পারে না (১৩)। (৬) আবলুশ কি—কাঠ (১) বা বৃক্ষ (১০)। (৭) হরেন কিছু চায় - না চায় না—চায়না (৫)। (৮) সে যা বলছে কি—জানি না (৭)। (৯) রামনাম কি—সত্য (১১) বা (২)। (১০) চন্দন কি পূজায় ব্যবহার হয় (১২)। (১১) তেড়েংফেড়েংচুং কি—কিছু না (৩)। (১২) সেগুণ কি বৃক্ষ (১০) বা (১)। (১৩) ওকাপি কি—এক রকম জন্তু (৪)।

## নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

দীপেশচন্দ্র সরকার, রঙপুর ; খুকুমান্তা, কলিকাতা ; নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, রাঁচী ; হৃষিকেশ, পারুল, নৃপেনবাবু, চিনু ও কৃষ্ণা, শ্রীহট্ট ; আশীষ দত্ত, সীলেট ; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বাঁকুড়া ; অধীর রঞ্জন দাস, বরিশাল ; শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে, ডলি দেবী, ভীমসেন বর্ম্মা ( ? ) ও মিহির সেন, গৌহাটি ; ঊষা ও মান্তু ব্যানার্জ্জি, পাটনা ; প্রবীর ও সুবীর ঘোষ, উড়িষ্যা ; শেখরেন্দ্র, সমীরেন্দ্র, সমরেন্দ্র, শেফালি, প্রবীর ও প্রদোষ গাঙ্গুলী, পুরুলিয়া ; বিষ্ণুপদ ব্যানার্জ্জী, নিমাসরাই ; তপন, দেবী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বরিশাল ; শ্রীসব্যসাচী, ইন্দ্রনীল ও নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ; পারুল, কানু, অমিতা, ডল্, রুবু, বীলু, আরু কবু, পুরুলিয়া ; জ্যোতির্ম্ময় দাস, তেলিনীপাড়া ; গীতা সেন রায়, বানদার ; নিমু, ধীরু, গোপ, কলিকাতা ; ইন্দুমতী, দার্জ্জিলিং।

## দু'টি ভুল উত্তরদাতাদের নাম

( একটি ভুল = দু'টি ভুল )

কালিদাস, সুপ্রকাশ, গৌর, সিপ্রা, পাটনা ; সুনীল চ্যাটার্জ্জি, বালিগঞ্জ ; অশোক, অজয়, অরুণ, নূপুর, বরিশাল ; কুমারী সাধনা ও রেণু, চট্টগ্রাম ; জয়ন্তী সেন মজুমদার, আথালিয়া ; শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ও আরো ১২ জন (?), কানপুর ; গীতা দত্ত ও দেবীপ্রসাদ দত্ত, কলিকাতা ; কানাই বসু, কলিকাতা।

অনেকের দু'টির বেশী ভুল হয়েছে কিন্তু স্থানাভাবে তাদের নাম ছাপা হ'ল না। দু'টির বেশী ভুল হওয়া উচিৎও নয়।

## রংমশাল

আষাঢ়ে প্রকৃতি

রংমশাল
সপ্তম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
আষাঢ়
১৩৪৯

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ মাসের মধ্যে লঙ্কার এত কাণ্ড হয়েছে, কুম্ভকর্ণ তার কিছুই জানেন না। ছেলে দুটো মরেছে, নিজেও যে বেঘোরে কাঁচা ঘুম ভেঙে মারা যাবার দাখিল সে জ্ঞানও নেই। অঘোরে ঘুম যাচ্ছেন আরামে নাক ডাকিয়ে ব্রহ্মার বরে।

"রত্ন-খাটে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন,
নাকের নিঃশ্বাস বয় প্রলয় পবন।
দুয়ারের নিকটেতে যদি কিছু আসে,
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিঃশ্বাসে!"

এই অবস্থায় গেছে রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে জাগাতে, মহোদর আছেন সঙ্গে। দোর ঠেলাঠেলি করে রাক্ষসেরা—দোর খোলে না! একি ব্যাপার!

মহোদর বল্লেন, "দেখ্ দোরের পরে ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরে বোধ করি খিল পড়ে গেছে!

—"মাজু কর্ত্তা, ও মাজু কর্ত্তা! দোর খোলেন!" মাজু কর্ত্তার সাড়া শব্দ নেই। তখন কষ্টে মই বেয়ে উঠে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন—কুম্ভকর্ণের ভুঁড়ি ঠেকেছে কড়িকাঠে—রত্নখাট ভেঙে উল্টে পড়ে কুম্ভকর্ণ দোর আটকে নিদ্রা যাচ্ছেন - কপাট খোলার উপায় কি? তখন মহোদর যুক্তি দিলেন—ঢাক, ঢোল, ঝাঁজ, শাঁখ, যা কিছু আছে বাজা ঘুলঘুলির কাছে।

বাজায় বেজায় শব্দে তিন লক্ষ শাঁখ,
তার সাথে ঢাক ঢোল, কাড়া নাকড়া ঝাঁজ।

হাতীর কর্ণ বধির হয় এমন শব্দ—কুম্ভকর্ণের কানেও পৌঁছালো না! সে ঝন্‌ঝনা ছাড়িয়ে উঠলো নাসিকার ডাক—হড়্ মড়্ গড়্ গড়্ হুড়ুম্ হুড়ুম্! যেন মেঘ ডাকে, ঝড় বয়, কামান গর্জ্জে, দুমদুমি ফাটে—দুদুম্ দুম্! ছরকট্ হোঁস—বে—হোঁস্ তাক্ তাক্ তুরুম্!! মাঝে মাঝে এর সঙ্গে অগণ্য নাস-তরঙ্গ সরু সুরে পোঁ ধরছে। কখনো হাঁড়ির ভিতর থেকে দশলাখ কোলা ব্যাঙ্ যেন মেঘ-ডম্বুর টাই-টম্বুর ছর্দ্দি-ঘোলা আওয়াজ দিচ্ছে—তুঃ কড় কৌচী। গড় বড় বড় হোঁচী। চটাৎ পটায় কখন; ঘোঁৎ ঘোঁৎ যেন শূয়োর ঘোঁতঘোঁতায়; কখনো যেন গড়গড়ার তামুক খায় জল-হাতী; কখনো খুব সূক্ষ্ম আওয়াজ দেয় নাক—ষুড়ুৎ ষাড়াড়াৎ, যেন বাদলের দিনে একটি ভুরুৎ পোকা বেরিয়েছে খেলতে।

কুম্ভকর্ণের নাক ডাক্‌নি, শুনতেই এক রঙ্গ
ইচ্ছা হয় না, করি নিদ্রা ভঙ্গ!

ওদিকে মহোদরের মইখানার উপর থেকে বলছেন—

আশ্চর্য্য দেখছি ভাই
পাঁচমাস অনাহার, ভুঁড়ি তো শুখায় নাই!
যে মাজু কর্ত্তা সেই মাজু কর্ত্তাই আছে,
বরং আরো যেন অধিক মুটিয়েছে!

মহোল্লাস নীচে থেকে হাত নেড়ে বলছে—"ওগো ওর খাবার দরকার কি? নিদ্রাই যে একটা প্রধান ভোগ। অর্দ্ধেক লঙ্কার লোকের ছ' মাসের খোরাক একদিনে পার করে ঘুমিয়েছে—সেও একটা কথা!"

—"ওহে সে কথা তো রাবণ বুঝলে হয়। এখন যুক্তি ঠাওরাও কি উপায়ে নিদ্রা ভঙ্গ হয়।"

—"দরজা ভঙ্গ না হলে নিদ্রা ভঙ্গ হয় কি করে? হাতি ঠেকাও!"

রাবণের মাহুত ডাঙস্ মেরে দিলে দোরের দিকে খেদিয়ে মত্ত হস্তি নীলগিরিকে। দুপ্‌দাপ্ করে যেমন কপাট খোলা, বাস্—কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসের টানে মাহুত শুদ্ধ মাতাহাতী



নাকের মধ্যে গিয়ে পিঁচুটি হয়ে যাওয়া। দরজা যেমন বন্ধ তেমনি রেখে রাক্ষসরা পলায়ন। কেউ আর এগোয় না দোরের দিকে—অজাগর নিঃশ্বাস পাছে নাকের গহ্বরে টেনে নেয়!

তখন পিছুটি মেরে মহোদর মই ছেড়ে কুমড়ো-গড়াগড়ি নেমে পড়ে বলছেন—"ওহে পলায়োনা। মহা যুক্তি এয়েছে মাথায়। দরজা ছেড়োনা!"

—"আরে কি যুক্তি তাই বলেন। ভিতরের দিকে টানছে কপাট!"

—"কুম্ভকর্ণের বৈঠকখানা ঘরে বড় বড় গের্দ্দা আছে—তাই এনে গোটা পঁচিশ নাকের ছেঁদায় ঠেসে দাও, এখনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।"

—"মরে যাবে যে মশায়!" এই বলাবলি হচ্ছে এমন হাতি আর মাহুত দুটোই চামুটি হয়ে ছিটকে পড়লো মহোদরের গায়ে।

—"না, তুলোর বালিসের ছিপি দেওয়া চলবে না। দোর খুলুক পড়ুক, সবাই এক পাশ হয়ে অন্য যুক্তি কর জাগাতে।"

—"বলেন কি যুক্তি! ঠুসে দিতে পারলে হতো অন্য দুই নাকে, হেঁচে কেসে বিসম খেয়ে জেগে উঠতেন কর্ত্তা।"

—"মশায়! গাঁজার পাতা খেয়ে হাতিয়ার নাকে ঢুকে হাঁচাতে পারে নি, মাহুত তার লস্যের ডিবে শুদ্ধ হাঁচাতে পারেনি, এখান থেকে আপনি লস্য উড়িয়ে তাকে হাঁচাবেন!"

—"আচ্ছা মৌমাছি যেমন জাগানো যায় ধূয়া দিয়ে!"

—"আরে একি মাছি পেয়েছো, ও মাজু কর্ত্তা! ঘর পোড়া যেদিন লঙ্কা পোড়ালে সেদিন ধূমা কম হয়েছিল, ধূম্র লোচনের চোখ পর্য্যন্ত ক্ষরে যাবার যোগাড়! মাজু কর্ত্তা আজও যা, সেদিনও তা, বেঁহুস ঘুমিয়ে আছে!"

তখন মহোদর মাথা চুলকে বলছেন,- "চল সবাই, মাজু কর্ত্তানীকে গিয়ে কই—মাজু কর্ত্তানী জানতে পারেন জাগাবার সন্ধি।"

—"ওগো জানলেও তিনি জাগাবেন না কর্ত্তার কাঁচা ঘুম, তাতে কর্ত্তারও ভয় আছে, কর্ত্তানীরও ভয় আছে।"

—"তবে?" বলে মহোদর নিজের চোয়াল চুলকাতে আছেন, এমন সময় মাজুকর্ত্তানী কুম্ভনিকুম্ভর মরণ শুনে—"ওগো আমার কি হলগো, ওরে বাপ্ কুম্ভনিকুম্ভ!" বলে ভয়ঙ্কর চিৎকার ছেড়ে ছুটতে ছুটতে এসে যেমন ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণের বুকে আছড়ে পড়া, অমনি নিদ্রা ভঙ্গ! কুম্ভকর্ণের হাতখানা ঘুমের ঘোরে চটাস্ পড়লো চেপে মাজুকর্ত্তানিকে। মশার মতো চেপ্‌টে গেল কর্ত্তানী—টেরও পেলে না যে ম'লো।

এই বলে চাঁইবুড়ো কথা রেখে উঠে পড়লেন।

———

# আদর্শ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

নূতন বছরের রংমশাল !

অন্তরের শুভ আশীর্ব্বাদ সুন্দর রংমশালকে।

রোগশয্যায়, 'রংমশালের আদর্শ' লেখাটি ধীরে ধীরে আমায় পড়ে শুনান হল।

সবল সুর। সব ক'টি তারে স্পর্শ বাজছে। শিশুকিশোররাজ্যের মনের রাজধানীতে, ধীরে ভোরের রোদ আর বাতাস ঝঙ্কৃত হচ্ছে। নির্ম্মল স্পষ্ট কথায় স্নেহগলা ইঙ্গিতে প্রীতি-সুমধুর—সত্য এরং সুন্দরের গান।

কিশোর মনস্তত্বের সংশয়ে রুদ্ধ দুয়ার, আস্তে খুলে, পুরী হর্ষিত করেছে।

মানুষের দুটো দিক। এক, খাঁটি মানুষ। আরেক, চিরকিশোর মানুষ। খাঁটি মানুষটি পৃথিবীর হিসেবের খাতায় খুব খাঁটি হলেও, সেটি মানুষের জ্ঞানে বিজ্ঞানে গড়া কৃত্রিম মানুষ। সে মানুষ রূপে, বয়সে আর তার নিজত্বে আলাদা। সংখ্যাতেও অনেক। তবু তাকে গণে উঠা শক্ত নয়। কিন্তু চিরকিশোর মানুষটির হিসেবের কোন খাতা নেই, রূপ অনেক হলেও বয়সে সে এক আর নিজে সে একা। তবু পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বুকের ভিতরেই জ্বলে সে দীপশিখার মত দীপ্ত। এখানে তাকে কোনরকমেই আর গণে উঠা যায় না! প্রকৃতি-স্বভাবের গড়া—অকৃত্রিম, সত্যমানুষটি সে।

প্রথম মানুষটিকে গড়ার বন্ধু, শিক্ষা। দ্বিতীয়টির বন্ধু—কল্পনা। এমনটিই খুব বেশি দেখা যায় যে, পূর্ণ শিক্ষাও যে-মানুষকে পূর্ণ করে তুলতে পারে নি, কল্পনা সে মানুষকে সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলেছে।



শিক্ষা আর সাহিত্যের এই পার্থক্য-রেখাটি মনে না পড়লে, আমাদের দেশের মাণিকদের 'সম্পূর্ণ মানুষের' দেশের পথযাত্রী করে দেবার বেলাতে, সংশয় এসে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

এজন্যে, যেখানে গোড়াতেই 'নর'-এর কথা ( মানে, সত্য মানুষের কথা ) স্মরণ করে কাজের সুরু হওয়া সুমঙ্গল, সেখানে কাজের উৎসাহে পাছে 'নর'-কেই হরণ করা হয়, আমাদের মহাকবি অনুপম করে এইখানে নরহরি কাহিনীকে অমর রংএ এঁকেছেন।

কিন্তু, অবশেষে কে এগিয়ে এলেন সস্নেহে ? মা। এই মাতৃস্নেহের কূলহারা সাগরের সঙ্গীতে যে আনন্দ আছে, জগতে একমাত্র সেই বস্তুটিই সকল শিক্ষা আর কল্পনাকে গলিয়ে, অপরূপ কমলে পরিণত করে ধরণীর দুলালদের গলায় মালা দুলিয়ে দিতে পারে, প্রত্যেকটি 'নর'-কে ভাবীকালের বরণীয় হবার জন্যে।

কি খাঁটি মানুষ, কি সত্য মানুষ, সকল মানুষকেই সম্পূর্ণ মানুষের মিলন বেদীতে এনে দিতে পারে এই আনন্দরস।

সাহিত্যের ক্ষীর সায়রের এই সরস কথা ভুলে, কেউ সৃষ্টি করতে পারেন, তা পান্না, চুনী, হীরে, মরকত হবে। তরুণ আর সত্য মানুষের বুকে কলির তরলতার রক্তধারা যুগে যুগে আসছে সেই কলস থেকে, যা রয়েছে ঐ সমুদ্রের হাঁসের পাখায়।

মানব-দরদী অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, দেশের কোন বেদনা যদি কোথাও থাকে, তার সঙ্গে আপন বুকের ব্যথা মিশিয়ে ও কথা জীবন্ত করে লিখতে চেয়েছেন। তাঁর এক চোকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, এক চোকে অশ্রু। কিশোর-সাহিত্যপত্রের ধারায় তাঁর এই সজীব পৃষ্ঠা কোন্ আব্ছা অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করে কী কল্যাণকে আহ্বান করছে, দেশের আর অল্পদিনের ভবিষ্যতের ঊষায় হয়তো দেখা যাবে।

# শিশু-সাহিত্য সেবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

আজ শিশু-সাহিত্যের প্রাঙ্গণের একটি কোণ থেকে মহাকবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাদের ক্ষমতা অল্প তাই এর দোষ ত্রুটি অনেক আছে। কিন্তু তার ক্ষমা আছে, কারণ প্রাণের যে আবেগ নিয়ে আজ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি তার সম্পাদের কাছে বাইরের উপচারের মূল্য কতটুকু?

হয় তো বলতে পারেন, মানুষের সেই মনের আবেগ এইরূপ কৃত্রিম সভাসমিতি বা সম্মেলনের দ্বারা কি প্রকাশ করা যায়? হয়তো যায় না! কিন্তু আমরা বাঙালী, আমাদের বারো মাসের তেরো পার্ব্বণ, আমাদের উৎসব না করলে মন পরিতৃপ্ত হয় না। উপলব্ধি হলেই যে তার প্রকাশ চাই! তাই যেমন আনন্দের দিনে বারোয়ারী উৎসব করি, দুঃখের দিনেও আমরা সেই আনন্দকে আরেকভাবে উপলব্ধি করি, পাঁচজনকে ডেকে আনি, পার্থিব সুখ সম্পাদের সীমা ভেদ করে প্রার্থনা করি—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়—

"আমাকে সত্য দাও, আলো দাও, অমৃত দাও!"

আজ যে কবির ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আমাদের জীবনের ধারা বদলে দিয়েছে তাঁরই আবির্ভাবের শুভদিনটিতে একটু স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে কলরব করে উঠি, সেই কলরব শিশুর আনন্দ-কাকলীর মতো হয় ত অর্থহীন হতে পারে, কিন্তু তাকে কৃত্রিম বলা যায় না।

আর তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে সত্যিই কি আমরা জেনেছি? আমাদেরই যুগে তিনি জন্মেছিলেন, তাই তিনি আমাদের সুপরিচিত। হয় তো বা এই পরিচয়ের জন্যই আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ জানতে পারি নি। কিন্তু তা ছাড়া আরও একটা দায়িত্ব আছে। দেশের জনসাধারণ তাঁর লেখা পড়েছেন, তাঁর গান গেয়েছেন, তাঁরই ভাষায় কথোপকথন করেছেন; কিন্তু মানুষটিকে তাঁরা হয় ত এখনও সম্পূর্ণভাবে জানেন নি। তাই যে সমস্ত সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন, তাঁদের দায়িত্ব আছে সেই জনসাধারণের কাছে সত্যকারের মানুষটিকে পৌঁছে দেবার। তাই এই প্রকার সভা সমিতি সম্মেলনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এতে সমারোহ করে বক্তৃতা বা অশ্রুবিসর্জ্জন করলেও সেই বক্তৃতা বা অশ্রুবিসর্জ্জনের মধ্যেও বিগত মানুষটির সঙ্গে আজকের মানুষের পরিচয় হয়, সত্যকারের আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। আমরা যে, একটি মানুষের জন্য হাসছি বা কাঁদছি বা উৎসব করছি, উৎসবের এই যে একটা মনুষ্যত্বের দিক আছে, একটা সামাজিক



দিক আছে, ঘরের কোণে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করায় বা কেদারা হেলান দিয়ে কাব্যের রসাস্বাদন করার আত্মতৃপ্তির মধ্যে তার কোনো নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। সেই অশ্রুধারার মধ্যে অথবা সেই কাব্য পাঠের মধ্যেও আত্মতৃপ্তির সংযোগ থাকতে পারে, কিন্তু সে সান্ত্বনা বা আনন্দের গভীরতা আরও পরিপূর্ণ হয় যখন আরও পাঁচজনকে ডেকে বলি, তোমরা আমাদের আনন্দের, শোকের ভার নাও।

কবি ও তাঁর কাব্যের বিশ্লেষণ দরকার! অক্ষয় কীর্ত্তি যাঁর, সেই কীর্ত্তিমানের জয় গানের সামাজিক সার্থকতা এখানেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করা কোনো একটি বিশেষ সভায় সম্ভব নয়। আমি তাঁর প্রতিভার একটি মাত্র দিক নিয়ে সামান্য আলোচনা করবো। আলোচনা বললে ভুল করা হবে, সামান্য একটু উল্লেখ বা নির্দ্দেশ বললে হয় ত ঠিক হবে।

এই নির্দ্দেশের বিষয় শিশু-দরদী রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আজকের এই শিশু-সাহিত্যসেবীসম্মেলনে প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য মনে করি। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি অভিজ্ঞ শিশুসাহিত্যিকদের আহ্বান করছি, কারণ এ কাজটা তাঁদেরই। যে দরদ এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন তা তাঁদের আছে। সম্প্রতি শিশু মাসিক-গুলির পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছু করবার বা বলবার আছে। শিশু-সাহিত্যগঠনে রবীন্দ্রনাথের যে দান তার প্রভাব আমাদের সমগ্র শিশু-সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারে কিনা তারও আলোচনা প্রয়োজন। তার কারণ আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্য এখনও শিশুই আছে। য়ুরোপ বা আমেরিকার ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিশু-সাহিত্য যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আপনার পথ বেছে নিয়ে ছিল, বাঙলার শিশু-সাহিত্য এখনও সেই যন্ত্রণার অধীন হয়ে আছে। এমন কি প্রগতিশীল আমেরিকাতেও উনবিংশ শতাব্দীর আগে ঠিক শিশু-সাহিত্য বলে কোনো সাহিত্য গড়ে ওঠেনি—তা হলে আর বাঙলাদেশের কি দোষ? এই সম্বন্ধে Frances Jenkins Olcott এর বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। Pittsburg এর Carnegie Libraryর যে Training School for Children's Librarians আছে, ইনি তারই ভূতপূর্ব্ব Director এবং বর্ত্তমানে Organiser। উনবিংশ শতাব্দীকে ইনি বলেন American Children's Century (মার্কিন শিশুদের শতাব্দী) এবং বলেছেন—

> "The Puritan argument that a child is a small-sized adult more prone to sin, possibly than his parents, and that his mind should be stuffed with facts and his imagination suppressed, gradually lost its hold on education in the United

States. Towards the end of the 19th century, the kindergarten movement and the impetus given by child study rediscovered the play life of little children and the unfolding of their faculties, thus affecting the writing of children's books. The changes, however, were progressive. The 19th century was marked by three district attitudes towards child life—the religious, the didactic and the sympathetic.

আমাদের দেশের শিশুসাহিত্য এখনও religious না হোক didactic stage পার হয়েছে বলে মনে হয় না। আনন্দময় কল্পনালোকের চেয়েও জ্ঞান ও তথ্যের নির্ম্মম ও কর্কশ বেড়া দিয়ে শিশু সাহিত্যের ছোট্ট প্রাঙ্গনটিকে ঘিরে রাখার ব্যবস্থাটা বেশী দেখা যায়। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ৺সুকুমার রায় চৌধুরী, সুনির্ম্মল বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ শিশুসাহিত্যের প্রকৃত সুরটিকে এদেশেও রক্ষা করে এসেছেন। আমার বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথও এই সুরটি তাঁর কবিতা, তাঁর শিশু-চরিত্র অঙ্কণে, তাঁর নিজের জীবনকাহিনীতে, বারে বারে শুনিয়েছেন। আজ সময়সংক্ষেপে এবং আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনায় বেশী কিছু বলবার অবকাশ পেলাম না। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ "শিশু" থেকে 'ভিতরে ও বাহিরে' নামক কবিতাটি পড়ে আপনাদের শোনাচ্ছি।

খোকা থাকে জগৎ মায়ের অন্তঃপুরে
তাই যে শোনে কত যে গান কতই সুরে।
নানান রঙে রঙিয়ে দিয়ে আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলাঘরের চাতাল।
তিনি হাসেন যখন তরুলতার দলে
খোকারকাছে পাতা নেড়ে প্রলাপ বলে।
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে সূর্য্য শশী
খোকার সাথে হাসে যেন এক বয়সী।
সত্যবুড়ো নানা রঙের মুখোস প'রে
শিশুর সনে শিশুর মত গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম্ম করে হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে করতে খেলা।
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি যা ইচ্ছে তাই
কোনো নিয়ম কোনো বাধা বিপত্তি নাই।
বোবাদেরও কথা বলান খোকার কানে
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন চেতন প্রাণে।
খোকার তরে গল্প রচে বর্ষা শরৎ
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে বিশ্বজগৎ।
খোকা তারি মাঝখানেতে বেড়ায় ঘুরে
খোকা থাকে জগৎ মায়ের অন্তঃপুরে॥

আমরা থাকি জগৎ পিতার বিদ্যালয়ে
উঠেছে ঘর পাথর গাঁথা দেয়াল লয়ে।
জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে সূর্য্য শশী
নিয়ম থাকে বাগিয়ে ল'য়ে রশারসি।
এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বৃক্ষলতা
যেন তারা বোঝেই নাকো কোনোই কথা।
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে এমনি ভানে
যেন তারা সাত ভায়েরে কেউ না জানে।
মেঘেরা চায় এমনি তারা অবোধ ভাবে
যেন তারা জানেই নাকো কোথায় যাবে।
ভাঙ্গা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে সকাল বেলা
যেন তারা কেবল শুধু মাটির ঢেলা।
দিঘী থাকে নীরব হয়ে দিবারাত্র
নাগ কন্যের কথা যেন গল্প মাত্র।
সুখ দুঃখ এমনি বুকে চেপে রহে
যেন তারা কিছুমাত্র গল্প নহে।
যেমন আছে তেমনি থাকে যে যাহা তাই
আর যে কিছু হবে এমন ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরু মশায় থাকেন কঠিন হয়ে
আমরা থাকি জগৎ পিতার বিদ্যালয়ে॥



আমরা যারা আজ জগৎমায়ের অন্তঃপুরের বাইরে অবস্থান করছি, যার পরিবেশ আজ কল্পনাহীন সত্যে ও রসহীন তথ্যে ভরাট হয়ে আছে, কল্পনালোকের অমরাবতী-নিবাসী খোকার মন পেতে হলে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে সেই জগৎমায়ের অন্তঃপুরে। তা না হলে আমরা আমাদের সেই নির্ব্বাসিত রূপই দেখতে পাবো খোকাখুকুদের মধ্যে, সত্যিকারের খোকা যাবে হারিয়ে!

আমার এই নিবেদন যে শিশুর এই যে পরিকল্পনা এই কবিতাটির মধ্যে পেয়েছি, আপনাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সেই শিশুটির নিজস্ব রূপ দরদ দিয়ে বুঝবেন, যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়!*

* গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর আবাসে অনুষ্ঠিত শিশু সাহিত্য সেবী সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ভাগ্য-চক্র

সমরখন্দ্। তৈমুর এখন আমার কাজ্‌গানের সভাসদ।

বিশ্বজয়ী জেঙ্গীজ্ খাঁর বংশধররা দুর্ব্বল হয়ে পড়তেই আমীর কাজগান মাথা তুলে দাঁড়ান। কিন্তু কাজ্‌গান বুঝেছিলেন, তাঁর দেহে রাজরক্ত নেই ব'লে কেউ তাঁকে রাজা ব'লে মানতে চাইবে না। কাজেই তিনি জেঙ্গীজের এক শান্তশিষ্ট, আমোদপ্রিয় বংশধরকে লোক-দেখানো রাজা সাজিয়ে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন নিজের হাতেই।

তৈমুরের দেহে রাজরক্ত নেই বটে, কিন্তু তিনি বার্লাস গোষ্ঠীর সর্দ্দারের ছেলে। কাজেই আমীর কাজ্‌গান সাগ্রহে তাঁকে আশ্রয় দিলেন। তৈমুরও নিজের সাহস, বুদ্ধি ও

বীরত্বের পরিচয় দিতে দেরি করলেন না। এমন কি ছু-একটা ছোটখাটো যুদ্ধও জিতে ফেললেন।

রাজসভায় যে-সব তাতারের 'বীর' ব'লে খ্যাতি ছিল, যুদ্ধযাত্রাকে যারা শোভাযাত্রা ব'লে মনে করত, লোকে তাদের ডাক্‌ত 'বাহাতুর' নামে। আমীর কাজ্‌গান লক্ষ্য করলেন, তৈমুর বয়সে তরুণ বটে, কিন্তু বাহাতুরদের দলে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা নেই। তিনি বুঝলেন, তৈমুর হচ্ছেন অসাধারণ যুবক, তাঁর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

কিছুদিন যেতে-না যেতেই তৈমুর আমীরের সামনে গিয়ে আবেদন জানালেন, "আমি বার্লাস্ গোষ্ঠীর সর্দ্দারের পদ প্রার্থনা করি।"

আমীর কাজ্‌গান তৈমুরের এই ব্যস্ততা পছন্দ করলেন না। বললেন, "অপেক্ষা কর। যথাসময়েই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

আরো কিছুদিন যায়। আমীরের এক পরমা সুন্দরী দৌহিত্রী ছিলেন, নাম তাঁর আল্‌জাই খাতুন আগা। তিনি এক রাজার মেয়ে।

আমীর বললেন, "আল্‌তাই হবে তৈমুরের বউ।"

তৈমুরও তাঁকে দেখেছিলেন, কারণ সে-সময়ে তাতার মুসলমানদের মেয়েরা পর্দ্দার আড়ালে বাস করতেন না। তীর্থযাত্রায় ঘোড়ায় চ'ড়ে তাঁরা হতেন পুরুষদের সঙ্গিনী। তাতার নারীরা জানতেন, দিগ্বিজয়ীদের বংশে তাঁদের জন্ম—বন্ধুর পথের সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করবার শক্তি তাঁদের আছে।

আল্‌জাইয়ের বয়স পনরো বৎসর। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, নতুন চাঁদের মতন ছিল তাঁর রূপ আর তাঁর দেহ ছিল তরুণ লতার মত।

তৈমুরের সঙ্গে আল্‌জাইয়ের বিবাহ হয়ে গেল। এবং এই বিবাহের ফলে তৈমুরের সম্মান যে বেড়ে উঠল, সে-কথা বলা বাহুল্য। তিনি রাজকন্যার স্বামী ও শক্তিমান কাজ্‌গানের নাত-জামাই!

বউ নিয়ে তৈমুর মহাসমারোহে সবুজ সহরে ফিরে এলেন। ভালো ভালো দামী জিনিষ দিয়ে সাজালেন নিজের মস্ত বাড়ী। কুড়ি থেকে চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তৈমুরের জীবন কেটে গেল সুখস্বপ্নের মত। তাঁদের একটি ছেলেও হ'ল, তৈমুর তার নাম রাখলেন, জাহাঙ্গীর।

তৈমুর এখন একজন ছোটখাটো সেনাপতি, তাঁর হুকুম মানে একহাজার সৈন্য। সমরখন্দের পশ্চিমে মরুভূমিতে গিয়ে তৈমুর নূতন নূতন যুদ্ধ জয় করলেন। সমরখন্দের দক্ষিণে পাহাড়ের পর পাহাড়ের উপত্যকা এবং সেখানে আছে বিখ্যাত হিরাট সহর। হিরাটের মালিক ছিলেন কাজ্‌গানের শত্রু। তৈমুর সেখানে গিয়ে লড়াই ক'রে হিরাটের মালিককে বন্দী ক'রে আনলেন।



তৈমুরের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন উর্দ্ধমুখে, তখন এক তুর্ঘটনা ঘটল।

একদিন আমীর কাজ্‌গান শিকার করতে গিয়ে আর ফিরে এলেন না! তুইজন বিদ্রোহী সর্দ্দার ধনুকের তীর ছুঁড়ে তাঁকে হত্যা করলে।

খবর পেয়ে তৈমুর ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন। প্রথমে আমীরের সমাধির ব্যবস্থা করলেন, তারপর আবার দলবল নিয়ে ছুটলেন হত্যাকারীদের পিছনে।

হত্যাকারী সর্দ্দাররা প্রাণের ভয়ে আমু নদী পার হয়ে তুর্গম পাহাড়ে গিয়ে উঠল। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিস্তার নেই—তৈমুরের কঠোর প্রতিজ্ঞা, হত্যাকারীদের হত্যা না ক'রে তিনি আর দেশে ফিরবেন না। এ পাহাড়ে, ও পাহাড়ে—তারা যায় যেখানে, তৈমুরও হাজির হন সেখানে, ছায়া যেন অনুসরণ করছে পলাতক কায়াকে! তারপর চারিধার থেকে তাদের পালাবার পথ বন্ধ ক'রে তৈমুর গিয়ে দাঁড়ালেন তুই হত্যাকারীর সম্মুখে। বিত্যুতের মতন জ্ব'লে শূন্যে উঠল নিষ্ঠুর তরবারি,—তুই সর্দ্দারের মুণ্ড ধূলায় প'ড়ে গড়িয়ে গেল।

প্রতিশোধ নিয়ে তৈমুর দেশে ফিরে এসে দেখলেন, রাজ্যের হালচাল সব বদ্‌লে গিয়েছে!

মধ্য-এসিয়ায় কোন রাজা মারা পড়লে তাঁর ছেলে সিংহাসন দখল করতে পারেন—যদি তিনি সক্ষম হন! নইলে রাজ্যের বড় বড় সর্দ্দাররা এক হয়ে পরামর্শ ক'রে নতুন রাজা নির্ব্বাচন করেন, কিংবা সিংহাসন নিয়ে হয় ঘরোয়া যুদ্ধের অবতারণা। ওখানকার প্রবাদই হচ্ছে: তরবারি ধারণের শক্তি আছে যে-হাতের, কেবল সেই হাতই ধারণ করতে পারে রাজদণ্ড!"

আমীর কাজ্‌গানের ছেলে রাজদণ্ডধারণের চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে উঠছে দেখে হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হ'লেন। তখন দিকবিদিক থেকে তাতারদের মধ্যে প্রধান হবার জন্যে যাঁরা এগিয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তৈমুরের খুড়ো হাজী বার্লাস্। অন্যান্য সামন্ত রাজা বা সর্দ্দাররা নিজের নিজের কেল্লায় ফিরে গিয়ে স্বসম্পত্তি রক্ষা ও পরস্বাপহরণের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

ঠিক এই সময়ে তৈমুরের সন্ন্যাসী পিতার মৃত্যু হ'ল।

ওদিকে উত্তর-দিকের পর্ব্বতমালার পরপার থেকে মহান খাঁয়ের টনক নড়ল। জেঙ্গীজ্‌ খাঁর বংশধরদের মধ্যে যাঁরা সম্রাটের মতন সম্মান লাভ করতেন, মহান খাঁ ব'লে ডাকা হ'ত তাঁদেরই। সমরখন্দ প্রভৃতি স্থানে যাঁরা শাসন করতেন, তাঁরা নিজের নিজের এলাকায় যতটাই স্বাধীনতা প্রকাশ করুন, আসলে তাঁদের সকলকার মাথার উপরে থাকতেন ঐ মহান খাঁ।

একদিন খবর পাওয়া গেল, মহান খাঁ সদলবলে আসছেন সমরখন্দের দিকে। বহু

বৎসর আগে এ-অঞ্চলে রাজবিদ্রোহ হয়েছিল ,সে কথা হঠাৎ তাঁর মনে প'ড়ে গেছে। এবং সেই ওজর তুলে তিনি পেয়েছেন আজ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করবার সুযোগ।

শুনেই যত তাতার আমীরদের পিলে দস্তুর মতন চম্‌কে গেল। তাঁরা তাড়াতাড়ি নানান-রকম দামী দামী উপঢৌকন দিয়ে মহান খাঁয়ের মন রাখবার চেষ্টা করলেন।

হাজী বার্লাস্ প্রথমে খাঁয়ের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। কিন্তু তারপরেই তাঁর সাহস গেল উপে। তিনি তৈমুরকে ডেকে বললেন, "চল, আমরা হিরাটের দিকে স'রে পড়ি।"

কিন্তু তৈমুর বললেন, "আপনি যেখানে ইচ্ছে যান, আমি খাঁয়ের সঙ্গে দেখা করব।

তৈমুর বুঝেছিলেন, জাট মোগললের সর্ব্বেসর্ব্বা এই খাঁ কেবল তাঁর পূর্ব্ব-দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে এদিকে আসছেন না, তাঁর মনে প্রাপ্তির আশাও আছে বিলক্ষণ। তিনি আরো বুঝলেন যে, কয়েক শত অনুচর নিয়ে বারো হাজার জাট মোগলকে বাধা দিতে যাওয়া পাগ্‌লামি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তৈমুর স্থির করলেন, তিনি কূট চালে বাজী মাৎ করবেন।

নিজের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি—অর্থাৎ ভালো ভালো ঘোড়া, সোনা-রূপো ও হীরা-মুক্তা নিয়ে তিনি জাট মোগলদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মোগলদের অগ্রদূত রূপে প্রথমে সসৈন্যে এল তিনজন সেনানী। তারা তৈমুরের শ্বেত প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই তৈমুর সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। তারপর তাদের জন্যে হ'ল ভোজের বিপুল আয়োজন। ভোজের পরে প্রচুর উপঢৌকন পেয়ে সেনানীরা পরম পরিতুষ্ট হ'ল।

তারপর তৈমুর চললেন আসল খাঁয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর নাম তোগ্‌লক।

তৈমুর তোগ্‌লকের সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে, যথারীতি অভিবাদন ক'রে বললেন, "হে মহান খাঁ, হে আমার পিতা, আমি হচ্ছি বার্লাস্ গোষ্ঠীর সর্দ্দার, সবুজ সহরে আমার বসতি।"

তৈমুরের নির্ভীক ও বীরোচিত মূর্ত্তি দেখে তোগ্‌লক বিস্মিত হলেন। তারপর দামী দামী ভেট পেয়ে তাঁর মেজাজ এমন নরম হয়ে গেল যে, তৈমুর সত্যসত্যই বার্লাস্ গোষ্ঠীর সর্দ্দার কিনা, সে-সম্বন্ধে কোন খোঁজ নেওয়া তিনি দরকার মনে করলেন না।

তৈমুর মনে মনে হেসে বললেন, "হুজুরের জন্যে আমি আরো অনেক ভালো উপহার আনতে পারতুম, কিন্তু তিনটে কুকুর সে-সব জোর ক'রে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।"

তোগ্‌লক ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "কে তারা ?"

তৈমুর বললেন, "পিতা, তারা হচ্ছে আপনারই তিনজন সেনানী।"

তোগ্‌লক বললেন, "হ্যাঁ, তারা কুকুরই বটে। কিন্তু তারা হচ্ছে আমারই কুকুর আর



তাদের লোভ হচ্ছে আমার চোখের বালির মত।" তিনি তখনই সেনানীদের কাছ থেকে সমস্ত ধনরত্ন কেড়ে আনবার হুকুম দিলেন।

কিন্তু যা হস্তগত করেছে তা হাতছাড়া করতে রাজি না হয়ে সেনানীরা স্বদেশে পালিয়ে গেল এবং নূতন ফৌজ গঠন ক'রে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলে!

তোগ্‌লক বললেন, "তৈমুর, এখন উপায় ?"

তৈমুর বললেন, "পিতা, নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করুন।"

তোগ্‌লক তাই করলেন এবং যাবার সময়ে তৈমুরকে দশহাজার সৈন্যের সেনাপতি ক'রে দিয়ে গেলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মোগল-যুগে তৈমুরের পূর্ব্বপুরুষরা এই সম্মানেরই অধিকারী ছিলেন।

ওদিকে ভাইপোর চালাকির কথা শুনে খুড়ো হাজী বার্লাস্ হ'লেন চ'টে আগুন! তৈমুর ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়! স্নেহময় খুড়ো অন্যান্য সর্দ্দারদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন, তৈমুরকে ভুলিয়ে এনে হত্যা করতে হবে।

কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল হ'ল না, বুদ্ধিমান তৈমুর ফাঁদে পা দিলেন না। হাজী বার্লাস তখন সদলবলে তৈমুরকে আক্রমণ করবার জন্যে সবুজ সহরে এসে হাজির হলেন। তৈমুরের অধিকাংশ সঙ্গীও হাজী বার্লাসের দলে যোগদান করলে। তৈমুর তখন নাচারে হয়ে তাঁর স্ত্রীর ভাই কাবুলের আমীর হুসেনের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন।

আমীর হুসেন ভগ্নীপতিকে সাহায্য করবার জন্যে আফগানি সৈন্যদের নিয়ে ছুটে এলেন। আট-নয় বৎসর এইভাবে কেটে গেল। তারপর আবার হঠাৎ একদিন এই ঘরোয়া যুদ্ধের মাঝখানে হ'ল তোগ্‌লকের পুনরাবির্ভাব। হাজী বার্লাস দক্ষিণদিকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন ডাকাতের হাতে। আমীর হুসেন তোগ্‌লককে বাধা দিতে গেলেন, কিন্তু তিনিও যুদ্ধে হেরে পলায়ন করলেন।

তৈমুর কিন্তু মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন না। তোগ্‌লক খুসি হয়ে তাঁকে সমরখন্দের সর্দ্দার ক'রে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু তৈমুর খুসি হ'তে পারলেন না, কারণ তাঁর মাথার উপরে প্রধান হয়ে রইলেন তোগ্‌লকের পুত্র ও সেনাপতি বিকিজুক্।

উপায়ান্তর নেই দেখে তৈমুর তখনকার মত মনের রাগ মনেই চেপে রইলেন বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি যখন দেখলেন, সেনাপতি বিকিজুক্ সমস্ত সমরখন্দ লুণ্ঠন করছেন, মেয়েদের ধ'রে বাঁদী ক'রে জাট মোগলদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, এমন কি পূজনীয় সৈয়দদেরও বন্দী করছেন, তখন তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না, জাট মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন।

তোগ্‌লক হুকুম পাঠালেন—"তৈমুরকে বধ কর!"

ঘোড়ায় চ'ড়ে দেশ ছেড়ে তৈমুর চললেন মরুভূমির দিকে। (ক্রমশঃ)

# ভাই বোন

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

বন্দী জার্মান সৈনিক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে রুষের বিরাট বরফ চাপা প্রান্তরের দিকে চেয়ে থাকে। তার তরুণ মন অলস ভাবে কল্পনার জাল বুনে চলে। বার্লিনের মধুর স্মৃতি আজ তার মনকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে। তার মনে পড়ে ছোট বোনটির কথা। হাস্যময়ী বোনটী ছাড়া বার্লিনে তার ছোট সঙ্গী ছিল না বড় কেউ, সেও ভাইটীকে ছাড়া আর কাউকে জানতো না। বয়সের পার্থক্য ছিল তাদের কম, শিশুকাল থেকেই তারা পরস্পরের সঙ্গী, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। বার্লিনে এমন সময় হয়তো তারা দুজনে টেনিস খেলায় মেতে উঠেছে। কিংবা হয়তো দুজনে মায়ের দুটী হাত ধরে গল্প আর হাসির ফুল ফুটিয়ে পার্কের দিকে এগিয়ে চলেছে। সৈনিকের মনটা ভারী হয়ে ওঠে। ভাবে, আজ হয়তো বোনটী কলেজ থেকে ফিরে বিছানার ওপর পড়ে পড়ে কাঁদছে কিংবা সজল চোখে মায়ের কাছে বসে তাকে সান্ত্বণা দিচ্ছে। কি ভেবে ও ধীরে ধীরে বিছানার ওপর ওঠে বসে পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কি বার করবার চেষ্টা করে। কিন্তু বার করা আর হয় না; রুষ নার্সটী ঘরে আসে। জার্মান সৈনিক তাড়াতাড়ি লক্ষ্মী ছেলের মত ঝুপ করে শুয়ে পড়ে। মেয়েটী হেসে ফেলে। জিজ্ঞাসা করে, "কি হচ্ছিলো?" সৈনিক বলে, "কই? কিছু না তো।" মেয়েটী তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলে, "ফের, মিথ্যে কথা!" জার্মান তরুণটি তবু ঘাড় নেড়ে দোষ অস্বীকার করে।

মেয়েটী এগিয়ে গিয়ে জানলার সার্সিটা ভালো করে বন্ধ করে দেয়। তারপর আগুনে খানকতক কয়লা ফেলে দিয়ে জার্মানটীর মাথার কাছে এসে বসে। তার চুলের ভেতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "কেমন আছো? "কি ভাবছিলে?" জার্মান অফিসারটী ব্যথিতস্বরে বলে, "পুরোনো দিনের কথা আজ আমার কেবলই মনে পড়ছে। কেবলই মনে পড়ছে দেশের কথা—বোনটীর কথা। আমার মায়ের কথা।"

সৈনিক চুপ করে যায়, নার্সের মন সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। জার্মান সৈনিকটিকে তার খুব ভালো লাগে। অন্যদের মতো নয়। মনটা একদম সাদা—ঠিক তার দাদার মত। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—দাদা কবে যে ফিরবে কে জানে? হিটলারের সৈন্য তাদের দেশ আক্রমণ করবার পর সেই যে গেছে আর কোনো খবরই নেই, যুদ্ধ সে কখনো দেখেনি। শুনেচে পশ্চিম সীমান্তে নাকি ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। জার্মান সৈনিককে বলে, "তোমার সৈনিক জীবনের গল্প বল না, শুনি।" জার্মান তরুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, "শুনবে?"

"পোল্যাণ্ডের সঙ্গে তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে আমরা বাজী লড়ে খেলতে আরম্ভ কর্লুম। সে জার্মানীর হয়ে খেলতে নামল, আর আমি নামলুম পোল্যাণ্ডের দলে। মা তাঁর বোনা ফেলে খেলা দেখতে এলেন। তাঁর ইচ্ছে আমি জিতি। তিনি আমায় খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন। যেন আমি যদি হারি তাহলেই বুঝি পোল্যাণ্ড হেরে যাবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমিই হারলুম। আর মনে মনে বোধ হয় আমিও তাই চাইছিলুম। এ হারে দুঃখ নেই, আনন্দটাই বেশী, দুজনে চীৎকার করে বলে উঠলুম, "হের্ হিট্লার! জয় জার্মানীর জয়।" মার দিকে ফিরে দেখি তিনি কাঁদছেন। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা কর্লুম, "কি হোলো মা?" তিনি কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, "সর্বনাশা যুদ্ধ আরম্ভ হোলো, গতবারে তোর দাদা গিয়ে আর ফিরে আসে নি। আর এবারে হয়তো"—তিনি আর বল্তে পার্লেন না, উচ্ছ্বসিত কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়্লেন। ফিরে দেখি বোনটীর চোখেও জল ভরে উঠেছে।



"সেদিন আনমনা হয়ে আমি একাই বেড়াতে গেলুম। রাত্রে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখি, বোনটী আমার—ক্রসের সামনে সমাহিত হয়ে বসে আছে। ডাকতে ইচ্ছা হোলো না, ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে গেলুম।

"পোল্যাণ্ডের পতন হোলে—নরওয়ে ও ডেনমার্ক তাদের স্বাধীনতা হারালো—হল্যাণ্ড ও বেল্জিয়াম্ জার্মান সৈন্যের পথরোধ কর্তে পার্লে না। ফ্রান্সও জার্মানীর কাছে সন্ধি প্রার্থনা করলে। আমরা ভাবলুম এইবার যুদ্ধের শেষ, কিন্তু না, যুদ্ধের শেষ হোলো না। গ্রীস ও যুগোশ্লেভিয়া হিট্লারের দাবী মেনে নিতে অস্বীকার কর্লে, সৈন্যের প্রস্তুত হয়েই ছিলো। ইঙ্গিত মাত্রই তারা ক্ষুধার্ত কুকুরের মত এই স্বাধীন দেশ দুটীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গ্রাসে ও যুগোশ্লাভিয়ায় জার্মান পতাকা উড়তে লাগ্লো। সকলেই তখন জয়ের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে। সবারই মুখে এক প্রশ্ন—"এবার কোনদিকে?"

"একদিন হিট্লারের ডাক আমাদের বাড়ী পৌঁছুলো—পূর্ব-সীমান্তের-দিকে আমাকে রওনা হতে হবে। ছোটবেলা থেকেই আমাদের যুদ্ধবিদ্যা সেখানো হয়েছে। সুতরাং যে কোনো মুহূর্তে ডাক আসতে পারে এই আশাই আগ্রহচিত্তে করছিলুম। মা খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বোনটীর ঘরে গেলুম। দেখ্লুম সে বালিসে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার মুখে জোগাল না। নীরবে যাত্রার আয়োজন কর্তে লাগলুম।

"যাবার সময় হোলো। মার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার যে কি কষ্ট সে আগে জানতুম না। তিনি শুধু চুপ করে বসে চোখ মুছ্তে লাগলেন। কোন কথাই বল্লেন না। মার ঘর থেকে বেরোতেই বোনটি কোথা থেকে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধর্লে। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো তার ফুলে গেছে। সে আমার কাঁধে মাথা রেখে অধীরভাবে কাঁদতে লাগলো। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কর্লুম। আমার ঘড়িটা তার হাতে বেঁধে দিয়ে বল্লুম, "যদি না ফিরি, আমায় মনে রাখিস্।" সে তার গলা থেকে তার প্রতিকৃতি আঁকা লকেটটা আমার হাতে দিলে। গত জন্মদিনে আমি তাকে এটা উপহার দিয়েছিলুম। আমি সেটা পকেটে রাখলুম। সে এগিয়ে এসে তার সুন্দর মুখখানি বাড়িয়ে দিলে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে দুটো চুমু খেলুম। তারপর ছুটে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্লুম। পেছনে চাইবার সাহস আমার ছিলো না। কি জানি যদি কেঁদে ফেলি।"

জার্মান সৈনিকটী চুপ করে। ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শ্রোতা ও বক্তা দুজনেই আনমনা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে রুষ তরুণীটি বলে, "তারপর?" জার্মানটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "হ্যাঁ, তারপর—"

"আমরা রুষ সীমান্তে পৌঁছেই আক্রমণ কর্বার জন্যে গোপনে প্রস্তুত হ'তে লাগলুম। সকলেই সজাগ হয়ে রইলুম—যে কোন মুহূর্তে আক্রমণের আদেশ আসতে পারে। সেদিন গভীর রাত্রে রুষ সীমান্ত অতিক্রম কর্বার নির্দেশ পেলুম। আমরা পাগলের মত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

"সেনাপতিরা ভেবেছিলেন হঠাৎ আক্রমণে রুষ সৈন্যদল একেবারে বুঝি মুছে যাবে। কিন্তু দেখা গেল শত্রুপক্ষও প্রস্তুত হয়েছিলো। আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণে তারা কিছু পেছিয়ে গেল বটে কিন্তু তত সহজে নয়। জার্মান পক্ষের ক্ষতি হোলো নিদারুণ। সমর নায়কেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আদেশ দিলেন—যেমন কোরে পারো শীত এসে পড়বার আগে রুষ সৈন্যদল ধ্বংস করে ফেলো।

"আমরা লেনিন্গ্রাদের পথ ধর্লুম। যতই এগোতে লাগলুম আমাদের গতিও তত মন্থর হয়ে এলো। প্রতি পদ জমির জন্য উভয় পক্ষের শত শত সৈন্য প্রাণ হারাতে লাগলো। একদিন হঠাৎ রুষ গরিলার আক্রমণে আমাদের ডিভিসন্ ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেলো। আমাদের অবশিষ্ট কয়জনকে নতুন সৈন্যদলে যোগদানের জন্যে স্মোলেন্স্কে পাঠানো হোল।

"নতুন সৈন্য দলে আমি লেফট্‌ন্যাণ্টের পদ পেলুম। দল গঠিত হবার পরদিনই আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হোলো। যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেখলুম উভয় দলই যে কোনো ক্ষতি স্বীকার কর্তে মরণ পণ করেছে। এবার লেনিন্‌গ্রাদের চেয়েও ভীষণতর সংগ্রাম আরম্ভ হোলো। এ যেন একখণ্ড মাংসের জন্য দুই ক্ষুধার্ত কুকুরের সংগ্রাম। মনে হোলো জীবন আর মৃত্যু মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা কর্তে।

"আমরা কখনো ধীরে কখনো জোরে মস্কোর দিকে এগিয়ে চল্‌লুম। রুষরা আমাদের ওপর প্রচণ্ড ভাবে বোমা আর গোলা ছুড়তে লাগলো। আমাদের প্রচুর লোকক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে যাবার আদেশ পেলুম। শেষ পর্য্যন্ত মস্কোর ৪০ মাইল দূরে এসে আমাদের গতিরুদ্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে রুষিয়ার ভয়াবহ শীত এসে পড়লো। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের ভেতর যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে উঠল। পেছনে রুষ গরিলার উৎপাত বেড়ে চললো। শীতের পোষাক এসে পৌছুলো না। খাদ্য ও রসদের আমদানী অনিয়মিত হয়ে উঠলো। আমাদের আর প্রতিরোধ কর্বার শক্তি রইলো না। ভাঙ্গা মনে আমরা স্মোলেনস্কের দিকে পিছু হট্‌তে লাগলুম।

"কিন্তু আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি হোলো না। সামনে রুষ সৈন্য, পেছনে গরিলা বাহিনী, ওপরে রুষ বিমান আর পায়ের নীচে রুষিয়ার বরফময় ক্ষুধার্ত প্রান্তর। আমার সহকর্মীরা একের পর এক তুষারের ওপর শয্যা নিতে আরম্ভ কর্লে। শেষকালে একদিন আমারও শরীর অবসাদে ভেঙ্গে পড়্লো, আমি আর এগুতে পারলুম না। বরফের ওপর শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা কর্তে লাগলুম।...তারপর—"

জার্মান সৈনিক যেন আরও কি বল্‌তে চায়। কিন্তু কিছু আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। ক্লান্ত হয়ে তার চোখ দু'টি বুজে আসে।

রুষ তরুণী তখন তার মাথায় হাত রেখে হেসে বলে, "তারপর রুষ রেডক্রস তোমায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌছে দিয়ে গেল, না? আর তুমি—।"

হঠাৎ সে দেখে জার্মানটী তার কোনো কথা শুনছে না। পকেট থেকে একটা লকেট বার করে তার ওপরে মিনে করা ছবিটার দিকে অতৃপ্ত চোখে চেয়ে আছে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, "সৈনিক ভাই কার ছবি ওটা?" জার্মান যুবক উত্তর দিতে যায় কিন্তু পারে না। তার ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে ওঠে। সে কান্না চাপবার জন্যে বালিসে মুখ গুঁজে দেয়।

মেয়েটী বুঝতে পারে এ তার বোনের স্মৃতি। সে ব্যথিত হয়। না জেনে ওর মনের দুর্বল জয়গায় ঘা দেওয়ায় দুঃখিত হয়। তার মনও দাদার স্মৃতিতে ছুটে যায়; ভাবে সেও হয়তো জার্মান বন্দীশালায় বসে—। হঠাৎ চাপা কান্নার শব্দে তার ভাবনার খেই হারিয়ে যায়। সে যুবকটীর মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। তার মাথাটা একটু নাড়া দিয়ে ডাকে, "ভাইটী, জার্মান ভাইটী!' জার্মানটী ওর দিকে করুণ ভাবে তাকায়। বিশ্ব প্রেমে দীক্ষিতা সাম্যবাদী মেয়েটী অসঙ্কোচে তার সুন্দর মুখখানি রুগ্ন জার্মান যুবকটির দিকে এগিয়ে দেয়। পরম স্নেহে যুবকটী তার গালে একটা চুমু দেয়। তার চুলের ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে তাকে আদর করে। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যেন আপন মনে বলে, "বোনটী, আমার সুন্দর বোনটী।"

——(০)(০)(০)——

# আষাঢ়ে দেশ

একটি ছেলে কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিল তার এই লেখাটি নিয়ে। লেখাটি আমার কেমন লাগে সে জানতে চায়। কদিন হ'ল তার এই দুঃসাহসিক ভ্রমণ-কথা আমি পড়েছি এবং প'ড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। আশ্চর্য সব ঘটনা!—সত্যি কথা বলতে কি, এর আগে আমি এমন ভ্রমণ-কথা পড়িনি।

কিন্তু লেখক-ছেলেটির আর দেখা নেই! তার নাম ঠিকানা কিছুই আমি জানি না, লেখার মধ্যেও কোথায়ও খুঁজে পেলাম না। আবার হয় তো কোনো দুঃসাহসিক পথে সে যাত্রা করেছে!

কিন্তু তার এই লেখাটি সবারই পড়া উচিত। তাই এটা ছাপতে দিলাম, প'ড়ে তোমাদের কেমন লাগে জানিও।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

পুজোর ছুটিতে কোথায়ও যেতেই হবে—মণ্টু আর নিতাইয়ের সঙ্গে ক'দিন ধ'রে পরামর্শ করছিলাম।—কলকাতার বাইরে আশেপাশে কোথায়ও।

মণ্টুর অভিমত হচ্ছে এই যে কলকাতার খুব কাছে যাওয়ার চেয়ে একেবারে কোথায়ও না যাওয়াই ভাল। কিন্তু আমি বেশি দূরে যেতে চাইনি তার কারণ নিতাই নিতান্ত ছেলে মানুষ, ওকে নিয়ে দূরে গেলে শেষটায় আমাদেরই মুস্কিল হবে।

এই নিয়ে কদিন ধ'রেই আমাদের মধ্যে তর্ক চলছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখি আমরা তিনজনেই শিয়ালদ ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনে দার্জ্জিলিং মেলে চেপে বসেছি!

তারপর ভাল মনে নেই, হঠাৎ দেখি হিমালয়ে উঠছি। ছোট্ট রেলগাড়ি, ছোট্ট একটা এঞ্জিনে টেনে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে। আমরা যত উপরে উঠছি ততই অপরূপ সব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ছে। শালবনের ভিতর দিয়ে, পাহাড়ের উপর দিয়ে, ভিতর দিয়ে, এঁকে বেঁকে সোঁ সোঁ শব্দ করতে করতে গাড়িখানা চলছে ঠিক সাপের মতো। রেলের আশেপাশে কত চেনা-অচেনা ফুল! ফার্ণের ঝোপ, কলাবন, গাঁদাফুল, ধুতুরাফুল, আমাদের দুপাশে। পাহাড়ের মানুষগুলো সব নতুন, তাদের গায়ের রং কত সুন্দর, তাদের পোষাক অদ্ভুত ধরণের—তাদের গায়ে কত শক্তি! পিঠে এক একটা প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে তারা চলেছে।

নীচে উপরে যে-দিকে তাকাই, কেবলই চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। শালবন ভেদ ক'রে আমাদের গাড়ি পাহাড়ের ধার দিয়ে চলেছে, নীচে তাকিয়ে দেখি অনেক উপরে উঠে এসেছি। বাংলাদেশের সমতল ভূমি ছবির মতো দেখাচ্ছে, কত দূরে—কত নীচে, অথচ কত স্পষ্ট! শত শত ঝরণা পাহাড় থেকে সমতল ভূমির উপর ব'য়ে চলেছে! মনে হচ্ছিল যেন মানচিত্রের উপর নদীর নীলরেখাগুলো দেখছি।

মুহূর্তে সে ছবি অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে আমরা মেঘের রাজ্যে এসে পৌঁছলাম। ক্রমে শীত করতে লাগল। হাত পা ভীষণ কাঁপতে লাগল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, মাঝে মাঝে মেঘ এসে আমাদের একেবারে ঢেকে ফেলছে। গায়ে ছিল পাতলা জামা, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একটু শীত করতেই সেই জামা গরম মোটা জামায় পরিণত হ'ল, পায়ে আপনা থেকেই মোজা গজিয়ে গেল, গলার চাদরখানা উলের গলাবন্ধে পরিণত হ'ল! সামনে চেয়ে দেখি তুষার ঢাকা হিমালয়ের চূড়া, দেখতে দেখতে কখন সেইখানে এসে পড়েছি!

তখন চারদিকে চেয়ে দেখলাম, আমরা যে ট্রেণখানায় আসছিলাম, কোথায়ও তার চিহ্ন নেই—আমরা বরফের উপর দিয়ে হিমালয় পার হয়ে চলেছি। ভয়ানক শীত। মোটা জামা, মোটা মোজা, হাতে মোটা দস্তানা, গলায় মোটা গলাবন্ধ, কিন্তু শীত এত বেশি যে কাঁপুনি কিছুতেই থামে না।

আমাদের চারদিকে কেবল তুষার আর তুষার। মাঝে মাঝে বেঁটে পাইন গাছের দুএকটা মাথা দেখা যায় আমাদের পায়ের নীচে, কিন্তু সেও তুষারে ঢাকা। আমরা পা টিপে টিপে ক্রমেই উপরে উঠে যাচ্ছি আর ক্রমে শীত বাড়ছে। হাওয়া নয় তো যেন তুষারের ঝড়, ঝড়ে তুষারকণা উড়ে এসে আমাদের চোখমুখে সূঁচের মতো বিঁধছে, কিন্তু উপায় নেই, চলতেই হবে।

এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ আমাদের পায়ের কাছ থেকে একটা বরফের পাহাড় ভীষণ শব্দে ফেটে ধ্বসে গেল। যেখানটায় ভেঙে পড়ল সেখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম! বরফের পাহাড় সেখানটায় প'ড়ে চারদিকে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর সব ধোঁয়ার মত দেখাতে লাগল।

আমাদের সামনের পথ এইভাবে বন্ধ হয়ে গেল, কেন না বরফের পাহাড় সামনের পথটা সুদ্ধ সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে গেছে। তখন কি করি! সেই ভয়ানক শীতে আর তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আমাদের মধ্যে যার নাম মণ্টু সে বললে, "এক কাপ্ ক'রে চা খেলে হয় না?"

কিন্তু তার বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কথাগুলোকে সেই তুষারের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। কথাগুলো ক্রমেই চীৎকারের মতো শোনাতে লাগল, তারপর মেঘের ডাকের মতো, পর্ব্বতের সবগুলো চূড়ায় সে শব্দ গিয়ে আছাড় খেতে লাগল। চূড়াগুলো কেঁপে উঠল। কাঞ্চনজঙ্ঘা চূড়া আমাদের সামনেই ছিল, সূর্য্যের আলোয় সে যে কি চমৎকার দেখাচ্ছিল! কিন্তু শব্দ তার কাছে যেতেই সে ভীষণ চমকে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা থেকে অনেকখানি জমানো বরফ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে নীচে পড়ে গেল। সেই বরফের নীচে ছিল তার চোখ নাক মুখ। বরফ ভেঙে যাওয়াতে সব দেখা যেতে লাগল। তার প্রকাণ্ড দুটো চোখ আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে!

"তোমাদের ভয় নেই"

কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলে। সে বললে, "তোমাদের ভয় নেই, আমি কাঞ্চনবুড়ো, তোমরা কে?"

আমি বললাম, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি।"

"কোথায় যাবে?"

"কোথায় যাব ঠিক নেই, তবে এই দিকে চলেছি।"—দিকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

কাঞ্চনবুড়ো বললে, "ও হচ্ছে আমার মেজদা গৌরীশঙ্কর, ওর কাছে যাবে? ওর পাশে আরও উঁচু একটা চূড়ো আছে—সে হচ্ছে এভারেষ্ট, আমার বড়দা। পারবে ওর কাঁধে উঠতে?"

বললাম, "পারব কি না কিছুই জানি না, এখানে আসতে পারব তাই কি জানতাম? কিন্তু এসে তো পড়েছি। মনে হচ্ছে এক পেয়ালা ক'রে চা খেলেই আবার আমরা চলতে পারব। খাওয়াবে চা?"

"নিশ্চয় খাওয়াব।"—ব'লে কাঞ্চনবুড়ো খুব নীচের দিকে তাকিয়ে বললে, "ঐ দেখ সমস্ত পাহাড় জুড়েই আমার চা বাগান। আদেশ করলেই চা তৈরী হ'য়ে আসে। তোমরা ব'স, এখুনি চা আসছে।"

বুড়োর কথায় একটুখানি বসতেই গরম চা এসে হাজির হ'ল। নীচে যে-সব কুলি মেয়েদের দেখেছি, তারাই আমাদের চা এনে দিলে। চা খেয়ে বড় আরাম হ'ল, বুড়োকে ধন্যবাদ নিয়ে বল্‌লাম, "তা হ'লে আমরা এখন আসি?"

বুড়ো বললে, "আচ্ছা, এসো। তবে ফেরবার পথে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেয়ো। আমি এখানে একা থাকি। কেউ আমার কাছে আসতেই চায় না। হাজার হাজার বছর ধ'রে আমি একা রয়েছি এইখানে। আমার মাথার উপর বরফ জমে থাকে বারো মাস, মাথার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায় বারো মাস, কিন্তু তবু আমার নড়বার উপায় নেই।"

"উপায় নেই কেন?"

"সর্ব্বনাশ! তা হ'লে কি রক্ষা আছে? আমি এখানে ব'সে তোমাদের দেশের

জলের ব্যবস্থা করি। আমার মতো অনেকে আছে এই পর্বতে। আমরা সবাই এখান থেকে মেঘ তৈরী ক'রে সময় মতো তোমাদের দেশে পাঠাই, ঝরনা তৈরী ক'রে জল পাঠাই। এমনি কতকাল ধ'রে করছি। কাজেই আমরা কোথায়ও যেতে পারি না।

নিতাই ছেলেমানুষের মতোই জিজ্ঞাসা করে বসল, "তুমি বুঝি এখানকার কর্পোরেশনে কাজ কর?"

বুড়ো এ কথায় খুব হাসতে লাগল। আমরাও খুব হাসলাম। বুড়ো বললে, "ঠিকই বলেছ তুমি। আমি এই হিমালয়ের কর্পোরেশনেই চাকরি করছি, কিন্তু বড় শক্ত চাকরি—তোমরা যেন এ চাকরির লোভ ক'রো না কখনো।"

বুড়োর কথা-বার্তায় আমাদের খুবই ভাল লাগল। বললাম, "ফেরবার সময় তোমার সঙ্গে আমরা নিশ্চয় দেখা ক'রে যাব। এখন তো আর সময় নেই, নইলে তোমার কাছে ব'সে অনেকক্ষণ আলাপ করা যেত।"

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার চলতে লাগলাম। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল আমাদের পায়ের নীচের বরফ আমাদের নিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। মনে হ'তেই ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম। সঙ্গীরাও চেঁচাতে লাগল। কিন্তু চেঁচিয়ে কি হবে—ছুটে পালাবার কোনো উপায় নেই, ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে বরফ আমাদের নীচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নীচে তাকিয়ে দেখি সে এক ভয়ানক গহ্বর, বাইরে থেকে তার ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। যদি ওখানে গিয়ে পড়ি তা হ'লে আর বেঁচে থাকতে হবে না। কাঞ্চনবুড়োর উপর ভয়ানক রাগ হ'ল। সে নাকি আমাদের জন্য জলের ব্যবস্থা করে, অথচ চলন্ত বরফকে একটু থামাতে পারে না!

"বুড়ো, ওগো কাঞ্চন বুড়ো, আমাদের বাঁচাও, আমরা মারা যাচ্ছি! শীগগির আমাদের রক্ষা কর!"—ব'লে সবাই মিলে চেঁচাতে লাগলাম, কিন্তু কোথায় বুড়ো! সে কি আমাদের কথা শুনছে, না তার শোনার কোনো গরজ আছে! এতক্ষণে হয় তো তার মুখ চোখ আবার বরফে ঢেকে গেছে।

কিন্তু এসব ভাববার আর বেশি সময় ছিল না। বরফ আমাদের নিয়ে ক্রমেই জোরে ছুটতে লাগল। কে কোথায় ছিটকে পড়ি সেই ভয়ে কারো মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না! ভয়ে আমরা হাত ধরাধরি ক'রে চলন্ত বরফের উপর ব'সে পড়লাম। মন্টু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতেই পকেট থেকে একখানা ছোট্ট খাতা বার ক'রে তাতে কি লিখতে লাগল।

আমি কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হি হি-···লিহিহি-খ্···ছহহ?"



মন্টুর মুখ থেকে যে কথা বেরুল তার একটি অক্ষরও বোঝা গেল না। সে বল্‌লে, "ডা-হা হা হা হা—।" ডা হা হা কি?—এর কি কোনো মানে হয়? আবার প্রশ্ন করলাম, "কি হি হি ছুহুহু ই বুহুহুখ্‌তে পাহাহার ছিহি না হা।"

তখন সে খাতাখানা আমার হাতে দিলে প'ড়ে দেখার জন্য। দেখলাম, তাতে এই কথা গুলো লেখা আছে—

বাংলা আর অল্প ইংরেজি ছাড়া আর কোন ভাষা জানি না, এবং মন্টু ও যে বাংলা আর অল্প ইংরেজি ছাড়া আর কিছু জানে এমন কথা শুনিনি। কাজেই তার এই লেখা দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম।

পরে অবশ্য সব জানতে পেরেছি। মন্টু বলতে চেয়েছিল সে ডায়েরি লিখছে, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতে ডাহাহাহা ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করতে পারেনি। আরও জানতে পেরেছি যে সে বাংলা ভাষাতেই ডায়েরি লিখতে গিয়েছিল, কিন্তু হাত কেঁপে যাওয়াতে তার হাতের লেখার ঐ চেহারা হয়েছে। ওর লেখার ইচ্ছে ছিল, "আমরা এখন বরফের পিঠে চ'ড়ে পাহাড় থেকে ভয়ানক জোরে নীচে পড়ছি।"

মন্টু লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভ্রমণ কথা প্রথম থেকেই লিখতে আরম্ভ করেছিল, সেইটে জানতাম না। যাই হোক আমাদের আর সন্দেহ রইল না যে এবারে আর আমাদের রক্ষা নেই। সেই বিরাট গহ্বরটা ক্রমেই যেন হাঁ ক'রে আমাদের গিলতে আসছে, আমরা এইবার তার মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ব, আর জীবনে কখনো আলো দেখব না, জীবনে কখনো বাড়ি ফিরতে পারব না, তার মানে জীবনটা ঐখানেই শেষ হবে।

মরতে হবেই। তাই তাড়াতাড়ি চারিদিকে চেয়ে নিলাম। এই সুন্দর আলো, এই সুন্দর পৃথিবী এখুনি চোখে মিলিয়ে যাবে। বড় দুঃখ হ'ল, এতদিন কেন এই আকাশ, এই আলো আর এই পৃথিবীর সব কিছু ভাল ক'রে দেখিনি! কিন্তু আর দুঃখ ক'রে লাভ নেই। আমাদের চলার বেগ আরও বেড়ে গেছে। আমাদের চারদিকের পাহাড়গুলো যেন তীর বেগে আকাশে উঠে যাচ্ছে—আর আমরা নীচে পড়ছি। চলন্ত বরফের চাপে গাছপালা সব মড়মড় ক'রে ভেঙে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে যত খণ্ড-পাথর ছিল সব ভীষণ শব্দে ছুটছে আমাদের সঙ্গে।

এবারে আরো জোরে চলছি, মাথা ঘুরছে, কিছুই ভাবতে পারছি না। মন, ভাববার শক্তি একেবার হারিয়ে ফেলেছে! তারপর কি হ'ল? একটা প্রচণ্ড শব্দ। কড় কড়্ ক'রে

মেঘ ডাকতে ডাকতে হঠাৎ যেমন আকাশ-ফাটা আওয়াজ হয় তেমনি এক অতি ভীষণ শব্দ আমাদের কানে এসে আঘাত করলে। মনে হ'ল যেন আমরা হুড়মুড় ক'রে ভাঙা গাছপালা আর পাথরের বড় বড় টুকরোর সঙ্গে সেই গহ্বরে এসে পড়লাম। তারপরে আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি আমরা একটা অন্ধকার জায়গায় বসে আছি। সেটা কি রকম জায়গা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেবল বোধ হচ্ছে হাত পা সব ঠাণ্ডায় জমে গেছে যেখানে হাত বাড়াই সেখানেই মনে হয় যেন জল আর পাথর। জল কল্ কল্ শব্দ করছে। এমন তার স্রোত যে তার মধ্যে পড়লে আমাদের টেনে নিয়ে যাবে। ভাগ্যিস্ আমরা একটা বড় পাথরের গায়ে সবাই আটকে আছি, নইলে আবার এই জলের স্রোতের সঙ্গে কোথায় ছুটতে হ'ত কে জানে!

মণ্টুকে ডেকে বললাম, "আমরা এখন কোথায়?"

মণ্টু বল্লে, "পর্বতের গহ্বরে।"

নিতাই আমাদের সঙ্গে বরাবরই আছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে কথা বলেনি, এইবার সে কথা বল্লে। কিন্তু সে-কথা সাধারণ কথা নয়। ডায়েরী লেখার সময় মণ্টুর হাত দিয়ে যে রকম অক্ষর বেরিয়েছিল, নিতাইএর গলা দিয়ে তেমনি কথা বেরুলো। সে কথা সুরু করলে কান্না দিয়ে—

'আঁ ই বাঁ ই যাঁ অঁ!'

এই কথাটা সে বারবার বলতে লাগল। সহজভাবে বললে ওর মানে হয়, "আমি বাড়ি যাব।"

তার যে বাড়ি যাওয়া খুবই দরকার সে কথা আমরা সবাই জানি। আমাদেরও বাড়ি যাওয়া দরকার। কিন্তু মনে করলেই তো আর যাওয়া যাবে না! তাকে বুঝিয়ে বললাম এখন কাঁদবার সময় নেই, এখন কেবল দেখতে হবে কি ক'রে আমরা বেঁচে থাকব। সেই সকালে এক কাপ্ চা খেয়েছি, তারপর আর কিছুই আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। এখন বেলা কত জানি না, এটা দিন কি রাত তাও জানি না, সঙ্গে যে ঘড়িটি ছিল সেটা বহুক্ষণ আগে বন্ধ হ'য়ে গেছে। আর চল্লেও এই অন্ধকারে তা দেখা যেত না। এখন আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, কি ক'রে আমরা এই চিররাত্রির দেশ থেকে আলোর দেশে ফিরে যাব, তারই পথ খুঁজে বার করা।

এই ধরণের অনেক কথা ব'লে নিতাইকে শান্ত করা গেল। তারপর আমরা সবাই মিলে বাইরে যাবার পথ খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ আমার হাত যেন কার গায়ে লাগল। মনে হ'ল যেন কোনো জন্তু। বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল, ভয়ে সমস্ত গা যেন কাঁটা দিয়ে উঠল! এই অন্ধকার গহ্বরে এ কোন্ জন্তু? [ ক্রমশঃ ]

# বর্ষার চিঠি

শ্রীহৃষিকেশ দে

"রংমশাল্চী" বন্ধুদল, আমি যখন তোমাদের চিঠি লিখ্ছি, আকাশে তখন কালো মেঘের সভা বসে গেছে। জানালা দিয়ে দেখ্তে পাচ্ছি দূর মাঠের প্রান্তে গাছগুলো ঝড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে মাথা নেড়ে যেন বিদ্রোহ কর্বার চেষ্টা কর্চ্ছে। পাতাশূন্য একটা মুমূর্ষু গাছেও জেগেছে জীবনের স্পন্দন। সে-ও তা'র শুক্নো ডালগুলোকে নাড়্বার চেষ্টা কর্চ্ছে নবীন গাছদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। বর্ষার এই এক বিচিত্র ধারায় আত্মপ্রকাশের চেষ্টা। বর্ষার আবাহনে নবীনের প্রাণে জেগেছে আনন্দ, ঝড়ো হাওয়ার সাথে তাই সে চায় উড়িয়ে দিতে, তা'র শুক্নো ঝরা পাতার দলকে, চায় মাতামাতি কর্তে, চায় জীবনকে ষোলআনা উপভোগ কর্তে। বর্ষার মেঘ তাই আকাশে জম্ছে একদল রাশছেড়া পাগ্লা পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত। হঠাৎ একসময় সব ভেঙে পড়্বে শুষ্ক পিপাসার্ত ধরণীর উপর। ধুয়ে নিয়ে যাবে তার সকল তৃষ্ণা, সকল কালিমা, সকল গ্লানি! গাছগুলি আবার নবীন তেজে উঠ্বে জেগে, তৃণদল পাবে নতুন জীবনীশক্তি, নবীন কিশলয়দলে মাঠঘাট যাবে ভরে। ভাসিয়ে দেবে সব পুরানোকে। বর্ষার আগমনীতে তাই আজ বাজ্ছে নবীনেরই জয়গান। বর্ষার আকাশ, বর্ষার বাতাস, বর্ষার কালো মেঘ যেন বল্ছে, "তোরা নবীন, তোদেরই জয়।" শুষ্ক, মৃতপ্রায় গাছগুলিরও প্রাণে তাই বুঝি জেগেছে জীবনের নতুন ধ্বনি। বর্ষার পাগ্লা হাওয়ায় তারাও তাই আজ ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছে বার্ধক্যের সকল জড়তা, সকল ক্লান্তি। বর্ষার সজল মেঘের শীতল স্পর্শে তারা আবার হয়ে উঠ্তে চায় পত্রে পুষ্পে মুঞ্জরিত, চায় তা'দের হারানো কৈশোরের সবুজ দিনগুলি ফিরিয়ে আন্তে। বর্ষার আকাশের কালো মেঘের বিজয় নিনাদে, তা'র ঝড়ো হাওয়ায় তা'র অবিশ্রান্ত বর্ষনে, আজ নূতনেরই জয়ধ্বনি।

নবীনের এই জয়গাথা যুগে যুগে বিশ্বের বুকে গীত হয়ে এসেছে। নতুন চিন্তা, নতুন কৃষ্টি প্রচারের জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে এসেছেন প্রচারক, এসেছেন সংস্কারক, এসেছেন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক। পুরানো ভাবধারাকে তাই সরে গিয়ে নতুন ভাব, নতুন সাধনার স্থান করে দিতে হয়েছে। অবশ্যি সব সময়ে তা' শান্তিপূর্ণভাবে হয়নি, হয়ত সংঘাত বেধেছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পরিণামে প্রাচীনকে মাথা নত কর্তে হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটীস যখন প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল পুরানো ভাবধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এথেনীয় নাগরিকরা সেদিন তাঁকে পারেনি সহ্য কর্তে, তাই বিষ খেয়ে সক্রেটীসকে কর্তে

হয়েছিল সত্য প্রচারের প্রায়শ্চিত্ত। প্রকৃত সত্যের মূর্তি প্রদীপ্ত ভাস্করের মত, তার আলোয় ছায়া নেই, নেই ছলনা। মন যা'দের সংস্কারে আবদ্ধ, যা'দের "চক্ষু দুটি ডানায় ঢাকা, যেন অন্ধকারের বন্ধ করা খাঁচায়", তা'রা সত্যের প্রখরতা সহ্য কর্তে পারে না। তাই লাঞ্ছনা শুধু সক্রেটীসের ভাগ্যেই জোটেনি, যুগে যুগে যে দেশে যখনই অতীতের ভাবধারার বনিয়াদী ভিত্তিতে ফাটল ধরাবার জন্যে জন্ম নিয়েছেন নতুন সংস্কারকের দল, তখনই এই অতীত মোহ-গ্রস্তের দল হয়ে উঠেছে সন্ত্রস্থ। তা'রা ভুলে যায় যে, যা প্রাচীন, যা বৃদ্ধ, তা'কেই নির্বিচারে সম্মান দেখাতে হবে, এ ধারণা ভুল। যা' নতুন, তা-ই বাজে, আর যা' পুরানো অতীতের ধ্বংসস্তূপ, তা-ই উৎকৃষ্ট, এ ধারণা আজ বদ্‌লাবার দিন এসেছে। বন্ধুগণ, অতীতের ধ্বংসাবশেষকে ঝটিতি বিদায় করে এসো আমরা গড়ে তুলি নবীন পৃথিবীর ইমারত্। "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"।...—কিন্তু কি বল্‌ছিলুম ?.....

—হ্যাঁ, বর্ষার আগমনীতে আজ এই নতুনেরই জয়গান উঠছে বেজে। বর্ষার বৃষ্টিধারা নিয়ে যাবে ধুয়ে অতীতের যত কালিমা, যত মালিন্য। বনস্পতি জেগে উঠ্‌বে নতুন আনন্দে, নতুন জীবনীশক্তিতে।

কিন্তু পুরানোকে নির্বিচারে দূর করে দিলেই কি আনন্দের সন্ধান পাওয়া যাবে, বন্ধুগণ ? বাইরের দিকে চেয়ো দেখো। অতীতে প্রত্যেক বছরেই বর্ষা এসেছে, ভবিষ্যতেও আস্‌বে, বর্ত্তমানেও আমরা বর্ষার রূপ দেখ্‌ছি। কিন্তু পুরাণো বলে কি আমাদের কাছে কিছু কম মনোহর ? তা' নয়, কারণ এই চিরপুরাতনের মাঝেই আমরা পাই চির নবীনের সন্ধান। অতীতে যুগে যুগে বাল্মীকি, কালিদাস থেকে সুরু করে কত কবি কত ভাবেই না করেছেন বর্ষার রূপ বর্ণনা, কিন্তু আজো কবিদের লেখনী মানা মানে নি বর্ষার স্তুতি থেকে। পুরাণো বর্ষা আবার এসেছে আমাদের নতুন আনন্দ দিতে। "The old order changeth yielding place to new, এ'কথা খুবই সত্য।

পরিবর্ত্তন যেখানে কল্যাণকর, যেখানে প্রয়োজনীয়, দৃঢ়হস্তে সেখানে কর্তে হবে সংস্কার, অতীতের মোহ থেকে সেখানে আমাদের মুক্ত হ'তে হ'বে। আজ বিশ্বের জনসাধারণ তাই অতীতের জীর্ণ পরিচ্ছদ ফেলে "এগিয়ে চলার ছন্দে" পা ফেলে ছুটে চলেছে। অতীতের বিধ্বস্ত চিন্তাধারার প্রতি তারা আজ মমতাশূন্য। অতীতের বিনষ্টপ্রায় ভাবধারায় যারা—শৃঙ্খলিত, পথ ছেড়ে তা'দের আজ সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। সবার সঙ্গে পা ফেলে তুমি চল্‌তে না পার, পথ তোমাকে ছেড়ে দিতে হ'বে, অন্যের অগ্রগতিতে বাধা দেবার তোমার সাধ্য নেই। তাই আজ এই নবীনের অভিযান অদম্য। অভিযাত্রীকের দল বল্‌ছে "বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই, থাম্‌লে তো আর চল্‌বে না।" পৃথিবীর সকল দেশ এই 'এগিয়ে চলার ছন্দ' আজ অনুভব কর্চ্ছে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু সবাই পারে না এগিয়ে যেতে। আফগানিস্থানের আমীর



আমানুল্লা চেয়েছিলেন, 'এগিয়ে চলার ছন্দে' জাগিয়ে তুল্‌বেন তাঁর দেশকে। কিন্তু অতীতের অস্বাস্থ্যকর মোহের 'পশ্চাতের টান' সে দেশের জনসাধারণকে করেছিল প্রবলভাবে আকর্ষণ। সে মোহ কাটাতে অসমর্থ হওয়ায়, আমানুল্লাকে ছাড়্‌তে হয়েছিলো তাঁর মস্‌নদ্। কিন্তু তুর্কীর কামাল করেছিলেন সাফল্যলাভ, কারণ দেশের যুবশক্তি ছিল তার সহকারী। বহুদিন পূর্বেই ভারতেরও আহ্বান এসেছে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে চল্‌বার। হে আমার রংমশাল্‌চী বন্ধুদল, মেঘমেদুর আকাশের চিরশাশ্বত বাণী যেন আমাদের এই 'এগিয়ে চলার ছন্দে' উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

---

## কবিতা

### ওগো সহরের ধনীর দুলাল

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ওগো সহরের ধনীর দুলাল পল্লীরে দেখ ফিরে,
তোমারি' মুখের অন্ন কেমনে যোগায় সে বুক চিরে।
তোমার লাগিয়া সে যে মরে খেটে, কেঁদে মরে দিন রাত,
নিষ্ঠুর তবু হেলায় তাহারে করনাকো দৃক্‌পাত।
শূন্য করিয়া আপনার ঝুলি সকলি করিয়া দান,
নিঃস্ব হইয়া বাঁচিছে হেথায় কয়েক জীবের প্রাণ।
এসো ফিরে ওগো, পল্লী মাতার শূন্য বুকেতে আজ,
ভুলে যাও বৃথা মান অভিমান, মিছে ও বিলাস সাজ।
সহরের মায়া ছাড়ি' এসো চলে, পল্লীরে দেখ ফিরে,
শত অজ্ঞান আঁধারে যেথায় হৃদয় রয়েছে ঘিরে।
তোমার অভয় সান্ত্বনা বারি আনুক্ নূতন প্রাণ,
পল্লী মাতার দুঃখ যাতনা হো'ক্ আজি অবসান।
লাঞ্ছনা তা'র দূরে যা'ক্ সব, ঘুচে যা'ক্ ঘৃণা গ্লানি,
তোমার পরশে লইবে সে যে গো জীবন সফল মানি।

## যাদুবিদ্যার কারসাজি

যাদুকর—শ্রীঅশোক সরকার

যে অদ্ভুত খেলাটি আজ তোমাদের বলছি, তার নাম—"বোতল ও বাতির খেলা।"

খেলাটা এই রকম ঃ—যাদুকর প্রথমে এসে ষ্টেজে দাঁড়ালেন, তারপর সকলকে দুটো লম্বা চোং পরীক্ষা করতে দিলেন। এরপর ষ্টেজের দু'দিকের দু'টী ছোট তেপায়ায় একটীর ওপর একটী কালো রংয়ের বোতল এবং অপরটির ওপর একটী জলন্ত বাতি রাখলেন। যাদুকর পরে বেশ একটু বক্তৃতা দিলেন। তারপর সেই চোং দু'টোর ওপরে কাপড় ঢাকা দিয়ে দিলেন এবং ম্যাজিক লাঠিটি দুটোর ওপর ঠেকিয়ে চোং দুটো তুলে ফেললেন,—কি আশ্চর্য্য! যেখানে বাতি ছিল সেখানে এসেছে বোতল আর যেখানে বোতল ছিল সেখানে চলে গেছে সেই জ্বলন্ত বাতি,—এতখানি দূরে থেকেও কেমন করে তা বদলে গেল?

চোং, বাতি ও বোতল

এ খেলা দেখাতে হলে একই রকমের দুটো বোতল আর দুটো বাতি চাই। বোতল দুটোর তলা থাকবে না, যাতে করে বোতল দুটী বাতির ওপর চাপা দিলে বাইরে থেকে বাতি দেখা যাবে না। খেলা দেখাবার সময় একটা ঐ রকম তলা শূন্য বোতল বাতি চাপা দিয়ে রেখে দেখে আর তার পাশেই একটী খালি চোং রেখে দেবে এবং অপর টেবিলে জ্বলন্ত বাতিটী থাকবে এবং বোতলটী চোং চাপা থাকবে। চোং দুটী বোতল দুটীর সমান হওয়া চাই।



এইবার মনে কর তুমি খেলা দেখাচ্চ। প্রথমে তুমি বেশ খানিকটা বক্তৃতা দিয়ে এসে যে বোতলটী চোং চাপা আছে সেটী কায়দা করে চোং শুদ্ধ তুলে বাতির ওপর চাপ দিয়ে দেবে এবং অপর খালি চোংটী সাধারণভাবেই চাপা দেবে। এইবার তোলবার সময় একটু কায়দা করবে। অর্থাৎ প্রথম যেটী বোতল শুদ্ধ চোং ঢাকা দিয়েছিলে, সেটা বোতল রেখে শুধু চোং তুলে নেবে, তাহলে বাইরে থেকে দেখা যাবে যে বাতি নেই তার বদলে শুধু বোতল দেখা যাচ্ছে, আর দ্বিতীয়টীর বেলায় করবে কি, চোংটা একটু চাপ দিয়ে তুলবে তাহলে বোতল শুদ্ধ উঠে আসবে আর সেখানে দেখা যাবে বাতি! সবাই তোমার খেলা দেখে হাঁ করে থাকবে।

এবার তোমাদের যে সুন্দর খেলাটী শিখিয়ে দেব, তোমরা সেটার নাম "The wonderful thought-reading" দিতে পার। শোনো খেলাটা কি রকম হবে। ম্যাজিসিয়ান এসে প্রথমে একটা বক্তৃতা দিলেন এই রকম "দেখুন আজ যে খেলাটী দেখাব সেটী আমি বিলেত থেকে শিখে এসেছি"—প্রভৃতি। তারপর সেই ম্যাজিসিয়ানের সহচর তার চোখটী ভাল করে বাঁধা হল, পরে তাকে ষ্টেজের এক কোণে একটী চেয়ারে বসান হল।

ম্যাজিসিয়ান দর্শকদের মাঝে উঠে এসে একজনের কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিলেন, তারপর সেটা নিয়ে তিনি আরও দুজন লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার ম্যাজিসিয়ান তার চোখবাঁধা সহচরকে বললেন, "এবার তুমি টাকাটার সালটা বলে দাও তো হে।"

সকলে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে সত্যি সেই টাকার সঠিক সালটী ম্যাজিসিয়ানের সহচর কেমন বলে দিলে। সকলে দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সকলেই হাততালি দিল। বল্‌তে পার, কেমন করে সেই সহচরটী ঠিক সালটী বলে ফেল্‌লো?—নীচের কৌশলটা বেশ ভাল করে পড়লে তোমরাও দেখাতে পারবে, তবে একটু অভ্যাস করতে হবে।

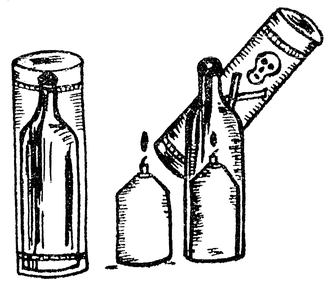

চোংএর ভেতর বোতল, বোতলের ভিতর বাতি

মনে কর একটা টাকা যাদুকর একজন ভদ্রলোক এর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন, টাকাটীর সাল হচ্চে "১৮৯৬"। এখন চোখ বাঁধা অবস্থায় সে কি করে সালটা বলতে পারে? বলার একমাত্র উপায় হচ্চে যাদুকর যদি কোন সংকেত করে তাকে জানাতে পারেন, তাহলেই সে বলে দিতে পারে। এখন তোমাদের কাছে সেই সংকেতটাই বলে দেব। যে টাকাটা

ভদ্রলোকের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল সেটার সাল হচ্চে,—১৮৯৬। এখন ১ থেকে ০ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যার একটা করে সাংকেতিক শব্দ থাকবে, সেই কথাটী উচ্চারণ করলেই যাতে অপর শেখান লোকটী চট্ করে বুঝে নিতে পারে। তোমাদের সংকেতগুলো বলছি শোনো :—

**সংকেত**

| | |
|---|---|
| ১। বল ; | ২। বলে যাও ; |
| ৩। বলে ফেল ; | ৪। কি হল ; |
| ৫। থামলে কেন ? | ৬। চলুক ; |
| ৭। চট্ করে ; | ৮। ভয় কি বল ? |
| ৯। ঠিক হচ্চে ; | ১০। খুব সোজা। |

এই হ'ল গিয়ে প্রত্যেক সংখ্যার সংকেত। এখন সেই টাকাটীর সাল ১৮৯৬ হ'লে, যাদুকর দূর থেকেই বলে যাবে, যেমন ধর যাদুকর ১৮৯৬ শর ১ অর্থাৎ প্রথম সংকেত বলবে, "বল"—তাহলেই তোমার অনুচর বুঝবে তুমি তাকে ১ বলতে বলছ। সে তাই বলবে। তারপর তুমি জান যে ৮ থাকলে বলতে হয়, "ভয় কি বল ?" সে বলবে ৮। এরপর তুমি বলবে "ঠিক হচ্চে" অর্থাৎ ৯, তারপর তুমি বলবে "চলুক" সে বুঝবে "৬"। এমনি করে সে ধীরে ধীরে বলবে ১৮৯৬, তাহলে সমস্ত মিলে যাবে। আর সবাই হাঁ করে থাকবে তাকিয়ে আর সাথে সাথে হাততালি দেবে।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে ১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাকটার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

# ছুটির ঘন্টা

## খেলার মাঠে

কে ভট্টাচার্য্য

এবারে আমি সংক্ষেপে কলকাতার খেলার মাঠের ফুটবলের খবর দিয়ে আরম্ভ করছি। এরপর এই ফুটবল খেলা সম্পর্কে কতকগুলি আবশ্যকীয় জিনিষ ও আমাদের খেলোয়াড়দের ভারতের বাইরে গিয়ে খেলার কথা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

এ বৎসরের ফুটবল খেলায় জনসাধারণের উৎসাহ যেন অনেক কম। খেলার মাঠে গেলে শূন্য বেঞ্চিগুলোই আগে চোখে পড়ে। ভাল ভাল খেলায় লোক সমাগম সত্যই অনেক কমে গিয়েছে। যুদ্ধের বিভীষিকা যেন সকলকেই নিরুৎসাহ করে দিয়েছে। একবার শোনা গিয়েছিলো, যুদ্ধের জন্য এ বৎসর ফুটবল খেলা হবে না। তা হলে সত্যই খুব অবিবেচকের মত কাজ করা হ'ত। প্রাণে বেঁচে থাকতে হ'লে যেমন রোজ নিয়মমত খাওয়ার দরকার হয়, সেই রকম জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম অভ্যাসও বেঁচে থাকার আর একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। তাই আজ এই ভীষণ বিপদের সময়ও কাগজে আমরা এখনও পড়ি ইংলণ্ডে ফুটবল টেনিস ইত্যাদি খেলার কথা। সেখানকার সুবিখ্যাত ফুটবল দলেরা সুবিধা হ'লেই প্রতিযোগিতার খেলায় খেলছে। দলে দলে লোকও যাচ্ছে সেই সব খেলা দেখতে এবং অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও এই নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করতে। যাঁরা নিজেরা খেলেন তাঁরা খেলে আমোদ পান আর যাঁরা খেলতে অসমর্থ তাঁরা তাই দেখে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করে থাকেন। তাই যাঁদের চেষ্টায় এ বৎসরও আমরা এই আমোদ থেকে বঞ্চিত হইনি তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ বৎসরের লীগ খেলার দলের মধ্যে মহামেডন স্পোর্টিং ও ইষ্টবেঙ্গল এই দুটি দলই সব থেকে ভাল খেলছে। মহামেডন স্পোর্টিং তাদের প্রায় সমস্ত পুরাণো খেলোয়াড়দের জোগাড় করতে সক্ষম হওয়ায় বেশ ভালই খেলছে। এঁদের সুবিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড রসিদকে খেলার মাঠে বেশী দেখা যায় নি। বড় নুরমহম্মদ, পা ভেঙ্গে যাওয়ায় দুবৎসর খেলতে পারেনি। এ বৎসর আবার পুরানো উৎসাহে খেলতে আরম্ভ করেছেন। নুরমহম্মদকে দলে ফিরে পাওয়ায় মহামেডান স্পোর্টিং-এর সেণ্টার-হাফের ভাবনা আর রইল না। তাজ মহম্মদ, নুরমহম্মদ (ছোট), মাসুম, বাচ্চি খাঁ, এঁরাও ভাল খেলছেন। প্রায় একই দল নিয়ে

ছয় সাত বৎসর লীগ চাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এই দলকে বাহাদুরি না দিয়ে থাকা যায় না। এ বৎসরেও চাম্পিয়ন হওয়ার আশা এঁদেরই সব চেয়ে বেশা।

ইষ্টবেঙ্গল দল থেকে যদিও দুজন ভাল খেলোয়াড়—অজিত নন্দী ও কে দত্ত ভবানীপুর দলে চলে গিয়েছেন, তাহলেও তাঁরাও বেশ ভাল খেলছেন। ইষ্টবেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইন বোধহয় এ বৎসরের সেরা বলে মনে হয়। এখানে সুনীল ঘোষ ও সোমানা দুজনেই ভাল খেলছেন। হাফব্যাকেরা একটু দুর্ব্বল। তবে ব্যাকে পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, পি দাসগুপ্ত ও রাখাল মজুমদার আছেন। এঁরা তিনজনেই ভাল খেলোয়াড় বলে সুপরিচিত। এঁদের বিপদ হল গোল রক্ষক নিয়ে। কে দত্ত চলে যাওয়ার পর ভাল গোল রক্ষক এখনও জোগাড় হয় নি। মোহনবাগানের দ্বিতীয় দলের ভূতপূর্ব্ব গোলরক্ষক এন মিত্তির কাজ চালাচ্ছেন।

মোহনবাগান দলে অনেক নূতন খেলোয়াড়ের আমদানী হয়েছে। কিন্তু কোনটি সব থেকে কার্য্যকরী দল হবে সেটা তাঁরা এখনও ভেবে উঠতে পারেন নি। এ বৎসর এ দলের খেলা আরম্ভ হয়েছিল বেশ উৎসাহের সঙ্গে। পর পর কয়েকটি খেলায় জিতের পরে বি, এণ্ড্ এ রেলওয়ের কাছে শোচনীয়ভাবে তিন গোলে হেরে যাওয়ায় সমর্থকদের দল অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। ব্যাকে শরৎ দাস ও এ গর্গরী ভাল খেলছেন। সেণ্টার হাফ ভাল না জোগাড় হওয়ায় সমস্ত হাফব্যাক লাইনের খেলায় গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে। ফরওয়ার্ডদের খেলায় তেমন বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। এখানে একমাত্র অমিয় ভট্টাচার্য্য ও এন বসুর খেলা আশানুরূপ হচ্ছে বলে মনে হয়। তরুণ খেলোয়াড় এন বসুর খেলায় উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

ভবানীপুর দলে কয়েকজন সুপরিচিত খেলোয়াড় এ বৎসর খেল্‌ছেন। এঁরা হ'লেন কে দত্ত, অজিত নন্দী ও কাইজার। এ ছাড়া আর সব তরুণ খেলোয়াড়রা খেলছেন। এঁদের খেলা বেশ কার্য্যকরী হচ্ছে। এ পর্য্যন্ত অনেক খেলা জিতেছেন এঁরা। আশা করা যাচ্ছে এ বৎসর লীগে বেশ উপরেই স্থান হবে এঁদের।

এরিয়ান্সের খেলার কথা নূতন করে বলার কিছু নেই। এই দলে খ্যাতনামা খেলোয়াড় বিশেষ কেউ না থাকলেও সময়ে সময়ে এত ভাল খেলার ক্ষমতা এঁদের আছে যে যার জন্য অন্য সব দলই এঁদের কাছে যে কোনও সময়ে হেরে যাবার ভয় রাখেন। এ ব্যাপারটা যে কতখানি সত্য তা বেশ ভাল ভাবেই সকলে বুঝতে পেরেছে যখন গত ১৯৪০ সালের আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালে এঁরা মোহনবাগানকে অপ্রত্যাশিতভাবে ৪ গোলে পরাজিত করে দিয়েছিলেন। সুপরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় খেলাড় দুঃখীরামবাবু এই দলের আর একটি খ্যাতিও প্রচার করে গিয়েছেন। সেটা হচ্ছে যে আজ পর্য্যন্ত এই দলে খেলায় শিক্ষা পেয়ে যত ভাল খেলোয়াড় তৈয়ারী হয়েছে, এরকম আর কোনও ক্লাব থেকে হতে দেখা যায় নি।



স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলটি সম্পূর্ণভাবে তরুণ খেলোয়াড় দিয়ে তৈয়ারী। কালিঘাট দলটিও প্রায় তাই। তরুণ খেলোয়াড় নিয়েও যে খেলায় জেতা যায় তা এঁরা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দেন। আর সত্যিই ঐ সব খেলোয়াড় নিয়ে জিৎতে দেখলে সকলেরই আনন্দিত হবার কথা। অন্যান্য দলগুলি যথা—ক্যালকাটা, ডালহাউসি, রেঞ্জার্স, কাষ্টমস, বি এণ্ড এ রেলওয়ে এবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। এঁরা যুদ্ধের জন্য কেউই ভাল করে দল গঠন করতে পারেননি। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এঁরা যে এ বৎসর লীগ খেলায় যোগ দিয়েছেন এইটাই এঁদের পক্ষে মস্ত বড় কৃতিত্ব। কোনও মিলিটারী দল এ বৎসর খেলতে পারেনি। এঁরাও না যোগ দিলে খেলার উৎসাহ আরও অনেক কমে যেত।

এ বৎসরের আর দু' একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলে আমি এবারকার মত বিদায় নেব। গত কয়েক বৎসর থেকে দেখে আসছি যে আমাদের ভারতীয় দলগুলি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের খেলোয়াড়ে ভর্ত্তি থাকত। এবং যখনই এই সব দল থেকে একটি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলার দল বাছাই করা হত—তাতে অর্দ্ধেকের উপর বাঙ্গলার বাইরের খেলোয়াড় থাকত। দু'এক বৎসর থেকে—দেখা যাচ্ছে যে মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়া আর সব ভারতীয় দলগুলিতে বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের সংখ্যাই এখন অনেক বেশী। এটা বাঙ্গলার ফুটবলের পক্ষে একটা মস্তবড় আশার কথা বলে মনে করি। বাঙ্গলা ভারতীয় ফুটবলের জন্মদাতা বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। ভারতের মধ্যে আমাদের প্রদেশেই এই খেলার সব চেয়ে বেশী আদর। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী এই খেলায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এসেছে এবং গত বৎসর আন্তর্প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্যান্য দলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে বাঙ্গলা সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছে। এখন সেই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হলে দরকার বাঙ্গালীর ছেলেদের আরও ভাল করে খেলা শিক্ষা করা। বাইরে থেকে ভাল খেলোয়াড় নিয়ে আসার আগে সকলেরই দেখা দরকার আমাদের তরুণ খেলোয়াড়দের ঠিক মত শিক্ষা এবং উৎসাহ দিয়ে ভাল খেলোয়াড় করা যায় কিনা। তাই যখন দেখছি যে আজ প্রায় সব ভারতীয় দলগুলিতেই অনেক বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা খেলছেন তখন বাঙ্গলার ফুটবলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে আনন্দ হচ্ছে।

এ বৎসরের ফুটবল মাঠের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে রেফারীদের উপর দর্শকদের আক্রোশটা যেন একটু কম। গত কয়েক বৎসর থেকে দেখা যাচ্ছিল যে প্রায় প্রত্যেক খেলাতেই রেফারীরা কোনও না কোনও কিছুর জন্য দোষী সাব্যস্ত হতই এবং খেলা

শেষ হওয়ার পর মাঠের বাইরে যাওয়া পুলিশের সাহায্য ব্যতিকে সম্ভব হত না। কখনও যে তাঁদের ভুল হয় না সে কথা আমি বলছি না, তবে বেশী সময়েই দেখা যায় যে দর্শকদের চিৎকারে এবং গালাগালিতে ঘাবড়ে গিয়ে তাঁরা এক একটা মারাত্মক ভুল করে বসেন। ভুল একবার করতে আরম্ভ করলে ক্রমশঃই ভুলের সংখ্যা বেড়েই চলে। তখন হয় যত গোলযোগের সৃষ্টি। রেফারীদের ভুলে খেলোয়াড়দের মেজাজও যায় খারাপ হয়ে। খেলায় মারামারি সুরু হয়। এদিকে গ্যালারিতে দুই বিভিন্ন দলের সমর্থকদের মধ্যে রেষারেষি ঝগড়ায় পরিণত হয়। খেলাটা তখন আর ঠিক খেলা থাকে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, দর্শকেরা যদি একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে থাকেন এবং আইনটা নিজের হাতে না নিয়ে রেফারীর হাতেই ছেড়ে দেন, তাহলে এই সব অনর্থক গোলমালের সৃষ্টি আর হয় না। সমর্থকদের এইটুকু মনে রাখা উচিৎ যে এই রকম করে তাঁরা নিজেদের দলের কোনও উপকার করতে পারবেন না। উল্টা ফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী হবে। তার চেয়ে বরং রেফারীরা যদি বুঝতে পারেন যে দর্শকদের সহানুভূতি তাঁদের উপর আছে, তাহলে তাঁরাও ভাববেন, যেন সে সহানুভূতি তাঁরা কিছুতেই না হারান্ এবং এই কথা মনে হলেই তাঁরা তাঁদের ত্রুটি সংশোধনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকবেন। রেফারীদের প্রতি কম গালাগালিটা তাই এ বৎসরের খেলাব মাঠের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে জানাচ্ছি। সকলে এই কথাগুলি মনে রাখ্‌লে তাঁরা খেলার উন্নতি সাধনেই সাহায্য করবেন।

# অরূপ কথা

( পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা )

শ্রীহরিভূষণ মৈত্র

সোনালী রংয়ের আলো ছড়িয়ে সূর্য্যি মামা ধীরে ধীরে পুবের আকাশে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানি হাসি হাসি, পৃথিবীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন খোঁজ করলেন, কিন্তু যার খোঁজ করলেন তার দেখা মিললো না।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন কেটে যায় কিন্তু রোজই সূর্য্যি মামাকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়, দেখা আর মেলেনা।

রোজই ভাবেন, তাইতো এমন কেন হলো, সব গেল কোথায়! নিশ্চয় কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। মনটা ভারী খারাপ হয়ে যায়।

একদিন আর স্থির থাকতে না পেরে পৃথিবীতে নেমে এলেন। মাঠের মাঝে দুটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে দেখা। তাদের কাছে ডেকে বললেন, তোমাদের নাম কি বাছা?

ছেলেটি বললো, আমার নাম জলি।

মেয়েটি বললো,—আমার নাম লিলি।

সূর্য্যি মামা অবাক হয়ে বললেন, জলি, লিলি! এ আবার নাম নাকি? এর আগে তো এ রকম নাম শুনিনি!

জলি আর লিলির ভারী রাগ হলো। বললো, জানবে কি করে? পাড়াগাঁয়ে থাকো, লেখাপড়াও শেখনি। ইংরিজী জানতে তো বুঝতে পার্ত্তে।

তাই শুনে—সূর্য্যি মামা বললেন, রাগ করোনা ভাই। আজ কাল যে নূতন নিয়ম হয়েছে তা কি করে জানবো। আমি যে অনেক দিন কোন খবরই পাইনা।

জলি লিলি বললো - তাই বলো তুমি বুঝি সেই বিচ্ছিরি কালের লোক!

সূর্য্যি মামা বললেন—হাঁ, ভাই, আমি বহু কালের লোক। তোমরা আমাকে বুঝি চিনতে পারছোনা?

তারা বললো, কৈ না! তোমার সঙ্গে চেনা আছে বলেতো মনে হচ্ছে না।

সূর্য্যি মামা অবাক হয়ে বললেন, সেকি, আমি যে তোমাদের সূর্য্যি মামা!

জলি আর লিলি ভাবে, এঁ্যা লোকটা বলে কি! এই লোকটা নাকি আমাদের মামা! তারপর জিজ্ঞেসা করে, কৈ তুমি তো একদিনও আমাদের বাড়ী যাওনি।

সূর্য্যি মামা বললেন, সে কি! আমি তো রোজই তোমাদের বাড়ী যাই, তোমরাই তো আমার সঙ্গে ভাব করোনা। সেটা কি আমার দোষ?

জলিরা বললো, তুমিতো ভারী মিথ্যুক, তোমাকে তো আগে কোন দিনই দেখিনি!

সূর্য্যি মামা বললেন, বারে! আমি তো রোজই সকাল হতে সন্ধ্যে অবধি তোমাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াই আর আমাকে বলছো মিথ্যুক! বেশ মজার ছেলে-মেয়ে তো আচ্ছা তোমরা কি তোমাদের দিদিমা, এই আমার মার কথাও ভুলে গেছ নাকি?

তারা বললো, বারে! তোমরা দিদিমার কথা ভুলে যাব কেন! দিদিমা আমাদের কত ভালবাসে; কৈ দিদিমাদের বাড়ীতে তো তোমাকে একদিনও দেখিনি?

সূর্য্যি মামা হতাশ হয়ে বল্লেন, আঃ...তোমরা বুঝতে পার্চ্ছনা। তোমাদের যে আর এক দিদিমা আছেন।

জলিদের মনে একটু সন্দেহ হলো, ভাবলো লোকটা কি চোর নাকি? না আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবে। তাদের ভারী ভয় হলো, বললো—দেখ তোমার যদি ইচ্ছে হয় আমাদের বাড়ীতে এসো। তা না হলে মিছিমিছি ওসব কথা বলোনা। মা বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে মানা করেছেন। এই বলে তারা সেখান থেকে চলে গেল।

সূর্য্যি মামার মনে ভারী আঘাত লাগলো। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, একি এরা আমাকে কেউ চিন্তে চাইলোনা কেন?

এমন সময় একটি আঠার-উনিশ বছরের ছেলে হন্ হন্ করে এগিয়ে এসে সূর্য্যি মামাকে ধমকে দিয়ে বললে, তুমি তো ভারী বদ লোক হে, ছোট ছেলেমেয়েদের ওরকম ভাবে ভয় দেখাবার মানেটা কি?

সূর্যি মামা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমি ওদের ভয় দেখিয়েছি কে বললো? আমি জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলাম ওরা আমায় চিন্তে পারে কিনা। আচ্ছা, তুমি আমায় চিন্তে পারছোনা? আমি যে তোমাদের সূর্য্যি মামা।

সূর্য্যি মামা! বাঃ বেশ ফন্দী বার করেছ তো দেখছি। সত্যি করে বলতো বাপু, তুমি পাগল না জোচ্চোর? এই কথা বলে ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে সূর্য্যি মামাকে দেখতে লাগলো।

সূর্য্যি মামা ছেলেটির একখানি হাত ধরে খুব করুণ ভাবে বল্লেন—তোমরা কি



সবই ভুলে গিয়েছ ভাই, সেই যে কোন দিন আমার আসতে দেরী হলে তোমরা আমার মার নামে ছড়া কেটে আমাকে রাগাতে, সেই যে,

সূর্যির মা বুড়ী, কাঠ কুড়ুতে গেলি
ছ'খান কাপড় পেলি, ছ' বৌকে দিলি......

ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—তুমি বুঝি আমাদের সে কালের ছেলে পেয়েছ, না? একটা যা তা আজগুবি বিশ্বাস কর্বো ভেবেছ? জানো এখন আমরা বিজ্ঞানের বই প'ড়ে সব জানতে পেরেছি। সূর্য্যি যে একটা প্রকাণ্ড আগুনের পিণ্ড আর সে যে কারুর মামা নয়, তা এ যুগের ছোট্ট ছেলেরাও জানে।

সূর্য্যি মামা চমকে উঠলেন। বললেন তুমি এ কি বলছো, না, না, জ্বলন্ত পিণ্ড না, আমি তোমাদের সেই সূর্য্যি মামাই আছি।

ছেলেটি মুখ বিকৃত করে বললে, দেখ ওসব ভাব প্রবণতার দিন আর নেই, বললাম্ না আমরা বিজ্ঞানের এখন বই পড়ি।

সূর্য্যি মামা ভয়ে জড় সড় হয়ে বল্লেন,—এ সব তুমি কি বলছো ভাই আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। তা হলে তোমরা আর আমার সঙ্গে ভাব কর্ব্বে না?

ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বললেন,—তুমি তো ভারী ইয়ে অসভ্য লোক, জেনে শুনেও তোমার ভণ্ডামী যাচ্ছে না। দাঁড়াও, পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তোমার বজ্জাতি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।—এই বলে সে বড় বড় পা ফেলে পথের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য্যি মামা খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে পাশের কামিনী গাছটার তলায় বসে পড়লেন। চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, অজান্তে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

কামিনী গাছটা সূর্য্যি মামাকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ওকি, সূর্য্যি মামা তুমি কাঁদছ যে?

সূর্য্যি মামা একটু সামলে নিয়ে জবাব দিলেন, তুমি তো জানো না ভাই, আমার কি কষ্টে দিন কাটছে, ওদের ছেড়ে আমি থাকবো কি করে? ওরা যে আমার খেলার সাথী।

কামিনী গাছটা মাথা নেড়ে হো হো করে হেসে উঠে বললো, কার সঙ্গে খেলা কর্ব্বে গো? দেখতে পার্চ্ছনা, উঠোনের নটে গাছকে উপড়ে ফেলে বিলিতি ফুলের মেলা বসিয়েছে।

---

—একুশ—

## রেঙ্গুনী জাহাজের দরদস্তুর

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

জাহাজের কর্ম্মচারী আংটিটা অঙ্গুলিগত করে' বল্লেন, "তোমাদের কিন্তু তলাকার ডেকে থাকতে হবে। তোমাদের টিকিট্ নেই কিনা!"

"খুব রাজি।" ঘাড় নেড়ে জানাল শিশির।

জাহাজের ওপরের ডেকে যত ডেক্ প্যাসেঞ্জার—সাধারণ যাত্রী যত। তার থেকে একটা থাক্ আলাদা-করা—বেশী ভাড়ার যাত্রীদের জন্যে;—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনের সারি। আর নীচের ডেকটায় যত মালপত্র বোঝাই।

সেই মালঞ্চের অন্তরালে—মালের সামাল হ'য়ে এক কোণে, শিশির ও লিলির জায়গা করে' দেয়া হোলো।

"এইখেনে তোমরা লুকিয়ে থাক্‌বে, বুঝলে? সাবধান, ওপরের ডেকে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরো না যেন।" কর্ম্মচারিটী বিশেষ করে' ওদের বলে' দিলেন। গতিবিধির ত্রুটি বিচ্যুতিতে যদি ইতরবিশেষ ঘটে, যদি ওরা ধরা পড়ে যায়, তখন আর উনি ঝুঁকি নিতে পারবেন না, সেকথাও বাৎলে দিতে কসুর করলেন না।

"না না। উঁকি ঝুঁকি মারব কেন?" বল্ল লিলি: "ও সব খারাপ কাজে আমরা নেই।"

অলঙ্কৃত আঙ্গুলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কর্ম্মচারি বল্ল: "এতো গেলো তোমাদের রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যাবার ভাড়া। তারপর রেঙ্গুন থেকে অ্যাকীয়াব্—আচ্ছা সে তখন রেঙ্গুনে গিয়ে দিলেই হবে।"

এই বলে' লোকটি লিলির কানের দিকে প্রলুব্ধ চোখে তাকায়।

"আমার দুল্‌তো আছেই। তাই দেব।" পরবর্ত্তী ভাড়ার ভার লিলি নিজের স্বকর্ণে অর্পণ করে।

"হাঁ, তোমার দুল্‌তো রয়েছেই! আমি সেই কথাই বল্‌ছিলাম।" কর্ম্মচারিটির খুসি-খুসি মুখ হাসি হাসি হয়ে ওঠে: "তোমাদের মত ভালো ছেলেমেয়ের কাছে আবার ভাড়ার জন্য ভাবনা!"

"কেন, দুল্ কেন? আমার ফাউন্টেন্ পেন্ নেই?" শিশির নিজের ফাউন্টেন্ পেন দেখায়।

ফাউন্টেন্ পেনটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে লোকটি বলে: "উঁহু, এই কলমে রেঙ্গুন থেকে অ্যাকীয়াব্ পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া পোষাবে না। এ কী কলম? এতো পার্কার নয়। শেফারও নয় তো! এতো দেখ্‌ছি আড়াই টাকা দামের জাপানী পাইলট্ পেন্। পার্কার ডু ফোল্ড্ হলেও না হয় দেখা যেত চেষ্টা করে'।"



"আমার হাতঘড়ির বদলে হয় না?" শিশির নিকেলের রিস্ট্ ওয়াচটা স্বহস্তে তুলে ধরে। হাত ঘুরিয়ে উঁচু করে' ঘড়িটা দেখায়।

"হাঁ, ওটা পেলে হয়ত তোমাদের অ্যাকীয়াব্ পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তাহলে তোমাদের আরও নীচে যেতে হবে। এর তলায় এঞ্জিন-ঘরের পাশে কয়লার ভাঁড়ারে থাক্‌তে হবে তাহলে। তোমাদের তাতে একটু কষ্ট হতে পারে হয়ত। অবশ্যি এখান থেকে না, রেঙ্গুন থেকেই বল্‌ছি।"

"বারে! তা কেন, আমার দুল্ আছে তো!" লিলি আবার দুলে ওঠে।

"থাক্‌লই বা! দুল নিয়ে অত টানাটানি কিসের?" শিশির লিলির দাতাকর্ণতায় বাধা দেয়: "আচ্ছা, যদি আমার ঝরণাকলম আর হাতঘড়ি দুটোই দিই—আর—আর যদি—। না, তা হয় না।"

"হাঁ, তাহলে হয়।" কর্ম্মচারিটী জানায়।

"লিলি ওপরে এই ডেকে আর আমি যদি নীচে কয়লার ঘরে যাই—?"

"না না না!" লিলি চীৎকার করে' ওঠে।

"তাইতো বল্‌ছিলাম, তা হয় না। লিলি আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না। আমি পারি, হাঁ, আমি খুব পারি। কিন্তু আমি একলা থাক্‌তে পারলেও ওর মন কেমন করবে যে! আমি চাই না যে ও আমাকে ছাড়া কখনো থাকে। তাহলে?"

"তাহলে তোমরা দুজনেই এক সাথে থেকো। তাতে আমার আপত্তি নেই। রিস্ট্‌ওয়াচ্ আর ফাউন্টেন্ পেন্ দুটো পেলে আমি তোমাদের দুজনকেই একসঙ্গে অ্যাকীয়াব্ পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারব! কিন্তু তারপরে?"

"তারপরে? তারপরে তো আমার আর কিছু নেই।" শিশির বিষণ্ণ গলায় বলে।

"কিন্তু তারপরেও, অ্যাকীয়াব্ থেকে চট্টগ্রাম রয়েছে।"

"আর আমার দুল জোড়া রয়েছে কি জন্যে? লিলি গরম হয়ে ওঠে। "শুনি একবার?"

"লিলি? ওগুলো মার দেয়া—তোমার জন্মদিনের উপহার। মনে আছে?"

"মার কাছ থেকে কি আর আমি পাবো না? আমার কতো জন্মদিন আস্‌বে।"

"ছিঃ, অমন কথা মুখেও আনিস্‌নে।"

"মানে? আমার জন্মদিন আর আস্‌বে না, তুমি বল্‌তে চাও?"

"না না, ঐ দুল্ দেবার কথা। আর যেন ও মুখে না শুনি।"

"তাহলে—অ্যাকীয়াব্ থেকে চট্টগ্রাম—তার কী হবে?" লোকটা মনে করিয়ে দেয়। (মেমসি আর ভারী ভালো।)

"দেখুন, আমার জুতো। খুব দামী জুতো। বাবার কিনে দেয়া। আর আমার সার্টটাও কেমন চমৎকার দেখুন। খুব দামী সিল্ক। এগুলো দিলে হয় না?"

"ওগুলো?" লোকটা ভুরু কুঁচ্‌কে নাক সিঁট্‌কে তাকায়: "তা হলেও হতে পারে। খুব কষ্ট স্বীকারই হবে। আমার সেজ ছেলেটা মাথায় অনেকটা তোমার সমান। সে পরতে পারবে। হাফ্‌প্যাণ্ট্‌টাও দেবে তো? ওটাও তোমার নেহাৎ মন্দ না।"

"নাঃ, হাফ্‌প্যাণ্ট্ দেখা যায় না।" শিশির সলজ্জ দৃঢ়তার সহিত বলে।

"আমি তোমাকে একটা গামছা দেব না হয়।"

"তাহলে হয়ত হতে পারে।" শিশির প্রস্তাবটা পুনর্ব্বিবেচেনা করে' দ্যাখে: "বেশ পরিষ্কার গামছা?"

"পরিষ্কার বই কি!" লোকটা তার প্রলোভনের সামগ্রীর চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত করে: "একটু আধময়লা এই যা! সারেংদের গা-মোছা কিনা! তা বলে' কয়লাঝাড়া ঝাড়ন্ নয় কিন্তু।"

ততটা নিন্দনীয় নয় জেনেও শিশির চুপ্ করে' থাকে—গামছার বাঞ্ছনীয়তাটাই চিন্তা করে বোধ হয়।

লিলি কিন্তু চুপ্ করে' থাকতে পারে না: "দাদার প্যাণ্টের বদলে আমার জুতো দিলে হয় না? ওই পচা প্যাণ্টের চেয়ে এটার দাম অনেক বেশী। আপনার ছোট মেয়ে পরতে পারবে।"

লোকটি লিলির সৌখান জুতোর দিকে কটাক্ষ করে। পাছে লোকটা 'না' বলে' বসে কিম্বা দাদার দিক থেকে বাধা এসে পড়ে লিলি তাই তক্ষুনি তক্ষুনি জুতো জোড়া খুলে ফ্যালে—সেই দণ্ডেই ওদের পদচ্যুত করে' দ্যায়।

জুতো জোড়া হস্তগত করে' লোকটা ভ্রূক্ষেপ করে: "বাঃ, বেশ বাহারী জুতো তো! মেয়ে কেন আমার বৌই পায় দেবে'খন! আমার বর্ম্মী বৌ—তার খুদে খুদে পা!"

"তাহলে আর তাকে পায় কে!" লিলি হেসে ফ্যালে। এই জুতো পায় দেখবেন কেমন খুর খুর করে' চল্‌বে।"

"হ্যাঁ, তাহলে তুমিও তোমারও রিস্ট্‌ওয়াচ্ ফাউণ্টেন পেন্—জুতো জামা সব দিয়ে দাও। নিয়ে রাখি এখুনি।"

"এখুনি? এখুনি কেন? এখনো তো আমরা রেঙ্গুনেই পৌছয়নি। রেঙ্গুন থেকে অ্যাকীয়াব্। অ্যাকীয়াব্ থেকে চট্টগ্রাম—তখন তো! তখনই দেব।" শিশির বলে।

"তা কি হয়? টিকিট্ লোকে গোড়াতেই কাটে। তা ছাড়া তোমরা ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষরা ভারী ছট্‌ফটে। তোমরা ঠিক ওপর-নীচ করবে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। এধারে ওধারে উঁকি ঝুঁকিও মারবে, আমি জানি। আর ধরাও পড়ে যাবে সেটাও ঠিক।"

"বাঃ, তা কেন করব? ধরা পড়তে যাব কেন? তাতে তো আমাদেরই সর্ব্বনাশ।"

"আর আমারই বা কী পৌষমাসটা শুনি? তোমার ধরা পড়ো তাতে ক্ষতি নেই—তোমরা গোল্লায় যাও না! কিন্তু ওই জিনিসগুলো সেই সঙ্গে ধরা পড়লে সমস্তই তো গেল! তাতে আমার লাভ? আর কি তখন ওগুলো আর আমার হাতে আস্‌বে? আমার ক্ষতিপূরণ কে দেবে, কে, শুনি?"

অগত্যা শিশিরকে তখনই জামা জুতো হাত ঘড়ি আর ঝর্না-কলমা হাত ছাড়া করতে হয়। শিশিরের গায়ে থাকে কেবল সেই হাফ্ প্যাণ্ট্ আর একটা সামার্‌কুল্। জালি-দেয়া গেঞ্জীটার ওপরেও তার নজর পড়েছিল, কিন্তু একটু পরীক্ষা করেই সে ওটাকে বরখাস্ত করে দিল—"নাঃ, অনেক কালের গেঞ্জী! তা নইলে এতো ফুটো ফুটো কেন? গেঞ্জিটার আগাপাশতলা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে—হাড় পাঁজরায় ঝাঁঝরা—

অপদার্থটিকে বাদ দিয়ে বাকী পদার্থগুলিকে কুক্ষিগত করে' লোকটি সহাস্য হয়ে উঠ্‌ল—

"বেশ বেশ! তোমরা চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পৌছুলে। আমাদের জাহাজ কিন্তু কলকাতায় যাবে। তোমরাও তো কলকাতাতেই নাম্‌বে। তাই না? তাহলে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার ভাড়া?"

সর্ব্বস্বান্ত শিশিরের ওপর দ্রুত বিচরণ করে' লোকটার লোলুপ চাহনি লিলির কানের গোড়ায়



গিয়ে আট্‌কে যায়। লিলি দুলের সঙ্গে দোল খেতে-থাকে। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা আরো দূর—তার মনে আরো দুরাশা।

"আমার দুল্!" লিলি আবার দোদুল্যমান!

"তুই থাম্। তোকে কর্ত্তাত্তি করতে হবে না। তাহলে মশাই, চট্টগ্রামেই আমাদের নামিয়ে দেবেন।

"চট্টগ্রামেই তোমরা নেমে যাবে?" লোকটা অবাক্ হয়।

"হ্যাঁ, সেখানেই নামিয়ে দেবেন দয়া করে'। সেখান থেকে পায় হেঁটে আমরা বাড়ী যাব।"

"পায় হেঁটে? চাটগাঁ থেকে আসাম?" লিলি আকাশ থেকে পড়ে—পড়বার সাথে সাথেই তার পা ব্যথা করতে থাকে। বার্ম্মার এত দৌড়-ঝাঁপের পর আবার আরেক প্রস্থ হাঁটাহাঁটি—চট্টগ্রাম থেকে তাদের অট্টালিকা কদ্দূর কে জানে!—ব্যাপারটা তার একেবারেই ভালো লাগে না।

"পারবি না? এমন কী দূর?" শিশির ওকে উৎসাহ দ্যায়: "আমাদের মামা যদি আসাম থেকে পদব্রজে বার্ম্মা যেতে পারে তাহলে আমরা কি চটগ্রাম থেকে হাঁটন্ দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে পারব না? খুব পারব। এক হাঁটায় মেরে দেব—দেখে নিস্।"

"হাঁটতে হবে না।" লিলি বলে: "সেখান থেকে রেলগাড়ী করেই আমরা বাড়ী ফিরতে পারব। চাটগাঁয় আমার এক পেন্‌ফ্রেণ্ড আছে। সে নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবে।"

"চাটগাঁয় আবার বন্ধু তুই কোথ্‌থেকে বাগালি?" শিশিরের তাজ্জব লাগে।

"রংমশাল-দলের ভেতর দিয়ে।··· পেন্‌ফ্রেণ্ড্ বল্‌ছিনে?" লিলি বলে।

"পেন্‌ফ্রেণ্ড্‌রা কিছু না! বলে প্লেজার-ফ্রেণ্ড্‌রাই কোনো কাজে লাগে না তো পেন্ ফ্রেণ্ড্! 'সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়। অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়॥' তোর অভাবের সময়ে কোনো বন্ধুই নেই—বইয়ে পড়িস্ নি?"

"আমার বন্ধু সেরকম নয়।" লিলি নিজের বন্ধুর গুমোরে গুম্‌রে ওঠে।

"বই ধার চাইলেই বন্ধুত্ব চলে যায়! বই ধার দিলেও যায়—কিন্তু সেই সঙ্গে বইও যায়। আমারও পেন্‌ফ্রেণ্ড্ ছিল রে! আমি তাকে দু একটা ভাবের কথা লিখেছিলাম, তাইতেই সে চিঠি লেখা ছেড়ে দিলে! অভাবের কথা কিছু লিখিনি, কী ভাবলে কে জানে—হয়ত ভাবলে ভাব জমিয়ে গল্পের বই ধার নেবার মৎলবে রয়েছি।"

"ছেলেরা আবার বন্ধুত্ব করতে জানে! দূর্ দূর্!" লিলি এক ফুৎকারে যাবতীয় বালকসুলভ বন্ধুত্ব উড়িয়ে দ্যায়।

"তোর মেয়ে বন্ধু না বেঁকে দাঁড়ায় শেষটায়! পেনফ্রেণ্ড্ শেষে পেন্‌ফুল্ ফ্রেণ্ড না হয়ে ওঠে।"

"হয় তো বয়ে গেলো। আমার কানে কি কিছু নেই? চাটগাঁতেই এটা আমি বেচে দেবো তাহলে। আর কারু কথা তখন শুনব না। পা আমার মাথায় থাক্! হাঁটা হাঁটি আমার পোষায় না বাপু।"

[ আগামী বারে সমাপ্য ]

# চলন্তিকা

## ট্রেণ-ডাকাতি ও হুর-উপদ্রব

হুর দস্যুদের বদ্‌মায়েসীতে—সিন্ধু প্রদেশে করাচী থেকে প্রায় ১৪০ মাইল দূরে, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের লাহোর মেল্ ট্রেণ লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে পড়ে। হুর দস্যুরা রাত্রে লাইনের অংশ নাকি সরিয়ে ফেলেছিল। এঞ্জিন ও ছয়খানা গাড়ী উল্টে যাবার পর হুর দস্যুরা সদল-বলে ডাক গাড়ীটি আক্রমণ করে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ওপর গুলি বর্ষণ করে ও মেয়েযাত্রীদের গহনাপত্র কেড়ে নেয়। দস্যু সংখ্যা নাকি প্রায় দু'শো ছিল। গহনাপত্র বা টাকাকড়ি দিয়ে দিতে যারা ইতঃস্তত করেছিল তাদের নাকি ওরা গুলি করে মারে। এরপর হুর দস্যুরা চেষ্টা করে ডাকের গাড়ীটি লুট করতে কিন্তু ঐ গাড়ীর কর্ম্মচারীরা আলো নিভিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে পাহারায় থাকে। ফলে দস্যুরা কোন ক্ষতি করতে পারেনি। এই দুর্ঘটনার পর মিলিটারী পুলিশ পাঠান হয়। ২৪ জন যাত্রী হত ও ৫০ জন যাত্রী নিহত বলে প্রকাশ। এই ভীষণ দুর্ঘটনার পর থেকে হুরদের অত্যাচার আরো বেড়ে চলে। সিন্ধু প্রদেশের নানা জায়গায় তারা খুনোখুনি, ডাকাতি সুরু করে। পুলিশ দারোগাও প্রভৃতি খুন হতে থাকে। রাস্তায় চলাফেরা করা ক্রমশঃ বিপদজনক হয়ে ওঠে। আবার একটি ট্রেণ উল্টে দেবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু ড্রাইভারের সতর্ক দৃষ্টির ফলে গাড়ী রক্ষা পায়। এই হুর দস্যুদলের সর্দ্দার হল পাগারোর পীর। ৭ বৎসর কারাবাসের পর একে ১৯৩৭ কারামুক্ত করা হয়। তারপর থেকেই সুরু হয় এদের অত্যাচার। পীরকে ধরবার জন্য বহু চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু এখনও সে ফেরার। সিন্ধু প্রদেশে হুরদের অত্যাচারের এলাকাগুলিতে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে এবং কয়েকটি হুর দস্যু নাকি ধরা পড়েছে। আশা করা যায় সামরিক কড়াকড়ির ফলে অত্যাচারী হুর সদলবলে ধরা পড়বে ও সিন্ধু প্রদেশে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

## পোল্‌ভল্ট রেকর্ড

১৫ ফিট পোল্‌ভল্ট করতে পারেন পৃথিবীতে মাত্র এক ব্যক্তি। তিনি স্কুলের এক শিক্ষক নাম Cornelius ("Corny") Warmerdum. গত ৭ই ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্কে একটা ধার করা বাঁশের সাহায্যে ইনি পৌণে ১৬ ফিট লাফিয়ে পৃথিবীর নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। এর এক সপ্তাহ পরেই কর্ণেলিয়াস ১৫ ফিট সওয়া সাত ইঞ্চি লাফিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য করে দেন। এর আগের রেকর্ড ছিল Earle Meadows এবং এক জাপানী স্পোর্টসম্যান Sueo ohe এই দু' জনের। Sueo ohe সম্প্রতি লুজনে এরোপ্লেনে নামতে



গিয়ে হত হয়েছেন। এই নূতন রেকর্ডধারী কর্ণেলিয়াস ৬ ফিট লম্বা এবং এঁর ওজন ১১ ষ্টোন ১৩ পাউণ্ড। ইনি সান ফ্র্যানসিস্‌কো অলিম্পিক ক্লাবের একজন সভ্য।

## লীগ ফুটবল

ছুটির ঘণ্টায় খেলার মাঠের খবর দিয়েছেন তোমাদের জনপ্রিয় খেলোয়াড় মিঃ কে ভট্টাচার্য্য নিজে। তোমাদের খেলার আসরে তিনি নিজে হাজির দিয়ে আসর যে শীঘ্রই জমিয়ে তুলবেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ফুটবল খেলার মারপ্যাঁচ্ দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিৎ এঁর লেখা থেকে সে বিষয় তোমরা অনেক শিখতে পারবে। খেলার মাঠের খবর ছাড়া ভবিষ্যতে ইনি ভারতীয় ফুটবলের অষ্ট্রেলিয়া টুর সম্বন্ধে তোমাদের কিন্তু শোনাবেন। তাঁর লেখাটি পাবার পর লীগের খেলা ইতিমধ্যে এ বারে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে মোহনবাগানের কাছে মহামেডানস এর ২-১ গোলে হেরে যাওয়া ও এরিয়ান্স এর কাছে মহামেডানস ড্র করা। এর ফলে ইষ্ট বেঙ্গল লীগ্ টেবিলে প্রথম অর্দ্ধের প্রতিযোগিতায় বেশ ভাল মার্জ্জিনে প্রথম হ'ল। চার পয়েণ্ট কমে মহামেডানস দ্বিতীয় ও পাঁচ পয়েণ্ট কমে মোহনবাগান তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। তবে অর্দ্ধেক খেলা এখনও বাকি।

## জন ব্যারিমুর

হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা জন ব্যারিমুরের মৃত্যু হয়েছে।* তোমরা অনেকেই হয়ত ব্যারিমুরের অভিনয় দেখোনি। সেক্সপীয়রের নাটকে এঁর অভিনয় দেখবার মত ছিল। শুধু ফিল্ম এ নয়, নাট্যমঞ্চে এর সুখ্যাতি ছিল। ফিল্ম অভিনয়ের মধ্যে ইনি ডাঃ জেকিল মিঃ হাইড, ডন জুয়ান, বিলাভেড ভ্যাগাবণ্ড, সার্লক হোমস, রোমিয়ো জুলিয়েট, টেমপেষ্ট প্রভৃতিতে পৃথিবীর সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। এর আসল নাম Blythe, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে পেণ্টার হয়ে ইনি জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন পরে নাট্যমঞ্চে যোগ দিয়ে নিজের প্রতিভা স্থাপন করেন। এঁর বোন বিখ্যাত অভিনেত্রী এথেল ব্যারিমুর। এঁর বড় ভাই লায়নেল ব্যারিমুরও খ্যাতনামা ফিল্ম অভিনেতা।

## রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসর উৎসব উপলক্ষে গত শনিবার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় কয়েকটি সুন্দর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। মহাবোধি সোসাইটি গৃহে 'ক্ষনিক সঙ্ঘ' একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়।

* ব্যারিমুরের মৃত্যুর দিন দশেক পর এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে! তাঁর উইলে পাছে তাঁর জীবন্ত সমাধি ঘটে সে রকম একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। উইলে তিনি নাকি বলেছেন যে আবশ্যক হ'লে ডাক্তার ও সন্দেহী লোকদের সাহায্য যেন নেওয়া হয়, যার দ্বারা তাঁর মৃত্যু যে নিশ্চিত ও সন্দেহজনক নয় ও তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধি দেওয়া হয়নি, সে বিষয়ে সকলে যেন নিশ্চিন্ত হয়।

ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করেন। শ্রীইন্দিরা দেবীর বাসভবনে শিশু সাহিত্য সেবীদের পক্ষ থেকে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করা হয়। আল্পনায় পত্র পল্লবে ও পুষ্পে সভাগৃহ সুশোভিত করা হয়। সঙ্গীত নৃত্য আবৃত্তি ও নানা আলোচনা হয়। রংমশালের পরিচালক অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন সভাপতিত্ব করেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ রংমশালে অন্যত্র ছাপা হল।

## রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ স্মৃতি কল্পে ও শান্তিনিকেতন সুরক্ষার্থে চাঁদা সংগ্রহ করতে মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি বোম্বাই গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাধু চেষ্টায় বোম্বাইর ধনীরা মহাত্মার চাঁদার থলিটি ভারী করেছেন। প্রকাশ, গান্ধীজির দু' লাখ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। এই বিপদ ও যুদ্ধবিগ্রহ ও দারিদ্র্যের দিনে এই টাকার দাম দু লাখেরও অনেক বেশী, সে বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে সুদূর বোম্বাই প্রদেশ বাংলা দেশকে এক শিক্ষা দিয়েছে। ধনদৌলতে বোম্বাই হয়তো বাংলার অগ্রণী কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী ও তাঁর শান্তিনিকেতন বাংলা দেশে ; বাঙ্গলার ধনীরা কে কত টাকা দিয়েছেন তা আমরা জানি না, বাংলায় কত চাঁদা সংগ্রহ হয়েছে তাও আমাদের জানা নেই। কিন্তু আশা করি রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতি কল্পে এ দেশেও চাঁদার থলী বোম্বাইর মতই ভারী হয়ে উঠবে।

---

## ছোট-গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

বড়দের মধ্যে পুরস্কার-যোগ্য

**অরূপ কথা**
হরিভূষণ মৈত্র

ছোটদের মধ্যে পুরস্কার-যোগ্য

**বেহালার ডাকাত**
অজয় দাসগুপ্ত

**চুরি**
জয়শ্রী সেন

### প্রসংসা যোগ্য

বসুধৈব কুটুম্বকম—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভাই-বোন—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
মা ও ছেলে—রহিমা খাতুন
কবি—জয়ন্তী সেন মজুমদার
কল্পনা ও বাস্তব—হৃষিকেশ দে
রামশরণা—দিলীপ মিত্র

উপরের দুয়েকটি রচনা রংমশালে ছাপা হবে

### মন্তব্য

ছোট-গল্প প্রতিযোগিতায় তোমরা আশাতীত ভাবে সাড়া দিয়েছে দেখে আমরা এবার খুব খুসী না হয়ে পারিনি। তোমাদের সকলের চেষ্টাই খুব সুন্দর হয়েছে এবং পুরস্কার যোগ্য, প্রশংসা যোগ্য এবং সমালোচনায় (পরে দেখ) উল্লিখিত গল্পগুলির মধ্যে যে খুব বিশেষ রকম তফাৎ আছে ভেবো না। কাজেই যাদের নাম পুরস্কার-যোগ্য বা প্রশংসা যোগ্য লিষ্টএ উঠেনি তাদের কিছুমাত্র দুঃখ করবার নেই। তোমাদের রচনার standard এবার বেশ ভাল হয়েছে।

# কবিতা

## বকুলবনের পাখী

শ্রীরসময় দাশ

ডাক দিয়েছে মাগো, আমায় বকুল বনের পাখী,
বল্‌না ঘরে কেমন ক'রে বন্ধ হ'য়ে থাকি ?
ভোরের আকাশ ঘিরে ঘিরে
উষার আলো ফুট্‌ছে ধীরে,
যূথীর বনে ব্যাকুল মুকুল খুল্‌ছে আকুল আঁখি,
ডাক দিয়েছে মাগো, আমায় বকুল বনের পাখী !

শিশির গুলি ঘাসের 'পরে পড়্‌ছে ঝরে' ঝরে',
আম বাগানে শালিক দোয়েল চিকির চিকির করে।
বেল-চামেলী মুখটি তু'লে
ভোরের আলো দেখ্‌ছে ভু'লে,
হৃদয় আমার উদাস হ'য়ে উঠ্‌ছে থাকি' থাকি',
ডাক দিয়েছে মাগো, আমায় বকুল বনের পাখী।

সাধ জাগে মা, প্রাণে আমার, ওই পাখীটির মত
থাক্‌তো যদি হাল্‌কা ডানা—উড়ে যেতাম কত !—
কত নতুন দেশের মাঝে
ঘুর্‌তেম আমি সকাল সাঁঝে
তুমি আমায় খুঁজে খুঁজে আকুল হ'তে নাকি ?
ডাক দিয়েছে মাগো, আমায় বকুল বনের পাখী !

আজকে আমার কী হয় মনে, বল্‌বো কেমন ক'রে ?
অসীম আকাশ দূরের থেকে হাতছানি দেয় মোরে !
বাতাস আমার কানে কানে
কী কথা কয় কে-ই বা জানে,
আপনাকে তাই ঘরের কোণে রাখ্‌তে নারি ঢাকি',
ডাক দিয়েছে মাগো, আমায় বকুল বনের পাখী !

বকুল বনের পাখী ডাকে,—ডাকে আকাশ, আলো ;
আজ কেন মা সব কিছুকেই লাগ্‌ছে এত ভালো ?
মনের গাঙে আজ্‌কে আমার
উথ্‌লে ওঠে—খুশীর জোয়ার,
সাধ জাগে মা, সবাইকে মোর বক্ষে চেপে রাখি,
ডাক দিয়েছে মাগো, আমায় বকুল বনের পাখী !

## গরু

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু ( গ্রাঃ নং ১৭৭৪ )

= এক =

তুমি মহীয়ান্, তুমি আরাধ্য—পূজ্য বিপুল বিশ্বে
তুমিই রেখেছ বাবুদের প্রাণ, তোমার স্নেহের শিষ্যে।
যে ক্ষীর খাইয়া দেবতাও মজে, তাহার মূলেতে তুমি,
লাঙ্গল করিয়া, সোণা ফলাইয়া, করেছ ভারত ভূমি
তেত্রিশ কোটী দেবতা যাহার, শোভে ও অঙ্গে চারু,
তোমারে মানব নির্ব্বোধ বলে ? তুমি গো মহান 'গরু'

= দুই =

মস্তকে যার শোভে 'গোরচনা,' কত' না মুদ্রা দাম,
গলদেশে যা'র কোমল চর্ম্ম, 'গলকম্বল' নাম
ক্ষুরেতে যাহার শিরীষ হইয়া লাগে মানবের কাজে,
যাহার চর্ম্মে 'বিনামা' হইয়া মানবের পদে রাজে,
যাহার দুগ্ধ-সুধা পান করি,' তৃপ্ত হৃদয়-মরু,
মরেও করিছ নর-উপকার 'দেবতা তুমি গো গরু,'

= তিন =

শৃঙেতে যার শিঙা হয়গো, বাজায় বালক দল,
শিঙেতে বাতাস লাগিলে শব্দ, কেমন মজার কল
যে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হয়েছে দেবতার নাভি হ'তে।
ক্ষত্রিয় শেষে হ'ল ব্রাহ্মন, সুরভীরই লাল পাতে,
যাহার দুগ্ধে চাল দিয়ে ওগো তৈয়ারী হয় 'চরু'
মানব হইয়া কবে তোমা ঘৃণা ?—পূজ্য তুমি গো 'গরু'

= **চার** =

শৈশবে যবে মাতৃ দুগ্ধ বিহনেতে শিশু কাঁদে
তখন কে তাঁরে রক্ষা করিল বল দেখি নানা ছাঁদে ?
দ্বারিক, ভীমনাগ, গর্ব্ব করেগো এখন কাহার লাগি
মানব এমন পুষ্ট শরীর কোথা হ'তে নিল মাগি ?
এত গুন তুমি দেখেছ কি কভু—অন্য পশু কি কারু ?
'ছানা সন্দেশ' খেতে কোথা হ'তে না থাকিত যদি গরু ?

= **পাঁচ** =

'দিলীপ' কিরূপে পেত সন্তান, না থাকিতে যদি তুমি ?
ঘৃত বিহনেতে হোম হ'ত কিসে কিসে উর্ব্বর জমি ?
প্রকাণ্ড নদী বৈতরনীতে ভেসে যায় কত দেহ,
রক্তেতে লাল হয় নদীজল—দৃশ্য সে ভয়াবহ !
সে সময়ে নর উতরিছে নদী কাহার পুচ্ছ ধরি ?
তথাপি ঘৃণ্য ? নির্ব্বোধ সনে, তোমার তুলনা করি !

= **ছয়** =

শকট টানিয়া, বোঝা ঘাড়ে ল'য়ে চলিছে কে দিবারাতি ?
তুমি না থাকিলে 'ঘানি' কে টানিত ? পারিত কি ঘোড়া হাতী ?
যে ঘুঁটে বিহনে, অতি সত্বর 'আঁচ' ধরান না হয়,
মল ও মূত্র পবিত্র যা'র,—পণ্ডিতগণ কয় ;
পূরাকালে 'নর যারে দান করি', পাপ হতে উতরিছে
সেই 'গরু' তুমি নম-নমস্ত ; তোমা 'বোকা' বলা মিছে !

= **সাত** =

পাঠ্শালে যে যে ছাত্রেরা কভু পড়া না বলিতে পারে,
গুরু মহাশয় তোমার সঙ্গে তাদের তুলনা করে !
এত গুন তব তবুত দেখিনা—কিসে তুমি এত হীন্
'শ্রীকৃষ্ণ' যা'রে চরায়ে বাড়িল—সে কিসে এত গো দীন্ ?
লোকে যা বলুক কাণ দিব কেন ? তুমিই আমার 'গুরু'
'পশু হইয়াও দেবের দেবতা, আরাধ্য তুমি "গরু"

——:*:——

**ছোট-গল্প প্রতিযোগিতা—**

# সমালোচনা

অলকা ঘোষ, তোমার "মানুষ কারো বন্ধু না" গল্পে লেখার ভাবটি নূতন কিন্তু তোমার ভাষা দুর্ব্বল আর তোমার লেখাটা ঠিক গল্পের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। কেয়া সেন—তোমার গল্পের দুটো ঘটনাকে খাপছাড়া ভাবে বসিয়ে তাদের মধ্যে কোনই যোগাযোগ রাখনি। মীরা রায়—তোমার গল্পের প্লট মন্দ না, ভাষা চলনসই কিন্তু তুমি দুটো বড় ভুল করেছো—চাষার বৌ সে জমিদারের ছেলের বৌ কি করে হবে আর চাষার বৌ গাছে চড়লে খাট হাল্‌কা হয়ে যাবার কথা। বিষ্ণুপদ ব্যানার্জ্জি—তোমার গল্পের প্লটটি একটু ইংরিজিতে থাকে বলে absurd হয়ে গেছে আর সেই জন্যেই তোমার গল্প জমতে পারে নি। অশোককুমার চৌধুরী—তুমি কোন নাম করা লেখকের ভাষার অনুকরণ করতে গিয়ে গল্পের দিকে নজর দেবারই অবসর পাওনি। জ্যোৎস্না রায়—তোমার বয়সের পক্ষে তোমার লেখাটি ভালোই, ভাষাও-মন্দ-না কিন্তু নির্দ্দিষ্ট প্লটের অভাবে তোমার লেখা খাপছাড়া হয়ে গেছে। সাধনা ভট্টাচার্য্য—প্লটটি পুরাণো আর সরস বর্ণনার অভাবে গল্প জমতে পায় নি। বিমল কুমার দত্ত—তোমার ভাষা কাঁচা, আগে ভাষা ভালো করো, তারপর গল্প লেখার দিকে মন দিয়ো। তৃপ্তি দেবী—তোমার গল্পের প্লটটি নিজের নয় আর ভাষায় তোমার দখল নেই। ভাষা ভালো ক'রে গল্প লিখতে চেষ্টা করো। আর্য্যকুমার মিত্র—তোমার লেখাটি ঠিক গল্প হয়নি তুমি সাধারণ একটা ঘটনাকে একটু উপভোগ্য করে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছো। অপূর্ব্বলাল মজুমদার—তোমায় লেখাটিও গল্পের পর্য্যায়ে পড়ে না, প্রথম পাতাটি রেখাচিত্র হিসাবে মন্দ নয়। সাধনচন্দ্র বসু—তুমি লেখার মাঝে মাঝে কতকগুলো ভালো ভালো কথা মানে না জেনে জুড়ে দিয়েছো, তোমার গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে গল্পের গতির সমতার অভাবে গল্প নষ্ট হয়ে গেছে,। শেষের কয়েক লাইন মন্দ হয়নি। মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত—তুমি যে কি বলতে চেয়েছে তাই বোঝা গেল না, তুমি ড় এবং র সম্বন্ধে সাবধান হবে। তোমার গল্পের নামের সঙ্গে বিষয়বস্তুর কোন সামঞ্জস্য নেই। বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—তুমি তোমার গল্পতে অতিরিক্ত হাস্যরসের অবতারণা করতে গিয়ে গল্পটি পাতে দেবার অনুপযুক্ত করে ফেলেছ, জোর করে হাসানো যায় কি ? এ গল্পটি একটু অস্বাভাবিক, ভাষার দিকেও নজর রাখা উচিৎ ছিল। শ্রীগীর্দ্দেবীকান্ত দাস—তোমার বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের সঙ্গে ষ্টাইল অথবা গল্প বলার ধরণ খাপ খায়নি। আইডিয়াটি ভালো। সুবীরকুমার ঘোষ—তোমার গল্পের আরম্ভ নেই কেন ? তুমি খুনের গল্প লিখছ অথচ

তার জন্যে যে পাঠকপাঠিকাকে প্রস্তুত করা দরকার তা মনে রাখোনি, তোমার গল্পের ঘটনাগুলিও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন। গিরীন্দ্রনাথ রায়—তোমার গল্প যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তা এ যুগে অচল। এ ধরণের গল্পে মাঝে মাঝে নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করে পাঠকের মনকে বিষয়ের গুরুত্ব থেকে মুক্তি দিতে হয়; তাই তোমার গল্প দাঁড়াতে পারে নি। মণিমালা দেবী—তোমার গল্পটি ঠিক গল্প হয়নি বরঞ্চ একটা সম্পূর্ণ গল্পের একটা ছেঁড়া পাতা বলা যেতে পারে। অজিতকুমার দে—তোমার গল্প অনেকটা ডায়েরীর মত হয়ে গেছে। সুবিমল চ্যাটার্জ্জি—তোমার ভাষা বড় খটমটে আর গল্পের নায়ককে অত বেশী বক্তৃতা দেওয়ালে গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। অলকা চ্যাটার্জ্জী—তোমার গল্পের প্লটটি বড্ড পুরাণো আর ভাষাও তেমন সরস নয়। রেখারাণী দে—গাঁথুনীর অভাবে তোমার প্লট জমতে পারেনি, প্লটটিও সুবিধের নয়, ভাষা চলনসই। সমীর চৌধুরী—তোমার প্লটে নতুনত্ব কিছু নেই, ওই প্লট নিয়ে ঠিক ওই ধরণেরই গল্প বহুবার লেখা হয়েছে। অমিয়কুমার ঘোষাল—তোমার ভাষা বিশেষ সুবিধের নয়, গল্পও ভালো হয়নি। তুমি কবিতা বেশ লেখো। নারায়ণকুমার দত্ত—তোমারও ভাষা ভালো নয়, প্লটটিও অচল। বেলারাণী গাঙ্গুলি—তোমার গল্পর প্লটই নেই। জগন্নাথ দাস—তোমার গল্প আরম্ভ হয়েছে "কনভারশেসন" দিয়ে কিন্তু তার কৌশল তোমার জানা নেই আর তোমার গল্প শেষ হবার আগেই শেষ হয়ে গেছে। সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়—তুমিও কোন লেখক বিশেষের অনুকরণ করতে চেষ্টা করছো, লেখাতে নিজের বৈশিষ্ট্যের ছাপ না থাকলে কি লেখা ভালো হয়? নিখিলেন্দ্রনাথ ঘোষ—তোমার লেখায় ভাব এবং ভাষা দুইয়েরই অভাব, ভাষা ঝরঝরে করবার চেষ্টা করবে। অবনীকুমার বসু—তুমি এমন একটি প্লট নিয়েছো যা তোমার অভিজ্ঞতার বাইরে, আরো ভাষার উন্নতি করা দরকার। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য—তোমার প্লট ছেলেদের উপযোগী হয়নি, বর্ণনা বৈচিত্রহীন—গল্প লেখার সময় মনে রাখবে যে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগাতে হবে। গুরুপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ বসু চৌধুরী—তোমাদের গল্পের ভূমিকা অত্যন্ত অস্পষ্ট তবে গল্পের শেষাংশে দু' একটি 'হিউমার' বেশ ভালো হয়েছে। অমিতরঞ্জন রায় চৌধুরী—তোমার গল্পের প্রথম দু' পাতা বেশ ভালো লেগেছে কিন্তু গল্পের শেষের দিকে তুমি 'ব্যালেন্স' রাখতে পারো নি। সাধনা ভট্টাচার্য্য—তোমার লেখাটি মন্দ নয় কিন্তু গল্পের প্রথম দিকটা একটু একঘেয়ে হয়ে পড়াতে গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হয়েছে, তুমি লেখার অভ্যাস ছেড়ো না। সাধনা ও রেণু বিশ্বাস—গল্পের নামকরণ একটা মস্ত জিনিষ, তোমাদের লেখা ও তার নামের সামঞ্জস্যই খুঁজে পেলাম না, না হলে তোমাদের লেখায় হাত আছে। চিন্ময়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—তোমার লেখাটি গল্পের পর্য্যায়ে পড়ে না। প্রদীপ সেন—তুমি কি প্রতিযোগিতার জন্য গল্প পাঠিয়েছ? তোমার ভাষাটি সুন্দর কিন্তু প্লটটিতে খুঁৎ।

( কয়েকটি লেখা দেরী করে আসার দরুন বিচার ও সমালোচনা করা সম্ভব হ'ল না )

# নূতন ধাঁধা

## কথাকাটাকাটি

( শ্রীসাধনা মিত্রের সৌজন্যে )

বলতো কি —?

(ক) আসলে চারিটি অক্ষর, মধ্যে যুক্ত হয়ে আছে বলে তিনটি। দু'ভাগ করলে—প্রথমার্দ্ধ হয় ইংরাজী কথা—শেষার্দ্ধ হয় বাঙ্গালা কথা। মজা এই যে, প্রথমার্দ্ধ, শেষার্দ্ধ ও সমগ্র কথার মানে একই।

(খ) চার অক্ষরে লকারান্ত কথা। কবন্ধে হয় ইংরাজী শব্দ, আর শির-যুক্ত ও শিরহীন দুই অবস্থাতেই মানে এক!

(গ) মাত্র দুই অক্ষরের কথা। প্রথমটা বাংলা, দ্বিতীয়টি ইংরাজী। মানে কিন্তু একই। অখণ্ড অবস্থায় লেহণ করি, খণ্ড করলে দুই খণ্ডেই পাণ করি।

## নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাঁচী; জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর; সৌরভ, শান্তিনিকেতন; সাধনা ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ; জগন্নাথ দাস, পাটনা; বিমল, মায়া, অমল, সুকোমল ও ছায়া, মেদিনীপুর; গুরুপ্রসাদ ও দেবী প্রসাদ বসু চৌধুরী; বীরশিমূল; কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত, শান্তিনিকেতন; শেখরেন্দ্র, অমরেন্দ্র, শেফালি, অরুণা, সোণালী, প্রদোষ, প্রবীর, যুথিকা, সমীর ও মীরা গাঙ্গুলী, পুরুলিয়া। সোমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা; অমিতরঞ্জন রায় চৌধুরী, কলিকাতা; উমা, গীতা, দীপা, অনিন্দা, ফণী, রবি, অবণী, অতীন, অরুণ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া।

বেশীর ভাগ গ্রাহকগ্রাহিকাদের একটি ভুল হয়েছে।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(ক) দক্ষিণ আমেরিকার জন্তু বিশেষ। (খ) আফগানিস্থানবাসী ক্ষত্রিয় শ্রেণীর হিন্দু (গ) পারসীক কবি ও লেখক বা যে কোরাণ কণ্ঠস্থ করেছে। (ঘ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (ঙ) হাওয়াই দ্বীপের রাজধানী।

**'চিঠির বাক্স' ও 'ভাবী গৃহিণীর বৈঠক' আগামী মাসে আবার নিয়মিত বসিবে।**

## গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রতি

নিম্নলিখিত গ্রাহকগ্রাহিকাদের ( গ্রাঃ নং দেওয়া হ'ল ) চাঁদা গত জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ হয়েছে।

১৭৪৮, ১৭৪৯, ১৭৫০, ১৭৫১, ১৭৫২, ১৭৫৩, ১৭৫৭, ১৭৫৮, ১৭৫৯, ১৭৬০, ১৭৬১, ১৭৬২, ১৭৬৩।

নিম্নলিখিত গ্রাহকগ্রাহিকাদের ( গ্রাঃ নং দেওয়া হল ) চাঁদা আষাঢ় মাসে শেষ হ'ল।

১১৫৪, ১৩১৭, ১৩২৬, ১৪১৯, ১৪২১, ১৪৩০, ১৪৩৩, ১৪৪০, ১৮৭৬, ১৪৭৭, ১৫১৯, ১৫৩৭, ১৫৪৩, ১৫৫০, ১৬৮৯, ১৭৬৪, ১৭৬৫, ১৭৬৬, ১৭৬৭, ১৭৬৯, ১৭৭০, ১৭৭১, ১৭৭২, ১৭৭৩, ১৭৭৪, ১৭৭৫, ১৭৭৬, ১৭৭৭, ১৭৭৮, ১৭৭৯, ১৮০০, ১৭৮১, ১৭৮২, ১৭৮৩, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৮৬, ১৭৮৭, ১৭৮৯, ১৭৯০, ১৭৯২, ১৭৯৩, ১৭৯৪, ১৭৯৫, ১৭৯৬, ১৭৯৭, ১৮০০।

উপরের গ্রাহক গ্রাহিকাগণ যেন তাঁদের চাঁদা মণি-অর্ডার যোগে শীঘ্র রংমশাল অফিসে পাঠিয়ে দেন। আষাঢ় মাসের মধ্যে চাঁদা না পেলে তাঁদের শ্রাবণের রংমশাল **ভি-পি** করা হবে।

রংমশাল কার্য্যালয়ের ঠিকানার একটি ছবি দেওয়া হল :—

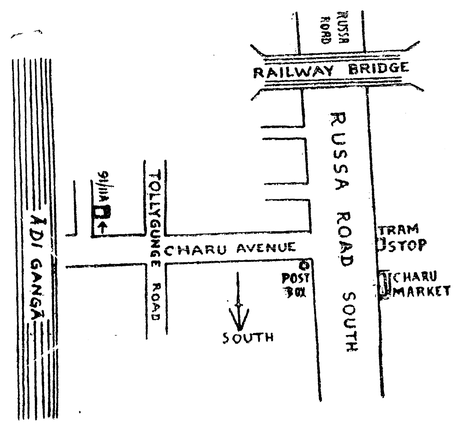


রংমশাল

বাঙ্গলা মায়ের অঞ্চল-নিধি

# শ্রাবণ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

প্রথম যখন এলে তুমি ছাতা হাতে আষাঢ় মাসে
ভিজিয়ে দিলে পৃথিবীটে জল ও আলোর অট্টহাসে।
বেরিয়ে এলেম তোমার সাড়ায়, পাড়ায় পাড়ায়, ছাতা খুলে,
দুলছে তখন বিজ্‌লী মালা তোমার মেঘের বাব্‌ডি চুলে!
টুপ্‌ টাপ্‌ টুপ্‌, টিপি টিপি পা-টি ফেলেই পালিয়ে যাওয়া,
ঝির্‌ ঝির্‌ ঝির্‌, ঝুপ্‌ ঝাপ ঝুপ্‌ নিরুদ্দেশে হঠাৎ ধাওয়া!
পথের ধূলোয় আঁকলে ছবি, শুকনো ঘাসে, কচুর পাতে,
ছড়িয়ে গেলে মুক্তোগুলি, বাড়ীর ছাদে, আঙিনাতে!
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ ঘরের চালে, মাঠে, বনে, ফুলের রাশি
নদী নালায় খালে বিলে জেগে উঠার আসা-আসি!

ভিজব, না কি ধরব ছাতা, আমরা তখন কী যে করি…
গাছগুলো তো দু'হাত মেলে নেয়ে নিলে প্রাণটি ভরি',
বাঁশ বনেরা ভিজে চুলে, ফিস্‌ফিসিয়ে, ইসারাতে
বলছে কথা, বুঝলেম না—তোমার না মোদের সাথে ?
ধানক্ষেতেতে গহন পাতার মাঝে থেকে উঁকি দিয়ে
বেরিয়ে পড়েই ধানশিষেরা নাচল তোমার বুকে গিয়ে,
কাঁচা টকো আমের দল হল মিষ্টি রাঙামুখো,
হুকো হাতে গাঁয়ের চাষী ভুলে গেল দারুণ দুখ-ও !
দু'একটা আঃ ! বিপুল মজার 'রেইনী ডে'র হল সুরু,
হেসে তুমি বাঁকালে যে রামধনুকের রঙিন্ ভুরু !

সব ছাড়িয়ে উঠে গেছে নতুন জলের দুষ্টু মিটে
সার্কাস দেখাতে এল নৌকা নিয়ে বুকে পিঠে,
মাছের দলের দর্শকদের ভিড় হচ্ছে টিকিট নেবার,
লাখে লাখে জোনাক্‌দেশের জোর আলো জ্বলল এবার !
চাঁদ আর তারা ঘোমটা দিয়ে দেখছে বসে নেমন্তনে,
কেমন সে ঐ নতুন বর আর কেমন সে ঐ নতুন কনে,
ডোবা পুকুর ডুবতে গিয়েও বাজাচ্ছে যে শাঁখ আর বাঁশী,
শেয়াল সাপ, শূয়র শের, বসতে এল পাশাপাশি,
তুমুল বাদ্য-উঠছে বেজে ব্যাঙ্ রাজারি হাতছানিতে,
বে হচ্ছে রাজকন্যার মেঘলা রাতের রাজধানীতে !



ভোর বেলাতে দেখছি চেয়ে, আকাশ ছেয়ে আলোর তুলি
কি যেন কি ভাবতে বসে, রং ফেরাতেই যাচ্ছে ভুলি' !
টগ্ বগ্ টগ্ শব্দ তুলে কোথায় কে যে ঘোড়ায় চড়ে'
চলছে মেঘের তেপান্তরে—সে পথ বেয়ে বৃষ্টি পড়ে !
আবার কোথায় উজল রোদে চমকে উঠা মেঘের ফাঁকে
খুলে দিলে যুগের যুগের—রূপবর্ণ ঝর্ণাটাকে !
গুরু গুরু গর গর কি গান তুমি গাইলে দূরে—
বকেরা সব শাদা ছাতায় চলল উড়ে স্বপনপুরে !

আমরা কালো ছাতাগুলো হাতে নিয়েই রইব বুঝি ?
জলের ভয়ে সার্সি এঁটেও ঘরেই থাকা কর্‌ব পুঁজি ?

ঝম্ ঝম্ ঝম্, ঝম্ ঝম্ ঝম্,
হাসলে শ্রাবণ, বুকে নিয়ে,
চলল অঝোর স্নেহ ধারায় আকাশ পাতাল সব ভাসিয়ে !

# "নবারুণ"

শ্রীঅখিল নিয়োগী

পরিচয়

লাল-কমল
তৃণদল
গানের পাখী
অন্ধকূপ-ব্যাঙ
কোটর-বাসী পেচক
ঝরণা-ধারা
অরুণ—

[ নীরব নিশীথে···নিস্তব্ধ বনভূমির একাংশ ]

লাল-কমল

গান

"আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে
দাওনা সাড়া কি তাই বারে বারে !
তোমার বাঁশী আমার বাজে বুকে,
কঠিন দুখে, গভীর সুখে !
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে !
চেয়ে রই রাতের আকাশ পানে,
মন-যে কী চায় তা মনই জানে
আশা জাগে কেন অকারণে
আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে !
ব্যথার টানে তোমায় আন্‌বো দ্বারে।"

এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহৃত হয়েছে



অরুণ

কে ? কে আমায় এমন ব্যাকুল সুরে ডাকে ?

লাল-কমল

আমি আঁধার বন-ভূমির লাল-কমল। রবির কিরণ এ বন-ভূমিতে পথ খুঁজে পায় না···তাই ত' আমি পারিনা ফুটতে ! আমার শতদল কি কোন দিনই বিকশিত হবে না ? তুমি কি আসবে না রবি ?

অরুণ

এখনো যে নিবিড় আঁধারে বন-ভূমি ছেয়ে রয়েছে···আমার আসবার যে এখনো সময় হয়নি !

লাল কমল

রবি ! তুমি না এলে এই দীর্ঘ রাত্রির ত' শেষ হবে না···প্রসন্ন-প্রভাত কি আমরা দেখ্‌তে পার্‌বো না ?

অরুণ

কিন্তু লাল-কমল···এমনও ত' হতে পারে যে তোমার আশে-পাশে যারা রয়েছে তারা আমার কিরণ সইতে পারে না·· ভালো লাগ্‌বে না তাদের আমার আলোকে···

লাল-কমল

না-না সে কথা সত্য নয়। শুধু আমি নই সমগ্র বন-ভূমি তোমায় চাইচে···তুমি এসো···তুমি এসো।

গান

"আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে
মম পল্লবে পল্লবে
হিল্লোলে হিল্লোলে
থর থর কম্পন লাগিল রে !···

অরুণ

লাল-কমল ! লাল-কমল ! তোমার আকুল আহ্বান আমি শুন্‌তে পেয়েছি···আমি আস্‌বো·· আমি আস্‌ছি···তোমাদের ঘুম আমি ভাঙাবো···

[ নবারুণের আবির্ভাব ]

কে তুমি···আমার আলোর কম্পনে থর্ থর্ করে কাঁপ্‌ছ ?

তৃণ দল

আমি তৃণ-দল···এত আলো, এত উচ্ছ্বাস···জীবনে আমি কখনো দেখিনি···তাই আবেগে আমি কাঁপছি···!

অরুণ

তৃণ-দল, তুমি তোমার কচি চিকন পাতা আমার আলোয় মেলে ধর!

তৃণ-দল

হ্যাঁ, আমি মেলে ধরবো। ওই আলোয় আমি অবগাহন করবো। আমার মনে হচ্ছে···অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকাই আমার কাজ নয়··আমার জীবন দিয়ে আমি পৃথিবীতে আন্‌বো সজীবতা···তোমার আলোর প্রথম কম্পন···সত্যি আমায় সজীব করে তুলেছে।

অরুণ

এম্নো তৃণ-দল, তবে তুমি আমার সহায় হও। কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ ভেসে আস্‌ছে গান! এই নীরব বন-ভূমিতে কে এমন করে গায় বল ত?

তৃণ-দল

তাইত! কে গায়! হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি রবি! তোমার আলোর সাড়া পেয়ে গানের পাখী এই দিকেই আস্‌ছে—

গানের পাখীর গান

"প্রথম আলোর চরণ-ধ্বনি উঠ্‌ল বেজে যেই
নীড় বিরাগী হৃদয় আমার উধাও হল সেই!
নীল অতলের কোথা থেকে
উদাস তারে করল যে কে!
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক ঠিকানা নেই!···

অরুণ

তুমিই গানের পাখী? আমার শেষ রাত্তিরের স্বপ্ন! ভোরের শুক তারার মত তুমি থেকো আমার পাশে-পাশে!

গানের পাখী

চল, আমি তোমার সঙ্গেই রইলাম—

[ **হঠাৎ ব্যাঙ ডেকে উঠ্‌ল** ]

গ্যাঙোর গ্যাঙ্‌! ওহে ও কোটরবাসী পেচক! বলি কিছু শুনতে পাচ্ছ?

পেচক

কেন-কেন···কি হয়েছে বলত? তুমিই বা কে?

ব্যাঙ্‌

আমিই বা কে! তুমি অবাক করলে কোটর বাসী পেচক! এদ্দিন এই বনে এক সঙ্গে রয়েছি·· আমি অন্ধকূপ-ব্যাঙ্‌ আমায় চেনো না!



পেচক

তাই ত! তুমি অন্ধকূপ ব্যাঙ্‌ই ত! তা কি জানো ভায়া! কোটরে আধ চোখ চাইতে ভয় হয়! বুঝি আলো এসে চোখে লাগ্‌লো!

ব্যাঙ্‌

আরে ভায়া সেই কথাই ত' বল্‌তে যাচ্ছি। আজ সকাল থেকে কি হুটো পুটি সুরু হয়েছে বনে! এত আলোই বা এলো কোত্থেকে? এ বনের গাছগুলো এত ঘন যে এখানে ত' আলো চোক্‌বার কথা নয়! গ্যাঙোর গ্যাঙ্‌!

পেচক

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি ঠিকই বলেছ! [ **পেচকের ডাক** ]

আর সকল থেকে এত কিচির মিচির গানই বা শোনা যাচ্ছে কোত্থেকে! কোথায় মনের সুখে আর একটু ঘুমিয়ে নেবো···তা নয় কি না—

ব্যাঙ্‌

যা বলেছ ভাই! অন্ধকারে ঘুমের মতো জিনিষ বিধাতা আর কিছু তৈরী করতে পারে নি।

পেচক

আমাদের সেই কোটরের কাল-ঘুম কিনা এমন করে ভেঙে দিলে···! [ **পেচকের ডাক** ]

ব্যাঙ্‌

আচ্ছা ভাই, ঐ ফুট্‌ফুটে ছোঁড়াটা কে আমায় বল্‌তে পারো? এ বনে ত' ওকে কখনো দেখি নি!

পেচক

না—না—আমি ওর দিকে তাকতে পাচ্ছিনে! আমার চোখ দুটো ঝল্‌সে যাচ্ছে··· আমি কোটরে যাই চোখ বুঁজে চুপ্‌চাপ ঘুমোই গে···কাজ কি আমাদের এই ঝামেলায়—

ব্যাঙ্‌

কিন্তু ভাই তাতে ত ও ছেলেটা আরো আস্কারা পেয়ে যাবে—! চিরদিনের মত আঁধার যাবে পালিয়ে আমাদের ঘুম চোখের পাতা থেকে নেবে ছুটি···

পেচক

তা হলে আমরা কি করবো? তুমি হচ্ছ অন্ধকূপ ব্যাঙ···আর আমি হচ্ছি কোটর-বাসী পেচক···আমাদের কি কোনো ক্ষমতাই নেই···?

ব্যাঙ্‌

আছে ভায়া আছে! এসো আমাদের হেঁড়ে গলার গানে ওদের দিই জাগিয়ে—

## ব্যাঙ্ ও পেচকের গান

গ্যাঙোর গ্যাঙ্···গ্যাঙোর গ্যাঙ্···গ্যাঙোর গ্যাঙ্
এই বনে যে ঘুম ভাঙাবে মারবো তারে ল্যাঙ্ !
কোটর মাঝে, অন্ধকূপে ঘুমিয়ে ছিলেম খাসা—
আলোর তুফান তুল্লে কেগো, ভাঙ্লে ঘুমের বাসা ?
ফের যদি আর আস্বি হেথায় ভাঙ্বো জোড়া ঠ্যাং !
ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ তুই করবি যদি জানিস্ পেচক রাজে ?
মাথায় তোদের ফেল্বো ছুঁড়ে অন্ধকারের বাজে !
তাহার পরে পেচক-ব্যাঙে নাচ্বো ড্যাড্যাং ড্যাং !
গ্যাঙোর গ্যাঙ্···গ্যাঙোর গ্যাঙ্···গ্যাঙোর গ্যাং !

ব্যাঙ্

এইবার ওরা নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে···চল ভাই কোটর বাসী পেচক···তুমি যাও তোমার কোটরে···আর আমি যাই আমার অন্ধকূপে··· ! তারপর মনের সাধে নাক ডাকিয়ে লাগাই ঘুম !

পেচক

কিন্তু ভাই অন্ধকূপ ব্যাঙ্ ! এ আলো যে আমি সইতে পাচ্ছিনে···

ব্যাঙ্

ঠিক হয়েছে ! ঠিক হয়েছে ! আমার আছে ব্যাঙের ছাতা। এসো তাই দিয়ে আমরা চোখ ঢাকি। আলো আমাদের কিছু করতে পারবে না।

[ গান গাইতে গাইতে দু'জনে চলে গেল ]

[ হঠাৎ ঝরণা ধারার শব্দ শোনা গেল ]

অরুণ

কে তুমি ভাই অফুরন্ত গতিবেগ নিয়ে ছুটে আসছ ?

ঝরণা-ধারা

আমি ঝরণা ধারা। অন্ধকূপ-ব্যাঙ্ আর কোটরবাসী পেচক পালিয়েছে···এইবার তোমার সঙ্গে সুরু হবে আমাদের খেলা—

অরুণ

সার্থক আমার তোমাদের এখানে আসা ! সার্থক আমার তোমাদের ভালোবাসা। এইবার আমায় ছুটি দিতে হবে তাই—

তৃণ-দল

ছুটি ! তুমি বল্ছ কি ভাই রবি ! তুমি এলে তোমার অরুণ-কিরণ নিয়ে···তাইত আমরা জাগ্লুম···তাই ত' আমরা জান্তে পার্লুম জীবনকে···শিখ্লুম পরস্পরকে ভালোবাস্তে···বুঝ্লাম সবাইকে আনন্দ দিয়ে বাঁচা তাই ত' জীবন !



লাল-কমল

তৃণ-দল সত্যি কথাই বলেছে ভাই রবি ! তুমি এসেছ তাইত' 'সকল কাঁটা ধন্য করে' আমি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছি—

গানের পাখী

তাইত' আমার নীরব কণ্ঠে জেগেছে সুর ! নইলে কে আমায় ডাক্বে গানের পাখী বলে ?

ঝরণা ধারা

সত্যি কথা···সত্যি কথা ! তুমি এসেছ রবি, তাইত আমি তোমার কিরণে হাসি ছড়াতে পাচ্ছি···নইলে কোথায় লুকিয়ে থাক্ত আমার গতিবেগ ! না—না তুমি যেও না—যেও না···। তোমায় খেলার সাথী পেয়েছি···তাই ত আমরা কাল ঘুম থেকে জেগে উঠেছি—

অরুণ

শোনো, আমার খেলার সাথীর দল ! আমি তোমাদের মাঝখানে কিরণ ছড়াতে এসেছিলাম সে কাজ আমার শেষ হয়ে গেছে। তোমরা ত জানো—

"গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নতুন জনম লভি !"

এখানকার কাজ আমার ফুরালো···তাই আমায় বিদায় নিতে হবে। আবার কোন সাগর পার আমায় ডাক দিয়েছে—আমি নিজেই জানিনে—

লাল-কমল

কিন্তু তোমায় ছেড়ে কি করে আমরা বেঁচে রইব ?

অরুণ

শোনো লাল-কমল, আমি তোমাদের কাছ থেকে চলে যাবো বলেই তোমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাবো না কখনো। তোমাদের মধ্যেই থাক্বো বেঁচে চিরকাল। তুমি লাল-কমল, তোমার মধ্যে আমি লুকিয়ে থাক্বো প্রাণ-শক্তি হয়ে···তুমি এই বনভূমিতে জাগাবে নতুন প্রাণের সাড়া—

তৃণদল

আর আমি তৃণদল ! আমি কি করে বাঁচ্বো ?

অরুণ

তৃণদল, ভয় নেই তোমার। ছোট্ট বলে তোমায় আমি ভুল্বো না···সজীবতা হয়ে আমি তোমার মধ্যে লুকিয়ে থাক্বো চিরদিন।

গানের পাখী

কিন্তু রবি ! আমি গানের পাখী ! তুমি চলে গেলে ত' আমার কণ্ঠে আর সুর বেরুবে না !

অরুণ

না—না— গানের পাখী···আমি তোমার কণ্ঠে বাসা বাঁধবো 'আনন্দ' হয়ে।

ঝরণা ধারা

কি নিয়ে তবে আমার দিন কাট্‌বে রবি? আমার ঝরণা-ধারা ত' দুদিনেই শুকিয়ে যাবে!

অরুণ

না ঝরণা ধারা! ভয় নেই তোমারো। গতিবেগ হয়ে আমি তোমার প্রাণের মাঝে লুকিয়ে থাক্‌বো। হয়ত তুমি আমায় দেখ্‌তে পাবে না···কিন্তু আমার পরশ পাবে—প্রতিদিন তোমার চলার পথে।

ঝরণা-ধারা

কিন্তু ঐ অন্ধকূপ ব্যাঙ···আর কোটর বাসী পেচক···ওরা চিরদিনই আমাদের চলার পথে দেবে বাধা···তখন আমরা কি করবো রবি? ওরা অন্ধকারে আবার আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌বে!

অরুণ

একবার যখন আমি তোমাদের ঘুম থেকে জাগিয়েছি তখন আর কেউ তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌তে পারবে না। তবে হ্যাঁ···ঐ অন্ধকূপ-ব্যাঙ আর কোটর বাসী পেচক!···ওরা তোমাদের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। অন্ধকূপের ব্যাঙ্‌ হচ্ছে সঙ্কীর্ণতা আর কোটর বাসী পেচক হচ্ছে অজ্ঞানতা ওদের কাছ থেকে তোমরা দূরে দূরে থাক্‌বে। জ্ঞানের আলোর ঝরণা ধারায় তোমরা অবগাহন করেছ তোমাদের ভয় কি? এইবার আমার যাবার সময় হল···আমায় তোমরা ছুটি দাও ভাই—

"কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ পারানীর কড়ি
একলা ঘাটে রইব নাগো পড়ি'
আমরা সুরের রসিক নেয়ে
তারে ভোলাবো গান গেয়ে
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি!
পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে?
দূরের হাওয়ায় ডাক দিল এই সুরের পাগ্‌লাকে!
ওগো তোমরা মিছে ভাবো—
আমি যাবোই যাবোই যাবো,
ভাঙ্‌লে দুয়ার, কাট্‌লো দড়া-দড়ি!

[ গান দূরে মিলিয়ে গেল ]

——(০)——

# লড়াইরাজের দিগ্বিজয়

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

জবরদস্তপুরের রাজা হ'লেন লড়াইরাজ। খালি লড়াই করে বেড়ান! রাজা বড় লড়াইবাজ। বীর পুরুষ ত' বটেই। আর যুদ্ধে একেবারে, যাকে বলে, অপরাজেয়।

জবরদস্তপুরের আশেপাশে, এখানে-সেখানে রাজামশাই লড়াই দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। বেশ ছিলেন। হটাৎ কি হল, বললেন, 'এই ছুটকি লড়াই আর ভাল লাগে না।'

শুনে সেনাপতিরা অবাক। লড়াইরাজের লড়াই ভাল লাগে না—এ কি একটা কথা হ'ল? বুড়ো সেনাপতি তরোয়ালের ডগাটা দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'লড়াই আর ভাল লাগে না—তা হ'লে, ত' মুস্কিল তা হ'লে কি করা যায়—।'

রাজামশাই বললেন, 'চুট্‌কি লড়াই আর ভাল লাগে না—চুট্‌কি লড়াই কি ভদ্রলোকের পোষায়, না, আমার শোভা পায়। আপনারা আয়োজন করুন এবার দিগ্বিজয়ে বেরুবো।'

শুনে সেনাপতিরা হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর দিগ্বিজয়ের আয়োজন করে লড়াইরাজের সাথে বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে। সঙ্গে চলল লাখো লাখো সৈন্যসামন্ত, হাতীঘোড়া, কামান বন্দুক ইত্যাদি হাজারো ব্রহ্মাস্ত্র।

লড়াইরাজ এ-রাজ্য সে-রাজ্য জয় করতে করতে চললেন। কোন রাজ্য জয় করতে লাগে একদিন, কোনটা বা একমাস, আবার কোনটা জয় করতে বছর কেটে যায়। লড়াই-রাজ কোন রাজ্যের রাজকন্যাকে বিয়ে করেন, কোন রাজ্যের মন্ত্রীর কান কেটে নেন, কোনটার রাজাকে আবার বন্দী করে পরে ঘটা করে মুক্তি দেন। এমনি করে এক একটা রাজ্য জয় করেই আবার আরেক রাজ্যের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর দু' বছর তারপরে দশ বছর—তারও পরে বিশ বছর—লড়াইরাজ শুধু লড়াই করেই কাটিয়ে দেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ তিনি জয় করে ফেলেন। বুড়ো সেনাপতির ছেলে এখন সেনাপতি, সৈন্যদের ছেলেরা এখন সৈন্য।

একদিন গুপ্তচর এসে খবর দেয়, 'মহারাজ, পৃথিবীর একটি মাত্র রাজ্য আপনার জয় করা বাকী—আর সে রাজ্য জয় করাও খুব সোজা কেননা রাজ্যের রাজা এখন রাজ্যে নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে লড়াইরাজের হুকুমে তার লাখো সৈন্য গিয়ে চড়াও হল সেই রাজ্যে। তুমুল যুদ্ধের পর সেই রাজ্য ত' জয় হল। লড়াইরাজেরও দিগ্বিজয় শেষ।

যুদ্ধজয়ের খবর নিয়ে সেনাপতি এলেন্ লড়াইরাজের কাছে। বাঁধানো মোটা খাতা খুলে লড়াইরাজ বললেন, 'এবার কোন রাজ্য জয় করলাম?' তাঁর জয় করা রাজ্যের নাম সব খাতায় লেখা থাকে। পৃথিবীতে কত রাজ্য—সব নাম ত' আর মনে করে রাখা চলে না!

সেনাপতি রাজ্যের নাম বললেন, 'জবরদস্তপুর।'

খাতায় নামটা তুলে রাখবার আগে লড়াইরাজ একটু ভেবে নিলেন।

কি. ভয়ানক কথা! তিনি যে নিজের রাজ্য জয় করে বসেছেন!

---

## এ-দেশে বিলাতী খেলার জন্ম

শ্রীপান্নালাল দত্ত

তোমাদের আজ বাংলার একটি দুরন্ত ছেলের গল্প বলি! এই ছেলেটি শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে এমন একটি নূতন জিনিস এনে দিয়েছেন, যা এখন সকলের প্রিয় ত বটেই, উপরন্তু বিশেষ দরকারী জিনিস! সেটি হচ্ছে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা! বাঙালী ভারতবর্ষে অনেক নূতন জিনিসের প্রবর্ত্তন করেন···তেমনি বিলাতী খেলাগুলিও এদেশে প্রথমে এক বাঙালী ছেলের দ্বারাই আমদানি করা হয়েছিল, এ কথা ভাবলে আমরা গর্ব্ব অনুভব করি!—তোমরা এঁকে মনে রেখ, এঁর নাম নগেন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। এঁকে খেলার মাঠে সকলে 'হুজুর' বলে ডাকত! পরে ইংরাজী নাম হয় "ফাদার অফ্ ফুটবল।"

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর পিতা রায় বাহাদুর ডাঃ সূর্যকুমার সর্ব্বাধিকারীও ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম মিলিটারী সার্জ্জন হয়েছিলেন··এবং সিপাহী মিউটিনির সময় অসম সাহসে দুর্গ রচনা করে অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন! সূর্য্যকুমারের আট ছেলে···তার মধ্যে প্রথম নগেন্দ্রপ্রসাদ সকলের চেয়ে বলবান ও সাহসী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন! গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ বালককে দেখে সকলেই আশা করত এ ছেলে কিছু একটা করবেই! যখন তাঁর ১০ বছর বয়স, তখন থেকেই তিনি ভাল ঘোড় সওয়ার



হয়ে উঠেছিলেন···এই জন্য তাঁর বাবা তাঁকে একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন—এবং বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ রোজ ভোরে সেই ঘোড়া গড়ের মাঠে ছুটিয়ে বেড়াতেন! একদিন ওই রকম ঘোড়ায় করে বেড়াতে বেড়াতে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লার ধারে কয়েকজন প্রকাণ্ডকায় গোরাকে একটা গোল মত বল নিয়ে ছুটোছুটি করতে দেখে,—তড়াক করে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সেই খেলা দেখতে লাগলেন! ওইটুকু ছেলে তাদের ভয় পায় না দেখে—গোরারা তাঁকে আদর করে মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ইংরাজীতে বল্লে, "তুমি ইংরাজী বলতে পার?"

নগেন্দ্র প্রসাদ নির্ভয়ে বল্লেন "খুব পারি! তোমরা ওই গোল জিনিসটা নিয়ে কী করছ?—"

গোরাগুলি সব জাহাজের নাবিক ছিল! তারা বড় বড় যুদ্ধ করেছে; তাই বল্লে—"যুদ্ধের খেলা খেলছি···এই বল যুদ্ধ করে জিতে নিতে হয়।" বাংলার বীর বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর মনে তখনই বাসনা জাগল—এই যুদ্ধের খেলা তিনি খেলবেন! ফুটবল তখন এদেশে পাওয়া যেত না। তিনি বাবার কাছ থেকে ৪০৲ টাকা এনে গোরাদের সেই বল কিনে নিয়ে গেলেন! তিনি তখন হেয়ার স্কুলে পড়তেন! পরদিন টিফিনের সময় বালক নগেন্দ্র যেমন দেখে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে কয়েকজন সহপাঠিকে নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন। সেই অদ্ভুৎ খেলা দেখে হেয়ার স্কুলের সব ছাত্র আর পাশের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা অবাক হয়ে ভিড় করে দাঁড়াল! ছেলেরা কেউ পড়তে আসছে না দেখে তখন কলেজের প্রফেসাররা বাইরে বেরিয়ে এলেন···তাদের মধ্যে অধ্যাপক ষ্ট্যাফ ও অধ্যাপক গিলিগ্যানও ছিলেন! তাঁরা বিলাতের ফুটবল খেলা হেয়ার স্কুলের ছেলেরা খেলছে দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে মাঠে নেমে এলেন···এবং কি করে এই ঘটনা সম্ভব হ'ল তা জানতে পেরে···তখুনি নগেন্দ্র প্রসাদকে ক্যাপ্টেন করে ক্লাব তৈয়ারী ও খেলার নিয়ম কানুন ভাল করে শিক্ষা দিলেন। ক্লাবের নাম হল "হেয়ার স্পোর্টিং ক্লাব।" কলেজের ছেলেরাও স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্রমে দল ভারী করতে লাগল এবং ক্রমশঃ ওয়েলিংটন ক্লাব প্রভৃতি আরো কয়েকটি ক্লাব গড়ে উঠল! সবগুলিরই ক্যাপ্টেন হলেন বীর বালক নগেন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী!

তারপর দেখতে দেখতে তাঁর নাম বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ল··বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা দেশের বিভিন্ন শহরে বহু ক্লাব গঠন ও খেলোয়াড় তৈরী করতে লাগলেন। নিজেও একজন দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন··তখন বড় বড় সাহেবরাও মিলিটারী

গোরাদের নিয়ে এ দেশে ফুটবল প্রভৃতির ক্লাব তৈয়ারীতে মন দিলেন। তোমরা শুনলে অবাক হবে—যে নগেন্দ্রপ্রসাদ ততদিনের মধ্যে তাঁর অন্য ছোট ছোট ক্লাবগুলি থেকে বাছাই করে খেলোয়াড় নিয়ে—"শোভাবাজার ক্লাব" তৈয়ারী করে ফেলেছেন! এই শোভাবাজার ক্লাব তখনকার দিনে মোহনবাগান ক্লাবের মতন জনপ্রিয় একমাত্র ক্লাব হয়ে দাঁড়াল—যখন তারা সেখানের আই এফ, এ শীল্ডের মত একমাত্র ট্রফি "ট্রেড্‌স্ কাপ" দুর্দ্দান্ত গোরাদের হারিয়ে জিতে নিয়ে-এলেন! সমস্ত সাহেব ক্লাবগুলি নগেন্দ্র প্রসাদকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তাইতেই সন্তুষ্ট হলেন না···তিনি কোচবিহার মহারাজার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, মহারাজার টাকা এবং নগেন্দ্রপ্রসাদের পরিশ্রম এই দুই মিলে ট্রেড্‌স্ কাপ ট্রফির সৃষ্টি এবং তার দ্বারা বিলাতী সাহেবদের সমকক্ষ বলে নিজেদের প্রমাণ করতে পেয়ে·····নগেন্দ্র প্রসাদ দেখলেন—সমস্ত ভারতীয়কে একত্র করে একসঙ্গে মিলিয়ে নেবার সঙ্গে খেলার মাঠের মতন এমন চমৎকার রাস্তা আর নেই! আর তা ছাড়া—সাহেবরা দেশী লোককে সব তাতে ঘৃণা কোরত—একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে চাইত না! তাদের সে গুমোরও ভাঙবার এই এক রাস্তা! কংগ্রেসের সবে মাত্র তখন পত্তন হচ্ছে জনসাধারণ তার কিছুই জানেনা! এই সময়ে নগেন্দ্রপ্রসাদ দেশীদের মর্য্যাদা এবং এমন জাতীয়তা বোধ জাগিয়ে তুললেন—যাতে সাহেবরা তাঁর প্রবর্ত্তিত "ইণ্ডিয়ান ফুটবল এশোশিয়ন" স্বীকার করে ত নিলেনই—এবং সসম্মানে তাঁর নাম দিলেন—"ফাদার অফ্ ইণ্ডিয়ান ফুটবল।" আই এফ এর গঠন তিনি করলেন বটে কিন্তু নিজে তার ভেতরে গেলেন না—প্রথম ভারতীয় সদস্য হিসাবে তিনি পাঠালেন তাঁর এক সাক্‌রেদকে; তাঁর নাম ৺কালীচরণ মিত্র। কালীবাবু হলেন 'আই এফ এর' প্রথম ভারতীয় সদস্য! নগেন্দ্র প্রসাদের মতন দুর্দ্ধর্ষ Centre Forward তখন গোরাদের মধ্যেও বিরল এবং তাঁর গুরু গম্ভীর আদেশ মাঠের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠলে দেশী বিলাতী সব খেলোয়াড়ই তটস্থ হয়ে উঠতেন! শোভাবাজার ক্লাবের ক্যাপ্‌টেন এবং সেক্রেটারী নগেন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর নাম তখন লণ্ডনের লোকও জানতে পেরে গেছেন! তাই অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হল 'অষ্ট্রেলিয়ান ইলেভন্' ও 'শোভাবাজার ইলেভন' ক্রীকেট ম্যাচ! কলকাতা ইডেন গার্ডেনে এই খেলা হয়! 'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্', দাদাভাই নরোজী, স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রভৃতি সকলে এই খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা সহর ভেঙে পড়েছে তখন গড়ের মাঠে—এই ঐতিহাসিক খেলা দেখতে·····তোমরা শুনলে আনন্দিত হবে যে এই খেলাতেও জিতল শোভাবাজার ক্লাব এবং স্কীপার হলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী! বিলাতের লর্ড হক্ তাঁকে চিঠি লিখলেন—"আজ আপনার জয়ে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হল! আপনি বহুদিন থেকেই এত দূর দেশেও সুপরিচিত—"



সাহেবরা মানুষকে খাতির করলে তখন ঠিক ভাবেই করে! সেইজন্য শোভাবাজারের ক্লাবের মধ্যমণি নগেন্দ্রপ্রসাদকে সম্মান দেখাতে কলকাতার গঙ্গায়—যুদ্ধ-জাহাজ "রোডেসিয়ায়" তাঁকে নিয়ে গিয়ে ডিনার দেওয়া হয়েছিল! বাঙ্গালীর ছেলের এত খাতির সাহেবরা এর আগে বোধ হয় আর কখনো করেনি।

তোমরা যেন মনে কোরো না—নগেন্দ্রপ্রসাদ শুধু খেলা ধূলাতেই বাহাদুর ছিলেন! তা নয়—তিনি হাইকোর্টের এটর্ণী হয়েছিলেন,···এবং ইংরাজী বাংলায় এতদূর পণ্ডিত ছিলেন যে তিনিই প্রথম মহামতি শেক্‌শ্‌পীয়রের সব বইগুলির বাংলা অনুবাদ করে গেছেন! তার প্রথম অনুবাদ বইয়ের নাম "ঝঞ্ঝা"! এ ছাড়া আর একটি আশ্চর্য্য কাজ তিনি করেছিলেন। বাঙালীকে পল্টন তৈরী করতে তিনিই প্রথমে কেল্লায় বন্দুক শিক্ষা করাতেন! তাঁর শ্বশুর বাড়ী শোভাবাজার রাজবাটি থেকে প্রায় ১০০ বন্দুক নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে তাঁর ছেলেদের বন্দুক ছুঁড়তে শেখাতেন···কিন্তু বিশেষ কারণে গভর্ণমেণ্ট একাজ বন্ধ করে দেন! কিন্তু তাতেও তিনি হাল ছেড়ে না দিয়ে জীবনের শেষ দিন অবধি একটির পর একটি ছেলের দল করেন, তার নাম "নারায়ণী সাধন চক্র।" এই দলে যারা যুদ্ধ বিদ্যা শিখত তাঁরা এখন অনেকে বড় বড় লোক হয়েছেন! এই নারায়ণী সাধন চক্রের ছেলেরাই পরে 'বাঙ্গালী পল্টন' বা 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোর' তৈরী করে গত জার্ম্মাণ যুদ্ধে গিয়েছিল। এই সেবা সৈনিকদল পাঠাবার কর্ত্তা হলেন নগেন্দ্র প্রসাদের চতুর্থ সহোদর লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

৭০ বৎসর বয়সে নীরোগ শরীর নিয়ে যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তিনি প্রথম খেলাধূলা করতেন, সেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করে বাড়ী এসে বলেছিলেন "কালকে আমি মারা যাব।" তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে কেউ একথা প্রথমে বিশ্বাস করেনি! কিন্তু ভোর বেলা তাঁর মেজছেলে মনুজচন্দ্রকে ঘুম থেকে ডেকে তিনি বল্লেন—"চল্লুম!" সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ বার হয়ে গেল!

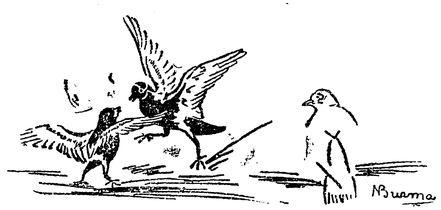

## ইউরেকা

রাখাল তালুকদার

দুইদলে রেষারেষি কাণ্ড !

হাইড্রোজেন পরমাণুদল ও অক্সিজেন পরমাণুদল থাকবে এক ঘরে, অথচ বাদ সাধবে সর্ব্বক্ষণ। বিবাদ সুরু হোল একটি চওড়া শক্ত-সমর্থ বোতলের মাঝে দুইদল একত্র ছাড়া পেয়ে। বোতলের ছিপির সাথে লাগাও রয়েচে দুটি তার—পজিটিভ ও নিগেটিভ ; হাঁ ধর্ম্মী ও না-ধর্ম্মী বৈদ্যুতের সঞ্চরণ মার্গ। পরমাণুদল এসে হুটোপুটি ক'রে কাচের দেয়ালের ওপর মাথা ঠুকে মরছে, তালগোল পাকিয়ে উঠচে তাদের মতবিভেদ। হাইড্রোজেন—হাল্কা, বর্ণহীন ভারিক্কি অক্সিজেন পরমাণুদলের ওপর গা-ভর করতে যাচ্ছিলো ; আপত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, হ'তে না-হ'তেই লাগলো হাতাহাতি—লড়াইয়ের ছোটখাটো মহড়া।

আগাগোড়া ঘটনাটির সংস্থান হোল বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিসের ( Cavendish ) প্রেক্ষণাগারে। হাইড্রোজন আগুনে পোড়ে নিঃশেষ হয়ে ; অক্সিজেন স্বভাবত অদাহ্য, ফুঁইয়ে ফাইয়ে আগুনকে উস্কানি দেয় এমন ভাবে যে, নিজের গায় একটু আঁচও লাগতে পারে না। বিজ্ঞানী করলেন পজিটিভ ও নিগেটিভ তারের সংযোজনা, অমনি আচম্‌কা বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সশব্দে চারদিক কেঁপে উঠলো। 'ঘরভেদী বিভীষণ' পরমাণুদের দেহরক্ষা ঘটলো। বিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কার ঘোষণা করলেন।—বোতলের তলাকার একবিন্দু জল দেখিয়ে তিনি বললেন যে, জল মৌলিক পদার্থ বলে এতদিন পরিজ্ঞাত ছিলো; সে মৌলিক নয়—যৌগিক। সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি পদার্থের সংঘাতেই এ'র উৎপত্তি ; ওজন হিসাবে প্রত্যেক ১৮ ভাগ জলে ১৬ ভাগ অক্সিজেন ও ২ ভাগ হাইড্রোজেন থাকে। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটা অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে মিলে জলের একটা যৌগিক অণু উৎপাদন করে। এই একবিন্দু জল অনন্ত কোটি বিন্দুতে জলধির আকার ধারণ করেছে। বিজ্ঞানের জগতে এটা হোল একটি মূল্যবান আবিষ্কার।

বস্তুর ধ্বংস নেই—পদার্থেরও। সাগরের জল বাষ্পাকারে মেঘ হয়ে উড়ে যাচ্চে ; পথের সমুখে দাঁড়িয়ে আছে গগন-বিসর্পি পর্ব্বত, উড়ে আসতে সে হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে



পড়লো তার ওপর ; বরফ হয়ে জমে আবার গলে, পাহাড়ীয়া নদীনালা দিয়ে সমতলভূমির বিস্তৃত নদীতে এ'সে সেই সাগরের সঙ্গেই যোগ স্থাপন করলো।

প্রাকৃতিক জল চার প্রকারের ! বৃষ্টিজল, প্রস্রবণ জল, নদীজল ও সমুদ্রজল। বিশুদ্ধ জল প্রকৃতির পানীয়শালায় নেই। মানুষ প্রকৃতিদত্ত জলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে করেছে বিশুদ্ধ। সাগরের জল পরিষ্কার, কিন্তু এর ভেতর গলে-যাওয়া পদার্থের ভাগ বড্ড বেশি। আদ্যন্ত কাল ধরে সে পৃথিবীর নদীনালা বুকে নিয়ে সোহাগ জানিয়েছে এবং ময়লা ধুয়ে এসেচে—তবুও সে অমলিন। তামার ভাগ বেশি ব'লে সাগরের জল নীল দেখায়। প্রকৃতির সব কয় রকম জলই কড়া জলের বিরোধিতা করে। কোমলত্ব এর স্বভাবে রীতিতে ; মানুষ তবুও নিজের প্রয়োজনে সুবিধামাফিক কড়া কোমল করে নিচ্চে। এর পরতে পরতে সাম্য ; সমতা রক্ষা করাই হোল এর ধর্ম্ম।

বিজ্ঞানের সাধনা হ'চ্ছে প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়। প্রকৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত, সে ভাণ্ডারের খোঁজ সাধারণ চর্ম্ম চোখে ধরা পড়ে না, পড়ে বিজ্ঞানীর জ্ঞাননেত্রে। বিজ্ঞানীদের মতে বিশুদ্ধ জলের স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, বর্ণ নেই। এ' স্বচ্ছ, আলোর দিগ্বিজয়ী গতি পথে বাধা দেয় না। বিদ্যুৎ ও তাপের ঠাঁই এ'তে কম। হাওয়ার মতো এ' সঙ্কুচিত হয় না, চাপ দিলে বিভিন্ন মুখে পা বাড়ায়। উপর থেকে নিচে গড়ায়, বাষ্পের খোলসে এ' আবার দিব্যি হাওয়া-গাড়িতে স্বচ্ছন্নবিহার করে আকাশ পথে। বিরুদ্ধতা করবার ক্ষমতা এর নেই বললেই চলে, যেমনটি থাকতে বলবে থাকবে, নড়ন-চড়ন-নট্‌পটং ? এই যেমন গেলাসে একটু জল গড়িয়ে নিলে, অমনি দেখতে পেলে গেলাসকেই সে তার শরীরের আদল ক'রে নিলে। তবু তার পালাবার মতলব সব সময় বর্ত্তমান। সব দিকে সে অদৃশ্যচাপে নিজেকে সজাগ রাখে, একটু ফুটো বা অসামর্থ্য দেখনে পেল ত ব্যস্, পালাবার বুদ্ধি খেললো। এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন বিজ্ঞানী পাস্কাল। কোন পাত্রের আবদ্ধ তরল পদার্থের ( জল ) ওপর চাপ দিলে সেই চাপ অপরিবর্ত্তিত হয়ে নানাদিকে প্রযুক্ত হয়ে পড়ে। 'হাইড্রোলিক প্রেস্' এই নিয়মে বিরাট বিরাট গাঁট গাঁটরি বাঁধাবার কাজে লাগে। তরল পদার্থ ( জল ) ওপরে, নিচে, পাশে - সব দিকেই চাপ দেয়। গভীরতা অনুসারে এই চাপ বাড়ে বা কমে। জলের ভেতরকার যে কোন স্থানে উপরের চাপ বা নিচের চাপ সমান থাকে। নদীর জলে ডুব দিলে দেখবে কে যেন ঠেলা মেরে ওপরে তুলে দেয়, আর সারা শরীর ভারী হাল্কা বোধ হয়। জলে ভোবানো জিনিসের ওজন কি পরিমাণে কমে তার নির্ণয় নিয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। আর্কিমেডিস ( Archimedes ) ছিলেন সিসিলি দ্বীপবাসী—পাগলাটে বিজ্ঞানী। তাঁর কাছে একদিন সেই দ্বীপের রাজার একটি অদ্ভুত ফরমাশ এল—রাজার সোনার মুকুটটির

খাঁটিত্ব প্রমাণ করবার জন্য। স্যাকরাকে তখন থেকেই যেন অবিশ্বাস করবার ধুয়া মানুষের মনে সংক্রামিত হয়ে পড়েছে। মুকুটটি আগুনে না গালিয়ে কেমন করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, ভাবছিলেন তিনি এই রকম ক্ষ্যাপামির কথা। সত্যি তো, কেমন করে সম্ভব! প্রথমে তিনি তৈরি করলেন ( অবশ্য রাজারই খরচায় ) সমান আয়তনের দুখানা ইঁট—একখানা সোনার আর একখানা রূপার। এবং মেপে দেখলেন যে, দুখানার আয়তন এক হ'লেও, ওজন সমান নয়। সোনার ইঁটখানা প্রায় দ্বিগুণ ভারী। মুকুটটির সমান আয়তন বিশিষ্ট খাঁটি সোনার ইঁটের ওজন যদি মুকুটের সমান হয়, তাহ'লে মুকুটের সোনা খাঁটি; আর মুকুটের ওজন যদি কম হয়, তাহ'লে উহা সোনা মিশ্রিত। কিন্তু মুকুটের আয়তন কিরূপে পাওয়া যায়, এই হোল সমস্যা। মহাফাঁপরে তিনি প'ড়ে গেলেন। একদিন তিনি স্নান করতে গিয়ে কানায় কানায় ভর্ত্তি চৌবাচ্চার জলে ডুব দিলেন। ডুববার সময় খানিকটা জল চৌবাচ্চা থেকে ছল্‌কে পড়ে গেল। জল হ'তে তিনি উঠে দেখলেন যে, চৌবাচ্চাটা আগের মতো ভর্ত্তি নয়—বেশ খানিকটা খালি। আবিষ্কারের নেশায় তাঁর মন মশ্‌গুল, ভুলে গেলেন তিনি তখন কি বেশে ছিলেন—ছুটে পড়লেন তিনি রাজপথে বেরিয়ে প'ড়ে বলতে বলতে—ইউরেকা, ইউরেকা—আমি পেয়েচি—আমি পেয়েচি—

রাজার কাছে গিয়ে তিনি হাজির। মুকুটটির আয়তন তেমনি করে পাওয়া গেল। তারপর তিনি মুকুটের সমান ওজন বিশিষ্ট একখানা রূপার ও একখানা খাঁটি সোনার ইঁট তৈরি করলেন। সোনার ইঁটখানা জলে তেমনি ভর্ত্তি চৌবাচ্চায় ডুবালেন, খানিকটা জল পড়ে গেল; আবার রূপার ইঁটখানা ডুবালেন, যে জল উপচে পড়লো তা আগের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু মুকুটটি জলে ডুবালে, যে জল পড়লো, তার পরিমাণ প্রথম ও দ্বিতীয় জলের পরিমাণের মাঝামাঝি। এ' থেকে প্রমান হোল, মুকুটের সোনার সঙ্গে রূপা মিশোল আছে। স্যাকরা ধরা পড়লো, জালিয়াতির জন্য রাজা তাকে শাস্তি দিলেন।

এমনি কতো খ্যাপা বিজ্ঞানী প্রকৃতির ভাণ্ডার উন্মোচনের জন্য আনাচ-কানাচ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। প্রকৃতির পরদার আড়ালে কত কী কাণ্ড ঘটচে! প্রকৃতি যেন আশ্চর্য্য নিপুণতায় ঘরকন্না করে। মানুষের মন খোঁজে আর ভাবে। 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর': বিজ্ঞানই হোল সেই পরশ-পাথর।

———

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একে পুত্রের জ্বালা, তাতে পিত্তের জ্বালা! বুকের জ্বালার পরে ভূখের জ্বালা। তদুপরে অকাল-নিদ্রাভঙ্গে চোখ-জ্বালা। আবার জ্বালার উপর জ্বালা, নর-বানরের দাপট! শুনে গায়ের জ্বালাতে জ্বলে উঠে কুম্ভকর্ণ অন্তঃপুর ছেড়ে বার হল যেন শ্বেত দ্বীপের আগ্নেয়-পর্ব্বত!

যুদ্ধেতে আগায় কুম্ভকর্ণ একেশ্বর
মাথায় ঠেকেছে নবজলধর।
আকাশের চন্দ্র খসে, বায়ু মন্দগতি,
সে যে রক্ত বরিষণ, কাঁপে বসুমতি।
অমর আকাশে কাঁপে, সাগর উথলে,
গড় ডিঙায়ে বীর, যুদ্ধং দেহি বলে!
গভীর গর্জ্জনে কম্পে চরাচর—

বাস্, আর কে কোথায় আছে—গোঁদা ভোঁদা কপিগণ নাচা কোঁদা লম্ফ-ঝম্প রেখে এ ওকে ঠেলে কে কার ঘাড়ে পড়ে! ঘাঁটি ছেড়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন চেষ্টা—তেষ্টার গলা কাঠ! কে ছোঁড়ে গাছ পাথর—অবশ হাত!

ভয়ে নল-নীল লাল নীল অকস্মাৎ,
গয়-গবাক্ষ নিখিলিতাক্ষ লেগে দাঁতে দাঁত!
জাম্বুবান কম্পজ্বরে কম্পবান,
হনুমান স্মরেন, রাম রাম!
অঙ্গদের অঙ্গ থথর, সুগ্রীব বানর গ্রীবাদেশে হাত বুলান,
রাম লক্ষণ বিভীষণের পানে চান!
কোমর ভাঙা বিভীষণের হৃদ্‌কম্প
ভাবে মেজদাদা বুঝি ফরসা করে কম্ম
বড় দাদার লাথিতে কোমর টন্‌টন্,
মেজদাদার চাঁটিতে বুঝি গুঁড়ায় বদন!

মর্কটের দল কর্কটের প্রায় কেবলি পাছু হাঁটে, ভিজা বালি খুঁড়ে চায় তলাতে। রাজ-জামাতা বিঘত সেতুর পরে উঠে চট্‌পট্ বঙ্গভূমির তটমুখে চান পলাতে!

পালাবার আর অবসর হলনা। কুম্ভকর্ণ এসে, কোনো কথা নয়, মুঠো মুঠো মুড়ি মুড়কীর মতো সব একদম দুই গরাসে পার—রণক্ষেত্র ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার! বিভীষণ বেঁচে গেলেন রাম্পোলের তলায় লুকিয়ে। বিঘত্ বানর বেঁচে গেল পোলের পর দিয়ে দেশ মুখে লম্বা দিয়ে। এই তারপর লাগল মজা—জিবে-গজা!!

কুম্ভকর্ণের কাণ্ড দেখে রাবণ কুতুহলী,
রাক্ষসে খোক্কসে মিলে করে কোলাকুলি।
এমন ভাই থাকতে কারে আর শঙ্কা,
লঙ্কার বাজারে বাজে রণ জয় ডঙ্কা!

এমন সময় হঠাৎ, জয়-রাম-ধ্বনি হনুমানের গগন ভেদ করে উঠল।

এককালে যত কপি ছাড়ে সিংহনাদ,
লঙ্কায় রাবণ-রাজা গণিল প্রমাদ!

তখন লঙ্কায় জয়-ডঙ্কা সুর ফিরিয়েছে—"মরিলে না মরে, এ কেমন অরি!"

রাবণ, "কি হলো" বলে শশব্যস্ত। মহোদর তাঁকে বোঝাচ্ছেন—"মহারাজ উতলা হবেন না। শত্রুপক্ষে মাজুকর্ত্তার পেটে তলাতে তলাতে 'জয়রাম' ডাক ছাড়ছে প্রাণের দায়ে।"

রাবণ বলছেন—"না হে, রাম-জয় শব্দে লঙ্কা করে টলমল; স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপিল, কাঁপিল রসাতল! এ তো পেটে তলাবার কাতর ধ্বনি বোধ হচ্ছেনা।"

—"আজ্ঞে তাই তো বোধ হচ্ছে।" বলে মহোদর সটকালেন।

এদিকে তো এই ব্যাপার, ওদিকে আর এক তামাসা—

'কুম্ভকর্ণের মুখ-বিবর ঘোর অন্ধকার,
দন্তগুলা যেন শিক বাঘের খাঁচার।'

তার মধ্যে সকটক রাম-লক্ষণ ধরা পড়ে বলছেন—'বল বল মহাবীরগণ কেমনে এখন হই উদ্ধার?"

হনুমান বলেন, প্রভু না করিবা ত্রাস,
গলদেশে তলালে পথ হইবে প্রকাশ।

আর সব বানরেরা বলছেন

"আরে ভাই, দেখিতে না পাই কিছু, যাই কেমনে,
দাঁত ভাঙ মুষ্ট্যাঘাতে ভাব কি কারণে!"

সুগ্রীব মুষ্টিযুদ্ধে পাকা, তিনি প্রথম করলেন দাঁতের পাটিতে মুষ্ট্যাঘাত। চটাও খসলোনা একটি দাঁতের; সুগ্রীবেরই হাত দিয়ে ঝর ঝর রক্তপাত।



রাম বল্লেন রক্ত বাণে ওড়াবো দাঁতের গোড়া। সরে দাঁড়া তোরা। সবাই সরে দাঁড়ালো তখন।

যে-বাণে সপ্ততাল হয়েছিল ভেদ,
সেই বান ছাড়লেন রাম দাঁতে করতে বেধ
রামের ঐশিক বাণ, তারা যেন ছুটে!
খড়্কির সমান কুম্ভকর্ণে ফিরলো দাঁত খুঁটে!
লক্ষ্মণ বলেন দাদা বিপদ বিলক্ষণ,
করা যাক যা বলেন মহাবীর হনুমন!
লক্ষণের বাক্যেতে সাহসে করি ভর
ধাপে ধাপে সবে নামে গলার ভিতর।
পথ দেখাইয়া হনু আগেতে চলিল,
সকল বানর তার পাছে গোড়াইল।
যে হোক সে হোক বলে সাহসে করি ভর
লেজ ধরাধরি যায় সকল বানর।
শত গজ গল নালী হল যখন পার
দুই কানের ছেঁদা দুই নাকের ছেঁদা দেখে পরিস্কার।
লাল নীল কাঁচ আঁটা য়েন চক্ষু তারা
লণ্ঠন জ্বেলেছে যেন পথের পাহারা।

ততখন দুই চোখ বাণে ফুটিয়ে রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই বেরিয়ে নাকের ডগায় বসলেন। ছোট খাটো বানর নাকের ছেঁদা দিয়ে গলে পড়ে গোঁফ ধরে ঝুলে পড়লো। বড় বড় বানর দুই কানের কর্ণ পটহ কিলে ফাটিয়ে কুম্ভকর্ণের কন্ধে চেপে বসলো। লক্ষ্মণ এই সময় বীরত্ব ফলালেন—খড়্গ বার করে এক চোপ কুম্ভকর্ণের নাকে। হনুমান বলেন—"করলে কি!" বলে দুজনকে ধরে ফেল্লেন; না হলে নাকের সঙ্গে আকাশ থেকে হঠাৎ হতেন পপাৎ দুই ভাই। হনুমান কুম্ভকর্ণের টিকি ধরে মাথায় চড়ে বসলেন রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে। স্থির হয়ে হনুমান লক্ষ্মণকে বল্লেন—"যে ডালে বসো ভাই, সেই ডাল কাটে!" রাম বল্লেন—"ভায়া নাক কাটতেই শিখেছেন।"

এত কাণ্ড হচ্ছে কুম্ভকর্ণ কিছুই জানেনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোন বানর কেশ ছিঁড়ছে পড় পড়,
কেউ মারছে দুগালে চড়,
কেউ উপড়াচ্ছে গোঁপ দাড়ি
লক্ষ কোটি বানর কামড়াচ্ছে চিমটাচ্ছে
যেন লাল কালো পিঁপড়ায় সারি!

কুম্ভকর্ণের সাড়াই নেই—

সকল গা বেয়ে পড়ছে শোণিত
লোমে লোমে ঝোলে বানর, দেখতে বিপরীত !

রাম লক্ষ্মণ হনুমানের দুর্গতির সীমা নাই—কুম্ভকর্ণের তেলা মাথার চড়ে চলতে গেলে পিছলে পড়েন ! তখন রাম বুদ্ধি করে কুম্ভকর্ণের ব্রহ্ম তেলায় মারলেন ব্রহ্মবাণ !

—'ব্রহ্ম অস্ত্র বাণ না হয় অন্যথা !'

ব্রহ্মবাণ এস্‌পার ওস্‌পার টিউব ওয়েল কেটে বার হয়ে গেল। তেলোর ফুটো দিয়ে ভল্ ভল্ ঘী রাম লক্ষ্মণের গা ভাসিয়ে দিলে। কুম্ভকর্ণ দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে মলো।

—'জয় রাম' বলে হনুমান এই সময় রাম লক্ষ্মণকে বগলে করে লাফ দিয়ে নামলেন। মাটিতে পড়েই এক নাথ কুম্ভকর্ণের বুকে -রক্ত শূণ্য হাল্কা যেন সোলার গড়া বিকট একটা সং উল্টে পড়লো—চোখেও দেখা নেই, কানেও শোনা নেই, নাকেও নিঃশ্বাস নেই। সোলার গাছ চাপা পড়েই কত মর্কট খোঁড়া হল তার ঠিক নেই, সেই তবু তারা নেংচাতে নেংচাতে বল্লে—

"জয় রাম, পেলাম নিস্তার,
আর যত বীর আছে, মোসবার ভার !"

এতক্ষণ বিভীষণ লুকিয়ে ছিলেন। এইবার নুড়ো জ্বালিয়ে আগালেন, মায়া কান্না কাঁদতে কাঁদতে—"ভাইরে, ভাইরে, তুই কি নাই রে, মরে যাই যে !" বলে কোমরে হাত বোলান কোঁতান আর বলেন—

"রাম নাম সার,
রাম বল রাম বল, পেলেম নিস্তার।"

এই বলে চাঁই বুড়ো কথা রাখলেন সেদিন।

# ভগবানের চাবুক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

## তৃতীয় অধ্যায়

### ভারতের দ্বারে প্রথম বার

মরুভূমি—আরক্ত, অনুর্ব্বর, বিপুল শূন্যতার রাজ্য ! তারই বুক-চেরা পায়ে-চলা পথে রাঙা মাটির প্রলেপ—রোদের তাতে পুড়ে শুকিয়ে, ফেটে চৌচির ! দুপুরের বাতাস গরম ফুঁ দিয়ে হু-হু ক'রে বালি ছড়িয়ে এমন উড়ন্ত যবনিকার সৃষ্টি করে যে, প্রভাত ও বিকাল ছাড়া অন্য কোন সময়ে তার ভিতর দিয়ে নজর চলে না।

কিন্তু এ আসল মরুভূমি নয়। কারণ এরই মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় শুষ্ক নদীর বাঁকা রেখা—তারা এগিয়ে গিয়েছে বৃহত্তর নদী আমু-দরিয়ার কোলের দিকে। এ-সব নদীর ধারে ধারে ছোট ছোট লতা গুল্ম ও শরবন দেখা যায়। মাঝে মাঝে পাওয়া যায় কূপ। সে-সব কূপের জল মানুষের ব্যবহারযোগ্য না হ'লেও, জন্তুরা তা পান করে সাগ্রহেই। এবং যেখানে যেখানে জল কতকটা চলনসৈ, সেখানেই তুর্কী-জাতীয় যাযাবররা তাঁবু ফেলে ব'সে থাকে—দলে-হাল্‌কা পথিকদের সাংঘাতিক অভ্যর্থনা করবার জন্যে !

স্থানীয় ভাষায় এই মরু-প্রান্তরের নাম হচ্ছে, 'রাঙা বালি'।

পলাতক তৈমুর নিলেন এই রাঙা বালির আশ্রয়। সঙ্গে তাঁর সহধর্ম্মিণী আল্‌জাই এবং জন-কুড়ি বিশ্বস্ত অনুচর। প্রত্যেকেই অশ্বারোহী ও সশস্ত্র।

দিন-কয় পথ চলবার পর এইখানেই তৈমুর তাঁর শ্যালক আমীর হুসেনের দেখা পেলেন। তিনিও পলাতক ও রাজ্যহারা। হুসেনেরও সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী বিখ্যাত সুন্দরী দিল্‌সাদ্ আগা। এবং এ দলেও কয়েকজন সৈনিক ছিল।

তৈমুর প্রথমে খিভা সহরের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু সেখানকার শাসনকর্ত্তা তাঁদের আশ্রয় না দিয়ে করলেন সসৈন্যে আক্রমণ !

তৈমুর ও হুসেন আত্মরক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা পাহাড়ের বা গিরিসঙ্কটের উপরে গিয়ে উঠলেন। শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশী হ'লেও তৈমুরের অধীনস্থ তাতাররা একটুও

ভয় পেলে না – কারণ ঘোড়ার পিঠে আসন পেতে ধনুক-বাণ ধরতে পারলে তাতার সৈনিকরা যমের সঙ্গেও লড়তে পিছপাও নয়!

তাতারদের এক কোমরে থাকে ছিলা-জোড়া ধনুক ও আর এক কোমরে বাণ-ভরা তূণ। তাদের ছোট ছোট ঢাল বাঁধা থাকে উপর-হাতে এবং তরবারি বা গদাও তারা সঙ্গে রাখে। কিন্তু অন্য অস্ত্রের চেয়ে তারা ধনুক-বাণ ব্যবহার করতেই বেশী ভালোবাসে।

বিকট চীৎকার করতে করতে তাতাররা শত্রু দলের ভিতরে গিয়ে পড়ল এবং বাণ ছুঁড়তে লাগল বৃষ্টিধারার মত। শত্রুরাও উত্তর দিতে ছাড়লে না। দেখতে দেখতে দুই পক্ষের অনেকগুলো ঘোড়া হ'ল আরোহীশূন্য।

তাতারদের মধ্যে একজন বীরের নাম এল্‌চি বাহাদুর। তিনি শত্রুদের মাঝখানে গিয়ে এমন বেপরোয়ার মতন লড়াই করতে লাগলেন যে, তৈমুর নিজে গিয়ে হাত ধ'রে তাঁকে টেনে আনলেন।

আমীর হুসেনও পড়লেন মহা বিপদে। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুদের পতাকাবাহীর উপরে গিয়ে প'ড়ে তাকে বধ করলেন বটে, কিন্তু শত্রু-ব্যূহ ভেদ ক'রে আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না। তৈমুর তাড়াতাড়ি তাঁকে উদ্ধার করতে গেলেন এবং শত্রুরা তখন হুসেনকে ছেড়ে তাঁকেই আক্রমণ করলে। সেই ফাঁকে হুসেন স'রে পড়লেন। তৈমুরের দুই হাতে যখন দুইখানা তরবারি শত্রুর রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে, অন্যান্য তাতার বীররা তখন তাঁর দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

তৈমুর চীৎকার ক'রে বললেন, "এইবারে সবাই দল বেঁধে এক সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ কর!"

হঠাৎ একটা তীরে আহত হয়ে হুসেনের ঘোড়া প্রভুকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। হুসেনের স্ত্রী বীরনারী দিল্‌সাদ্ তখনি নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে স্বামীর পাসে এসে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর ঘোড়ায় চ'ড়ে হুসেন আবার যুদ্ধে যোগদান করলেন।

এ-সব দিকে তখন তৈমুরের দৃষ্টি ছিল না, কারণ তাঁর প্রধান শত্রু খিজার শাসন-কর্ত্তাকে তখন তিনি সাম্‌না-সাম্‌নি পেয়েছেন! তখনি বেজে উঠল তাঁর ধনুকের ছিলা। এবং সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডদেশে আহত হয়ে শাসনকর্ত্তা হলেন পপাতধরণীতলে! পর-মুহূর্ত্তে অশ্বারোহণে নিপুণ তৈমুর ঘোড়ার পিঠ থেকে না নেমেই মাটির দিকে ঝুঁকে প'ড়ে একটা পরিত্যক্ত বর্ষা তুলে নিয়ে ভূপতিত শত্রুর বুকে দিলেন আমূল বসিয়ে!

নেতার শোচনীয় পরিণাম দেখে শত্রুরা পলায়ন করলে।

তৈমুর যুদ্ধে জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে বেঁচে ছিল তখন সাতজন মাত্র সৈনিক এবং তারাও প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর আহত।



তৈমুর কঠোর হাস্য ক'রে বললেন, "না, এখনো আমরা অদৃষ্ট-পথের শেষে এসে হাজির হইনি!"

পাছে শত্রুরা আবার দলে ভারি হয়ে আক্রমণ করতে আসে, সেই ভয়ে তৈমুর রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে অন্ধের মত অগ্রসর হ'ত লাগলেন।

তারপর আবার এল প্রভাত এবং আবার এল রাত্রি এবং আবার দিনের আলোর পর রাতের অন্ধকার! এর মধ্যে আরো নূতন নূতন দুর্ভাগ্যেরও অভাব হ'ল না। আমীর হুসেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দল ছেড়ে স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন। তৈমুরের সঙ্গে রইল মাত্র একজন অনুচর ও দুইটি ঘোড়া। মালবহনের জন্যে একটি ঘোড়া রেখে বাকি ঘোড়াটি স্ত্রীকে দিয়ে তৈমুর পদব্রজে চললেন মরুবালু দলন ক'রে।

জীবনে এর আগে যিনি পায়ে হেঁটে পথ চলেন নি এবং এর পরে যাঁর উপাধি হবে 'পৃথিবী-জেতা,' তাঁর দিকে তাকিয়ে আল্‌জাই বললেন, "স্বামী, আমাদের অদৃষ্ট এর চেয়ে মন্দ হ'তে পারে না!"

বারো দিন কাটল পথে বিপথে। তারপর হ'ল রাঙা বালির শেষ ও নূতন দুর্ভাগ্যের আরম্ভ।

সে অঞ্চলের সর্দ্দারের নাম আলি বেগ। পলাতক তৈমুরকে দেখে সে বুঝলে, এঁকে হস্তগত করতে পারলে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা। আলি বেগ তখনি তৈমুর ও তাঁর স্ত্রীকে একটা গোয়ালঘরে বন্দী ক'রে রেখে জাট মোগলদের কাছে দূত পাঠালে।

কীট পতঙ্গ ও দুর্গন্ধ ভরা জঘণ্য গোয়াল-ঘর। রাজার জামাই ও সবুজ সহরের কর্ত্তা তৈমুর এবং রাজার মেয়ে আল্‌জাই তারই ভিতরে ব'সে মরুভূমির তপ্ত হাওয়ায় পুড়তে পুড়তে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। এই ভাবে কাটল দুই মাস দুই দিন।

তৈমুর এমন কষ্টের কল্পনাও করেন নি কোন দিন। বিকৃত স্বরে তিনি বললেন, "দোষী হোক্ অরি নির্দ্দোষীই হোক্—জীবনে কারুকে কখনো আমি বন্দী ক'রে রাখব না!

এদিকে তৈমুরের মূল্য কত হওয়া উচিত, তাই নিয়ে জাট-মোগলদের সঙ্গে দর-কষা কষি করতে করতে আলি বেগ তার লাভের সুযোগ হারাতে বাধ্য হ'ল।

আলি বেগের দাদা ছিলেন পারস্য-দেশের এক সর্দ্দার। সমস্ত খবর শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে ভাইকে চিঠি লিখলেন, "জাট-মোগলদের সঙ্গে হয়েছে সবুজ সহরের কর্ত্তার ঝগড়া। এর মধ্যে তোমার মাথা গলানো উচিত নয়।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তৈমুরের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন অনেক মূল্যবান উপহার।

আলি বেগ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তৈমুরকে মুক্তি দিলে। দাদার পাঠানো উপহারগুলি বুদ্ধিমানের মত নিজের ভাগে রেখে তৈমুরকে সে দান করলে একটা বেতো ঘোড়া ও একটা বুড়ো উট।

এত দুঃখেও মিষ্টি হাসি হেসে আল্‌জাই বললেন, "স্বামী, এখনো আমরা পথের শেষে আসি নি!"

শরৎ-কালের বৃষ্টি এল—এই সময়ে আমু নদীর তীরে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে হুসেনের সঙ্গে তৈমুরের যোগদান করবার কথা।

কিন্তু তৈমুর একবার লুকিয়ে নিজের দেশটা দেখে আসবার লোভ সাম্‌লাতে পারলেন না। বিশেষ, একেবারে খালি-হাতে সঙ্গীহীন কাঙালের মত কুটুম্বের কাছে যাবার ইচ্ছাও তাঁর হ'ল না। হুসেন ছিলেন রীতিমত জাঁকী মানুষ। তিনি কেবল নিজেকে তৈমুরের চেয়ে বুদ্ধিমান নয়, উচ্চশ্রেণীর লোক ব'লেই মনে করতেন।

আল্‌জাইকে কাছাকাছি একটা গ্রামে লুকিয়ে রেখে ছদ্মবেশী তৈমুর এসে হাজির হলেন সমরখন্দ সহরে।

কিন্তু সেখানকার গতিক সুবিধার নয়। জাট-মোগলদের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সবাই সেখানে ভয়ে থরহরি কম্পমান। সমরখন্দের তাতরীরা চিরদিনই একজন যোদ্ধা নেতার অনুগামী হ'তে অভ্যস্ত। সাধারণ মুসলমানদের মতন তাদের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতার প্রভাব ছিল না—তারা বীরধর্ম্মে শিক্ষিত, যুদ্ধ ছাড়া আর কোন-কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইত না। যে নেতা তাদের বীর্য্যকে জাগ্রত ও বিজয়-গৌরবের পথে চালনা করতে পারতেন তারা হ'ত তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর।

কিন্তু তৈমুর হচ্ছেন যুবক ও সহায়সম্বলহীন। তাঁর অনুগামী হয়ে দুর্দ্দান্ত জাট-মোগলদের বিষ-দৃষ্টিতে পড়বার জন্যে তাদের আগ্রহ দেখা গেল না।

তবু কয়েকজন ডানপিটে লোক তৈমুরের সঙ্গী হ'তে রাজি হ'ল।

এর মধ্যে মোগলরা তৈমুরের পুনরাবির্ভাব আবিষ্কার ক'রে ফেললে। তৈমুর সঙ্গীদের নিয়ে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে চুপিচুপি সবুজ সহরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রিয় সবুজ সহর! এইখানেই তাঁর জন্ম এবং এইখানেই কেটেছে তাঁর স্বপ্নময় শৈশব ও আনন্দময় প্রথম যৌবন!

আমীর কাজ্‌গানের রণপ্রবীণ বাহাদুররা তখনো সবুজ সহরে ব'সে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল রক্তাক্ত অতীতের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। তৈমুরের আগমন-সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছতে দেরি লাগল না। ছুটে এল এল্‌চি বাহাদুর, জাকু বার্লাস্ প্রভৃতি বীরবৃন্দ।

তারা বললে, "তৈমুর, তৈমুর! ভগবানের ধরণী যখন এমন বিপুলা, তখন আমরা আর এই সংকীর্ণ সহরে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকি কেন?"

তৈমুর দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, "থামো বনবাগীশের দল! কী তোমরা করতে চাও? তোমরা কি বাজ-পাখীর মত শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে? না, তোমরা হচ্ছ কাক - জাট-মোগলদের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খেয়েই দিনের পর দিন কাটাবে?"



বাহাদুররা বললে, "ইয়ে আল্লা! আমরা কাক নই!"

নিজের ছোটখাটো দলটি নিয়ে তৈমুর চললেন হুসেনের সঙ্গে দেখা করতে। এ-দলের অধিকাংশ লোকই সৈনিক ব'লে আত্মপরিচয় দিতে পারে না—তাদের কেউ হচ্ছে বন্য তুর্কীজাতীয় লোক, কেউ-বা বিপদপ্রিয় আরব। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলতে তারা খালি বোঝে হানাহানি ও লুঠতরাজ! তারা সৈনিক হিসাবে উচ্চ শ্রেণীর না হ'লেও তৈমুর পা দিয়েছেন যে দুর্গম পথে, তার পক্ষে যোগ্য সহযাত্রীই বটে।

এ পথ দুর্ব্বলের পথ নয়। মাইলের পর মাইল, এমনি পাঁচশত মাইল ধ'রে এ নতোন্নথ পথ চলেছে সুদীর্ঘ পর্ব্বত শ্রেণীর ভিতর দিয়ে—সর্ব্বাঙ্গে নিয়ে মেঘচুম্বী শিখরের পর শিখরের ছায়া। গিরিসঙ্কটের মধ্যবর্ত্তী এক নদীর তীর ধ'রে এই উচল পথ উর্দ্ধে, উর্দ্ধে,—ক্রমে আরো উর্দ্ধে গিয়ে উঠে ডুবে গিয়েছে প্রায় দেড়ফুট পুরু তুষাররাশির মধ্যে এবং গিয়ে পড়েছে একেবারে আফগানিস্থানের বুকের উপরে!

মহাপর্ব্বতের হিমানী ক্ষেত্রের পর হিমানী-ক্ষেত্র! তুষারার্ত্ত ঝঞ্ঝাবায়ু হা-হা রবে বয়ে যায় অধিত্যকার উপর দিয়ে—ধ্বনি-প্রতিধ্বনি জাগিয়ে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে! সেইখানে পড়ে যাত্রীদের তাঁবু। দিনের বেলায় কোনদিকে ভালো ক'রে তাকানো যায় না—কারণ তুষার-ক্ষেত্রের উপর তীব্র সূর্য্যকর প'ড়ে লক্ষ লক্ষ তীক্ষ্ণ ছুরির জ্বলন্ত শিখার মত অন্ধ ক'রে দেয় দৃষ্টিকে!

ঘোড়াদের গায়ে পশমী আবরণ, মানুষদের পরোনে নেকড়ে ও নকুলজাতীয় পশুর চর্ম্মে প্রস্তুত পোষাক। মাঝে মাঝে স্থানীয় গিরিদুর্গের ভিতর থেকে ভেসে আসে প্রহরী ও কুকুরের চীৎকার। মাঝে মাঝে লোভী আফগানীরা হিংস্র জন্তুর মতন এসে হানা দেয়। কিন্তু তারা জানত না যে কোন্ শ্রেণীর বেপরোয়া গোঁয়ারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছে! প্রত্যেক বারেই তৈমুরের দল তাদের হারিয়ে যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়!

অবশেষে হিন্দুকুশের তুষার-মুল্লুক ছাড়িয়ে তৈমুর কাবুলের উপত্যকার ভিতরে গিয়ে পড়লেন।

কাবুলের সিংহাসন দখল করেছেন তখন জাট-মোগলবংশের এক ব্যক্তি। আমীর হুসেন স্বরাজ্য ত্যাগ ক'রে পলাতক।

ক্রমশঃ

( পূর্বানুবৃত্তি )

সেই জন্তুটি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন ব'লে উঠল, "ভয় পেয়ো না আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।"

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! টাইগার অর্থাৎ বাঘ! অথচ মানুষের মতো কথা বলে! যাই হোক বাঘের মুখে বাংলা কথা শুনে ভয় অনেকটা কেটে গেল। বাঘের উপর কৃতজ্ঞও হ'লাম কম নয়, কেননা বাঘ হিন্দি অথবা ইংরেজি না বলে খাঁটি বাংলা ভাষায় কথা বলেছে!

জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে কি ক'রে এলে? আর দেশ ছেড়ে এমন অদ্ভুত জায়গাতেই বা কেন এলে?"

বাঘ বল্‌লে, "তোমাদেরই মতো ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, এবং তোমাদেরই মতো এইখানে এসে পড়েছি।"

বাঘ খুব সহজেই কথাগুলো বল্‌লে, কিন্তু বুঝতে পারলাম আসল ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কিন্তু তখন আর বাঘের খবর শোনার খুব প্রবৃত্তি ছিল না। তখন যে কথাটা সব চেয়ে জরুরি সেইটেই জিজ্ঞাসা করলাম। ভয়ে ভয়ে বাঘকে বললাম, "বেরিয়ে যাবার কি কোনো পথ নেই এখান থেকে?"

"তোমাদের নেই, কিন্তু আমার আছে। আমি ইচ্ছে করলেই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে পারি, কিন্তু তোমরা তা পার না। বিশেষ ক'রে এই গহ্বরটা এমন, যে এর গায়ে নখ বেঁধানোও শক্ত। গাছ নেই, এক আধটা শিকড়ও নেই যা ধ'রে উপরে উঠতে পার।"—বাঘ দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলো বল্‌লে।

আমি বললাম, "তোমার বেরিয়ে যাবার পথ আছে তবে তুমি পড়ে আছ কেন?"

"আর বল কেন দাদা, দেশে ফিরব না ব'লেই দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। তারপর নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ে এসে পড়লাম। এইখানে এসে মনটা একেবারে বদলে



গেল। কেমন যেন একটা ধর্মের ভাব মনে জেগে উঠল। বরফের উপর ব'সে ব'সে একদিন নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। চিন্তা করতে গিয়ে দেখি ছেলেবেলা থেকে শুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত একটা ভালো কাজ কিছু করিনি।"

বাঘ একটুখানি থেমে আবার বলতে লাগল, "সমস্ত জীবন কেবল হিংসা ক'রে এসেছি। ছাগল, ভেড়া, হরিণ এই সব ধ'রে ধ'রে খেয়েছি, মানুষও কিছু কিছু খেয়েছি, আর দেশময় অত্যাচার ক'রে ফিরেছি। এই সব ভাবতে গিয়ে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল মনে বড় দুঃখ হ'ল। ভাবলাম আর এ সব করব না। হিমালয়ে যখন এসেই পড়েছি তখন এইখানে ব'সেই একটু সাধনা করব। জায়গাটা সাধনার পক্ষে বড় ভালো।" এই পর্য্যন্ত ব'লে সে আবার থামল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর কি হ'ল?"

রয়্যাল বেঙ্গল বলতে লাগল, "কিছুদিন এই বরফের মরুভূমির উপর সাধনা ক'রে বুঝতে পারলাম—নাঃ, এ তো কাজের কথা নয়! এখানে আমি না খেয়ে আছি বটে কিন্তু তাতে আমার বাহাদুরিটা কোথায়? এখানে খাবার কিছু মেলে না বলেই তো না খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি! হ্যাঁ, যদি আশেপাশে অনেক খাবার থাকত এবং তার মধ্যে না খেয়ে ব'সে থাকতে পারতাম, তবেই না বোঝা যেত আমার ক্ষমতা! এই সব ব'সে ব'সে ভাবছি, এমন সময় বরফ ভেঙে গড়াতে গড়াতে এখানে এসে পড়লাম।"

বললাম, "এখানটায় তোমার ধর্মসাধনা ঠিক মতো চল্‌ছে তো?"

"অদ্ভুত ভালো চলছে!" রয়্যাল বেঙ্গল বল্‌লে। "আজ প্রায় সাতদিন হ'ল এখানে এসেছি—সাতদিন কিছুই খাইনি। আমার যে খুব মনের জোর আছে এ থেকে তা বুঝতে পেরেছি। আর তাতে ফল হ'য়েছে কি জান? আমি ধর্মসাধনার পথে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পেরেছি। তোমরা যে এখানে এসে পড়েছ, এটাও আমার একটা পরীক্ষা। বোধ হয় ভগবানই তোমাদের পাঠিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে। ইচ্ছে করলেই—"

"না না বাঘ, তুমি কি বলছ!"

"শোন, গোলমাল ক'রো না। ইচ্ছে করলেই তোমাদের সবাইকে আমি খেতে পারি। তোমরা তিনজন আছ, তিন তিরিক্ষে ন'টা দিন তো আমার বেশ ভালো ভাবেই চ'লে যেত। বুঝতে পারছ?"

মণ্টু আর নিতাই আমার দুই হাত দুদিক থেকে চেপে ধ'রে ছিল। এই কথার পর আমার হাত দুখানা তাদের মুঠোর মধ্যে পিষে যেতে লাগল। ভয়ে তাদের মুঠো ক্রমেই লোহার মতো শক্ত হয়ে গেল। ভয়টা আমারও কম হয়নি। কি জানি যদি বাঘ ধর্ম-সম্বন্ধে

মত বদলায়! তা হ'লে আমাদের আর রক্ষা নেই। সে বলেছে আমাদের তিনজনকে ন'দিন ধ'রে খাবে! তাই ভয়ে ভয়ে তাকে বল্‌লাম, "ভাই বাঘ, ধর্ম ই পৃথিবীতে সব চেয়ে

ইচ্ছে করলেই তোমাদের খেতে পারি।

ভালো জিনিস। তোমার মতো হিংস্র একটি জন্তু যদি ধার্মিক হয়, তা হ'লে কেমন চমৎকার হয় বল দেখি!"

কিন্তু বাঘকে ধর্ম সম্বন্ধে বেশি কিছু বল্‌তে পারলাম না। তার কারণ, আমি নিজেই ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানি না। ইস্কুলে যে রচনার বই পড়েছি তাতে "সাধুতা" সম্বন্ধে একটি রচনা ছিল। মাত্র সেইটেই আমি জানতাম। কিন্তু বাঘ যে-ধর্ম পালন করতে চায়, যে-ভাবে সে না খেয়ে সাধনা করতে চায়, সে বিষয়ে সেই রচনা বইতে একটি কথাও নেই। কাজেই নিরুপায় হ'য়ে "সাধুতা" সম্বন্ধে যেটুকু জানি তাই বাঘকে বোঝাতে লাগলাম।

তাকে বললাম, "ভাই বাঘ, সাধু লোককেই সকলে ভালোবাসে। পরের জিনিসে লোভ করা, পরের জিনিস চুরি করা, এসব ভয়ানক অন্যায়। ধর তুমি যদি তোমার গুরুর কথার অবাধ্য হও এবং ক্লাসের পড়া ঠিক মতো মুখস্থ না কর—"

কিন্তু এই কথাগুলোও ভালো ক'রে বল্‌তে পারলাম না। আমি বুঝতে পারলাম, "সাধুতা" সম্বন্ধে যে রচনাটি আমার পড়া ছিল সেটাও ভালো মনে নেই। "ছাত্রের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে আর একটি রচনা পড়েছিলাম, তারই সঙ্গে গোলমাল ক'রে বাঘকে "ছাত্রের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বোঝাতে আরম্ভ করেছি!



অন্য সময় হ'লে নিজের ভুলে নিজেই হেসে অস্থির হতাম, কিন্তু বাঘের সামনে হাসার সাহস হ'ল না। আমি হাসতে পারলাম না, কিন্তু আমার কথায় বাঘ হাসতে লাগল।

মনে পড়ল একবার আমাদের ইস্কুলে 'ইন্‌স্‌পেক্‌টর' এসে আমাদের ক্লাসে পৃথিবী সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। নিতাই ভড়কে গিয়ে সূর্য সম্বন্ধে মুখস্থ করা রচনাটি আবৃত্তি করেছিল। আমারও আজ সেই দশা ইস্কুল 'ইন্‌স্‌পেক্‌টর' আর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারে যে কোনো তফাৎ আছে তা মনেই হ'ল না।

বাঘ হাসি থামিয়ে বল্‌লে, "আমি সব বুঝতে পেরেছি, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না! ছাত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তুমি যা বলতে চাইছ সেটুকু আমার জানা আছে।"

আমি ভরসা পেয়ে বল্‌লাম, "আচ্ছা, আর কিছু বলব না, তোমার তো অজানা কিছুই নেই। তা ছাড়া তুমি এই সাতদিন যে তপস্যা করেছ তাতে তোমার দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়েছে। কিন্তু ভাই বাঘ, তুমি যে আগে বলেছ এখানে এসে খাবার জিনিস পেয়েও তুমি তা খাও নি, সেই খাবার জিনিসটি কি? আমরা তো এখানে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! একটা ইঁদুরও এখানে নেই! তবে তুমি কিসের কথা বলেছ?"

বাঘ গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, "এখানে মানুষের গন্ধ পেয়েছি। আমার পাশে একটা বড় পাথর আছে, সেইটের ফাঁক দিয়ে শুধু মানুষের গন্ধ নয়, মানুষের শব্দও আমি শুনতে পেয়েছি! এই পাথরটা সরালে সেই মানুষের দেশে যাবার একটা পথ পাওয়া যাবে ব'লে আমার মনে হচ্ছে।"

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবু বাঘের প্রত্যেকটি কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস করছিলাম। বাঘ বল্‌তে লাগল, "ইচ্ছে করলে তোমরা এই পথে যেতে পার। আর, আমার মতে তোমাদের যাওয়াই ভালো, গেলে হয়তো সেখানে খেয়ে দেয়ে বাঁচতে পারবে। কিন্তু এখানে থাকলে তোমাদের বাঁচার আর কোনো আশাই নেই। যাবে? যদি যাও তো বল, পাথরটা একটু সরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ওখানে গিয়ে যদি মনে হয় কোনো বিপদে পড়েছ তা হ'লে আমাকে খবর দিও, যদি পারি তা হ'লে সাহায্য করব।"

বাঘের কথা শুনে আমাদের মনে যে কি আনন্দ হ'ল তা আর কি বলব! আমরা সবাই মিলে বাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। পরে শুনেছি, মণ্টু আর নিতাই অন্ধকারে বাঘের পা টিপে দিয়েছে, এমন কি, তার পিঠও চুলকিয়ে দিয়েছে। বাঘের প্রতি তাদের এমনি কৃতজ্ঞতা হয়েছিল!

ক্রমশঃ

# বটবৃক্ষে বররুচি

শ্রীইন্দিরা গুপ্ত

অনেক অনে – ক দিন আগের কথা - সে-ই বিক্রমাদিত্যের আমলের। তখন যেমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও গুণীর প্রাচুর্য্য —তেমনি রাক্ষস, খোক্কস, ভূত প্রেতেরও অভাব ছিল না। আবার তাদের ইচ্ছে সিচ্ছেগুলোও ছিল কেমন বিদ্‌ঘুটে রকমের! এই দেখনা এক রাক্ষসী হঠাৎ বায়না ধ'রে ব'সল যে রাজমাংস খাবে; সে কালের স্বামীগুলোও ছিল তেম্নি ভ্যাবা গঙ্গারাম—আশ্বাস দিয়ে বল্লে -'তাই এনে দেব'। তারপর একটা অভিসন্ধি এঁটে সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে রাজসভায় উপনীত হ'ল!

কালিদাস গেছেন তীর্থে - অবশিষ্ট আটটি রত্নে শোভিত মহারাজ বিক্রমাদিত্য গ্রহগণ পরিবেষ্টিত গ্রহরাজ আদিত্যের মতই প্রভা বিকীর্ণ করছেন। সাধুবেশী রাক্ষসকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন রাজা।

ছদ্মবেশী রাক্ষস পান ভোজনে তৃপ্ত হ'য়ে ব'লল, "রাজা, খাতির যত্ন ত যথেষ্টই হ'ল কিন্তু খেতেই ত আমি আসিনি, প্রশ্ন ক'রতে চাই।" মহারাজ বললেন -"বেশ, কর তোমার প্রশ্ন।"

—"কিন্তু না পারলে?"

রাজা হেসে বল্লেন—"প্রশ্ন তোমার, অতএব তুমিই বল' না পারলে?"

রাক্ষস অত সভ্যতার ধার ধারে না, সোজা সুজিই বল্‌ল—"না পারলে তোমায় ধ'রে নিয়ে যাব, বৌ তোমায় খেতে চেয়েছে।"

কৌতুক হাস্যে রাজা বল্লেন -"আচ্ছা নিয়ে যেও ধ'রে কিন্তু প্রশ্ন কি?"

"এখানে আছে, সেখানে নেই;
সেখানে আছে, এখানে নেই;
এখানেও আছে, সেখানেও আছে;
সেখানেও নেই, এখানেও নেই।"

'এই প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে না জানি, তবু সাতদিন সময় দিলাম" - এই ব'লে রাক্ষস ত বিদায় হল।

এখন বররুচি ছিলেন ওরই মাঝে ফিচেল বুদ্ধি পণ্ডিত—তিনি সাঁ ক'রে রাজসভা থেকে সরে পড়লেন। এবং চুপি সাড়ে রাক্ষসের পিছু নিলেন। রাক্ষস নগর ছাড়িয়ে মাঠে —মাঠ অতিক্রম ক'রে অজগর বিজন বনে ঢুকল! অলক্ষিতে বররুচিও পিছু পিছু



চলেছেন। গহিন বনের মাঝে বিরাট এক বটবৃক্ষ—তারই তলে রাক্ষসের কুটীর। রাক্ষস গৃহ প্রবেশ করল – বররুচি বটগাছে ঘন পত্রান্তরালে লুকিয়ে আড়ি পেতে বসে রইলেন।

শুধু হাতে রাক্ষসকে ফিরতে দেখে রাক্ষসীর ত মুর্চ্ছা হবার উপক্রম। আহা বেচারী! কত আশা ক'রেই আছে রাজমাংস খাবার উল্লাসে সবই ব্যর্থ হ'ল।

রাক্ষস প্রবোধ দিল—"সাতদিন সবুর কর, তারপর রাজমাংস খাওয়া কে ঠেকায়!"

রাক্ষসী নাকিসুরে বলল "সাতদিনই বা কেন? আজ আনলে কি হ'ত?"

"ওরে ক্ষেপি অত বড় রাজাকে কি এম্নি আনা চলে? একটা ধর্ম্ম বলে বস্তু ত আছে।"

"তা সাতদিন পরে ধর্ম্ম কোথায় যাবেন?"

"আহা ধর্ম্ম যাবেন কেন! প্রশ্নের উত্তর ত দিতে পারবে না। বাস, এনে খেয়ে ফেলা যাবে।"

সনিশ্বাসে রাক্ষসী বল্‌ল "হুঁ তুমিও এনেছ আর আমিও খেয়েছি। রাজার অত বড় বড় পণ্ডিত -তারা কত শাস্ত্র জানে। তুমি মুখ্যু আকাট, তুমি আর কি প্রশ্ন করবে তাকে?"

রাক্ষস ঘাড় নেড়ে বল্‌ল - "ওরে বুকি, সব সময়ে কি পাণ্ডিত্যের দরকার হয়, রাক্ষসী বুদ্ধির কাছে মা সরস্বতীও কখন কখন হার মানেন।".

"তা প্রশ্নটা কি, শুনি?

'সে তুই শুনে কি করবি? সব কথা কি মেয়ে মানুষের কাছে বল্‌তে আছে?"

রাক্ষসী নাছোড়বান্দা। অগত্যা সব খুলে বল্‌তেই হ'ল।

বররুচির মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় চুপি চুপি গাছ হ'তে নেমে পা টিপে টিপে রাক্ষসের এলাকা ছাড়িয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে সটাং রাজসভায় গিয়ে হাজির। সারা রাত্রির অনিদ্রায় ক্লান্ত স্তিমিত নয়ন, কাঁটা ছড়ায় সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত, বসন ভূষণ বিস্রস্ত বিপর্য্যস্ত। সবিস্ময়ে মহারাজা বললেন, "একি বররুচি? এমন অবস্থা কেন আপনার?"

"বড় অসুস্থ মহারাজ, সাতদিন বিশ্রাম চাই।" মহারাজ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

সাতদিন পরে রাক্ষস আবার এল রাজসভায়। বিক্রমাদিত্য রাজকার্য্যে ব্যস্ত, রাক্ষস বা তার প্রশ্নের কথা তাঁর স্মরণ ছিল না। এখন তাকে দেখে বিব্রতভাবে পণ্ডিতগণের প্রতি চাইলেন। পণ্ডিতরা অবশ্য ব্যাপারটা ভোলেন নি এবং সমস্যাটির সমাধান করবার জন্য প্রত্যেকেই যথাসাধ্য কসরৎ করেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। কাজেই মলিনমুখে ভূমি নিরীক্ষণ ক'রতে লাগলেন।

রাক্ষস সফলতার তৃপ্ত হাসি হেসে ব'ল্‌ল - "চল মহারাজ তা হ'লে—।" প্রশান্ত ভাবেই রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন।

"চল, এ নশ্বর দেহ একদিন ধ্বংস ত হবেই, কারও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হবে এই দেহে এ ত আমার পরম সৌভাগ্য।"

সভাসদগণের ভয়-করুণ চাহনির মাঝে রক্তবস্ত্র পরিধেয় রাজা রাক্ষসের অনুগামী হন, এমন সময়ে বররুচি সভা প্রবেশ করলেন। সবিস্ময়ে বললেন—"একি মহারাজ! কোথায় চলেছেন?"

রাক্ষস ভেংচে উঠল—"ন্যাকা! জাননা? রাজা যে হেরে গিয়েছে, উত্তর ত দিতে পারনি তোমরা।"

"বেশ—এখনও দুই দণ্ড সময় আছে, এরই মধ্যে নিয়ে যাবে কী? বল্‌ছি ভেবে—"

বররুচি কপাল কুঁচকে চিন্তার ভাণ করলেন, ক্ষণপরেই তাঁর মুখ হ'ল প্রফুল্ল—বল্লেন—সংস্কৃত করেই বল্লেন পণ্ডিত মানুষ কিনা—বাংলায় বল্লে তাঁর মান থাকে না—বল্লেন—

"চিরঞ্জীব রাজপুত্র, মা মর, মা মর,
মুনি পুত্র মা জীব মা জীব,
জীব বা মর বা সাধু,
ব্যাধ পুত্র মা জীব মা মর।"

অর্থাৎ—"চিরজীবি হও রাজপুত্র, মর না কখনও, কারণ তোমার সুখ যা, তা এখানেই, পরকালে তোমার কিছুই নেই। মুনি পুত্র বেঁচ না বেঁচ না, এখানে তোমার সুখ নেই, পরকালে আছে।

বাঁচা কিম্বা মরা দুইই তোমার সমান নির্ব্বিকার সাধু, তোমার সেখানেও যা, এখানেও তা। ব্যাধ পুত্র তুমি বেঁচনা, আর মরেও কাজ নেই, তোমার সুখ না এখানে, না সেখানে।"

উত্তরটা হুবহু ঠিক হওয়ায় রাক্ষস ভারী আশ্চর্য্য হ'ল।

"গভীর বনে, ঘরের কোণে,
কইনু গোপনে, জান্‌ল কেমনে?"

মুখের গ্রাস ছেড়ে দিতে হ'ল বলে রাগও কম হ'ল না, সে তখনি সভার এক প্রান্তে ব'সে খড়ি পেতে ব্যাপারটা জেনে ফেললে—তারপর চোখ পাকল ক'রে দাঁত কিড়মিড় ক'রে বল্‌ল—"ওঃ! বটে বররুচি।"

কিন্তু কি করে! প্রশ্নের উত্তর যখন মিলেই গেছে, আর ত কিছু বলা যায় না। হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতেই হ'ল।

---

# কাহিনী

## দৃষ্টান্তের প্রভাব

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ, (কেণ্টাব) বার-এট-ল

দৃষ্টান্ত যে সংক্রামক তার সুন্দর একটী উদাহরণ পাওয়া যায় হুমায়ুন বাদশার জীবনী থেকে। বাদশার কর্ম্মচারী জওহর তাঁর একটী জীবনী লিখেছেন। তাতে লেখক বলেন:

পাঠানদের সঙ্গে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাদশা পলায়নপর হলেন। হস্তী পৃষ্ঠে বড় একটা নদী অতিক্রম করে তীরের কাছে এসে বাদশা দেখলেন, স্থানটী অত্যন্ত উঁচু এবং দূরতিক্রম্য—দুর্গম এক দেওয়ালের মত সোজা সেটা দাঁড়িয়ে আছে। সেখান দিয়ে পাড়ে ওঠা একরকম অসম্ভব।

বাদশা কি করবেন ভাবছিলেন, এমন সময়, শাহি ফৌজের কতকগুলি রংরেজ (যারা কাপড়ে রং দেয়) তাঁকে দেখতে পেলো। তারা রংএর কাজে ব্যস্ত ছিল। বাদশার সঙ্কট দেখে তাঁর সাহায্যে তারা তৎপর হল। মাথার পাগড়ির কাপড় একত্রিত করে তারা প্রকাণ্ড একটা রশি তৈয়ের করলে আর সেই রশি জলে বাদশাহের কাছে নিক্ষেপ করলে। কাপড়ের সেই রশির সাহায্যে বাদশা তীরে উঠলেন।

রংরেজরা তখন বাদশার জন্য একটা ঘোড়া যোগাড় করলে। সেই ঘোড়ায় চড়ে বাদশা আগ্রাভিমুখে যাত্রা করলেন।

পরে বাদশা তাঁর জীবনী লেখককে বলেছিলেন: "দুই সহোদর ভাই এই রংরেজদের অধিনায়কত্ব করছিল। তাদের পরস্পরের ব্যবহারে ভ্রাতৃপ্রেম এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল যে সেই দৃষ্টান্ত দেখে আমার প্রাণেও ভ্রাতৃপ্রেমের জোয়ার এল। ছোট ভাই হিন্দোল তখনও শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। আমি তার এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেলুম। একান্ত ভক্তির সঙ্গে সকলের মঙ্গলের জন্য আমি করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করতে লাগলুম। আল্লা আমার অন্তরের সেই প্রার্থনা শুনেছিলেন। এক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হতে না হতেই হিন্দোল আমার সঙ্গে এসে মিলিত হল। স্নেহ সম্ভাষণে সে আমার মনপ্রাণ পুলকিত করলে। ভক্তি গদগদকণ্ঠে খোদাকে তাঁর করুণার জন্যে আমি ধন্যবাদ দিলুম!"

দুজন সাধারণ রংরেজের সুদৃষ্টান্ত দিল্লীর বাদশা জীবনে দেখ কত দূর প্রভাব বিস্তার করেছিল!

৫

---

—বাইশ—
ছাগলের
ভাসমান
রাজ্য

দুরাশাপরবশ ব্যক্তিটি হতাশ হয়ে তাদের চট্টগ্রামের উপকূলে, ( ভবিষ্যৎ বাচ্চো, ) পরিত্যাগ করে যাবার পর শিশির-লিলি তাদের তলার এধারে-ওধারে ঘুরে ফিরে দেখতে বেরুল।

শিশির লিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ওপরে না গেলেই হোলো। ওই যে উন্নতির মূল সিঁড়িটি দেখা যাচ্ছে ওতে পদার্পনের লোভ সম্বরণ করলেই যথেষ্ট, তাহলেই নিশ্চিন্তি। ওপর থেকে কেউ আর এখানে উঁকি ঝুঁকি মেরে আমাদের দর্শন দিতে আস্‌ছে না নিশ্চয়।

হাঁটাহাঁটি লিলির ততটা না পোষালেও এক জায়গায় পা জড়িয়েই বা কতক্ষণ থাকা যায়? তাছাড়া, লম্বা লম্বা পা ফেলে ছোটখাট হণ্টন্ লিলির ভালোই ল'গে।

একধারে একগাদা প্যাক্‌করা পার্শেলের বাক্স—আরেক ধারে যত রাজ্যের ফলের ঝুরি! ঝুরির ডালা উন্মুক্ত হয়ে, উন্মুখ হয়ে কত রকমের ফল ওদের অভ্যর্থনা করছিল। তাদের দু'এক জনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে'—এবং তাদের বাঁচিয়ে ডিঙি মেরে মেরে ওদের চল্‌তে হচ্ছিল। শিশির লিলিকে বল্ল, "বুঝছিস্ তো! এরাই আমাদের এই কদিনের ফলার! চট্টগ্রাম অবধি সংগ্রামের রসদ্।"

লিলি বল্ল: "খাবার ভাবনাতেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। খাবার কথা মনেই পড়ে নি।"

"কর্ম্ম করলেই তার ফল আছে, বাবা বলেন না? তেমনি ফল থাকলে তার কর্ম্মও থাকবে। তবে মুস্কিল এই—এত ফল, আর দুটি মাত্তর হাত! বেশি কর্ম্ম করে' উঠতে পারব না। এই দুঃখ!"

এক জায়গায় আবার রাস্তার পাহাড়! বস্তাবন্দী হয়ে সার সারি কী বস্তুরা দাঁড়িয়ে আছে—শিশিররা মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে। যাই থাক্, বস্তা ফাঁক্ করে' দেখার তাদের সাহস হয় না। তাদের নিজেদের যে-অবস্থা, তাহলে হয়ত সেই পাপে নীচের কয়লার ঘরেই নির্ব্বাসিত হতে হবে। এবং সেখানে খুব যে সুবিধে হবে না, তা বলাই বাহুল্য। কয়লারা কেবল যে দৃশ্যকটু তাই নয়—তার ওপরে—যারপর নাই অখাদ্য!

মোটা মোটা কাছির দড়া তাল-গোল-পাকানো—এখানে ওখানে সেখানে কুণ্ডলী করে রাখা। লাফ্ মেরে মেরে ওরা চল্‌ছিল। ডেকের ওধারটায় পৌঁছতেই দু'একটা চাপা গলার আওয়াজ ওদের কানে এল।

"অর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌....." কে যেন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

"পাঁঠা নাকি?" বল্ল লিলি। "পাঁঠাতো নিশ্চয়।" শিশির বলে: "কিন্তু দুপেয়ে না চারপেয়ে?"

কৌতূহলী হয়ে কণ্ঠধ্বনি অনুসরণে আর একটু এগুতেই পরিষ্কার ভাষায় ছাগলাদ্য ব্যাকরণ ওদের কানে এল—এবং তার পরেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে সংশয়ের তিলমাত্র অবকাশ রইলো না।



ছাগলের পাল তাদের চোখের সামনে।

"ওমা! এতো ছাগল কেন এখানে?" লিলি গালে হাত দ্যায়।

"জাহাজে করে' রপ্তানি হচ্ছে বোধ হয়।" শিশির বলে।

ডেকের সেধারটা বেড়ার মত করে' ঘেরাও করা—আর তার ভেতরটা অগুন্‌তি ছাগল। ওই অল্প পরিসরের মধ্যে ঠাসাঠাসি বন্দী দশায় বেচারীরা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। লম্ফ ঝম্ফ দূরে থাক্, স্বভাবসিদ্ধ চেঁচামেচি পর্য্যন্ত করার কারো উৎসাহ ছিল না। কেবল ওদের মধ্যে দু'একজন নেতৃস্থানীয়ই বোধ হয়—বিশুদ্ধ ব্যাকরণে মাঝে মাঝে অসন্তোষ প্রচার করছিল। মুখপত্র কিম্বা মুখপাত্র হিসেবে প্রেরণাদানের কর্ত্তব্য পালন মাত্র।

"কোথায় এদের ধরে বেঁধে চালান্ দিচ্ছে দাদা?"

"আমি তো তাই ভাবছি। কোথায় আবার ছাগল নেই? কোন্ মুলুকে ছাগলাভাব? সব দেশেই তো দেদার পাঁঠা—খেয়ে ফুরোনো যায় না!"

'মাগো! কি বিচ্ছিরি গন্ধ!" লিলি নাকে রুমাল দ্যায়।

"ছিঃ! পাঁঠা বলে' ওদের অবজ্ঞা করিস্‌নে। পাঁঠা বলে' কি মানুষ নয়? একবার ওরাই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পাঁঠারা অতি নমস্য ব্যক্তি।" শিশির নমস্কারের দ্বারা নিজের কথায় সায় দ্যায়।

"দক্ষযজ্ঞের গল্প শুনিস্‌নি বাবার কাছে? দক্ষ তার যোগ্যতার কী পুরস্কার পেয়েছিল শিবের হাতে? পাঁঠার মাথা। তার মানে কি? পাঁঠার মত দক্ষলোক দুনিয়ায় আর নেই। প্রত্যেক যোগ্য লোককে ভালো করে' যাচিয়ে দ্যাখ্—দেখ্‌বি আসলে একটা পাঁঠা। বাবাই একথা বলে—এবং আমি বাবার সঙ্গে এবিষয়ে একমত। আমি তো পাঁঠার মাংস পেলে আর কিছু পেতে চাইনে, এমন নিস্বার্থপর পরোপকারী জীব পৃথিবীতে আর কে আছে? আমরা ওদের বলিদান করি—তার বদলে ওরা আমাদের বলদান করে।"

"পাঁঠা নয়তো বলদ্!" লিলি এক কথায় বলে দ্যায়।

"বল্‌তে পারিস্, গোরুরা যদি আপত্তি না করে\ বাবা বলেন, পাঁঠারা সামান্য নয়। পৃথিবীর সমস্ত কাণ্ডকারখানা কারা চালায়—যুদ্ধ বিগ্রহ যত কারা বাধিয়ে রাখে? পৃথিবীর বড় বড় কাজ করে কারা? পাঁঠারা। ছোটখাট কর্ত্তৃত্বের চূড়া থেকে বড় বড় সাম্রাজ্যের মাথায় কারা বসে আছে? হয় একটি—নয় এক দল—সেই পাঁঠা। পাঁঠাদের লীলা বোঝা ভার। এক মুখে ওদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা যায় না।" শিশিরের গম্ভীর মুখে প্রবীণের বুলি।"

"মানুষের তাহলে মানুষ হবার এখনো ঢের দেরি আছে, কি বলো দাদা? এখনো ওদের পাঠ্যাবস্থা চল্‌ছে তাহলে?" লিলিও বাবার মুখ থেকে শোনা শক্ত একটা কথা উচ্চারণ করে' দ্যায়।

"ফলের ঝুরির ওখান থেকে কট্‌মট্ করে' আমাদের দিকে চাইছে ও লোকটা কেরে?" শিশির চকিত হয়ে ওঠে।

"এই মাত্র ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলনা?"

"হুঁ। দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে!" শিশির রবীন্দ্রনাথের পংক্তি দিয়ে লোকটার সম্বর্দ্ধনা করে।

"গ্র্যাণ্ড মামার আড্ডায়।" লিলির মনে হয়।

"ঠিক ধরেছিস্। গ্র্যাণ্ড মামাদের দলের কোনো লোক। তা না হয়ে যায় না। আমাদের ও চিন্‌তে পেরেছে।"

"তাহলে—তাহলে কি হবে?" লিলি শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

"নিশ্চয় ও একা নেই এখানে। গ্র্যাণ্ড মামার দলবল সবাই এই জাহাজেই যাচ্ছে তাহলে। ওদের তো পরশুদিন পাড়ি দেবার কথা শুনেছিলাম—তাহলে আজকেই—এই জাহাজেই—চল্ল কেন? য়্যাঁ?"

"আমাদের ধরবার জন্যে নাকি?"

"নিজেরা ধরা পড়বার ভয়ে। পুলিসের তাড়ায় বোধ হয়। গ্র্যাণ্ডমামাও নিশ্চয় এই জাহাজে চলেছে।"

"কিন্তু লোকটা অমন রেগে মেগে তাকাচ্ছে কেন দাদা?"

শিশিরকে এর উত্তর দিতে হয় না—লোকটা নিজেই, প্রকাণ্ড একটা ছোরা হাতে, বোধ হয় সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবার উদ্দেশ্যেই ওদের দিকে এগুতে থাকে।

## —তেইশ—

### পাঁঠায় পাঁঠায় হোলো ধুল পরিমাণ!

লোকটা ছুরিকা হস্তে, রজনীর মত, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। শিশির আর লিলি চারিধার অন্ধকার দ্যাখে—সেই আঁধারের মধ্যে কেবল সেই ছুরিখানার চাক্‌চিক্যই তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

"কই? কই সেই গুপ্তধন? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ বের কর্!"

লোকটার প্রথম কথাই কাজের কথা। বাজে কথার লোক সে নয়, বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় তার বিরল—ছুরির ইঙ্গিতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ সে দ্যায়।

"এই তো।" হাফ্‌প্যাণ্টের দুই পকেট থেকে রত্ন ডিম্ব দুটিকে উদ্ধৃত করে' তুলে ধরে শিশির।

"এই দুটো? দুটো কেবল? আর সব কই?"

"আর! আর তো সব গ্র্যাণ্ড মামার কাছে।"

গ্র্যাণ্ড মামা? সে আবার কোন্‌ছুঁচো?"

"ছুঁচো কিনা জানিনে—নাম তার বক্কেশ্বর আইচ্।"

"ইয়ার্কি হচ্চে? তিনি তো আমাদের দলের সর্দার! তার সঙ্গে কী সম্পর্ক তোদের?" খেঁকিয়ে ওঠে লোকটা।

"মামাতুত সম্পর্ক। তিনি আমাদের মামার মামা। তিনিই তো এই দুটো আমাদের প্রেজেণ্ট দিয়েচেন।"

"প্রেজেণ্ট দিয়েছেন!" হাতের ছুরিখানা আমূল নিজের বুকে বিদ্ধ হলেও লোকটা বোধ করি এতখানি আহত হোতোনা। "তিনি প্রেজেণ্ট দিয়েছেন তোমাদের!" বিমূঢ় কণ্ঠে সে বলে। তার হাতের ছুরিখানা—না, হাত থেকে নয়—হাত সমেত খসে পড়ে। হাত লাগাও হয়ে হাঁটুর কাছে ঝুলতে থাকে।

"তিনি ছাড়া আবার কে দেবে! কার দেবার ক্ষমতা?" বলে শিশির।

সে কথাও তো মিছে নয়! তাদের কর্ত্তা ছাড়া এই ব্যাপারে ক্ষমতাবান আর কারো কথাই সে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে—স্বহস্তে—এই লোভনীয় মণিরত্ন,—নিজের কাছে না রেখে, নিজের



অনুচরদের না দিয়ে—কোথাকার কোন্ ভাগ্‌নের ভাগীদারদের ডেকে বিলিয়ে দেবেন এমন পরমাশ্চার্য্য কথাও তো ধারণা করা যায় না। কিছুটা বিশ্বাস—কিছুটা অবিশ্বাস—আর সমস্তটাই বিস্ময়ে ওতোপ্রোতো হয়ে সে বলে: 'তবে যে তিনি বল্লেন তোমরা বাগিয়ে নিয়ে পালিয়েছ।"

"তা কি করে' হয়?" লিলি বলে' ওঠে এখন: "আমাদের গ্র্যাণ্ড মামা কতো বড়ো আর কী জোয়ান্—আর আমার দাদা কত ছোট্ট—সে কি কখনো তাঁর হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে?"

সেও তো একটা কথা। লোকটার মুখ দেখে মনে হয় সে যেন আরো বেশি মর্ম্মাহত হয়েচে। তার মুখ থেকে প্রতিবাদ আসে না।

শিশিরের মুখ থেকে আসে: "তুই যে কী বলিস্, লিলি! আমি বুঝি আর বড়ো হইনি? আমি বুঝি আর জোয়ান্ নই? কী যে বলিস্ তুই!"

'তাহলেও, আমার দাদা ছোটো জোয়ান তো!' লিলি দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে—দাদার অভিমান এবং দাদা দুই কূল বাঁচিয়ে রাখতে চায়: "সেটা তো তুমি মান্‌বে। একটা ছোট জোয়ান্—তা সে যত বড়ই জোয়ান হোক্—আসল একটা বড়ো জোয়ানকে কি গায়ের জোরে হারিয়ে দেবে?"

"দেবেই তো! দিয়েছেই তো!" শিশির বক্ষের বিস্তৃতির ওপরে বাহুর স্ফীতি আম্‌দানি করে এবার: হাড়ের মাস্‌ল্ ফুলিয়ে বলে: "তা না হলে এগুলো এই শ্রীহস্তে এল কি করে'—শুনি?"

এই অযাচিত বীরত্ব লিলির ভালো লাগে না—ঝুলন্ত ছুরিখানা থেকে তখনো আলোকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অকাল যৌবনের ফলে, অকালবার্দ্ধক্যের আগেই দাদার অকাল মৃত্যু না ঘটে যায় এই ভয়ে সে শিটিয়ে ওঠে: "আহা, তুমি গ্র্যাণ্ডমামাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না বাপু! তিনিই এগুলো দাদাকে প্রেজেণ্ট্ দিয়েছেন কি না! তাহলেই তো ফুরিয়ে যায়। তিনিও তো এই জাহাজেই প্রেজেণ্ট্ আছেন!

এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে লোকটার মনে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছিল—এই সব চেয়ে বেদনাদায়ক কথাটা—আল্‌পিনের চেয়েও তীক্ষ্ণতর—ছুরির চেয়েও মর্ম্মভেদী এই উপলব্ধি! সর্দ্দার হয়ে নিজের দলবলের সঙ্গে তিনি ছলনা করবেন—তাদের ন্যায়সঙ্গত ভাগ, ন্যায্য ভাগ্য থেকে বেদখল করে, এ ভাবে বর্‌খাস্ত করবেন; এই আইডিয়া বরদাস্ত করতেই তার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌ছিল। অন্তরঙ্গদের সাথে এই ধরণের রঙ্গ, নেতৃস্থানীয় তাঁর কাছ থেকে অন্ততঃ আশা করা যায় না। এই কি তাঁর নেতৃসুলভতা?

লাঞ্ছিত কুকুর যেমন করে' ল্যাজ গুটিয়ে নেয়, সেই ভাবে ছুরিখানাকে নিজের অন্তর্গত করে' লুকিয়ে নিয়ে ম্লান মুখে লোকটা উন্নতির মূল সেই সিঁড়িটা ধরে ওপরের ডেকে রওনা দ্যায়।

একটু পরেই গ্র্যাণ্ড মামা—অবনতির উপায়—সেই সিঁড়িটা দিয়েই হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

"তোমরা করেছ কি!" হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন তিনি: "কী সর্ব্বনাশ করেচ বলো দেখি?"

"সর্ব্বনাশ! কেন, কি হয়েচে?" ওদের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে: "আপনাকেও ছুরি নিয়ে তাড়া করেছে না কি?"

"আমাকে! আমাকে আর তাড়া করতে হয় না। তারা দল বেঁধে তোড়জোড় করে' তোমাদের তাড়া করতেই আস্‌চে, তবে তোমাদের কাছে হতাশ হলে—হয়ত আমাকেও তাড়া করতে পারে বলা যায় না।"

"তাহলে তো মুস্কিল!" ওদের কণ্ঠে অকৃত্রিম সহানুভূতি।

"মুস্কিল বই কি! তোমাদের কাছে দুটি মোটে রত্ন—আর আমার রত্ন অনেকগুলি! দুটি নিয়ে কি

তারা তুষ্ট হবে ? তখন চটে মটে কি ক'রে বসে বলা যায় না, তোমরা এক কাজ ক'রো, ওধার দিয়ে—ওধারেও একটা সিঁড়ি আছে—তাই ধরে' গা ঢাকা দিয়ে আমার কেবিনে চলে এসো। দশ নম্বর কেবিন—ওপরে বাঁ ধারে। সেখানে এই কদিন তোমাদের লুকিয়ে রাখব'। হাজার হোক্, তোমরা আমার ভাগ্‌নের ভাগ্‌নে। যতই বজ্জাত হও, বংশ লোপ হতে দিতে পারিনে তো।"

"আমি পালালুম। তারা এসে পড়ল বলে'। তোমরা ওধার দিয়ে চলে এসো চট্‌পট।" এই বলে' গ্র্যাণ্ডমামা সিঁড়ি দিয়ে সর্ সর্ করে' উঠে গেলেন।

"যাই বল্, গ্রাণ্ডমামা লোকটা যতই দুষ্টু হোক্, আসলে কিন্তু খুব ভালো।" শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে।

ও ধারের সিঁড়ির উন্নতির সোপানের ঘেঁষে গিয়েই দেখা যায় সেই পথেই গ্র্যাণ্ডমামার রত্নগুলি দুদ্দাড় করে' নেমে আস্‌ছে। লিলিরা আর কোথায় পালাবে—একেবারে জাহাজের রেলিংএর ওপরে গিয়ে একমাত্র জলে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর যা উপায়।

"নেপোলিয়ন কর্সিকা থেকে লম্বা এক সাঁতারে ফ্রান্সে গিয়েছিল—না রে ?" জিজ্ঞেস করে শিশির।

লিলি চুপ করে' থাকে—শিশির যে নেপোলিয়ন নয়, সে কথা জানানোর অবধি সাহস হয় না।

"মৌলমীন থেকে আমরা কতটা এসেছি ? ক' মাইল্ বল্ তো ? এখান থেকে রেঙ্গুন সাঁৎরে যাওয়া যায় না কি ?"

লিলি একেবারে নিরিবিলি।

"গেলে তোকে অবশ্যি পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাব, তুই ভাবিসনে। তোকে ফেলে যাবনা নিশ্চয়।" শিশির ওকে উৎসাহ দিতে চায়ঃ "আমি কি ভালো সাঁতার জানিনে নাকি ? বলি, গ্র্যাণ্ড মামাকে সলিল সমাধি থেকে উদ্ধার করেছিল কে ? কে শুনি ?"

লিলি ভরসান্বিত হয় কি না বলা যায় না, কিন্তু মতামত প্রকাশের আগেই ডাকাতরা ওদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে !

"ছাখো, তোমরা যদি আর এক পা এগিয়েছ, আমি তাহলে এক্ষুনি—আমার হাতে এ দুটো কী, দেখ্‌ছ ?—এক্ষুনি এগুলি ছুঁড়ে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেব।" শিশির বেঁকে দাঁড়ায়।

"সাত রাজার ধন এক মাণিক !" সমস্বরে সবিস্ময়ে ওরা বলে' ওঠে।

"এক নয়—দুই মাণিক ! শুধরে দেয় শিশিরঃ "মাণিক জোড় বলতে পারো বরং।"

"জলে ফেলে দেবে ?" ওরা চম্‌কে যায়—যদিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না—তবু ওরা থম্‌কে দাঁড়ায়। এক পা এগোয়না আর।

"জলাঞ্জলি দেব একেবারে।" শিশিরের কণ্ঠে কুণ্ঠার লেশ নেই।

'তাহলে ? তাহলে তোমাদের ধরতে না পারলে আমরা ওগুলো পাব কি করে ? হাতাবো কি করে শুনি ?···এ কি রকম কথা ?"

"তার আমি কি জানি !" শিশির যেন এক চড়ায় গিয়ে চড়াও হয়েছে—তার চড়া গলা।

"আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?—" ওদের মধ্যে মোটা মোটা মত একজন এক উপায় বাৎলায়ঃ "তার চাইতে তুমি মাণিক দুটো আমার হাতে দাও—আমি না হয় তোমাদের দুজনকে তুলে ধরে জলে ফেলে দিচ্ছি। তাহলে হয় না ?···জলে ফেলা নিয়ে তো কথা ?"



"ইয়ার্কি পেয়েছ ?" ধম্‌কে দ্যায় শিশির।

"তাহলে কি অনন্তকাল ধরে' আমরা এই রকম স্থির হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাক্‌ব ?" একটু আগে যে ছুরি বাগিয়ে আগিয়ে এসেছিল তারই ক্ষুব্ধ কণ্ঠ থেকে এই প্রশ্ন বেরয়।

"বেশীক্ষণ নয় এই যতক্ষণ পুলিশ অথবা রেঙ্গুন এই দুটোর একটা না এসে পড়ছে ততক্ষণ একটু কষ্ট করে' দাঁড়াতে হবে বই কি !" শিশির বলে। "কিন্তু কতোক্ষণ আর ?"

"পুলিস !" নামোচ্চারণেই ওদের মধ্যে শিহরণ খেলে যায়—দেহে মনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

"অথবা রেঙ্গুন্।" শিশির ওদের আশ্বস্ত করতে চায়ঃ "রেঙ্গুনও আসতে পারে। যদিও কোনটা আগে আস্‌বে বলা কঠিন।"

## —চব্বিশ—

## বৃহৎ ছাগলাদ্য যুদ্ধ

কিন্তু ততক্ষণই বা কি করে' ওই সব বদ্‌খৎ মুখ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখা সহ্য করা যায় ? আর অতক্ষণ ধরে দণ্ডায়মান হয়ে থাকাও তো চাট্টিখানি নয় ! ঘুম পাবে যখন ?

"দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তোমরা চি-বুড়ি খেলা জানো ?" সে জিজ্ঞেস করে।

ঘাড় নাড়ে তারা। বুড়ি জিনিসটা জানা বটে—মেয়ে ছেলেরা বুড়ো হলে যা হয়ে দাঁড়ায় তো খেলা ধূলার বায়রে।

"উঁহু, সে বুড়ি নয়। ভেবে দ্যাখো, আমার হাতে এ দুটি মাত্র মাণিক—আর তোমরা এতগুলি সৎপাত্র। কাকে রেখে কাকে দেয়া যায় ? তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্—খেলাটা তোমাদের আমি সমঝিয়ে দিচ্ছি। এই লিলি হোলো গিয়ে বুড়ি—ওই সিঁড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াক্। আর তোমরা ওই ধার থেকে—যে ধারটায় ছাগলরা আট্‌কানো আছে—ওখান থেকে এক এক বারে এক এক জন করে চি-দিয়ে আমাকে ছুঁতে আসবে। আমি পালিয়ে পালিয়ে যাব। যে এক দমের মধ্যে আমাকে ছুঁতে পারবে এই মাণিক দুটো তার হবে। আর দম ফুরিয়ে গেলে আমি যদি তাকে ছুঁয়ে দিতে পারি তা হলে সে মরা। তার খেলা ফুরিয়ে গেল, সে আর মাণিক পাবে না। কেবল আমি ছোঁবার মুখে যদি সে ছুটে গিয়ে বুড়িকে ছুঁয়ে ফেল্‌তে পারে তবেই তার বাঁচোয়া। পালিয়ে নিজের কোঠায় পৌঁছে গেলেও বেঁচে গেল। কেমন, এতে তোমরা রাজি আছো ?"

দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে দৌড়াদৌড়ি ভালো—ঢের বেশি মজার, এক কথায় তারা রাজি হয়ে পড়ে। আর তা ছাড়া, এ ভাবে মাণিকটা হাতে এলে অপর কারো সাথে ভাগ বখ্‌রা করতে হবে না—ঢের ফ্যাসাদ্ বেঁচে যাবে—সেও এক মস্ত সুবিধা। চি-বুড়ি খেলা সুরু হতে দেরি হয় না।

প্রথম একজন চি দিয়ে তার গণ্ডী থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে—কিন্তু শিশির খুব হুঁসিয়ার; দৌড়ে ধরা তাকে সহজ নয়। ফলের ঝুরি—পার্শেলের বাক্স—সে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়—বস্তাদের ওপর দিয়ে টপ্‌কে টপ্‌কে চলে যায়—আর চি-ওয়ালা তক্ষ সুরে সুরু করে বটে কিন্তু শেষটায় চিঁচি

করতে থাকে—ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে তার স্বর বাতাসে মিলিয়ে যায়। তখন আধার শিশিরের উল্‌টো তাড়ার পালা আসে। শিশিরের তাড়নায় তার তখন পালানোর পথ নেই। কেউ বা ফলের খোসায় পিছ্‌লে পড়ে, কারো বা পার্শেলের বাক্সে ধাক্কা লাগে, কেউবা বস্তার পাহাড়ে গিয়ে আটকে যায়। আর ধরা পড়লেই মড়া!

একে একে ওদের সাতজন এইভাবে শিশিরের হাতে মারা পড়ল। ম্লান মুখে পাঁঠাদের কম্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্পের কাছে গিয়ে বসে রইল তারা—পাঁঠ্‌শালার বেড়া ঠেসান্ দিয়ে। নিজেদের বাদ বাকীদের মৃত্যু কামনা ছাড়া অন্য কামনা তাদের মনে নেই তখন।

বাকী সাতাশ জনেরও সেই দশা হোলো। পূর্ব্ব মৃতদের আন্তরিক প্রার্থনাতেই কি না বলা যায় না।

আর একজন কেবল তখনো বেঁচে—পেল্লায় রকমের নাদুস্ নুদুস্ একজন। বেচারা দু একবার এর মধ্যে চি দিয়ে এসেছিল—কিন্তু ওর চি বেশি দূর এগোয় নি। ও নিজে তার চেয়ে আরো কম এগিয়েছে।

সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি বল্লে: "আমি অত দৌড়তে পারব না। হাত দিয়ে ছোঁয়া আমার পোষাবে না বাপু! আমি এই বাঁশ দিয়ে ছোঁব। এই লম্বা বাঁশটা দিয়ে।"

এই বলে শিশির তার প্রস্তাবে রাজি কি না জান্‌বার আগেই, তার প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করে' ছাগলদের বেড়ার বিলম্বিত একখানা বাঁশ সে খুলে নিল। তারপরে সেই বাঁশখানা স্বহস্তে ধরে—শিশিরের দিকে বাড়িয়ে—চি-দানের উপক্রম করল সে। কিন্তু উপক্রমের সূত্রপাতেই হুলুস্থুল!

"এই লিলি, দেখ্‌ছিস্ কি! সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়্ তাড়াতাড়ি। ছাগলরা ছাড়া পেয়েছে, দেখছিস্ নে!" শিশিরের চীৎকার শোনা যায়।

মুক্তি পেতেই, ছাগলের পালের উৎসাহ দ্যাখে কে! ডেকের ওপর দিয়ে ছাগলের তরঙ্গ যেন ছুটে আস্‌তে লাগল। তার গোড়ার ধাক্কাতেই বেড়ায় ঠেসান্ দেয়া বীররা ভেসে গেলেন প্রথমে। লিলি ওধারের সিঁড়িতে ওপরে উঠে দাঁড়িয়েচে—শিশির এ ধারের।

ছাগলের খরস্রোত চারিধার প্লাবিত করে' চল্ল। ফলের ঝুড়ি তছনছ করে'—প্যাকিং বাক্সদের ভেঙে চুরে—বস্তাদের দুরবস্থায় ফেলে—দিগ্বিদিক ভাসিয়ে দিয়ে চল্ল। আর গ্র্যাণ্ড মামার দলবল—মায় সেই বংশধারী স্থূলকায় পর্য্যন্ত—সেই স্রোতের মুখে বেকায়দায় পড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চল্ল। তৃণখণ্ডদের মতই।

তাদের কেউ কেউ যে সেই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'র নি তা নয়—কিন্তু তীব্রতার মুখে পারবে কেন? দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গুতো মেরে ফের তাদের শুইয়ে দিয়েছে। কাৎ হয়ে, চিৎ হয়ে, উপুর হয়ে—ওল্‌টাতে পাল্‌টাতে—নানারকমে তারা ভেসে চলেছে। বাঁশ হাতে সেই মোটা লোকটিও ভাসতে দ্বিধা করছে না! তীর বেগে ভেসে যেতে যেতে অবশেষে—তারা—সোজা জাহাজের রেলিংএর কিনারায়—

"সর্ব্বনাশ হোলো!" চেঁচিয়ে উঠ্‌ল লিলি।

"এই যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে!" শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: "হরে মুরারে—হরে মুরারে!!" কিছুদিন আগের পড়া তার আনন্দ মঠ—এখনো সে যে ভুল্‌তে পারেনি, এই কথা জানিয়ে দ্যায়।

"ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ্!" লিলিও আওয়াজ ছাড়ে—সেও কম যাবার মেয়ে নয়।

রেলিংয়ের কিনারায় এসে সে এক দারুণ সংঘর্ষ—ওধারে সমুদ্রের দুর্দ্দান্ত কল্লোল—এধারে ছাগলদের উত্তাল তরঙ্গ—মাঝখানে ছত্রভঙ্গ গ্র্যাণ্ডমামার দলবল! ছাগলাদ্য ঢেউয়ের ধাক্কায় রেলিংয়ের ওপরে গিয়ে বারম্বার তারা আছ্‌ড়ে পড়ছে—

দেখতে দেখতে রেলিংয়ের খানিকটা মড় মড় করে ভেঙে পড়ল। এবং তারপরে আর দেখতে হোলো না। পঁয়ত্রিশটি বীরের একজনেরও আর টিকি দেখা গেল না। সবাই হুড়মুড় করে সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে পড়ছে! পেছনে পেছনে পাঁঠারাও প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে লাগল। একটাও পিছু ফিরে তাকাল না। রক্ষা পেল না কেউ। এমন কি সেই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ লোকটি পর্য্যন্ত সবংশে লোপ পেয়ে গেল।

(সমাপ্ত)

# রেড ক্রস্

শ্রীঅনিলকুমার দাশ গুপ্ত

রাস্তা দিয়ে রোজ হাসপাতালের যে গাড়ীটা চলে যায় তা'কে দেখে তোমরা অনায়াসেই চিনতে পার। ওর গায়ে যে একটা লাল ক্রস্ ( red cross + ) দেখতে পাও, সেটা রেড ক্রস্ সোসাইটি নামে একটা দল আছে, তাদের ব্যাজ (badge) বা চিহ্ন। এই দলের যাঁরা সভ্য, তাঁদের প্রত্যেকেরই রেড ক্রসের ব্যাজ লাগাতে হয়। তাঁদের কাজ হচ্ছে রোগীদের সেবা করা ও যুদ্ধের সময় আহতদের চিকিৎসা করা। এই রেড ক্রস্ সোসাইটির প্রবর্ত্তক হ'লেন হেন্‌রি দুঁনা ( Henri Dunant ) এবং এ'র প্রবর্ত্তক হিসেবেই তিনি শান্তির জন্য প্রথম নোবেল পুরস্কার পা'ন।

হেন্‌রি দুঁনার জীবন চরিত বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তিনি জন্মেছিলেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রমে বড় হয়ে তিনি যান ইতালীর একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে। সেখানে আহত সৈনিকদের যন্ত্রণা ও তা'দের কাতরানি দেখে তাঁর মন বিচলিত হয়। তখন থেকে তাঁর চিন্তা হ'ল কেমন করে এদের যন্ত্রণা লাঘব করা যায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে এ'দের এই কষ্ট উপশম করার উপায় বর্ণনা করে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জেনিভাতে এক পুস্তিকা বা ছোট বই লেখেন। তা'রপর তিনি এই আহতদের সাহায্য কল্পে একটি স্থায়ী সম্প্রদায় গড়বার জন্য আবেদন করতে লাগলেন। দুঁনার আবেদনের সাড়া এলো খুব তাড়াতাড়ি। গুস্‌টাভ ময়নিয়ার ( Gustave Moynier ) ছিলেন তৎকালীন জেনিভা হিতসাধন সমিতির (Societe Genevoise d' utilite Publique ) সভাপতি। দুঁনার এই পরিকল্পনায় আকৃষ্ট হ'য়ে তিনি দুঁনাকে তাঁদের সমিতির এক সভায় তাঁর মতবাদ বুঝিয়ে দেবার জন্য আহ্বান করেন। তদনুযায়ী দুঁনা সেই সভাতে তাঁর মত ভাল করে বুঝিয়ে দিলে, যুদ্ধে আহতদের সেবার সুবন্দোবস্ত করবার জন্য সুইজারল্যাণ্ডের তৎকালীন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, ময়নিয়ার, দুঁনা প্রভৃতিকে নিয়ে একটি কার্য্য নির্ব্বাহক মণ্ডলী গঠিত হ'ল।

এঁদের প্রথম কাজ হ'ল একটা জাতীয় সমিতি গঠন করা; তাই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে একটি আন্তর্জ্জাতিক সভা ডাকা হয়। এই সভায় ৩৬ জন সুদক্ষ লোক ও বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি যোগদান করে রেড ক্রসের কতকগুলি প্রাথমিক নিয়ম রচনা করলেন।

আহতদের সাহায্য করতে হ'লে জাতীয় সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি সাধারণ সমিতি দরকার; কিন্তু এ'কাজে অসুবিধে অনেক। তবুও দুঁনা দেশে দেশে গিয়ে সেখানকায় কর্ত্তৃস্থানীয় লোকদের এই কাজে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করার ফলে এবং ময়নিয়ারের সুশৃঙ্খল কার্য্য প্রণালী ও রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শেষে এ' কাজ সম্ভব হল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট এক সভা হয়। এ'তে ২৬টা গভর্ণমেণ্ট যোগদান করেন। এই সভাতেই কতকগুলি সর্ত্ত হয়, যেমন—আহতদের সম্মান করতে হ'বে, সৈনিকদের হাসপাতালকে নিরপেক্ষ মনে করতে হ'বে, আর এই রক্ষা সমিতির প্রতীক ( চিহ্ন ) ব্যাজ হ'বে সাদা নিশানের ওপর আঁকা একটা লাল ক্রস। এই ব্যাজ প্রায় সকল দেশেই গৃহীত হয়েছে, শুধু তুরস্ক ও মুসলমান শাসিত দেশগুলিতে হয়নি। মুসলমানদের দেশের প্রতীক হ'য়েছে, লাল অর্দ্ধচন্দ্র বিশিষ্ট পতাকা এবং তুরস্কে হয়েছে সিংহ ও লাল সূর্য্য আঁকা পতাকা।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন এক ইংরাজ ধনীর কন্যা। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় ইংরাজদের মধ্যে ( এমন কি সমগ্র ইউরোপে ) শুশ্রূষার বিশৃঙ্খলতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলই এসব দূর করে শুশ্রূষা রাজ্যে নব যুগের সূচনা করেন। এঁরই নামে রেড ক্রস সোসাইটি একটি পদকের ব্যবস্থা করেছেন। এই পুরস্কার প্রতি তিন মাস অন্তর শ্রেষ্ঠ শুশ্রূষাকারীকে দেওয়া হয়।

রেড ক্রস সোসাইটির লীগ বা জাতি সঙ্ঘ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা, বৃটেন, ইতালী, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশ ক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়। এর কেন্দ্র প্রথমে ছিল জেনিভায় তারপর স্থানান্তরিত হয় প্যারী নগরীতে। এই সমিতির কাজ হ'ল প্রধানতঃ বন্যা বা ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবক নিযুক্ত করা, স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে ছায়াছবির সাহায্যে জনসাধারণকে সাবধান করা বা মহামারীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ও আর্ত্ত বা রোগীর শুশ্রূষা করা।

এই সব সেবার কাজে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করে সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্ক লোকেরা। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকাতে ছোট ছোট ছেলেরাও এতে যোগ দিতে আরম্ভ করল। এই দেখে আমেরিকার রেড ক্রস সোসাইটিই প্রথমে ছোটদের নিয়ে স্থায়ী দল গঠন করলেন এবং এই দলের নাম হ'ল জুনিয়ার রেড ক্রস্ ( junior Red Cross )।

এই জুনিয়ার রেড ক্রস প্রতিষ্ঠানটি ছোট ছেলেমেয়েদের আত্মশিক্ষার, স্বাস্থ্যের এবং দেশের ও দশের মঙ্গল সাধনার একটি প্রকৃষ্ট চমৎকার বাহন। আজ আমাদের দেশেও এরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সময় এসেছে। ১৯২২ সালে জুনিয়ার রেড ক্রস এই বাণীটি প্রচার করেন ঃ

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে শান্তি ও সেবার আদর্শ গড়ে তোলা, বিশেষ করে নিজেদের ও অপর ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া, দেশের ও দশের দায়িত্বের ভার গ্রহণ করা এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মৈত্রী ও সেবাধর্ম্ম স্থাপন করা।

এই বাণীর আহ্বানে ১৯২৮ সালের মধ্যেই জুনিয়ার রেড ক্রসে পৃথিবীর দশ লক্ষ ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছিল!

---

# একটি প্রার্থনা

শ্রীইন্দিরা দেবী

মাত্র দু'টি বা চারটি অক্ষর নিয়ে একটা নাম!

হয়তো একটা স্থানের···একটা বছরের বা তারিখের···একটি মানুষের···এই ক'টি অক্ষরে গড়ে ওঠা এই একটি স্থানের, একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের, একটি মানুষের পিছনে থাকে একটি জাতির, একটি দেশের সমগ্র জন সাধারণের জীবন মরণের ইতিহাস, চকিতে তা চোখের সাম্নে ভেসে ওঠে।

একটি জাতির জীবন মরণের বাস্তব চিহ্ন হয়ে ওঠে একটি স্থান···

একটা মুক্তি পিপাসু জাতির মুক্তি সংগ্রামের সাক্ষ্য হয়ে থাকে একটি তারিখ···

একটি দেশের সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি মানুষের নাম···

তাই সেই একটি স্থান, একটি তারিখ, একটি মানুষের নাম করলে গোটা জাতির চেহারা তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় জেগে ওঠে, চোখের সাম্নে ভেসে ওঠে মুক্তি-পণ যজ্ঞের হোতাদের নাম।

যদি বলি···১৯০৫ সাল! চোখের সাম্নে ভেসে ওঠে ছবি নাকি?

> পরাধীন জাতির মুক্তি পিপাসায় ব্যথা কাতর সংগ্রাম রত মূর্ত্তি জেগে ওঠে মনে। একটি সালের নাম করলে সে যুগের ইতিহাস চকিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে···

যদি বলি—পলাসী!

> চোখের সামনে দেখ্‌তে পাই ইংরেজ আর নবাব সৈন্যদলকে। দেখতে পাই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর গুপ্ত মন্ত্রণায় রত···উমি চাঁদ···বীর মোহনলাল। দেখতে পাই মীরজাফরের দল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের চারপাশে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। দেখতে পাই বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা সিরাজের চিন্তাক্লিষ্ট বিষন্ন মূর্ত্তি। পলাসীর সূর্য্য অস্ত যায়। ইতিহাস এসে ধরা দেয় মূহূর্ত্তে।

যদি বলি—যশোহরের প্রতাপাদিত্য!

> মাত্র একটি মানুষের নাম কিন্তু চোখের সাম্নে ভেসে ওঠে অসম সাহস, তেজস্বিতা, ত্যাগ, দেশপ্রেমের ছবি··একটা গোটা জাতির চেহারা গৌরবদীপ্ত সাহসে দুর্জ্জয় শঙ্কায় অচল অটল, বীরত্বে দুর্দ্দমনীয়···এমন একটা চেহারা চোখের সাম্নে ভেসে ওঠে শুধু একটি মানুষের নাম উল্লেখে।

আজকে শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে স্মরণ করছি

একটি তারিখকে একটি স্থানকে···একটি মানুষকে···

একটি তারিখ···২২শে শ্রাবণ ··

এদিনে আমাদের মাঝ থেকে সারা জগতের মাঝ থেকে একটি মানুষ পরম নিঃশব্দে চলে গেলেন। তাঁর আসা ও যাওয়ার মাঝে একটি মরণোন্মুখ জাতিকে একটি বিরাট দেশকে, তাঁর প্রতিভা স্পর্শ দিয়ে নতুন করে জাগালেন!

এই একটি তারিখ জাতীয় জীবনে নিগূঢ় বেদনার সঙ্গে জড়িত হয়ে রইল।

একটি স্থান·· বাংলা···

এই দেশে তিনি জন্মেছিলেন। এদেশের আকাশ বাতাস, এদেশের ফল ফুল, এ দেশের পথ প্রান্তর নদ নদী, এদেশের জন সাধারণ তাঁর সবচেয়ে প্রেয় ও শ্রেয় ছিল। একটি অক্ষম জাতি, একটা অধঃপতিত জাতিকে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন। সে ভালবাসার বিকাশ দেখেছি সহস্র ধারে।

একটি মানুষ···রবীন্দ্রনাথ···

শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি, আমাদের তিনি, এদেশের তিনি, এ জগতের তিনি। তাঁর দানে, তাঁর সেবায়, তাঁর প্রতিভায়, তাঁর শিক্ষায়, তাঁর ভাবে, তাঁর চিন্তায়, তাঁর কর্ম্মে বাংলা ও বাঙ্গালীকে বিশ্বসংসারে তিনি নতুন করে পরিচিত করলেন। তাই বাংলা আজ নতুন করে ভাব্‌ছে জাগ্‌ছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

বর্ত্তমান বাংলা ও বাঙ্গালীর সমস্ত উন্নতি অগ্রগতির মূলে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিরাট পুরুষ।

এই বিরাট পুরুষের ক্ষয় ক্ষতি নেই···তিনি রবীন্দ্রনাথ।

আমরা একান্ত শ্রদ্ধায় ভালবাসায় আন্তরিকতায় স্নেহে স্মরণ করি

—একটি তারিখ

—একটী দেশ

একটি মানুষ

—এই হোক আমাদের প্রার্থনা।

## চীন-সুহৃদের গান

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এশিয়ার মহাজ্ঞানী প্রাচীন,
প্রগতি-কামী হে চির নবীন,
উন্নত-শির চিত্ত স্বাধীন
মহাচীন, মহাচীন।

ছিলে ক্ষণকাল সুপ্তি মগন,
সুরু শয়তানী জাপ লুণ্ঠন,
দস্যু আঘাতে হ'ল জাগরণ
ক্ষুরধার চেতনায়;

মুনাফা জীবীর বর্বর লোভে,
ধ্বংস-লীলার ভীম তাণ্ডবে
হত্যাকারীর মৃত্যু আহবে -
মহাচীন মহাচীন।

গেছে নান্‌কিঙ্ যাক্ হ্যাঙ্কাও,
চেকিয়াং জ্বলে' যায়, স'বো তাও,
মিলেছে চিয়াং, কমরেড্ মাও—*
হবে জয় নিশ্চয়।

রক্ত-স্নানে জনম নূতন,
সুমহান্ জাতি, এক প্রাণমন,
জন-সেনানীর দুর্জয় পণ—
মহাচীন, মহাচীন।

মুক্তি যুদ্ধে তুমি মহনীয়,
ভারতের চির সাথী বরণীয়,
মোরা তব পাশে আছি জেনে নিও ঃ
মহাচীন, মহাচীন॥

* চীনের সাম্যবাদী নেতা মাও-সে-তুঙ্

## রবীন্দ্রনাথ

হাবীবুর রহ্‌মান্

কবি শুধু নহ তুমি হে পূজ্য দেবতা
জীবন হ'তেও প্রিয়, একান্ত আপন;
তোমারে বাসিয়া ভালো, শিখেছি মমতা,
বিশ্বরে চিনেছি আজি; সঁপি' কায়মন
শ্রদ্ধার্পিতে শিখিয়াছি নর নারায়ণে!
তোমার সর্বতোমুখী প্রতিভার আলো,
ঘুচা'য়ে হীনতা, দৈন্য, মরমের কোণে
বিকশিয়া তুলিয়াছে জগতের ভালো।
তাই তব প্রয়াণের অন্তিম-সন্ধ্যায়
ভুলিতে পারি না তোমা', মনে পড়ে যায়—
তোমারে হারা'য়ে বুঝি হারায়েছি সব!
না, না, সে তো নয়! পূর্ণিয়া মোদের সব
তুমি তো রয়েছ জাগি'; তব আশা-বাণী
বুকে ল'য়ে ছুটে যাব, এ-ই আজ জানি॥

# রাখী-বন্ধন

শ্রীতিলোত্তমা মজুমদার

আঁধারের রাণী উষা, আজ দিবাকরের করে প্রেমের রাখী বাঁধবার অভিযানে চলেছেন। পরণে তাঁর ফিকে গেরুয়া সাড়ী, মাথায় তাঁর সোণার মুকুট। শান্ত ধীর মুখমণ্ডল, নয়নে নির্ম্মলজ্যোতি। পূজারিনী চলেছেন দিকবিজয়ী বীর রবিদেবের কাছে।

ধীরে ধীরে শত নূপুরের ধ্বনি ধ্বনিত হয় পাখীর কাকলী তানে। ফুলের বুকে জেগে উঠে সুরভী, পৃথিবী জুড়ে রাখী বন্ধনের মধু উৎসব প্রচারিত হয়। পথ ঘাট আনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে। মাঠে রাখাল চলে সরু পথ ধরে এক হাতে বেণু আর এক হাতে রাঙা রাখী। ধানের আলে চাষীর মেয়ে মৌয়া রাখী হাতে ডাক দেয় তাকে।

ঘরে ঘরে মঙ্গল গীত। শ্রাবণের টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে যায় সূর্য্যের বুকের উপর দিয়ে, মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মিলন সভায় অভিনন্দন জানায়। সূর্য্য প্রখর হতে প্রখরতর হয়, বন্ধনে গর্ব্বিত রামধনু মিলনের রঙীন সেতু বাঁধে। গৃহে গৃহে হাসিখুসী. হাতে হাতে রঙ্গিন রাখী, আজ সবার মনে আনন্দ ও প্রীতি।

ক্রমে দিনশেষে অরুণদেবের প্রখর দৃষ্টি শান্ত ধীর জ্যোতির্ম্ময় হতে থাকে। আকাশে বাতাসে, স্বর্গে, মর্ত্তে, বিজয় পতাকা উড়িয়ে ভাস্করদেব গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ললাটে তাঁর জয়টিকা, পরণে তাঁর স্বর্ণ পরিধান, রঙ্গিন তাঁর উত্তরীয়, মাথায় তাঁর মণিমুক্তা খচিত কিরিট, হাতে তাঁর রাঙা রাখী। মেঘের কোলে কোলে হোমাগ্নি জ্বলতে থাকে। স্বর্গলোক হতে পুষ্পবৃষ্টি, মর্ত্তলোক হতে শঙ্খধ্বনি হতে থাকে। ধীরে ধীরে রঙীন মেঘের সহস্র সোপান বেয়ে তপনদেবের জয়রথ চলে যায়। এই জয়যাত্রার হিল্লোলে পূর্ণিমার চাঁদ মধু মিলনের সবুজ আলো পৃথিবীর কোলে ছড়িয়ে দেন। সূর্য্যদেব তাঁকে বাসর জাগিয়ে রাখতে বলে বিদায় নেন।

—()০()—

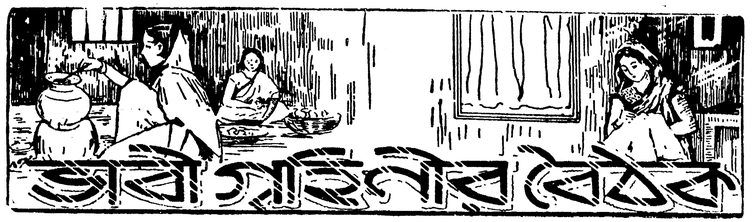


শ্রীইন্দিরা দেবী

আমার প্রিয় বোনেরা!

বহুদিন পরে তোমাদের বৈঠকে এসে হাজির হলাম। কতদিন পরে এলাম তা জানি না—অনেক, অনেকদিন। পৃথিবীর মাঝে যে বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা না দেখলেও পরোক্ষভাবে দেখছি। আশা করছি এই হানাহানি এই দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের চিতাভূমে আবার নতুন করে জীবন জাগবে, নতুন পৃথিবীতে নতুন করে জাগবে মানুষ, মানুষ পৃথিবীর হবে নবজন্ম—সমবেত ভাবে আমরা এ আশা এ প্রার্থনাই করছি।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ না করে পারলাম না, যে এই যুদ্ধে একটা সত্য বিরাট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং তা প্রমাণ করেছে মেয়েরা দুর্ব্বল ও অসহায় নয়, প্রয়োজন হলে তারাও পুরুষের সমশক্তিতে দেশ ও জাতির মুক্তি সংগ্রামে রত হতে পারে। গৃহের অন্তরালে দাঁড়িয়ে নারী শুধু এতকাল পুরুষের উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে—কিন্তু তারা যে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে পুরুষের শক্তি সামর্থ নিয়ে চমৎকার ভাবে কাজ করে যেতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছে ইংলণ্ডের মেয়েরা, প্রমাণ করেছে চীনের মেয়েরা, প্রমাণ করেছে রাশিয়ার মেয়েরা। প্রয়োজন মত মেয়েরাও যে শক্তিরূপা দেবীর মত সংগ্রামে আবির্ভূতা হতে পারে একাধিকবার তা প্রমাণ দিয়েছে ভারতবর্ষ। চাঁদ সুলতানা, অহল্যাবাঈ, রাণী দুর্গাবতী, ঝান্সীর রাণী প্রভৃতি অনেকে। বিগত যুগের ইতিহাস এ যুগে নারীর শৌর্য্যের যে গৌরবময় কাহিনী শোনায়—তা এ যুগের মেয়েদের মনে হয়তো অবিশ্বাসের ছায়াপাত করে।

ভাবী গৃহিণীদের শুধু সুগৃহিনী হলেই চলবে না, শক্তিরূপিনী হয়ে উঠতে হবে। যদি তোমাদের ভাল লাগে তাহলে বা লা ও ভারতবর্ষের মেয়েদের সঙ্গে এ যুগের ভাবী গৃহিনীদের পরিচয় করিয়ে দেবো।

এবার তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা কাজের কথা বলে নিই। এইমাত্র তোমাদের দিদিভাইএর নিকটে খবর পেলুম - রাঁচী থেকে দুটী বোন সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু লিখতে

বলেছে। জানতে চেয়েছ তোমরা কি করে রং ফরসা হয়—কিন্তু আমি বলি এখন সৌন্দর্য্য চর্চ্চা বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যচর্চ্চাটা করাটাই ঠিক নয় কি? সময়োপযোগীও হবে বলে আমার বিশ্বাস - এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা বর্ণের উজ্জলতা আনবার চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ সেটা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু শেষেরটা করলে সব দিকেই সুফল অনিবার্য্য। রাগ করলে নাকি তোমরা? না বাপু ওসব করোনা.—একে তো ন'মাসে ছ'মাসে আসি তার উপর যদি রাগারাগি করো - তাহলে তো দেখছি দরজায় খিল পড়বে। মীরা রায় তুমি এই দারুণ গরমের সময় চেয়ে বসলে উলের জামার ডিজাইন আমি বলি তুমি আর একটু সরে ঐ রাঁচীর বোনেদের কাছে দিন কতক থাকগে, তাহলে তবু প্রশ্নটা খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হবে, —কি তুমিও মুখ গম্ভীর করছো নাকি?

তোমরা তো জানো 'ভাবীগৃহিণীর বৈঠক' আছে কিন্তু স্থান তার জন্য প্রায় বন্ধই, সেটা সকলেই দখল করতে চায়—আজকাল তো লড়াইএর যুগ, ক্ষমতা কম তাই জোর করতে পারি না শেষে অন্যের দখলে আসে—এই দেখনা—গতবার তোমাদের দিদিভাই (মাত্র একবার) আসেননি বলে এবার তাঁর স্থান দীর্ঘ,—অথচ ভাবী গৃহিনীদের লেখা একটু বেশী হলেই সম্পাদক মশাই ঘাড় নাড়তে সুরু করবেন।

তোমরা যদি রাগ করে থাক—তাহলে আসছে বার অবশ্যই রূপচর্চ্চা আর সেলাইএর বাক্স নিয়ে বসবো—না হলে তোমাদের কাছে বলবো 'বিভিন্ন দেশের মেয়েদের কথা'। কোন্‌টা তোমরা চাও শীগগীর জানিও।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে ১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কন্‌ট্রাকটার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

# ছুটির ঘন্টা

## খেলার মাঠে

কে ভট্টাচার্য্য

এখনকার খেলার মাঠের সব চেয়ে বড় খবর হচ্ছে, ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের লীগ চাম্পিয়ন হওয়া। এই লীগ চাম্পিয়ানসিপের মীমাংসার জন্য সকলকে এ বৎসর প্রায় শেষ খেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাবকে দ্বিতীয় বার হারিয়ে দিয়ে আর একটি খেলা বাকী থাকতেই লীগ বিজয়ী হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জ্জন করেছে। এই সম্মান তাদের অনেক আগেই পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকবার কাছাকাছি গিয়েও আজ পর্য্যন্ত এর আগে সফলকাম হতে পারেনি। ১৯২৫ সালে এই ক্লাব প্রথম 'এ' ডিভিসনে খেলতে আরম্ভ করে। তখন থেকে অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড় এই দলে খেলেছে। এখনকার দলের থেকে বোধ হয় অনেক ভাল দল নিয়েও যা এই ক্লাব আগে করতে পারেনি, সেই কাজ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন সোমানা এবং তাঁর তরুণ দল সকলের প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেছেন।

| | খেলা | জিৎ | ড্র | হার | স্বপক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইষ্টবেঙ্গল | ২৪ | ২০ | ৩ | ১ | ৬৪ | ৯ | ৪৩ |
| মহামেডান স্পোর্টিং | ২৪ | ১৭ | ৬ | ১ | ৫৮ | ১২ | ৪০ |
| মোহনবাগান | ২২ | ১৪ | ৪ | ৪ | ৪৯ | ১৬ | ৩২ |

এবার খেলার গোড়া থেকেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব বরাবর লীগের অন্যান্য দলগুলির ওপরে স্থান বজায় রেখে এসেছিল এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সকলের আশানুযায়ী শেষ পর্য্যন্ত লীগ বিজয়ী হয়ে নিজেদের সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছে। গত ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান লীগ বিজয়ী হয়ে বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের মুখোজ্জল করেছিল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে গঠিত না হলেও বাঙ্গালীর চেষ্টায় তৈয়ারী এই ক্লাবের সাফল্য বাঙ্গালীরই গৌরব ও কৃতিত্ব প্রচার করছে। এই ক্লাবকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই কৃতিত্বের জন্য কোনও বিশেষ বিশেষ খেলোয়াড়ের প্রশংসা করা উচিৎ নয়,

কেননা সকলে প্রাণ দিয়ে না খেললে, খেলায় জিত হয় না। তবু আজকের এই সাফল্যের জন্য পি দাসগুপ্ত, আপ্পারাও, সোমানা ও সুনীল ঘোষের কৃতিত্বপূর্ণ খেলার কথা না বলে পারা যায় না। এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে সোমানা এ বৎসর এই লীগ খেলায় ২৮টি গোল দিয়ে সকলের চেয়ে বেশী গোল দেওয়ার সম্মান লাভ করেছেন।

১৯৩৯ সালে মোহনবাগানের জিত এবং এ বৎসর ইষ্টবেঙ্গলের জিত বাঙ্গালীর ফুটবলের দিক থেকে সত্যই খুব আনন্দের কথা। এই লীগের খেলায় প্রথমস্থান অধিকার করা বাঙ্গালীর ফুটবল ইতিহাসে এক একটা স্মরণীয় ঘটনা। মোহনবাগান ১৯১১ সালে শীল্ড জিতে সকলকে চমৎকৃত করে জানিয়ে দিয়েছিল, আমাদের ফুটবল ভবিষ্যতের কথা। তারপর ১৯১১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৮ সাল অবধি অনেক ভাল খেলা খেলে বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা স্বদেশে এবং বিদেশে প্রশংসা অর্জ্জন করে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স ক্লাবের আই, এফ, এ শীল্ড জেতা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু লীগে জয়ী হ'য়ে এই চরম সম্মান লাভ করা আজ পর্য্যন্ত মাত্র দুটি বাঙ্গালী দলেরই হয়েছে। তাই ১৯৩৯ সাল ও ১৯৪২ সাল আমাদের ফুটবল জগতের এক একটা স্মরণীয় বৎসর বলে মনে করি।

এই সম্পর্কে আমাদের ফুটবল মাঠের দু' একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারের উল্লেখ না করে থাকতে পারছিল না। ঘটনাটি হয়েছিল ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লীগের প্রথম খেলায়। এই খেলায় মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের চেয়ে অনেক ভাল খেলে ১-২ গোলে হেরে যায়। মাঠে লোকে লোকারণ্য। সকলেই হয় মোহনবাগান, না হয় ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক। যথেষ্ট চিৎকার ও রেফারী ও খেলোয়াড়দের প্রতি অজস্র গালাগালিতে খেলার মাঠটি মুখর। এই খেলায় রেফারীর যে একটু ত্রুটি না হয়েছিল তা বলতে পারি না। মোহনবাগান খুব ভাল খেলল কিন্তু ভাগ্যপ্রসন্ন না থাকায় শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গলেরই জয় হল। যাইহোক, খেলার শেষে দেখা গেল, দুদলের ক্যাপ্টেন একসঙ্গে খেলার মাঠ থেকে তাঁবুর দিকে ফিরছে। তারপরেই মিনিটখানেকের ভেতর মাঠের মধ্যে একটা দাঙ্গার সৃষ্টি হল। দেখা গেল, ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমর্থকদের মধ্যেই এই মারামারি। দুদলের মধ্যে জুতা, লাঠি, কিল, চড় চলতে লাগল। খেলার ফল নিয়েই এই ঝগড়া। কেউ বলে, কোনও খেলোয়াড় আর একটি খেলোয়াড়কে অন্যায় ভাবে মেরেছে। কেউ বলে রেফারী ইচ্ছা করে হারিয়ে দিয়েছে, আবার কেউ বলে এক দলের ক্যাপ্টেন অন্যদলের ক্যাপ্টেনকে অপমান করেছে। আসলে কিন্তু কেউই জানে না ব্যাপারটা কি হয়েছে এবং কোনও কথার ভেতরেই বিশেষ যুক্তিও কিছু নেই। পরস্পরের কাছ থেকে শোনা কথা মাত্র। কিন্তু গ্যালারিতে সমর্থকদের মধ্যে



রেষারেষির ভাব এতই প্রবল যে যুক্তি তর্ক দিয়ে ভেবে কাজ করার মত সময় এই সব লোকেদের নেই। যাই হোক ফল এই হল, পুলিশ মাঠের মধ্যে ঢুকে শান্তি রক্ষার জন্য বেশ কয়েক ঘা লাঠি চালাতেই সকলে এদিক ওদিক ছুটে পালাল। সেদিনকার মত শান্তি রক্ষা হল।

কিন্তু ফুটবল মাঠে এই দৃশ্য যে কতখানি হাস্যাস্পদ ব্যাপার, সে ধারনা যদি আমাদের থাকত, তা হলে এই রকম ঝগড়া করা ত দূরের কথা, এর কথা ভাবলেও লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যেত। দুটি বিভিন্ন দলের মধ্যে রেষারেষি থাকা ভাল কিন্তু সেটা থাকা উচিৎ খেলার মাঠে এবং খেলার সম্পর্কে। কি করে একদল আর এক দলের চেয়ে ভাল খেলবে, এই নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় খেলার উন্নতি হওয়ারই কথা। যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা মাঠের বাইরে ঝগড়া ও মারামারিতে পরিণত হয় তার থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে। খেলার মাঠ হওয়া উচিৎ বন্ধু সৃষ্টির জায়গা; সেখানে তার বদলে যদি শত্রুর সৃষ্টি হয়, তো সে খেলার কি দাম! সে খেলা যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই আমাদের মঙ্গল। এই নির্দ্দোষ আমোদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার কোনও স্থান নেই, কেননা উদারতাই হ'ল খেলোয়াড়ের সব থেকে বড় পরিচয় এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সৃষ্টি করা খেলাধুলার অন্যতম উদ্দেশ্য।

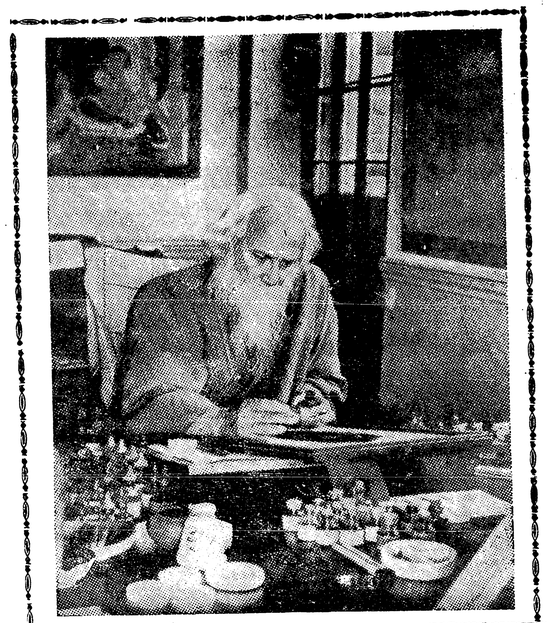

রবীন্দ্রনাথ

## ২২শে শ্রাবণ !

আগামী ২২শে শ্রাবণ বিকেল ৫টায় "রংমশাল দল" এর সহযোগিতায় কলিকাতা বেতারে একটি উৎসব হবে।

এ উৎসব আনন্দের নয়, এ উৎসব স্মৃতি-পূজার। ২২শে শ্রাবণ, এমনই এক অশ্রু-সজল দিনে, বিশ্ব থেকে বিদায় নিয়েছিলেন বিশ্ব-কবি।

এই দিনটি স্মরণ করে' আমরা বেতারে "ছোটোদের আসর"এ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। দিনটি মনে রেখো—২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট।

রংমশালের এই সংখ্যায় আমাদের বন্ধু শ্রীঅখিল নিয়োগী "নবারুণ" নামে যে নাটিকাটি রচনা করেছেন, সেই নাটিকাটি সেদিন বেতারে "রংমশাল দল" অভিনয় করবেন। পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, সঙ্গীতের ভার নিয়েছেন শ্রীবিমান ঘোষ।

তা ছাড়া কবিগুরুর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবো, প্রার্থনা করবো তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্য।

তাঁরই ভাষায় তাঁরই গানে আমাদের সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি সার্থক হবে।

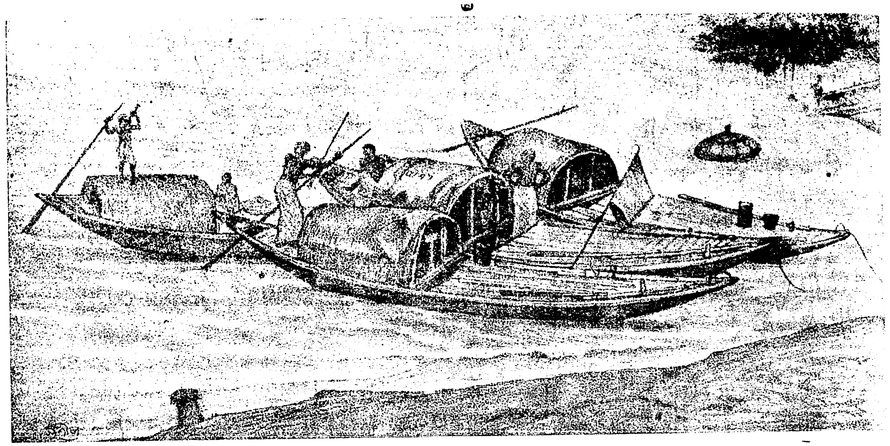

# বাদলা-দিনে

শ্রীবেতাল

**এক-দিক**

বর্ষাকালে ভর্সা করে জোর্সে চল ভাই
দু' চোখ যেথা যায় নিয়ে সেথায় উজান বাই
টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি ঝরে নরম মাটির 'পরে
হাত ধরে আয় এক সাথে যাই নদীর কিনারে
চাষার ছেলে খুসী মনে চলছে মাঠে ঘাটে
নৌকা বাঁধা সারে সারে কদম তলার ঘাটে
হরে মাঝি মংলু মাঝি হরেক নামের মাঝি
নিয়ে যাবে সখ্ হলে তোর অনেক দূরে আজি
দল বেঁধে আয় নৌকা নিয়ে জমাই জলে পাড়ি
ঘুচবে মনের দুঃখ যত থাকবে না আর আড়ি
এমন দিনে ঘরের কোনে বসতে মানা ভাই
আয়রে যেথায় যে আছে ভাই ছুটে চলে যাই ॥

**অপর-দিক**

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
ন'পাড়াতে ন' জন ছেলে ধরল ভীষণ গান
'আল্লা' বলে পাল্লা দিয়ে নৌকা দিল টান
ন' পাড়ার ঐ নয়টি ছেলে করতে গেল স্নান
উপ্ছী নদীর দুকূল ছেপে জলের ভীষণ টান
'ডোণ্ট কেয়ার' নবরত্ন তুচ্ছ করে জান
একটি গেল কোথায় ভেসে কেউ দিল না কান
আর একটি ডুবল বুঝি কোথায় গেল মান
তৃতীয়টি কুমীর পেটে করলে আত্মদান
চতুর্থটি তলিয়ে বুঝি পাতালপুরী যান
পাঁচটী বাকি লড়েন অতি পেটপুরে জল খান
বর্ষা কালে উপ্ছী নদী ভর্সা কোথায় পান ॥

## = 'দধি ভ্যাম্'' =

প্রবোধচন্দ্র বসু

নিধিরাম গয়লা
ও মাসের পয়লা,
গিয়েছিল হারুদের বাড়ীতে,
কি এক পূজার তরে,
দই, দু'টী হাতে ক'রে
যাচ্ছিল ঝুলাইয়া হাঁড়িতে।
হারুর বাড়ীর পাশে
যখন আসিল ও সে,
হারাধন 'ব্যাকরণ' পড়্ছে,
'দধি' শব্দের 'রূপ',
'চতুর্থী' অপরূপ
সুর তার সপ্তমে চড়ছে।
'দধ্নে' 'দধিভ্যাম্'
'দধ্নে' 'দধিভ্যাম্'
বারবার পড়তে সে লাগল,
ভ্যাবাচাকা নিধিরাম
ভাবে, বিধি একি বাম!
দধিতে পড়েছে 'ব্যাং' জান্ল।
"কখন হয়ত আনি
দধির পাত্রখানি
আ-ঢাকা রাখিয়াছিনু তাইতে
তাহাতে পড়েছে 'ব্যাং'
নাড়িতে চারিটী 'ঠ্যাং'
হারাধন দেখেছে তা যাইতে!
তাড়াতাড়ি যাই গিয়ে
দধি সব ফেলে দিয়ে
নূতন হাঁড়িটা নিয়ে আসি"
পূজা হবে সাতটায়
সময় চলিয়া যায়
ছুটে নিধিরাম ;—আমি হাসি।

## ❀গরমের ধাক্কায়❀

তরুণ রায়

বোমায় ভয়েতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিনু পাটনা সহরে
এখানে যে দেখি গরমের চোটে প্রাণটা যায় বা বেঘোরে।
দিনরাত শুধু হাহুতাশ করে কাটিয়া যাইছে দিন
গরমের চোটে প্রাণটাও বুঝি হইয়া আসিছে ক্ষীণ।
গরম হেথা কাটিতে চাহে না পাখার হাওয়া কি সর্বতে
মন চাহে যে গো ছুটিয়া পালাতে শিলং সিমলা পর্বতে।
প্রাণটাও দেখি পালাইতে চাহে শুধু গরমের যন্ত্রণায়
বোমার ভয়েতে কেন যে আসিনু পাড়া পড়শীর মন্ত্রণায়।

*　　*　　*

দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের ভিতর রয়েছি বসে
এই গরমেও ঝুটিদা তো চোখ বুজে ডন্ দিচ্ছে কষে।
তুতু কিন্তু ব্যস্ত আছে সকাল থেকে গোঁপ ছাঁটাতে
তুকাও বোধ হয় তৈরী আছে কলিকাতায় লিষ্ট্ পাঠাতে।
রমা তো সে গভীর ভাবে পড়ছে সুনির্ মলের বই
'ব্লাকি'টা তো দিনে রাতে খাচ্ছে শুধু ভাত ও দৈ
দাদু দেখি আপন মনেই পড়ে যান খবর কাগজ
গরম দেখে আরও গরম হয়ে উঠে আমার মগজ
এতদিন তো মগজ আমার ছিল শুধু ঘিয়ে ঠাসা
এখন দেখি শুকিয়ে যায় আমার মনের যত আশা
মাথার ঘিলু গরম লেগে টগবগিয়ে উঠ্ছে ফুটে
ইচ্ছে করে কোথায় আমি পালিয়ে যাই লম্বা ছুটে॥

---

রংমশালের ভাই বোনেরা!

চিঠির পাহাড় নিয়ে বসেছি। সামনের জানালাটা খোলা, বাতাসে শীতল স্নেহস্পর্শ, আকাশে মেঘের সমারোহ। আকাশ অভিমানী মেয়ের মত মুখ ভারী করে বসে আছে—একটু স্নেহের স্পর্শ পেলেই সে কেঁদে ফেলবে। তোমাদের অভিমান ভরা মুখগুলি মনে পড়ে—স্পষ্ট অস্পষ্ট অনেক কিশোর কোমল মুখ। গত মাসে তোমাদের কাছে আসিনি—তাই তোমাদের প্রতিজনের আখরের মাঝে অভিমান উত্তপ্ত অভিযোগ।

মাসের পর মাস ধরে তোমাদের কাছে আমি তোমাদের কথা নিয়ে আমাদের কথা নিয়ে এসেছি। অনেক জানবার কথা তোমাদের জানাতে, অনেক শোনবার কথা তোমাদের শোনাতে, অনেক বোঝাবার কথা তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি—জানিনা সে সব কথা তোমাদের মনে ধরেছে কিনা। তোমাদের সকলের কাছে থেকে মাঝে মাঝে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দেখি তোমরা আমার এই ক্ষণিক অনুপস্থিতিটা অনুভব করো কিনা—অনুভব যে তোমরা করো, তোমাদের প্রত্যেকের মনের মাঝখানে ছোট্ট একটুকরো স্থান যে আমার আছে, তারই আভাস আজ তোমাদের চিঠির ছত্রে ছত্রে।

তোমাদের কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো শ্রাবণ মাসের কথা। বছরের ভিতর এ মাসটি আমাদের জাতীয় জীবনে দুঃখের ও শোকের বিশেষ চিহ্ন হয়ে থাকবে। আমাদের দেশের একটি মানুষ যিনি অসাধারণ হয়েও আমাদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন, যাঁর সহস্র রকমের কাজের ভিতর, চিন্তার ভিতর তোমাদের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল! যিনি সারা জগতের কবিশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ চিন্তার নায়ক হয়েও তোমাদের ছোট্ট মনের ছোট্ট চিন্তাগুলির দাম দিতেন বেশী এবং কিশোর কিশোরীদের আনন্দ ও তাদের মনে কৌতুক সঞ্চার করবার জন্য রেখে গেছেন ছবি ছড়ার ও গল্পের আনন্দ ভাণ্ডার। সেই ছোটদের বন্ধু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারিয়েছি ২২শে শ্রাবণ! তাই শ্রাবণ মাসটা আমাদের জাতীয় জীবনে দুঃখের ও শোকের স্থির চিহ্ন। এদেশের নিরক্ষর অর্দ্ধ শিক্ষিত জন সাধারণ তাঁর কাছে যে কী প্রিয় ছিল তা বলবার নয়। তোমরা বড় হও, তাঁর সাহিত্য তাঁর কাব্য তাঁর স্বপ্ন, তাঁর কর্ম্মসাধনা ও

আদর্শের সঙ্গে তোমাদের যোগ্য পরিচয় হোক—২২শে শ্রাবণকে স্মরণ করে এই প্রার্থনা তোমাদের জন্য করি।

তোমরা জানো কি ?

তোমরা অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করে পাঠাও—সব প্রশ্নগুলো যে বুদ্ধি প্রতিভা দীপ্ত নয়—এমন নয়। তবু প্রশ্ন করতে যেমন মজা লাগে, প্রশ্নের উত্তর পেলে তেমনি আনন্দ হয়। এবার আমাদের সম্পাদক-মশাই বলেছেন—তোমাদের প্রশ্নগুলির সমাধান তোমাদের ভেতর দিয়েই করাতে—তোমাদের কাছে থেকে এর উত্তর এলে তা দেখে আমরা সংশোধন করবো অর্থাৎ যেগুলি ভুল হবে সেগুলি আমরা পরের বারে সংশোধন করবো।

**গীতা সেন রায়—**

১। রুজভেল্টের সম্পূর্ণ নাম কি ?

২। "ম্যাডাম চিয়াং কাই শেক"কে চীনের First Lady বলা হয় কেন ?

**চিত্তরঞ্জন মিত্র—**

৩। শাঁখ আলুর ইংরাজী শব্দ কি ?

**মীরা রায়—**

৪। জগদীশচন্দ্রের আবিস্কৃত কয়েকটি যন্ত্রের নাম কি ?

**প্রবীর ও সুবীর ঘোষ—**

৫। খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে কোন্ দেশ সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল ?

**বিতর্ক আসর ঃ—**

'যুদ্ধ না শান্তি' কোনটা তোমরা চাও এ নিয়ে তোমাদের মাঝে একটা বিতর্কের আসর বসাতে চেয়েছি। এই বিতর্ক মূলক প্রশ্নটি করে পাঠিয়েছে মেদিনীপুরের বিমলকুমার। অনেকগুলি প্রবন্ধ আমরা পেয়েছি। তোমাদের ভেতর অনেকেই অনুরোধ করেছ সময়টা বাড়িয়ে দেবার জন্য। সুতরাং পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট সময়টা বাতিল করা হলো—শ্রাবণ মাসের ২২ তারিখের ভিতর লেখা পাঠানর তারিখ রইল।

**রচনা করবেন কেমন করে ঃ—**

কেমন করে লিখতে হয় তা আমরা অনেকেই জানিনা। কথাটা শুনে তোমরা একটু অবাক হচ্ছো না ? লিখতে পড়তে জানি আমরা অনেকেই—কিন্তু কেমন করে লিখতে হয় তা আমরা অনেকেই জানিনা। স্কুলে পরীক্ষার সময় তোমরা অনেকে প্রবন্ধ লিখে থাকো—তাছাড়া তোমাদের প্রিয় পত্রিকাগুলোয় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় তোমরা



অনেকেই যোগ দাও। রচনা লিখে পাঠাও একথা খুব সত্যি, কিন্তু যদি বলি তোমরা—শুধু তোমরা কেন আমরাও কেমন করে লিখতে হয় তা জানিনা—তাহলে তোমরা যে চটবেই এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। সাদা কাগজের ওপর কালির আঁচড় টানাটা লেখা নয়—এ তোমরা মানো তো ? আমরা লিখি বটে কিন্তু লেখার সাধারণ নিয়মগুলো মানি না। ধরো—এবারকার তোমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতার আসরে তোমরা লেখা পাঠাবে মনস্থ করলে—যেমন মনে হওয়া অমনি ঝরণা কলম তোমার সাদা কাগজের বুকের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে ফোয়ারা কাটতে সুরু করলো। দশপাতা লেখার পর ঘাড়টা চড় চড় করতে তবে হয়তো থামলে এবং লেখাটা পড়ে দেখলে, নাঃ নেহাৎ মন্দ হয়নি। কিন্তু তবু আমি বলবো তোমরা লেখার নিয়ম জানো না। যত রচনা আমরা পাই লেখার নিয়ম না জানার দরুণ অনেক কষ্টে ও কিশোর মনের যত্নের লেখাগুলো অলেখাই হয়ে ওঠে—তা সাধারণের মাঝে দেবার উপযুক্ত হয় না, ফলে হয় কি তোমাদের পরিশ্রম নষ্ট হয়, অযথা আমাদের উপর তোমাদের ক্ষোভ জাগে এবং আমাদেরও নানা অসুবিধার অন্ত থাকে না।

লেখার সময় ও রচনা পাঠাবার সময় মনে রাখবে ঃ—

১। কাগজের একপিঠে লিখতে হয়, দু'পিঠে নয়।
২। নিজের বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা উচিৎ।
৩। ভাবাবেগ অযথা উচ্ছ্বাস করে পাতার সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই।
৪। উচ্ছাস কমিয়ে যুক্তি তর্ক যাতে জোরালো হয় সে দিকে দৃষ্টি দেবে।
৫। সংখ্যার চেয়ে গুণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।
৬। ছেড়া অপরিস্কার কাগজে রচনা লিখবে না।
৭। হাতের লেখা পরিস্কার যাতে হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।
৮। যা জানো না তা জানার ভাণ করা উচিৎ নয়।
৯। পুরো নাম ঠিকানা গ্রাঃ নম্বর—শুধু রচনা নয় প্রত্যেক চিঠিতেও লিখবে।
১০। অমনোনীত রচনা ফেরত নেবার জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবে।

এবার চিঠির বাক্সের ঢাকা খুলছি—

**বরুণ রায় (জঙ্গীপুর) ১৬০৬**

তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর আমি জানিনা, পরিচালক মশাই জানেন। শিশু পত্রিকা সম্বন্ধে তোমার যা মতামত সে মতামত অন্য কার আছে না জানলে আমি কেমন করে লেখনী বন্ধু যোগাড় করে দেবো ?

**রণজিৎকুমার রায়চৌধুরী ( সমস্তিপুর ) ১১৬২**

যে রংমশালগুলি চেয়েছ তার পৌষ ও আষাঢ় সংখ্যা নেই। অন্যগুলির দাম প্রত্যেক খানি পাঁচ আনা করে।

**সৌরভ ( শান্তিনিকেতন ) ১৮১০**

ধাঁধার উত্তর পৃথক কাগজে দেবে ও মাস কাবারের দিন সাতেক আগে পাঠাবে। বৈশাখ সংখ্যা পাঠান হয়েছে।

**অধীররঞ্জন দাশ ( বরিশাল ) ১৩৪২**

ডাক টিকিট বা মণি অর্ডার যা সুবিধে। মণি অর্ডার হলেই বোধ হয় ভাল কারণ ডাক টিকিট যদি পাঠাও তাহলে ৷৷৫ ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

**সুজিত কান্ত রায় ( নৈহাটী ) ১৩০৪**

তোমার আগের কোনও চিঠি আমি পাইনি—পেলে বা উত্তর দেবার থাকলে নিশ্চয় রংমশালের পাতায় দেখতে পেতে। তোমাকে আর একখানি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পাঠান হয়েছে। লেখা ভালো হলেই আমরা রংমশাল বৈঠকে বা অন্য পৃষ্ঠায় ছাপাই! তুমি কি চাও তোমার লেখা অপছন্দ অবস্থায় ছাপা হয়? তুমি লেখো তোমার চেষ্টায় একদিন সুফল হবে—আমরা সকলেই খুসী হবো। তোমার দাদা মিহির বাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তিনি সুলেখক ছিলেন, রংমশালে তার লেখা গল্প 'পিঙ্গল ধরিণী' আজও আমাদের মনে আছে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি তোমায় বলেছেন তোমার কি উচিৎ লেখা ছাপা হচ্ছে না বলে এ রকম চিঠি লেখা?

**আশীষ দত্ত (শ্রীহট্ট) ১৫৬৯**

বর্ত্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কে ঠিক করে বলা যায় না, স্থির মীমাংসা কিছু হয়নি।

**নীলিমা চক্রবর্ত্তী (দিল্লী)**

তুমি I. A. পরীক্ষায় এবার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছে—বহুদিন বাদে এমন শুভ সংবাদ ভরা চিঠি খুব ভাল লাগল। নাগপুরের খুকুরাণীর খবর আমি জানি না, ওরা তোমায় ছ'মাস পরে লিখেছে আমায় বোধ হয় ছ'বছর পরে লিখবে। ততদিনে বোমার তলে না যাই।



**অক্ষয়কুমার (Chindwara)**

আমি তো ভাই 'নতুনদি' নয় বা অন্য কিছু নয়—একটা মাত্র নাম 'দিদিভাই'। তোমার গ্রাহক নম্বর গতমাসেই পেয়ে গেছ নিশ্চয়?

**জগন্নাথ দাস ( পাটনা )**

লেখাগুলি বিচার করার ভার আমার নয় সেইজন্য আমি এখন কিছু বলতে পারিনে। তোমার চিঠিটি খুব সুন্দর—অনেকবার পড়লাম।

**নারায়ণকুমার দত্ত বৈচি)**

এমন অনেক চিঠি আসে যাতে উত্তর দেবার কিছু থাকে না—তাতে কি তোমরা রাগ করবে? অনর্থক চিঠি লিখতে আমি বারণ করি এই অর্থ সঙ্কটের দিনে। প্রয়োজন না হলে লিখবে না। প্রশ্নের ব্যবস্থায় খুসী হয়েছ কিনা জানি না।

**জয়া সোম বিনীতা ঘোষ (রাঁচি) ১৪৮৯**

ছবির কথা কেন লিখেছ – ওর সমাধান অনেক আগে হয়ে গেছে। না, মধুদিকে আমি চিনি না, পরিচয় থাকলে বলতে পারতাম। ইন্দিরাদেবীকে রং ফরসা হওয়ার প্রেসক্রপসন দিতে বলেছি সম্ভবতঃ এইমাসে তিনি দেখাদেবেন বলে জানি।

**অসীম দেব গোস্বামী (কলিকাতা) ১৬৮২**

ঐ শিশু মাসিক এখন বন্ধ আছে। যুদ্ধের পরের কথা এখন কেমন করে বলবো?

**সাধন চন্দ্র বসু ১৫২৩**

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা প্রকাশের ব্যবস্থা বিলক্ষণ আছে। তাদের জন্যই মাঝে মাঝে 'রংমশাল বৈঠক' বসে অর্থাৎ ভাল ভাল লেখা এলে।

**বিষ্ণুপদ ব্যানার্জ্জি, দেবকুমার চৌধুরী, শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা সেন, মীরা সান্যাল, সাধনা রেণু বিশ্বাস, সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত,** তোমাদের চিঠি পেয়েছি। তোমরা যারা লেখনী বন্ধুর জন্য ষ্টাম্প পাঠিয়েছিলে, তাদের সকলকে পাঠান হয়েছে।

**সাধনা ভট্টাচার্য্য** ( ইসিবপুর ), **অমিতরঞ্জন রায় চৌধুরী,** তোমাদের চিঠির উত্তর বিশদভাবে পরের বার যাবে এবার স্থানাভাব।

আমার শুভেচ্ছা তোমাদের জন্য রইল। ইতি,

তোমাদের

দিদিভাই

# চলন্তিকা

ক্রিমিয়ার বিখ্যাত নৌঘাঁটি দুর্গ সেবাস্তোপোলের পতন হয়েছে। এই বন্দরটি দীর্ঘ আট মাস ধরে জার্ম্মানদের পূর্ব্বমুখী অভিযানে বাধা দিয়ে এসেছে। ক্রিমিয়ার সমস্ত গুরুত্ব পূর্ণ ঘাঁটি সোভিয়েটের হাত ছাড়া হওয়ার পর এতদিন এইটিই সোভিয়েটের একমাত্র অবলম্বণ ছিল। এই বন্দরটী আয়ত্বে আনার পর থেকে জার্ম্মাদের ককেশাসে আসবার পথ একরকম খুলেই গেল তাতে আর সন্দেহ নেই; কিন্তু এখনও কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েটের নৌবহর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের চোখে ধূলো দিয়ে ককেশাসে যাওয়া বেশ কষ্টসাপেক্ষ হবে। একমাত্র বিমান পথে যাওয়াই সহজ। এদিকে সেবাস্তোপোলের পর মস্কো—রষ্টোভ রেলপথে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। এই রেলপথে জার্ম্মান প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে ককেশস আক্রমণ করা আরও সহজ হবে। এ যুদ্ধের গতি এখন অনিশ্চিত।

লিবিয়ার তব্রুক, গাজালা ইত্যাতি বিখ্যাত ঘাঁটির পতন হওয়ায় যুদ্ধের গতি এবার লিবিয়া থেকে মিশরের দিকে ফিরেছে। আলেকজান্দ্রিয়া শত্রুর বিমান আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ব্রিটিশ বন্দরটি এশিয়ায় আসবার অন্যতম প্রধান পথ। সুতরাং জার্ম্মান সৈন্যদল এখানে পৌছবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এখন জেনারেল রোমেলের সৈন্যদল এল্-আলামিন শহরের চারধারে প্রবল চাপ দিচ্ছে। মিশর এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেও আসন্ন অভিযান তাকে প্রতিরোধ করতেই হবে।

সম্প্রতি জাপানী বিমানবহর অ্যালিউশিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে (আলাস্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত) হানা দিয়ে বোমাবর্ষন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কিস্কা দ্বীপ অধিকার করেছে। এই থেকে আসন্ন আমেরিকা ভূখণ্ডব্যাপী যুদ্ধের সূচনা পাওয়া যাচ্ছে। মিডওয়ে ও হাওয়াইয়ের যুদ্ধে জাপানীর যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গত ৭ই জুলাই চীন-জাপান যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হল। এই দীর্ঘকাল ধরে এই দেশটি যেরকমভাবে শত্রুকে বাধা দিয়ে আসছে, তা সত্যিই লক্ষ্য করবার বিষয়। 'নিজের



দেশকে শত্রুর পদানত হতে দেবো না,' এই রকম আত্মসম্মানজ্ঞান যে দেশের আছে, সে দেশ সারা পৃথিবীর আদর্শ হওয়া উচিত।

বেশ কিছুকাল নিরাপদে কাটবার পর বাংলাদেশে আবার 'মাজদিয়া'র পুনরাবৃত্তি ঘটেছে! হয়েছে সেই ই আই রেলওয়েতেই! গত ৭ই জুলাই যখন আপ দিল্লী এক্সপ্রেস বর্দ্ধমানে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই সময় আপ দেরাদুন এক্সপ্রেস সেই লাইনেই পিছন থেকে এসে দিল্লী এক্সপ্রেসকে ধাক্কা মারে। ফলে দিল্লী এক্সপ্রেসের দুখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি ও একখানা ব্রেকভ্যান চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দেরাদুন এক্সপ্রেসের কোন ক্ষতি হয় নি। নিহতের সংখ্যা এ-পর্য্যন্ত জানা গেছে ১০ জন ও আহতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়! এ বিষয়ে রেল কর্ত্তৃপক্ষর নজর দেওয়া উচিত। বারবার এরকম দুর্ঘটনা ঘটলে রেলে ভ্রমণ যে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে!

রোম থেকে এক সরকারী খবরে বলা হয়েছে, যে সিসিলি দ্বীপের বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এট্না থেকে পুনরায় অগ্নুৎপাত আরম্ভ হয়েছে। ৬ই জুলাইয়ের এক খবরে বলা হয় যে ৩৬ ঘণ্টা ধরে আগ্নেগিরিটি সক্রিয় রয়েছে ও লাভা ও ছাইয়ের স্রোত পূর্ব্বাঞ্চলে ক্যাটানিয়া পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছেচে। সর্ব্বপ্রথমে ভীষণ ভাবে আগ্নেয়গিরিটি তার ক্রিয়া আরম্ভ করে; কিন্তু এখন তা' অনেকটা কমে এসেছে। মাউন্ট এট্না সিসিলি দ্বীপের পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত। এইটিই ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরিটির সম্বন্ধে গ্রীকদের অনেক অদ্ভুত বিশ্বাস আছে। তারা বলে দেবতা 'জিউস্' নাকি এই আগ্নেয়গিরির দ্বারা রাক্ষস 'টাইফুন্'কে বধ করেছিলেন।

১৪ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯২৮ সালে—নভেম্বর মাসে এই আগ্নেয়গিরিটি একবার সজীব হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে মিনিটে কুড়ি ফুট গতিতে লাভার স্রোত বেরিয়েছিল। তা'তে মেসিনা-ক্যাটানিয়ো রেলপথ লাভার নীচে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ৭ই নভেম্বর লাভা স্রোত সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তার ফলে, মাস্কাটি সহর ও সুন্জিয়াটা নামে একটি গ্রাম লাভার তলায় প্রায় চাপা পড়ে যায়। অনেক লোক মারা যায় ও দু'লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

## চুটকি খবর ঃ

প্রায় একবছর শান্তিপূর্ণ ভাবে কাটবার পর ২২ শে জুন ঢাকা শহরে আবার দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শ্রীমতী ফুল্লরা রায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীমান কল্যাণকুমার দত্ত এবং দ্বিতীয় হয়েছেন দক্ষিণ কলিকাতা গার্ল্‌স কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এস্ সি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীমান বিমলেন্দু ঘোষ ও দ্বিতীয় হয়েছেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র শ্রীমান সুকুমার বিশ্বাস।

শ্রীযুক্তা সারদা মেটা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় মহিলা চ্যান্সেলার নিযুক্তা হয়েছেন।

ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ্ পেয়েছেন।

বোম্বাইয়ের চার্চ্চগেট অঞ্চলে একটি পাঁচতলা বাড়ি ধ্বসে পড়ার ফলে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

তব্রুকের পতনের ফলে পার্লামেণ্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের বিরুদ্ধে একটা অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে!

তুরস্কের প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর স্থানে মিঃ সারাজগ্লু নিযুক্ত হয়েছেন।

ওয়াশিংটনে ত্রিশক্তি-চুক্তির (পর আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া) ইউরোপে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটি এই বছর থেকেই নাকি কার্য্যকরী হবে।

মাদাগাস্কার ব্রিটিশ-অধিকৃত হবার পর মোজাম্বিক উপকূলের কাছে "মেয়টি" দ্বীপও অধিকৃত হয়েছে ও ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের ভিশি-প্রভাবাপন্ন দ্বীপগুলি অধিকারের উদ্যোগ চলছে। ভিশি-কর্ত্তৃপক্ষ এতে প্রতিবাদ করেছেন।

পি এস্

## সত্যি নাকি?

পৃথিবীর ওপর প্রায়ই যে উল্কাপাত হয়, তাদের ভারে পৃথিবীর ওজন প্রতি বছর নাকি ১০০, ০০০ টন্ করে বৃদ্ধি পায়। উল্কাপাত ছাড়া বায়রের জগৎ থেকে আরো নানা বিচিত্র জিনিষ, পৃথিবীর পিঠে জমা হয়ে বৎসরে ১লক্ষ টন্ হিসেবে নাকি পৃথিবীর ওজন বাড়িয়ে দিচ্ছে!

নিউ ইয়র্কের একটি মেলাতে এক আশ্চর্য্য ঘড়ি প্রদর্শন করা হয়েছিল। ঘড়িটির ৯৮টি 'ডায়াল,' তার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিভিন্ন সময় দেখা যায়। ঘড়িটির কাঁটাও অনেকগুলি, তাদের গতিও ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন। সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত কাঁটা এক সেকেণ্ডে ১০০ বার ঘুরে যায়, সর্ব্বাপেক্ষা ধীরে যেটি, সেটির পুরো ঘর একবার মাত্র ঘুরে আসতে ২৬০০০ বছর লাগবে!

নিউ জার্সিতে এক মৌমাছি ও এক পায়রার মধ্যে আধ-মাইল দৌড়ের পরীক্ষায় মৌমাছি পায়রাকে নাকি ৪ সেকেণ্ডে হারিয়ে দিয়েছে। ঐ পথ দৌড়ে শেষ করতে মৌমাছির লেগেছিল ৪ মিঃ ৫৬ সেঃ পায়রার লেগেছিল আরো ৪ সেকেণ্ড বেশী।

মৃত্যুর পরও মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ কিছুকাল করে নাকি "বেঁচে" থাকে! মস্তিষ্ক নাকি বেঁচে থাকে ১০ মিঃ; চোখ ৩০ মিঃ; কান ১ ঘণ্টা; হাত পা'র মাংস-পেশী ৪ ঘণ্টা; রক্তবীজ ১৮ ঘণ্টা এবং চামড়া সজীব থাকে ৫ দিন!

# নূতন ধাঁধা

( শ্রীসাধনা মিত্রের সৌজন্যে )

( ১ ) তিনটি চীনা কোথায় থাকে ?
( ২ ) চুণী থাকে কোন্ বাজারে ?
( ৩ ) কোন্ রাজা চাঁদকে লুকান ?
( ৪ ) কোন্ খাবারে খবর থাকে ?
( ৫ ) একশ' বারোয় ক'টা বারো ?

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

( ১ ) সঙ্গীত ( ২ ) দে-ওয়াল ( ৩ ) চা-টি

ছোট-গল্প প্রতিযোগিতার ছোটদের মধ্যে পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা দু'টি আগামী রংমশাল বৈঠকে প্রকাশিত হবে।

ছোট-গল্প প্রতিযোগিতায় প্রশংসা-যোগ্য লিষ্টে আর একটি রচনা ভুলক্রমে উল্লেখ করা হয়নি। লেখক ও রচনার নাম ঃ কুমারী রূপবাণী রায়—'কবি'।



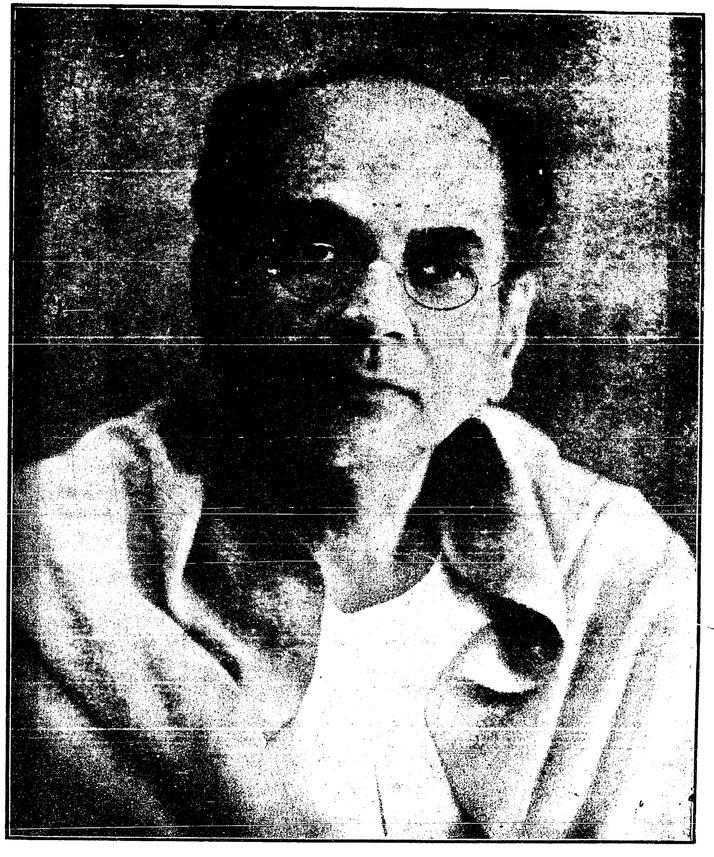

শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## অবনীন্দ্রনাথ

ভরা ভাদর আবার ঘুরে ফিরে এলো। এমনিই এক ভাদ্রে বাঙলা মায়ের একটি কৃতী সন্তান জন্মেছিলেন। তিনি তোমাদের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জোড়া-সাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে তাঁর জন্ম, যে ঠাকুর-পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়ে বাঙলাদেশ ধন্য হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। আকাশ যেমন মাটিকে আদরে ঢেকে রাখে, তেমনি বাঙলাদেশের বর্ত্তমান যুগের শিল্প ও সাহিত্য এই ঠাকুর পরিবারকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে বললে বেশী বলা হবে না। রবীন্দ্র-সূর্য্যের প্রতিভায় অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আলো আমাদের চোখে হয়ত বেশী লাগে নি কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে তাঁদের আলো, শুধু বাঙলা নয়, ভারতবর্ষের যুগ পরিবর্ত্তনে সহায়তা করে নি। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে জন্মালে তাঁদের প্রত্যেকেই যে রবীন্দ্রনাথের মত সেই যুগকে প্রভাবান্বিত করে রাখতে পারতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভা হয়তো তাঁদের ছিল না, কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা যে বাঙলাদেশের, তথা ভারতবর্ষের, সংস্কৃতির এক একটা দিক্‌পাল ছিলেন সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই জনকয়েক মহাপুরুষ মিলে বাঙলাদেশের আত্মজাগরণের সাড়া এনেছিলেন।

এই মহাপুরুষদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম। ভারতীয় শিল্পের আত্মজাগরণের যুগ প্রবর্ত্তক রূপে তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তোমরা যখন আরও বড় হবে তখন এই নবজাগরণের প্রকৃতরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় কলাবিদ্‌দের শিখিয়েছেন যে বাস্তবের প্রাণহীন অনুকরণই আর্ট নয়। সাহিত্য

যেমন অনুবাদ নয়, অন্তরের রসধারায় তার অভিষেক, তেমনি শিল্পকলা বা ললিতকলার রূপ-সৃষ্টিও অন্তরের জিনিস না হলে কেবলমাত্র বাইরের বাস্তবতার অনুবাদ বা অনুকরণমাত্র হয়ে পড়ে, কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকে না। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পকলাকে এই অন্তরের ধনে সমৃদ্ধ করেছিলেন, দিয়েছিলেন তাকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনেকগুলি ছবি বিশ্ব শিল্পের দরবারে রাজসম্মান পেয়েছে। তার মধ্যে 'নির্ব্বাসিত যক্ষ' ও 'সাজাহানের মৃত্যু' দুইখানি শ্রেষ্ঠ ছবি। তিনি শুধু ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি ভারতীয় শিল্পকলার নূতন পথ সৃষ্টি করেছেন—ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ্ আর্ট্স্ বলতে যা বুঝায় সেও তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর ছাত্রেরাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করে এসেছেন। এঁদের মধ্যে নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র। ইনি এখন বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথ নিজে যৌবনে পাশ্চাত্য শিল্পীদের প্রভাবে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর কলাসৃষ্টি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাঁর ছাত্রেরা সেই ভাবধারাকে রক্ষা করে' আসছেন।

এই ত হল তাঁর শিল্পকলার কথা। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কাছে অবনীন্দ্রনাথ হলেন গল্প বলার দাদামশায়! তোমরা ত তাঁর মুখে গল্প শোন নি! আমার একবার শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল, রামমোহন লাইব্রেরী হলে, তখন আমিও তোমাদের মত ছোটো। সে কী সুন্দর গল্প বলার ভঙ্গী! তোমাদের জন্য অনেকগুলি গল্পের বই তিনি লিখেছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় সব বইগুলি এখন পাওয়া যায় না। 'ভূতপত্রীর দেশে' 'বুড়ো আঙলা', 'রাজকাহিনী' 'ক্ষীরের পুতুল', 'খাতাঞ্চীর খাতা' ইত্যাদি অনেক বই তিনি লিখেছেন তোমাদের জন্য। রংমশালের পাতায় তোমরা তাঁর 'বাদশাহী গল্প', 'চট্‌জলদি' পড়েছ। এখনও 'মহাবীরের পুঁথি' পড়্ছ। যাঁরা ভালো গল্প বলতে পারেন তাঁদের ধরে এই গল্পগুলি পড়িয়ে শোনাতে বল্‌বে, দেখবে কত ভালো লাগবে। নিজেরাও মজা করে' সুর করে' পড়তে পারো! এ সব গল্প মনে মনে পড়বার নয়।

যতগুলি শিশু মাসিক পত্রিকা আছে, অবনীন্দ্রনাথ রংমশালকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করেন। সেইজন্য রংমশালের অগুণ্‌তি পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষ থেকে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে আজ প্রার্থনা করছি। তোমরা সকলে সেই প্রার্থনায় যোগ দিও। আমাদের এখনও মনে আছে অসুস্থতা সত্তেও তিনি 'রংমশাল দল'এর প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভায় পৌরহিত্য করে আমাদের কত উৎসাহ দিয়েছিলেন। শিশুর মতই সরল, সকলপ্রকার জাঁকজমকের বিরোধী, এই সহৃদয় দেবতুল্য মানুষটিকে, আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

# ঠাকুরদাদা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকোর চিৎপুর রোডে যেখানে হরেন-শীলের বাড়ী—সেইখানে তখন এক পুরোনো ইস্কুল বসতো—নর্ম্মালস্কুল। একদিন ইংরাজি পড়াতে পড়াতে একজন মাষ্টারমশাই 'পুডিং' কথাটিকে 'পাডিং' উচ্চারণ করায় একটি বছর পাঁচ ছয়ের ছেলে ঘোরতর আপত্তি করে ওঠে। ছেলেটির নাম শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাষ্টারমশাইয়ের ভুল ধরা! যদিও অবনীন্দ্রনাথের পিঠে সেদিন বেত পড়েছিল এবং টানা পাখার দড়ির সঙ্গে তাঁর হাত বেঁধে ছুটির পরও তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল—তবু 'পুডিং'এর উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ এই মাষ্টারমশাইর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন—এবং বাড়ীতেই তাঁর পড়াশোনার বন্দোবস্ত করে দেন। রং দিয়ে ঘরবাড়ীর Engineering Plan আঁকা গুণেন্দ্রনাথের একটি খেয়াল ছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার রংএর বাক্স ও লাল নীল পেন্‌সিল দিয়ে প্রথম ছবি আঁকতে সুরু করেন। সেই সময় গুণেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে গঙ্গার তীরে তাঁদের চাঁপদানির বাগান বাড়ীতে কিছুদিন এসে বসবাস করতে থাকেন। অতি পুরোনো প্রকাণ্ড বাগান সেকালের আসবাব পত্রে সাজানো বাড়ী। বাগানের মধ্যে হরিণ, হাঁস, খরগোস, সারস আরো নানা রকমের পশুপক্ষী অবাধে চরে বেড়াতো। কলকাতা থেকে এই প্রথম বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে গঙ্গা-তীরের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে অবনীন্দ্রনাথের সামনে এক নতুন চিত্র জগৎ খুলে গেল। এই চাঁপদানির বাগানবাড়ীতেই অবনীন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হয়। অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন আট বছর। তাঁরা সপরিবারে জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন।

কলকাতায় ফিরে এসে অবনীন্দ্রনাথ কিছুকালের জন্যে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। এরপর তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে কিছুদিন ইংরাজি সাহিত্য পড়াশোনা করেন। এর কিছুকাল পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার বইএ ছবি আঁকেন; এবং রবীন্দ্রনাথেরই অনুরোধে 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল' নামে দুটি বই লেখেন। এই সময় অবনীন্দ্রনাথ কিছুকালের জন্যে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গীত চর্চ্চাও করেছিলেন। এস্রাজ, বেহালা ও বাঁশী এই তিনটি যন্ত্র সংগীতে তাঁর বিশেষ দখল আছে। কিছুদিন আগেও রবীন্দ্রনাথের

বর্ষা-মঙ্গল প্রভৃতি ঋতু-উৎসব তাঁকে এস্রাজ বাজাতে দেখা গেছে। অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় করবার ক্ষমতাও যথেষ্ট। ঠাকুর বাড়ীতে অভিনীত 'ফাল্গুনী'র 'শ্রুতিভূষণ' ও 'ডাকঘরের' 'মোড়লমশাই'কে আজও অনেকে ভুলতে পারেন নি। এই সমস্ত নাটকের মঞ্চ সজ্জা ও অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদের উপর অবনীন্দ্রনাথের সাহায্য ছিল অনেকখানি।

কিশোর বয়সে বাংলার 'টিসিয়ান্' হব—এই রকম একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা অবনীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসে। তিনি একজন ইটালীয়ান ও একজন ইংরাজ শিল্পীর কাছে রীতিমত চিত্রবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করে দেন। অনেক পরিশ্রম করে তিনি বিলাতী চিত্রবিদ্যা দখলে আনেন। বড় বড় oil painting আঁকতে থাকেন। এই সময় একখানি সুচিত্রিত ইণ্ডোপারসিক পাণ্ডুলিপি, একখানি মিসেল পেন্টিংএর বই ও অজন্তার চিত্রাবলী দেখে তাঁর শিল্প জীবনের সমস্ত পাশ্চাত্য ধারা বদলে যায়। অবনীন্দ্রনাথ নতুন পদ্ধতিতে জলের রংএ ( water colour ) দেশী ধারায় কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকতে সুরু করেন। এর কিছুকাল পরে সৌভাগ্য ক্রমে ই, বি, হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে ভারতীয় শিল্প অনুরাগী এই বিদেশী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে প্রচুর উৎসাহ দেন ও প্রাচীন ভারতীয় লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধারে অনুপ্রেরণা জোগান। এই হ্যাভেল সাহেবকেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'গুরু' বলে স্বীকার করেন। ১৯০৭ সালে হ্যাভেল সাহেব যখন কলিকাতা স্কুল অফ্ আর্টের অধ্যক্ষ তখন তিনি অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী হিসাবে ডেকে পাঠান এবং দুজনে নূতন ধারায় দেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ পরিশ্রম করতে থাকেন। এই সময় একটি দুটি করে ছাত্র অবনীন্দ্রনাথের কাছে আসতে সুরু করে। ধীরে ধীরে লোকের দৃষ্টি দেশী শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। কিছুদিন পরে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ, 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্টাল আর্ট' নামে এক নূতন শিল্প শিক্ষালয় স্থাপন করেন। দেশবিদেশের অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটির ফাউণ্ডার মেম্বার হয়েও অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কয়েক বছর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাগেশ্বরী প্রফেসার হিসাবে তিনি শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা দিয়েছেন। বর্ত্তমানে তিনি বিশ্বভারতীর আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেশ বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর আঁকা কয়েকটি বিখ্যাত ছবি, যেমন 'মৃত্যুশয্যায় শাজাহান', 'ভারতমাতা', 'অশোক মহিষি', ওমর খৈয়ম ও আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী, 'কাজরী' 'শেষ বোঝা' প্রভৃতি দেশ বিদেশে অনেক জায়গায় প্রদর্শিত হয়েছে এবং প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।

অবনীন্দ্রনাথের হাতে তুলিও যেমন কলমও তেমনি। দুদিকেই তিনি সমান ওস্তাদ।



বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে তিনি যে সমস্ত বই লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার আর তুলনা নেই। তাঁর লেখা—'বুড়ো আংলা' 'খাতাঞ্জির খাতা' 'আলোর ফুলকি'। যদিও বিদেশী সাহিত্যের ভাব নিয়ে লেখা, তবু এই বইগুলি পড়লে মনেই হয় না যে অনুবাদ। মনে হয় একেবারে খাঁটি বাংলার জিনিষ। অবনীন্দ্রনাথের লেখার বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর অপূর্ব্ব ভাষা। 'রাজ কাহিনী', 'নানক', 'শকুন্তলা', 'ভূতপত্রীর দেশ' এর যে কোন পাতা খুলে একটু চোখ বোলালেই মনে হয় যেন এক আশ্চর্য্য রঙ্গিন কলমে তিনি লিখে গেছেন। তাঁর আকা ছবির মত তাঁর লেখা ভাষাও বিচিত্র বর্ণের।

অবনীন্দ্রনাথের বয়স এখন সত্তর পার হয়ে গেছে। এখনও তিনি নানা রকম শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন। শুকনো গাছের ডালপালা, ভাঙ্গা, ফেলে দেওয়া জিনিষের টুকরো—এই সমস্ত নানা প্রয়োজনহীন্ জিনিষ একসঙ্গে জড় করে তিনি এক আশ্চর্য্য শিল্প গড়ে তুলছেন। আমাদের চোখে যার কোনই মূল্য নেই, যার দিকে আমরা হয়তো ফিরেও তাকাই না—সেই জিনিষই অবনীন্দ্রনাথ সযত্নে সংগ্রহ করেন এবং তারই মধ্যে থেকে যখন এক নূতন রকম মূর্ত্তি সৃষ্টি করে আমাদের চোখের সামনে ধরেন, তখন অবাক হয়ে যাই এই শিল্পীর চশমা ঢাকা দুটি আশ্চর্য্য চোখের কথা ভেবে।

বর্ত্তমানে অবনীন্দ্রনাথ আবার ছবি আঁকা সুরু করেছেন। কলকাতা থেকে কিছুদূরে বরানগরে একটি বাগান বাড়িতে তিনি থাকেন। সেইখানে দক্ষিণের বারণ্ডায় ধ্যানাসনে বসে একাগ্র মনে আজও তিনি ছবি আঁকছেন। সামনে রেল লাইনের দীর্ঘ টানা পথ, সারি সারি নারিকেল গাছ, বাগানের ধার দিয়ে দিয়ে একখানি রাঙা মাটির পথ চলে গেছে, দূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়--অবনীন্দ্রনাথ নতুন উৎসাহে এই সমস্ত গ্রাম্য ছবি আঁকতে সুরু করেছেন। প্রথম যৌবনে যে তন্ময়তা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কাজ সুরু করেছিলেন, আজ বাহাত্তর বছর বয়সেও তাঁর সেই তন্ময়তা। অবনীন্দ্রনাথ বলেন—"শিল্পীকে তার কাজের মধ্যে যতদূর সম্ভব নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। লোকে এইটুকুতে সন্তুষ্ট, বাজারে এই হলেই চলবে—এমনি ধারা মনোভাব নিয়ে শিল্প সাধনা চলে না!"

একথা তিনি শুধু মুখেই বলেন নি,—তাঁর সমস্ত জীবনে তাঁর সমস্ত শিল্প সাধনায় এই আদর্শ নিয়েই কাজ করে গেছেন—এবং আজও করে চলেছেন।

———

# সুন্দর পুরুষ

## দিদিভাই

বাংলার ভাইবোনেরা আর বাংলা ভাষাভাষী কিশোর কিশোরীর দল।

আবার ফিরে এলো সেই **২২শে শ্রাবণ**।

ছিল আঁধারে ঢাকা পৃথিবী, আলোর রেখা নেই কোনখানে। এই আঁধার ছিল আমাদের দেহ মনে, আমাদের অন্তর বাহিরে; আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার পথে প্রান্তরে, অসুন্দরের অন্ধকার আমাদের জীবনের চারিদিকে।

আধারে কাটছিল দিন···মাস···বর্ষ···যুগ।

রাত্রির আঁধার, মলিনতা ঘুচিয়ে দিল সূর্য্য। সমস্ত গ্লানি মালিন্য আর জড়তা দূর করে দিল প্রভাত রবি—তাই অরণ্যে অরণ্যে, প্রতিটি পাতায় পুষ্প পল্লবে, পাখীর গানে প্রকৃতি অভিনন্দন দেয় রবিকে, বলে ঃ তুমি আমার আঁধার দূর করে দিলে তাই পত্র পল্লবের শ্যামল কোমলতায়, পুষ্পের সুরভিতে, শিশির ধোয়া কিশলয়ে কিশলয়ে, পাখীর কল কাকলিতে তোমাকে দিই অন্তরের অভিনন্দন। মানুষ প্রণাম করে সেই প্রভাত সূর্য্যকে, বিশ্ব প্রকৃতির প্রাণদাতা বলে' আর আমরা প্রণাম করি আমাদের যুগ সূর্য্য রবীন্দ্রনাথকে।

আমাদের অন্তরের অন্ধকারে ঘট্‌লো সূর্য্যোদয়, তিনি জাগিয়ে তুল্‌লেন, 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' মহাবাণী—প্রভাত সূর্য্যের আলোয় আনন্দে প্রেমে, সত্যে সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর অন্তরকে পরিতৃপ্ত করলেন রবীন্দ্রনাথ। সূর্য্যের মত অকৃপণ দানে সারা বিশ্বভুবনে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন।

এই দেশের প্রতিটি মানুষকে এই দেশের মাটিকে তিনি জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। দেশের জন্য, জাতির জন্য এদেশের সাহিত্যের জন্য তিনি যে অমৃত সঞ্চয় করে গেছেন তার মূল্য কোনদিন নিরুপণ হবে না, এই অমৃত ভাণ্ডারের অধিকারী হওয়া কোন সম্রাটের ভাগ্যে ঘটে না।

অধঃপতিত বাংলাদেশে একটি মানুষ জাগ্‌লেন—সারা বিশ্বকে জাগালেন—বাংলাদেশে জাগলো প্রাণ সূর্য্য। এই মানুষটির, আমাদের অন্তরতম প্রিয়জনটির কায়িক উপস্থিতি আমরা হারিয়েছি ২২শে শ্রাবণ। এই দিনটি জাতীয় জীবনে স্মারক চিহ্ন।

মৃত্যুকে আমরা মানি না, তিনি নেই একথা আমরা স্বীকার করি না। তাঁর উপস্থিতি আমরা অনুভব করি আমাদের অন্তরে, আমাদের ভাষায়, আমাদের আশায় আমাদের সুন্দর



পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন আবেষ্টনীতে, সৌন্দর্য্য বিকাশের প্রতি রূপটির ভিতর তিনি আছেন। তিনি আছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি সুন্দর কাজে, আনন্দ উৎসবে, আমাদের সাহিত্য আলোচনায়, সঙ্গীত আলাপে। আমাদের আজকের এই মার্জ্জিত পরিচ্ছন্ন সমাবেশের ভিতর সেই আনন্দসুন্দর পুরুষটি তাঁকে আমরা প্রণাম করি!

আজ আমরা তাঁকে সমবেতভাবে স্মরণ করি, শ্রদ্ধা দিই কিন্তু শোক প্রকাশ করিনে, কেননা তিনি অমর। প্রতিদিনকার সূর্য্যের মত তাঁর নব নব জন্ম হয়। তিনিই বলেছেন—

"বাঁশি যখন থামবে ঘরে
নিভবে দীপের শিখা
তখন যেন কবির তরে
ভীড় না জমে সভার ঘরে
হয় না যেন উচ্চৈস্বরে
শোকের সমারোহ।"

এ পৃথিবীর যেখানে আছে বাঙ্গালী, যেখানে আছে বাংলা ভাষা, যেখানে আছে বাংলা ভাষাভাষী ছেলেমেয়ের দল, সে দেশে, সে সংসারে, সে ঘরে আছেন রবীন্দ্রনাথ। আজকে আমাদের স্মরণ উৎসবে শোকের কথা নয়, তাঁর কথা দিয়ে, তাঁর গান দিয়ে, তাঁর বাণী দিয়ে আমরা স্মরণ করবো তাঁকে। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা হবে আমাদের। তাঁকে ঘিরেই আমাদের স্মরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, শুধু নির্দ্দিষ্ট একটি দিনে নয়, নির্দ্দিষ্ট একটি স্থানে নয়, নির্দ্দিষ্ট তিথি বা বার নিয়ে নয়। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে তাঁকে আমরা স্মরণ করি, আজকের এই স্মরণ উৎসব আমাদের অন্তর উৎসবের একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এসো, আজকের দিনে আমরা প্রার্থনা করি—"হে অলোক সামান্য পুরুষ! জাতীয় জীবনের অমৃত বাহক! তোমার আদর্শ আমরা যেন সার্থক করে তুল্‌তে পারি। তোমার সাহিত্যের সঙ্গে, কাব্যের সঙ্গে ভাবধারার সঙ্গে আমাদের যোগ্য পরিচয় ঘটুক।"

আজকে বাইশে শ্রাবণ হোক আমাদের জাতীয় প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণের শুভদিন।

---

২২শে শ্রাবণ কলিকাতা রেডিয়োতে ছোটদের আসরে রংমশাল দল কর্ত্তৃক রবীন্দ্র স্মৃতি অনুষ্ঠানে দিদিভাইর পঠিত অভিভাষণ।

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগ্ন পাইক কহে, "শুন মহোদর,
কুম্ভকর্ণ পড়িল সংগ্রাম ভিতর।"
—"আর কেমন করে পড়লো তাই ক' !
—"আর কি কইবো মহারাজ,
কুম্ভকর্ণ পড়লেন আজ কুমড়ো-গড়াগড়ি
খুদি পিঁপড়ে খেলে তারে—
এই দেখে এলেম, আঁচিলে পাঁচিলে চড়ি !"
—"হাঁ রে ভগ্ন পাইক,
তোর এক পা ভাঙা,
চোখটা কানা
নেই এক পাটি দাঁত,
আছে আধখানা হাত—
পাঁচিলে তুই চড়লি কেমন করে ওরে মিথ্যেবাদী বজ্জাত !"
—"আজ্ঞে এই তো সবাই বলছে, যার সাথে হচ্ছে সাক্ষাৎ !"
—"আরে কি বলছে বল না,
কেবল করছে তা না-না-না !"
—"আজ্ঞে পিঁপড়েতে খেয়েছে কুম্ভকর্ণ !"
—"বেটা কানকাটা, তোর কথার নেই মাথা,
প্রত্যয় না হয় একবর্ণ !"
—"আজ্ঞে প্রত্যয় না হয় দেখেন ছাতে উঠে !"
মহোদর ছাতে উঠে দেখেন পিঁপড়ের সার চলাফেরা করছে রণক্ষেত্রে !
—"কইরে, এতো খালি পিঁপড়ে, মাজুকর্ত্তা কই ?"
—"দুঃখের কথা কি আর কই,
যে কুম্ভকর্ণ জিনিল ত্রিভুবন,
খুদি পিপীলিকায় করিল ভক্ষণ !"

'নবারুণ' রূপক-নাট্যের অভিনয়

গানের পাখী —মঞ্জুশ্রী সেন

বিশ্বকবির প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রেডিয়োতে ছোটদের আসরে রংমশাল দল যে বিচিত্র অনুষ্ঠানটি করেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

প্রথমে রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের একটি আবৃত্তির পর, দিদিভাই বাংলার কিশোর কিশোরীদের পক্ষ থেকে কবি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। তারপর শ্রীমান গোপাল দাসগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের একটি গান করেন। গানের পর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন 'নবারুণ' রূপক-নাট্যের তাৎপর্য্যটি বুঝিয়ে দেন। পরে নবারুণ নাটিকাটি আরম্ভ হয়। অভিনয়ে বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিমল বসু, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, অরুণ চক্রবর্ত্তী, লীলাদেবী, প্রীতি ঘোষ, অরুণা ঘোষ, মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রী সেন।

পরিচালনা—দিদিভাই
রচনা—অখিল নিয়োগী
সঙ্গীত—বিমল ঘোষ

—"ওটা কিরে সমুদ্রের ধারে পড়ে যেন ব্রহ্মাণ্ডের রাক্ষসের পিণ্ডি চটকাবার মালসা!"

—"আজ্ঞে ওটা কুম্ভকর্ণের মাথার খুলি, সকালের রোদে পোড়ামাটির মতো লাল দেখাচ্ছে!"

—"যা রাবণকে জানা গা।"

—"আজ্ঞে কি জানাবো?"

– "তুই কি বলবি তা আমি কি জানি! আমি কি রণক্ষেত্রে ছিলেন তা যে বলব?"

—"আজ্ঞে, আমিও তো ছিলেম না।"

—"তবে তোর এতটা খবর দেবার তাড়া কেন?"

—"আজ্ঞে চাকরি বজায় রাখতে।"

—"যা যা রাবণকে খবর দিলে দাবাড়ি খাবি এমন, যে চাকরী তো চাকরী, তোর রাবড়ি খাওয়াও ঘুচে যাবে!"

ভঙ্গ পাইক আধফাটা মাথা চুলকোতে চুলকোতে পাইকাকে গিয়ে বলে—"কি করি কি বলি!"

অমনি পাইকা গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিলে—

"যার ভয়ে নিদ্রা নাহি যায় দেবগণ,
চির নিদ্রাগত তিনি এখন
অগ্রজ যাঁর জাগ্রত দশানন!"

ভগ্ন পাইকের কথা শুনে রাবণ বল্লেন—"নিদ্রাগত হয়েছে, মরেনি তো ভাই।"

—"আজ্ঞে তা কি হয়? নর বানর সব সাপ্‌ট খেয়ে ভাত-ঘুম দিচ্ছেন সমুদ্রের ধারে শুয়ে এমন সময়—"

—"এমন সময় আবার কি!"

—"বিভীষণ মুড়ো জ্বেলে ঠুসে ধরলে মুখে—…"

—"আর বলতে হবে না, বুঝেছি,

ঘুমেই লোকে পোড়ায় সাপ,
তাই 'জয়রাম' বলে হনুমান দিয়েছে হাঁক!
নর বানর জাতিতে অধম,
ততোধিক অধম ঘরভেদী বিভীষণ
একা আমি কি করি এখন!
ভস্ম করে উড়াতে পারতো বিশ্ব
সেই ভস্ম লোচন করে গেছে নিঃস্ব।

ধূম্রাক্ষ যে ধূমা ওড়াতো মারের চোটে,
সেও আজ রণক্ষেত্রে লোটে।
বীর আছে মোটে একা ইন্দ্রজীত্,
আর এই কিরীট শূন্য লঙ্কাদীপ্।
ঘরে ঘরে শোক, দিনে রাতে কান্না,
অস্ত্র কই, রথ কই, বার হই আন্ না!"

দশ কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে দশানন দশা পাবার জোগাড়। তখন সমর সচীবা মন্দোদরী বলছেন—

—"মহারাজ, সম্মুখ যুদ্ধে কেন গিয়ে মরি,
কূট যুদ্ধে যদি মবে অরি।"
—"আরে মরেও মরে না যে, তারে কি করি!
বাড়িল যন্ত্রণা, খুলে বল মন্ত্রনা মন্দোদরী!"

তখন রাণী মন্দোদরী কইছেন—

"জনক নন্দিনী যে প্রকার রূপ ধরে
সেই রূপ সীতা নির্ম্মাও মায়া বলে।
মায়া সীতা কাট নিয়া রামের গোচর,
সীতার শোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর!
রামের মরণে মরিবে লক্ষ্মণ,
হা রাম, বলে অক্কা পাবে হনুমান বিভীষণ।
পলাইবে সুগ্রীব গণিয়া প্রমাদ
বিনা যুদ্ধে রাম সনে ঘুচিবে বিবাদ!"

রাবণ শুনে বল্লেন—"মায়া সীতা কাটতে যাবে কে রণক্ষেত্রে!"
—"কেন ইন্দ্রজিতের বৌ প্রেমিলে, যে এই বুদ্ধি দিয়েছে!"
—"স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।" বলে রাবণ মন্দোদরীকে উত্তর দিচ্ছেন—

"ওগো না হয় তোমাদের
শাশুড়ি-বোয়ে ঝগড়াই আছে,
তা বলে কি বৌটায়
নাক কাটাতে চাও সবার মাঝে।
ভেবে দেখ সূর্পণখার হাল,
নাক-কাটা বৌ নিয়ে
ভুগতে চাও কি চিরকাল!"



—"ওগো, আমি ও কথা বলেছিলুম বৌকে,
খাঁদা হোস্ বোঁচা হোস্ সব সইতে পারি
নাক তুলে কথা যদি কোস্ তবে লাগবে ভারি!"

—"তবে? বৌ কি উত্তর করলে?"

—"সে বল্লে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে নেত্য করতে করতে ছড়া কেটে আমার মুখের উপর—

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সেই ভিখারী রাঘবে।

—"প্রেমিলা নয়, একেবারে বীরবালা!"
রাবণ বল্লেন "তুমিও তো বীরপত্নী জবাব দিতে পারলে না মুখের মতো!"
—"আমি তো অত নেকা পড়া শিখিনি, বৌ যা বল্লে, তাই তোমায় জানালেম, এখন যা ভাল বোঝ কর তুমি।"
—"এর আর বোঝাবুঝি কি, বল গা—ও বৌ তোমার শ্বশুর বল্লেন—

রাঘব নয় সে রাঘব বোয়াল
তারে বাঁধে এমন নেই জাল!"

—"ইন্দ্রজিত যদি জিদ ধরে বসে, লড়াই করবে!"
—"জিদ ধরে ঠিক মরবে!"

## সময় নেই

রাখাল তালুকদার

সময় নেই,—এ কেমন কথা
সময়ের মুখে লাগাম্ টানি ঃ
তহবিলে জমে অনেক সময়,
কৃপণের ধন সবার জানি।
আদেখলে স্বভাব, ছোট করে রাখা
সময়ের বেড় আজীবন,
সময় চেয়েও, পেয়েও জোটে না ;
মানুষ আজকে ডাহা কৃপণ।

অফিস যাত্রী, তাঁরে, ডেকে বলি ঃ
বাজলো কটা একটু বলুন ;
জানালো অম্নি—সময় নেইক,'
সময়হিসাবী তাহলে চলুন!
সময়ের দাগ লাগে কী আকাশে,
তবু ছোটাছুটি সময় বাঁধা।
রাত্রি অলস, কর্ম্মঠ দিন,
সময় নেই,—এ মস্ত ধাঁধা॥

চতুর্থ অধ্যায়

## মেঘ আর বিদ্যুৎ

কাবুল থেকে কান্দাহারের পথ। তৈমুর হয়েছেন দক্ষিণের যাত্রী।

তারপর আমীর হুসেনের সঙ্গে দেখা। হুসেনের দল তৈমুরের চেয়ে ভারি।

তুষারবর্ষী শীত—মানুষের দেহকে ভাসিয়ে বরফ ক'রে দিতে চায়। তৈমুর ও হুসেন সদলবলে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সিজিস্থানের এক সর্দ্দার এসে তাঁদের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, তৈমুর ও হুসেন সর্দ্দারের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে রাজি হলেন।

তৈমুর রাজি হলেন কেবল নূতন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের লোভে। হুসেন রাজি হলেন এই ফাঁকে দক্ষিণ প্রদেশের প্রভু হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায়।

এই তিন যোদ্ধার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সিজিস্থানের বিদ্রোহীরা দাঁড়াতে পারলে না। দুর্গের পর দুর্গ বিদ্রোহীদের হাতছাড়া হ'তে লাগল।

অতি-লোভী হুসেন ভাবলেন, দাঁও মারবার এই মস্ত সুযোগ। তিনি গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করতে লাগলেন, চারিদিকে নিজের সৈন্যদের ঘাঁটি বসালেন।

নির্ব্বোধ হুসেন! ব্যাপার দেখে ক্ষাপ্পা হয়ে সিজিস্থানের সর্দ্দার বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়ে ফেললেন এবং তারপর আক্রমণ করলেন তৈমুর ও হুসেনকেই।

তৈমুরের রণকৌশলে সিজিস্থানীরা পরাজিত হ'ল বটে, কিন্তু তিনি নিজে হলেন আহত। একটা তীর এসে তাঁর হাতের হাড় ভেঙে দিলে, আর একটা এসে ঢুকল তাঁর পায়ের ভিতরে। হুসেনের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে শাস্তি পেতে হ'ল তৈমুরকে।



সেই গিরিরাজ্যের মধ্যে আহত ও অকর্ম্মণ্য তৈমুরকে বিশ্রাম করবার পরামর্শ দিয়ে, হুসেন নিজের সৈন্যদল নিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

খবর পেয়ে স্বামীর সেবা করবার জন্যে এলেন আলজাই। জন্ম-যোদ্ধা তৈমুর বাধ্য হয়ে অস্ত্র ছেড়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে লাগলেন। কোলে ব'সে খেলা করে ছেলে জাহাঙ্গীর, পাশে ব'সে মিষ্টি কথা বলেন সুন্দরী আলজাই, সামনের উপত্যকা দিয়ে আঙ্গুর-লতা দুলিয়ে বয়ে যায় ফুলগন্ধী বাতাস, রাতের চাঁদ উঠে তাঁদের পানে তাকায় আলোমাখা মুখে।

তৈমুরের কিন্তু শান্তি নেই—আলস্য তাঁর পক্ষে বিষ। বিপুল বিশ্ব জাগতে চায় যাঁর নখদর্পনে, ফুলের কুঞ্জে ব'সে দিবাস্বপ্ন দেখতে তাঁর ভালো লাগবে কেন?

কিন্তু উপায় নেই, দেহ অপটু। অশান্ত তৈমুরের মন করে ছট্‌ফট্, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চারিদিকে ঘোরাফেরা করেন।

কিছুকাল পরে অধীর স্বরে তিনি বললেন, "নিয়ে এস আমার ঘোড়া, নিয়ে এস আমার তরবারি, নিয়ে এস আমার বর্ম্ম আর শিরস্ত্রাণ!"

তৈমুর আবার যোদ্ধার সাজ পরলেন। তিনি সিধে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু হাঁটতে গেলেই তাঁকে খোঁড়াতে হয়। তাঁর পা আর সারল না। এবং তখন থেকেই তাঁর নাম হ'ল তৈমুর লং বা খোঁড়া তৈমুর!

তৈমুরের হাতের ভাঙা হাড় তখনো জোড়া লাগে নি, তিনি ঘোড়ার লাগাম পর্য্যন্ত ধরতে পারেন না। কিন্তু তবু তাঁকে যাত্রা করতে হ'ল।

শ্যালক হুসেন আবার এক কীর্ত্তি ক'রে বসেছেন। তিনি বোকার মতন তৈমুরের মানা না মেনে জাট মোগলদের আক্রমণ করেতে গিয়ে হেরে ভূত হয়েছেন। তৈমুর চলেছেন তাঁকেই সাহায্য করতে।

গিরিসঙ্কটের সামনেই একই নদী। সেইখানে ছাউনি ফেলে তৈমুর অপেক্ষা করছেন, এমন সময়ে একদিন এক ঘটনা।

পরিষ্কার রাত, ধব্‌ধবে চাঁদের আলো। আড়ষ্ট খঞ্জ পদকে কার্য্যক্ষম ক'রে তোলবার জন্যে তৈমুর একাকী নদীর তীরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

ভোরের আভাস জাগল পূর্ব্বাকাশে—তখনো তৈমুর বিনিদ্র।

আচম্বিতে দেখা গেল, গিরিসঙ্কটের অন্য পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে দলে দলে সশস্ত্র অশ্বারোহী। তৈমুর তখনি নিজের সৈন্যদের ডাক দিয়ে একলাই ছুটে গেলেন তাদের দিকে।

চীৎকার ক'রে বললেন, "কে তোমরা? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ?"

উত্তর এল, "আমরা হচ্ছি প্রভু তৈমুরের ভৃত্য। আমরা তাঁরই খোঁজে চলেছি।"

সাবধানের মার নেই। তৈমুর বললেন, আমিও তৈমুরের চাকর। তোমরা যদি প্রভুর কাছে যেতে চাও, আমার সঙ্গে এস।"

তিনজন লোক এগিয়ে এসেই তৈমুরকে চিনতে পেরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে সসম্মানে তাঁকে অভিবাদন করলে।

তখন তৈমুরও চিনলেন। এরা তাঁরই—অর্থাৎ বার্‌লাস গোষ্ঠীর তিন সর্দ্দার।

তাদের মুখে খবর পাওয়া গেল, জাট মোগলেরা আবার এমন অত্যাচার সুরু করছে যে, সারা দেশের লোক ক্ষেপে উঠেছে। দেশের লোক এখন দলপতিরূপে পেতে চায় আমীর তৈমুরকে।

এত বড় সুযোগ তৈমুর ছাড়লেন না। যদিও এখনো দেহ তাঁর প্রায় পঙ্গু, তবু তিনি ছাউনি তুলে দেশের পথ ধরলেন।

আমু নদীর তীর ধ'রে যাত্রা করেছেন জাট মোগলদের সেনাপতি বিকিজুক্। সঙ্গে তাঁর বিশ হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য।

আমু নদীর আর এক তীর ধ'রে অগ্রসর হয়েছেন তৈমুর। তাঁর অর্দ্ধ শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা পূরো পাঁচ হাজারও হবে না।

আমু নদী ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে এল। তারপর একটি পাথরের সেতু। একমাস পরে বিকিজুক্ এইখানে এসে তাঁবু ফেললেন।

তৈমুর নদীর এ তীরে মাত্র পাঁচশত লোক রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে লুকিয়ে নদী পার হলেন। তারপর পাহাড়ের আনাচে কানাচে নিজের সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে শত্রু বূহের দিকে অগ্রসর হ'তে বললেন। তাদের উপরে আরো হুকুম রইল, তারা যেন সকলেই মশাল জ্বেলে এগিয়ে যায়।

গভীর রাত্রে জাট মোগলরা সভয়ে দেখলে, তাদের তিন দিক বেষ্টন ক'রে এক অগ্নিময় বিপুল অর্দ্ধচক্র এগিয়ে আসছে। তারা ভাবলে, শত্রুরা সংখ্যায় অগণ্য!

ভোর হবার আগেই ভীত জাট মোগলরা বিশৃঙ্খল হয়ে পালাতে আরম্ভ করলে! তৈমুর তখন তাদের আক্রমণ করলেন বিপুল বিক্রমে।

ইতিমধ্যে আমীর হুসেনও সসৈন্যে এসে পড়লেন। তিনি বললেন, "পরাজিত শত্রুর অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

তৈমুর বললেন, "ওরা এখনো পরাজিত হয় নি।"

অপটু দেহেও তৈমুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিকিজুক্ ও অন্য দুইজন সেনাপতিকে স্বহস্তে হারিয়ে বন্দী করলেন। জাট-মোগলদের দুর্দ্দশা দেখে সাহস সঞ্চয় ক'রে দলে দলে তাতারী এসে তৈমুরের পক্ষে যোগদান করতে লাগল।



তারপরেই খবর এল মহান খাঁ তোগ্‌লক আর ইহলোকে বর্ত্তমান নেই। পিতার গদীতে বসবার জন্যে যুবরাজ ইলিয়াজ তাড়াতাড়ি সমস্ত জাট সৈন্য নিয়ে তখনকার মত স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন।

বিজয়ী তৈমুর তাঁর প্রিয় জন্ম নগর সবুজ সহর দখল করতে ছুটলেন। এখানেও তাঁর অপূর্ব্ব কৌশলে জাট-মোগলরা হেরে গেল বিনা যুদ্ধেই।

তৈমুর এখানেও তাঁর সেপাইদের সবুজ সহরের চারিদিকে দূরে দূরে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর তারা অসংখ্য গাছের ডাল ভেঙে ধূলো ঝাঁট দিতে অগ্রসর হ'ল।

নগরের জাট-মোগলরা দূরে যেদিকে তাকায় সেই দিকেই দেখে পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলোর মেঘ! তারা ভাবলে, ন'-জানি কত সৈন্যই আসছে আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে!

সহর ফেলে দিলে তারা পিঠ্‌টান!

তৈমুর এক বিপুল বাহিনীকে হারিয়ে দিলেন আগুন-খেলা দেখিয়ে এবং একটি নগর দখল করলেন তুচ্ছ ধূলো উড়িয়ে!

তারপরেই তৈমুরের তারকা আর একবার নিম্নগামী হ'ল।

নতুন মহান খাঁ ইলিয়াজ নিজের পরাজয় ভুললেন না। আবার তিনি সদলবলে এলেন তৈমুরকে শাস্তি দিতে।

এবারে জাট-মোগলরা সংখ্যায় তাতারীদের চেয়ে কম বটে, কিন্তু তাদের শিক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব ছিল তাতারীদের চেয়ে ঢের উন্নত।

তৈমুর নিজের সৈন্যদলকে তিন অংশে বিভক্ত করলেন—দক্ষিণ ভাগ, মধ্য ভাগ ও বামভাগ। দক্ষিণ ভাগ ছিল সমধিক প্রবল এবং বাম ভাগ ছিল সব চেয়ে দুর্ব্বল। তৈমুর ইচ্ছা ক'রেই নিজে বাম ভাগের ভার নিয়ে দক্ষিণ ভাগে পাঠিয়ে দিলেন আমীর হুসেনকে। কথা রইল, দরকার হ'লেই হুসেন এসে তাঁকে সাহায্য করবেন।

এদিকে আকাশ মেঘ চ্ছন্ন ক'রে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। হা হা রবে গর্জ্জন করছে ক্রুদ্ধ ঝটিকা! ভূমি কর্দ্দমাক্ত—চলতে পা ব'সে যায়। নদী ক্ষেপে উঠেছে চারিদিকে ছুটছে বন্যার প্রবাহ। ধনুকের ছিলা ভিজে গেছে—তাতারীদের প্রিয় অস্ত্র অচল।

তবু কেবলমাত্র তরবারি, বর্ষা ও কুঠার নিয়ে তৈমুর সদলবলে দুর্দ্দান্ত সিংহের মতন জাট মোগলদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, আকাশ মেঘের বিদ্যুৎ—পৃথিবীতে অসি বর্ষার বিদ্যুৎ চমক, অঙ্গহীন দেহ—দেহহীন মুণ্ড, ভূমিতলে রক্তহাসির উচ্ছ্বাস, জাট মোগলদের জয়নাদ 'দার্ উ গুর!' তাতারীদের জয়নাদ—'আল্লা হো আকবর!' গতির ঝড়, আহতদের মৃত্যু চীৎকার!

তৈমুর শত্রুদের পতাকা কেড়ে নিলেন। পতাকা হারিয়ে জাট মোগলেরা হতাশভাবে পশ্চাৎ পদ হ'তে লাগল।

এই সময়ে চাই হুসেনের দলকে! হুসেন এলেই যুদ্ধ জয়!

তৈমুরের দূত হুসেনের কাছে ছুটে গিয়ে বললে, আমার প্রভু "আপনাকে আহ্বান করেছেন শীঘ্র আসুন!" হুসেন চ'টে গিয়ে দূতের গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিয়ে আমিরী চালে বললেন, "তৈমুর আমাকে হুকুম দিতে চায়, আমি কি কাপুরুষ?"

দূতের মুখে সব শুনে তৈমুর অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলেন। তারপর হুসেনের দুই আত্মীয়ের দ্বারা ব'লে পাঠালেন, জাট মোগলেরা পালাবার জন্য প্রস্তুত, এখন সকলে মিলে আক্রমণ করলে জয়ী হব আমরাই।

হুসেন সক্রোধে বললেন, "আমি কি পশ্চাৎপদ হয়েছি? তবে আমাকে বার বার অগ্রসর হ'তে বলা হচ্ছে কেন? সবুর কর, আগে আমি আমার সৈন্যদের এক জায়গায় এনে জড়ো করি!"

হুসেন তখনো গেলেন না। জাট-মোগলদের সংরক্ষিত সৈন্যরা তৈমুরকে ফিরে আক্রমণ করলে। ফল, তৈমুরের পরাজয়।

তৈমুর প্রতিজ্ঞা করলেন, "হুসেনের সঙ্গে আর কখনো যুদ্ধযাত্রা করব না।"

হুসেন তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'চল, আমরা ভারতবর্ষের দিকে যাই।" তৈমুর তখন অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আছেন। উত্তর দিলেন, "ভারতবর্ষে বা নরকে, তুমি যেখানে খুসি যাও, তাতে আমার কি?"

হুসেনের দোষে নিশ্চিত জয় তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। এজন্যে হুসেনকে তিনি জীবনে আর ক্ষমা করেন নি। তৈমুরের শত্রুতা যে কি নিষ্ঠুর, হুসেন অল্পদিন পরেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। তৈমুর আবার সমরখন্দে ফিরে এসে দেখলেন, নিয়তির ভাণ্ডারে তাঁর জন্যে আরো নিদারুণ দুঃখ সঞ্চিত হয়ে আছে।

তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আলজাইকে মৃত্যু এসে হঠাৎ কেড়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু এখন শোকেরও সময় নাই। সারা দেশ ছেয়ে ছুটে আসছে বিজয়ী শত্রুরা। পঙ্গপালের মত—বাধা দিতে হবে, তাদের বাধা দিতে হবে!

ক্রমশঃ

## মা ও ছেলে

রহিমা খাতুন

পশ্চিমের একটি সুন্দর সহর। বাঙালী এখানে মাত্র দু' ঘর, ডাঃ আহমদ আর ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সেন। মস্তো গ্রাউণ্ডের উপর ছবির মত তাদের লাল দু'খানি বাংলো। সামনে ফুলে আলো হয়ে আছে একখানি বাগান। এর চাইতেও সুন্দর মীরা ও মাছুম। মীরা মিঃ সেনের মেয়ে, ওর বয়েস বছর সাতেক হবে—মাছুম ডাঃ আহমদের ছেলে—মীরার চাইতে বছর দুয়েকের বড়।

বাংলার বাইরে এসে এই হিন্দু মুসলমান দু'টি পরিবার ভুলে গেছেন—তাঁরা হিন্দু আর মুসলমান, তাঁরা বাঙালী এই সূত্রেই তাঁদের বিশেষ আলাপ। ডাঃ আমিন আহমদ ও মিঃ সোমেন সেন, মিসেস লিলি সেন ও আমেনা আহমদ পরস্পর নাম ধরেই ডাকেন।

ভোরের আবছা অন্ধকার কোনদিন হয়তো কাটে না, মাছুম বাগানে গিয়ে ডাকে, 'মীরা এস শিউলী ফুল কুড়োই।" মীরা তাঁর কোঁকড়ানো চুলের রাশি দুলিয়ে ছুটে আসে, আবার কোনদিন সে শিউলী ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে ঘুমন্ত মাছুমের গায়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ডাকে—"মাছুম দা জাগো রে"—মাছুম চমকে ওঠে-চেয়ে দেখে মীরা খিলখিল করে হাসছে। হাসলে ওকে বড় সুন্দর দেখায়, ছোট গাল দুটিতে টোল পড়ে। মাছুম বলে—"তুমি বড় দুষ্টু, সকালবেলা এমন ভয় পাইয়ে দেয় নাকি?" মীরা বলে, "বারে, এত বেলা হয়ে যায় তবু তুমি ওঠো না, জানো আমাদের পুষির বাচ্চা হয়েছে, রামু বলেছে। তোমাকে ডাকতে এসেছি তুমি এলে দেখব। মাছুম আনন্দে লাফিয়ে উঠে মীরাকে নিয়ে ওদের বাড়ী এসে ভাঁড়ার ঘরের পাশে যেখানে পুষি বাচ্চা নিয়ে বসে গোঁফ চাটছিল সেখানে উপস্থিত হ'ল। বেড়াল ছানা নিয়ে হৈ চৈ বেঁধে যায়। দস্যি মাছুম পুষিকে ঠেলে ফেলে বাচ্চা দেখতে, পুষি তেড়ে আসে। মীরার ছোট ভাই নানকুও ওদের সঙ্গে যোগ দিল। গোলমাল শুনে মিসেস সেন রান্নাঘর থেকে ব্যস্ত হয়ে এসে জিজ্ঞাস করেন—"কি হ'ল মাছুম?" মাছুম বলল—"মাসীমা পুষির কেমন সুন্দর ছানা হয়েছে দ্যাখো, আমি একটা নেব।" মাসী মা হেসে বললেন—বাচ্চা তো তোমারই রইল। এখন নিলে মার জন্যে কাঁদবে, একটু বড় হোক তোমাদের বাড়ী নিয়ে যেও।" মাছুমের তখনো হাত মুখ ধোয়া হয় নি দেখে তিনি চাকর রামুকে ডেকে হাত মুখ ধুইয়ে ওকে এক গ্লাস গরম দুধ খাইয়ে দিলেন।

বিকেলে ডাঃ আহমদের বাড়ী মিঃ সেন এবং ডাঃ আহমদ বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে গল্প করছিলেন। মিসেস আহমদ জলখাবার ঠিক করে দিচ্ছেন—মিসেস সেন বারান্দায় টেবিলের উপর সব সাজিয়ে রাখছেন। এ মজলিশে চাকরদের ডাকা হয় না। ডাঃ আহমদ বাইরে তাকিয়ে বললেন, "সোমেন, মীরুমা আর খোকার কাণ্ড চেয়ে দেখ।" মিঃ সেন দেখলেন, মীরা দুলছে গাইতে গাইতে ও মাছুম ওর পিঠে তাল ঠুকতে ঠুকতে দুলছে, ফুলের মত সুন্দর দুখানি মুখ, ওরা যেন ভোরের দু'টি পাখী। তিনি হেসে বল্লেন—"সত্যি আমিন, কী সুন্দর, মীরু আর খোকন মণিতে যেমনি ভাব তেমনি ওরা দুটিতে চমৎকার মানায়। আমার মীরাকে খোকনের সঙ্গেই বিয়ে দেব।" মিসেস সেন বলে উঠলেন—"কী যে বল ঠিক নেই, খোকন আমার এমনি ছেলে হ'য়ে বেঁচে থাক, জামাই হ'তে যাবে কেন! ওরা যে দুটি ভাইবোন।" মিসেস আহমদ হাসিমুখে বললেন—"সোমেন বাবু জানেন না বুঝি! লিলির সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, মীরা আমার মেয়ে আর খোকন ওর ছেলে হয়ে থাকবে।" আমিন সাহেব ও সোমেন বাবু হেসে ওঠলেন। রামু ছোট্ট নানকুকে এনে হাজির করল। নানকু তাঁর মাসীমাকে 'বিক্কুত দাও' 'সব্বত খাব' বলে ব্যস্ত করে তুলল। এম্‌নি করেই এদের দিন কাটে।

দশ বছর পরের কথা। সেই ছিপছিপে ছোট্ট মাছুম আজ তরুণ যুবক। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়ছে। দু'বছর আগে টাইফয়েড জ্বরে মিসেস আহম্মদ পরলোকগতা হয়েছেন। ডাঃ আহমদ ছেলেকে নিয়ে বালীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর নিজের বাড়ীতেই থাকেন। দেশে তার যথেষ্ট জমীজমা আছে। মিসেস আহমদের বিরাট পৈতৃক জমিদারীর বর্ত্তমান মালিক তিনি-ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মাছুম।

পাঁচ বছর আগে মিঃ সেনের মৃত্যুর পর সেন ও আহমদ পরিবারে ছাড়াছড়ি হয়। বিদায়ের দিনটির কথা মাছুমের বড় উজ্জ্বল হয়ে মনে আছে। মাসীমা যে দিন মীরাদের নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, সেদিন তাঁকে বুকে চেপে ধরে বলেছিলেন—"খোকন! নানকু মীরা যে তোর আপন ভাই বোন কখন তা ভুলিসনে-আর তোর মাসীমার খবর নস সময় নিস।" মীরা এসে শুধু বলেছিল—"দাঁড়াও প্রণাম করে নিই। চিঠি লিখো।" এর বেশী সে আর কিছু বলতে পারেনি—পালিয়ে গিয়েছিল। আর নানকু গাড়ীতে ওঠা পর্য্যন্ত মাছুমের সঙ্গ ছাড়েনি। গাড়ীতে ওদের তুলে দিতে যেয়ে মিসেস আহমদ মিসেস সেনের হাত ধরে কেঁদে ফেললেন—"লিলু! তোমার এ বোনকে ভুলোনা।" মীরা আর নানকুকে চুমু খেলেন। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন চিঠি-পত্র ঠিক মত আস্‌ত যেত। তিনি মারা যাওয়ার পর নানা ঝঞ্ঝাট গোলমালে কয়েক মাস আর মীরাদের খোঁজ নেওয়া হয়নি।



মাছুম কলকাতায় এসে ওদের বাসা খোঁজ করে দেখল, সে বাসা ছেড়ে দিয়ে ওরা অপর জায়গায় চলে গেছে। তারপর কেউ কারো খবর জানে না।

মাছুমের ক্লাশ ফ্রেণ্ড সুনীল কলেজে একদিন গল্প করতে করতে বলল—তাদের পাশের বাড়ীর মীরা সেন খুব ভাল মেয়ে, স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে, আই-এ পড়ছে। অনেক বড় বড় জায়গা হ'তে সম্বন্ধ আসছে কিন্তু টাকার অভাবে ওর মা তেমন জায়গা বিয়ে দিতে পারছেন না। মাছুমের অন্তরে সপাং করে যেন চাবুকের ঘা লাগল—সে ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল—"সুনীল, মীরা সেনের ছোট ভাইয়ের নাম কি নানকু?"—"হ্যাঁ ভাই, তুমি ওদের চেনো নাকি?"—সুনীল বল্ল।—"আমার মাসীমাকে, মীরা ও নানকুকে আমি চিনব না! চল সুনীল, এক্ষুনি তাঁদের ওখানে আমি যাব।" পথে যেতে সুনীলকে সব বলতে বলতে ছেলেবেলার সব কথা ও মায়ের কথা মনে পড়ে মাছুমের চোখ দুটি জলে ভরে এল।

বাসার দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তেই নানকু এসে কবাট খুলে দিয়ে মাছুমের পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। প্রথম সে চিনতে পারেনি, ওর হাত ধরে মাছুম বলল—"আমায় চিনতে পারোনি নানকু? আমি তোমার মাছুমদা, মায়ের কাছে চল।" সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে এসে সে দেখতে পেল, মাসীমার বড্ড অসুখ, মীরা তাঁকে বাতাস করছে। ধীরে ধীরে মীরা উঠে এসে মাছুমকে প্রণাম করে ডাকল, "মা চেয়ে দেখ মাছুমদা এসেছে।"—মিসেস সেনের রোগ ক্লিষ্ট মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—"সত্যি মীরু! খোকন এসেছে! খোকন আয় আমার কাছে কতদিন তোকে ভেবেছি, ঠিক সময়েই এসেছিস।" এইবার মাছুম ছেলে মানুষের মত উচ্ছসিত হয়ে কেঁদে ফেল্‌ল—"মাসীমা আমি যে কতদিন তোমাদের খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। আজ সুনীলের কাছে শুনে এখানে এসেছি।" মিসেস সেন আস্তে আস্তে সব কথা বললেন। সোমেন বাবু তেমন কিছু রেখে যান নি লাইফ ইন্‌সিওরেন্স যা ছিল তাই দিয়ে আর মীরার স্কলারশিপ দিয়ে কোন রকমে এদের পড়ার আর সংসার খরচ চলে। মায়ের অসুখের জন্য মীরার কলেজ কামাই হচ্ছে, সামনে পরীক্ষা কী যে হবে ভেবে আকুল হচ্ছেন। টাকার জন্য মীরার বিয়েরও কিছু করতে পারছেন না। মাছুম বল্ল—"তুমি কিচ্ছু ভেব না মাসীমা! তোমার বড় ছেলে থাকতে কিসের চিন্তা? তুমি সেরে ওঠো সব ঠিক হয়ে যাবে।" মাছুমদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ রায়কে মীরার মার চিকিৎসার ভার দেওয়া গেল। কয়েক দিনের ভেতরই তিনি সেরে ওঠলেন।

মাছুম প্রত্যেকদিন রাত্রে শোবার আগে কিছুক্ষণ তাঁর বাবার সঙ্গে গল্প করে। সারা-দিনের খুটিনাটি সব কথা, মিসেস সেনের সঙ্গে মাছুমের দেখা হওয়ার কথা তাঁর অসুখও আরোগ্যের কথা তিনি সবই জানান। মাছুম বল্ল—"বাবা আমার একটা কথা রাখবে?"

তিনি বল্লেন—"কি কথা খোকন? তোর কোন্ কথা আমি না রাখি?" "হ্যাঁ তুমি আমার সব কথাই তো রাখ, এটাও রাখবে। মীরার বিয়ের কথা চলছে। একটি খুব ভাল ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে, ইঞ্জিনিয়ার, অবস্থা ভাল, দেখতেও খুব সুন্দর। কিন্তু দশ হাজার টাকার কমে সেখানে বিয়ে দেওয়া যাবে না। তুমি যদি টাকাটা দাও, মায়ের এত আদরের মীরুকে যোগ্যপাত্রে দেওয়া হয়। আর নানকুর পড়ার খরচও আমরা দেব—দেবেতো?" দশ বছর আগের স্মৃতি আমিন সাহেবকে পীড়িত করে তুলল, তিনি নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন—"তোর বোনের বিয়ে তুইইতো দিবি। নানকুকেও তুই-ই পড়াবি, একথায় আমি আপত্তি করব কেন খোকন?"

মীরার বিয়ে হয়ে গেল। জোড় পিঁড়ির উপর বর কনেকে দেখাচ্ছিল যেন দু-টি ফুটন্ত পদ্ম! কপালে চন্দনের পত্র লেখা ও সিন্দুর নিয়ে, বরের সঙ্গে মীরা মাকে প্রণাম করল। মাছুমদাকে প্রণাম করার জন্য খোঁজ করে দেখা গেল যে সে যৌতুকের সব জিনিষ গুছিয়ে দিতে ব্যস্ত। তাকে প্রণাম করার সময় গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মীরার অন্তর ভরে গিয়েছিল। মাছুম আশীর্ব্বাদ করল—"চিরসুখী চির আয়ুষ্মতী হও।" আর কিছু সে বলতে পারল না। মীরার বর-নিখিল আগেই শুনেছিল মাছুম এদের কী। চলে যাওয়ার সময় সে এসে প্রণাম করে বলল—"দাদা, তোমার মত ভাই কারো কোনদিন হয়নি, হবেও না।"

মেয়েজামাই বিদায় দিয়ে মীরার মা চোখের জলে ভেসে মাছুমকে বুকে নিয়ে বললেন—"খোকন! আমার ছেলে হয়ে তুই তো সব করলি, কিন্তু তোর হতভাগা মা যে মায়ের মত কিছুই করতে পারল না রে।" চোখের জল মুছে হেসে মাছুম বল্ল, "কে বলেছে তুমি কিছু করতে পারো নি। আমার হারানো মাকে যে আবার আমি পেয়েছি মা।"—

চাঁদশূন্য আকাশের তারারা যেন সেই মুহূর্ত্তে হেসে উঠলো—কোথা থেকে এক ঝলক বাতাস এসে মিষ্টি ফুলের গন্ধে মা আর ছেলেকে অনির্ব্বচনীয় এক আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করে দিল। এমন মিলন কেউ দেখবে না, পৃথিবীতে আবার বুঝি স্বর্গ নেমে এল।

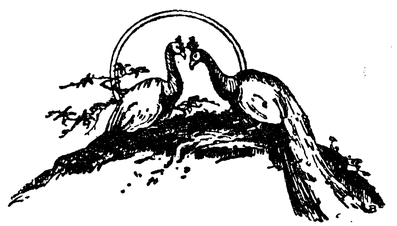

## নৃমুণ্ড শিকারী

শ্রীধর

বোর্নিয়োর নৃমুণ্ড শিকার সম্বন্ধে আজকাল বিশেষ কিছু শোনা যায় না। প্রায় চল্লিশ বছর আগে হ্যাডন্ প্রভৃতি কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ্ বোর্নিয়োতে এক অভিযান করে এ বিষয়ে তাঁদের গবেষণার বিচিত্র ফলাফল জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

আমরা সভ্য মানুষ বাঘ-ভাল্লুক-হরিণ শিকার করি নিছক আনন্দ ও উত্তেজনার লোভে। আজকের যুদ্ধে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষ শিকার চলছে। প্রাচীনকালে দেবতার তুষ্টির জন্য নরবলির প্রথা ছিল। অনেকে গোপনে নরবলি দিত অমানুষিক শক্তিলাভের কামনায়। সেকালে কোন বিরাট প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য শিশুবলিও নাকি দেওয়া হোত।

কিন্তু আদিম জাতিদের মধ্যে নৃমুণ্ড শিকার একটা প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ বিচিত্র রকমের। নৃমুণ্ড শিকারের উদ্দেশ্যও একটি নয়, অনেকগুলি। নৃমুণ্ড শিকারী জাতিদের আচার অনুষ্ঠান, তাদের কল্যাণ অকল্যাণ এই নৃমুণ্ড শিকারের ওপর অনেকটা নির্ভর করতো এবং এখনও করে।

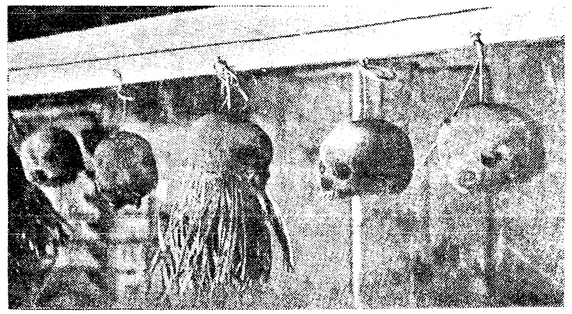

গৃহ-সামনে নৃমুণ্ডের সারি ঝোলান

প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হোল—বিবাহ করবার আগে বর যদি নমুনা স্বরূপ অন্ততঃ একটি নৃমুণ্ড শিকার না করতে পারে, তাহলে কনে সহজে তাকে বিবাহ করতে রাজী হয় না। এর অর্থ, নৃমুণ্ড শিকারে যে অক্ষম, সে ভীরু ও সংসার-ধর্ম্ম পালনে সে অকর্ম্মণ্য।

এর প্রমাণ শুধু বোর্নিয়োর আদিম জাতিদের মধ্যে পাওয়া যায় নি, আরো নানা দেশেও এরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

অনেক নৃমুণ্ড শিকারীর বিশ্বাস যে যাদের তারা হত্যা করেছে, পরজন্মে সেই মৃত লোকেরা তাদের কৃতদাস হবে। অতএব বর্ত্তমানে নৃমুণ্ড শিকার করে রাখায় তাদের ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ হওয়ার কাজে সাহায্য করবে। অবশ্য নিছক প্রতিহিংসা বশতঃ অনেকে যুদ্ধে উপযুক্ত নরমুণ্ড শিকার করে গৃহে আনাও বীরোচিত কাজ মনে করে এবং তাকে সম্মান দেয়।

বোর্নিয়োতে অনেক সময় দেখা গিয়াছে, কবর থেকে বা অন্য উপায়ে নরমুণ্ড চুরি করে কার্য্য উদ্ধার করা। একবার বোর্নিয়োর লঙ্‌লামা প্রদেশের একটি লোক কবর থেকে একটি নরমুণ্ড চুরি করে তার বাড়ীর সামনে ঝুলিয়ে রেখে সকলকে দেখায় সে যেন নিজেই নরমুণ্ডটি শিকার করেছে। তার উদ্দেশ্য, পাঁচজনকে তার এই নরমুণ্ড দেখিয়ে সে নিজের মাথায় পাখির পালক পরতে পারবে ও তার হাতে উল্কি-চিহ্ন দিতে পারবে। কারণ মাথায় পালক ও হাতে উল্কি না থাকলে কেউ পুরুষ বলেই গণ্য হয় না। কিন্তু সেই লোকটির উদ্দেশ্য সফল হোল না, কারণ তার চুরি ধরা পড়ল ও তার এই অসাধুতার জন্য শাস্তি হোল।

অনেক জাতের মধ্যে প্রথা আছে, নরমুণ্ড ধার করে এনে কার্য্য সিদ্ধি করা। নরমুণ্ড ক্রয় বা বিক্রয় করার কোন প্রথা নেই। বহু পূজাপার্ব্বনে নরমুণ্ড শিকার বারণ। সারাওয়াকের রাজার বিধানে একটা যাদুঘর নির্ম্মাণ করে তাতে নরমুণ্ডের একটা বিরাট সংগ্রহ রাখা হয়েছে। পূজাপার্ব্বণে বা অন্যান্য ব্যাপারে দরকার মত এখান থেকে নরমুণ্ড ধার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাজকর্ম্ম শেষে যথাস্থানে আবার নরমুণ্ডগুলি ফিরিয়ে দিতে হয়।

যাতে দেশে ভাল বৃষ্টি ও শস্যাদি হয়, জলকষ্ট মড়ক বা দুর্ভিক্ষ না হয়, তার জন্যও এরা নৃমুণ্ড শিকারের অভিযান করে থাকে। নৃমুণ্ড শিকারের এটা একটা বড় উদ্দেশ্য। এদের মতে ভালরকম নৃমুণ্ড শিকার হোলে ভালরকম শস্যাদি জন্মায়। নীচে এই সম্বন্ধে বোর্নিয়োতে প্রচলিত একটি গল্প দেয়া হোল।

এক রাজা তার এক প্রতিবেশী গ্রামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল, কারণ সেই প্রতিবেশীরা নাকি তাদের গ্রামের লোকেদের হত্যা করেছে। ধান বোনা হয়েছে, শস্য সুবিধের নয়, এমনি সময় তারা যুদ্ধে যাত্রা করল শুভক্ষণ দেখে এবং নদীপথে এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। তিন দিনের দিন যখন তারা একটা ছোট নদীর ধারে ভাত রান্না করছে, এমন সময় শুনতে পেলে, একটা ব্যাঙ্ ডাকছে : 'ওয়াং কক্ কক্ টাটাক্ বাটক্, ওয়াং কক্ কক্ টাটাক্ বাটক্!' এখন টাটাক্ বাটক্ এর অর্থ হচ্ছে, গলা কাটো মানে মাথা কাটো। রাজা শুনে ব্যাঙকে বললে, 'এর মানে কি হে?' ব্যাঙ্ জবাব দিল, 'তোমাদের জাতটা বড়



বোকা, তোমরা যুদ্ধে যাও বটে কিন্তু লোকদের মেরে কেবল তাদের মাথার চুল সংগ্রহ করো, সেটা কোন কাজেরই হয় না। কিন্তু তোমরা যদি নরমুণ্ড সংগ্রহ করো তাহ'লে তোমাদের সব অভাব পূর্ণ হবে। ভাল শস্য খাবার দাবার পাবে আর কোন অসুখ বিসুখের বালাই থাকবে না। কেমন করে মাথা নিতে হয়, তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি —' এই বলে ব্যাঙ্‌মশায় চট্ করে একটা ক্ষুদে ব্যাঙকে ধরে তার মাথাটা কেটে ফেললে।

রাজা এ বিষয় কর্ণপাত করলে না কিন্তু তার একজন বৃদ্ধ 'বাকিশ' বা ডান-হাত স্বরূপ ব্যক্তি সেই রাতে স্বপ্ন দেখল যে তাদের দেশে মাঠঘাট ধনধান্যে করে গিয়েছে, তাছাড়া আখ মিষ্টি-আলু প্রভৃতি আরো কত রকমের খাবার দাবারে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। পরদিন রাজার কাছে বৃদ্ধ 'বাকিশ' তার স্বপ্নের কথা নিবেদন করে ব্যাঙের উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিলে। তখন অন্যান্য সকলেও তাতে সায় দিলে।

অবশেষে সেই গ্রামটি তারা আক্রমণ করল ও সাতজন লোক নিহত করতে সক্ষম হোল। বৃদ্ধ বাকিশ তখন তাদের মধ্যে তিনটে মাথা নিয়ে ডালা বন্দী করলে ও তারা সকলে তাদের দেশের দিকে রওয়ানা দিলে। আশ্চর্য্য, তারা বেশ আরামে অথচ খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল এবং নদীর ধারে এসেও অবাক, জল এতই ভরপুর যে তারা সহজেই নৌকা পার হয়ে গেল। পরে আরো অবাক হয়ে তারা দেখল যে মাঠ শস্যে ভরে গিয়েছে, গাছগুলো তাদের ভার আর বইতে পাচ্ছে না। তাদের চোখের সামনেই গাছগুলো তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে ও তাদের কাণের কাছে ফুট্‌ফাট্ শব্দ করছে।

তখন তারা সকলে মিলে যুদ্ধ-জয়ের চীৎকার ছাড়ল ও প্রত্যুত্তরে গ্রাম থেকে ঢঙ্কার আওয়াজ এলো। গ্রামের সমস্ত লোকেরা তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলো, এমন কি খোঁড়ারাও চলতে সুরু করলে, রুগীরাও সেরে ওঠে বিছানা থেকে নেমে এলো। তারপর ঘটা করে মাথাগুলি সব ঝুলিযে রাখা হোল এবং তাদের তাপ দেওয়ার জন্য নীচে আগুন জ্বালা হোল। সকলেই খুব খুসী হয়ে উঠল। সব দেখে শুনে তখন রাজা বললে, 'ব্যাঙ্ ঠিক কথাই বলেছিল, এবার থেকে আমরা নিশ্চয় মাথা যোগাড় করব।'

বোর্ণিয়োতে সারাওয়াকের জাতিরা অন্যান্য নরমুণ্ড শিকারী জাতিদের মত নরমুণ্ড-গুলিকে জীবন্ত মনে করে বা ভাল মন্দ করার ক্ষমতা তাদের আছে বলে বিশ্বাস করে। সেজন্য নানা উপচারে তাদের খাতিরে ও তোয়াজে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক সময় স্থান পরিবর্ত্তন কালে তারা পুরোনো নরমুণ্ডগুলি ফেলে শুধু নূতন নরমুণ্ডগুলি নিয়ে প্রস্থান করে। প্রস্থান করবার আগে পুরোনো নরমুণ্ডগুলির জন্য তাদের অনেক ভাবনা ও উপায় করতে হয়। তাদের বিশ্বাস যে ঐ পুরোনো নরমুণ্ডগুলি যদি জানতে পারে যে তাদের ফেলে তারা চলে যাচ্ছে তাহলে আর রক্ষা নেই, তাদের বংশ লোশ পাবে বা লোকেরা উন্মাদ হয়ে যাবে। কাজেই নরমুণ্ডগুলি তাদের স্থান পরিবর্ত্তনের কথা না জানতে পারে, তার উপায় উদ্ভাবন করে।

এক বিচিত্র উপায়ে তারা পুরোনো নরমুণ্ডগুলিকে ফাঁকি দেয়। পাশের এক জমীতে একটা ছোট কুটীর তৈরী করা হয় এবং কুঠীরের মেঝেতে আগুণ রাখা হয় ও তার উপর আল্‌না তৈরী করা হয়। তারপর ঘটা করে ঐ নরমুণ্ডগুলি ঐ কুঠীরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং আল্‌নায় অতি যত্নে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হয়। পরে একটি শূকর বা মুরগী বলি দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়। এরপর রোজই তাদের দেখাশুনা আদর যত্ন করতে হয়, রোজই আগুণ জেলে দিতে হয়। কিন্তু কখনও কখনও যদি কোন সন্দেহী মুণ্ড ক্র্যাক্ ক্র্যাক্ করে বা নীচে গড়িয়ে পড়ে তাহলে লক্ষণ ভাল নয় বলে তারা চিন্তিত হয় ও মুণ্ডগুলিকে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু অমন যদি কিছু না ঘটে তাহলে সকলে মনে করে নেয়, নরমুণ্ডরা খুসীই আছে, তাদের আর কোন সন্দেহ সেই।

যে দিন গৃহস্থ তার নতুন বাড়ীতে যায়, সেদিন সকালে মুণ্ডগুলীর নীচে একটা বড় রকম আগুণ জেলে দিয়ে যায়।

কিন্তু দিন তিনেক পরে যখন ঐ আগুণ নিভে যায়, তখন মুণ্ডগুলির ভেতর খুস্ খুস্ গুজ্ গুজ্ শব্দ শোনা যায়,…'এরা সব গেল কোথায় ?'…'আগুণ দেয়নি, ব্যাপার কি ?' 'উঃ কি ঠাণ্ডা !' এমনি করে কয়েকদিন কেটে যায়। তবুও তারা আশা ছাড়ে না। তারপর ছাত থেকে বৃষ্টির জল পড়তে সুরু হয়। তখন মুণ্ডগুলি ছাতকে বলে, "তুমি এমন ব্যবহার করছ কেন ?"…"আমাদের মাথায় বৃষ্টি পড়তে দিচ্ছ কেন ?"…"লোকগুলোকে ডেকে তোমাকে সেরে সুরে দিতে বল না কেন ?" তখন হাত উত্তর দেয়, "ওরা তোমাদের সব ফেলে চলে গিয়েছে, তাও জানো না বুঝি ? অনেক দিন তারা চলে গিয়েছে।' এইশুনে মুণ্ডগুলো মন্ত্রণা করে কেমন করে লোকগুলোর ওপর তারা প্রতিহিংসা নেবে। তখন তারা বেরিয়ে পড়ে নদীর ধারে এধার ওধার অনেক খোঁজাখুজি করতে থাকে। কিন্তু বৃষ্টির জলে লোকেদের পায়ের দাগ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তখন তারা নিরাশ হয়ে নিজেদের ভাগ্য মেনে নেয়। ক্রমশঃ জলে ভিজে রোদ্দুরে পুড়ে তাদের রঙ্ নষ্ট হয়ে যায় ও অবশেষে মাটিতে পড়ে তাদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এমনি করে লোকেরা তাদের বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

বোর্ণিয়েরা নৃমুণ্ড শিকারীদের মধ্যে এমনি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত বিশ্বাস আছে এবং এই এই সমস্ত বিশ্বাস ঘিরে তাদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের বিচিত্র আচার বিধি ব্যবহার, তাদের সমাজের ভালমন্দ নির্ভর করে।*

* Head-Hunters by A. C. Haddon দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীর বহু দেশেই নৃমুণ্ড শিকারের প্রথা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপে বল্কান উপদ্বীপে আজও নৃমুণ্ড শিকারের প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য পূর্ব্বের সেই আসল নৃমুণ্ড শিকার ব্যাপারটা আর নেই। ভারতবর্ষে গারো, নাগা, খাসি ও কুকিরা এক সময় নৃমুণ্ড শিকারী ছিল। নাগাজাতিদের মধ্যে কেউ কেউ আজও নাকি নৃমুণ্ড শিকার করে থাকে।

( পূর্বানুবৃত্তি )

আমরা গহ্বরের মধ্যেকার সেই পথ দিয়ে নতুন দেশে রওনা হ'লাম। বেরিয়ে কিছু দূর গিয়েই তাদের দেশে এসে পড়লাম। সেটা একটা শহর ব'লে মনে হ'ল। অদ্ভুত তার সব পথ। তা ছাড়া ভারি নোংরা। পথে আলো যা আছে সে আর এক মজা। অনেক দূরে দূরে আলো। পথ সবই প্রায় অন্ধকার—আলোতে কোনই কাজ হচ্ছে না! লণ্ঠন গুলোয় খুব কারুকার্য—খুব দামী লণ্ঠন, কিন্তু যা-কিছু শোভা বাইরেই।

মণ্টু বললে, "তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করছ না, আমরা রাত্রি বেলা এই শহরে ঢুকেছি।"

রাত্রিকে রাত্রি ব'লে আবিষ্কার করার কোনো বাহাদুরি থাকতে পারে না, কিন্তু মণ্টু এক হিসেবে যা বলেছে তাতে ওকে প্রশংসা করতে হয়। মানে আমরা পর্বতগহ্বরে থেকে রাত্রি কি দিন সেটা বুঝতে পারছিলাম না, সুতরাং বেরিয়ে এসেই সেটা একবার আমাদের খেয়াল করা উচিত ছিল।

শহরের আলোর এই ব্যবস্থা দেখে আমি বল্‌লাম, "এরা বোধ হয় খুব নির্বোধ।"

মণ্টু আমার কথার প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, "নির্বোধ নাও হ'তে পারে। হয় তো তারা অত্যন্ত চতুরই—কিছুই তো তাদের সম্বন্ধে জানি না!"

প্রশ্ন করলাম, "কি ক'রে বুঝলে ?"

মণ্টু বললে, "বুঝিনি ব'লেই বলছি।"

আমি বল্‌লাম, "এরা নির্বোধ না হ'য়ে যায় না। বুদ্ধিমান হ'লে লণ্ঠনের চেয়ে আলোর ব্যবস্থাই বেশি ভালো করত।"

আমরা এই সব বলাবলি করছি এমন সময় দেখলাম, একটি লোক পাহারাওলার বেশে পথের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার হাতে একখানা লম্বা লাঠি, লাঠির মাথায়

একখানা কাগজ বাঁধা। পাহারাওলা সেই কাগজখানা সবার বাড়ির সামনে একবার ক'রে দেখিয়ে যাচ্ছে।

সে পথে চলছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, তার পায়ে কোনো জোর নেই, মনে কোনো উৎসাহ নেই, তার কাজের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই, যেন বহু দিনের অভ্যাস বশে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে।

দেখলাম সকল বাড়ির দরজাই বন্ধ, তবে ঐ কাগজ দেখাচ্ছে কাকে? মনে বড় কৌতূহল হ'ল। একটু এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে ডাকলাম। তিনজন নতুন লোক দেখে লোকটি প্রথমে খুব ভড়কে গেল, তারপর চীৎকার ক'রে লাঠি খানা ফেলেই ছুটে পালিয়ে গেল। এ রকম নিস্তেজ একটি লোক যে এত জোরে ছুটে যেতে পারে তা কল্পনাই করতে পারিনি। মন্টু বললে, "দেখে মনে হচ্ছে সামনে এগিয়ে চলার জোর এদের নেই, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে যাবার জোর এদের খুব বেশি।"

আমারও তাই মনে হ'ল। কিন্তু একটি মাত্র লোককে দেখে সবার সম্বন্ধে আগে থাকতেই কিছু বল্‌তে আমার ইচ্ছে হ'ল না। তাই চুপ ক'রেই রইলাম।

এগিয়ে গেলাম সেই লাঠির দিকে। গিয়ে দেখি এক মজার ব্যাপার! লাঠির মাথায় যে কাগজ বাঁধা ছিল তাতে লেখা আছে, "হে গৃহস্থ, সাবধানে ঘুমোও—সজাগ থাক—চোরের হাত থেকে বাঁচো।"

এবারে নিতাই বল্‌লে, "এরা নিশ্চয় আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, এদের ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।"

মন্টু বল্‌লে, "কি ক'রে বুঝলে?"

নিতাই কাগজখানার দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে বল্‌লে, "দেখছ না? এখানকার লোকেরা ঘুমন্ত অবস্থাতেও সব পড়তে পারে।"

মন্টু সে কথা বিশ্বাস করতে পারলে না, আমিও পারলাম না। আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গে লা সত্যিই মনে হ'ল আসল কাজের চেয়ে, কাজের নিয়মটাকেই এরা বড় ক'রে দেখে। এদের কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে।—এদের সঙ্গে ভালো ক'রে মিশে সব জানতে হবে। এদের বুদ্ধি সম্বন্ধে মন্টুর মনেও সন্দেহ জেগে উঠছে।

বেশ বোঝা গেল আমরা শেষ রাত্রে এদের দেশে এসে পড়েছি, রাতটা না কাটলে কোনো সুবিধাই হবে না, কিন্তু কোথায় রাত কাটানো যায়? যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক নয়, তা ছাড়া সবাই এক সঙ্গে ঘুমোনোও ঠিক নয়। এ দিকে ক্ষিধে যা পেয়েছে তা আর ব'লে লাভ কি? নিতাই তো পেটে হাত দিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে



আর কি! বল্‌লে, যা হোক কিছু খেতে হবে, চুরি ক'রেও যদি হয় তাতে আপত্তি নেই।

ক্ষিধে আমারও খুব পেয়েছিল, তাই সবাই মিলে পরামর্শ করতে লাগলাম কি করা যায়। মন্টু বললে, "এদের এই শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখা যাক যদি কোথায়ও খাবারের দোকান মেলে। কিন্তু এই রাত্রে ঘোরা কি সহজ কথা?

এই ভাবে এক জায়গায় ব'সে ব'সে আলোচনা করতে করতেই রাত শেষ হ'য়ে ভোরের অস্পষ্ট আলোকে সামনেই দেখতে পেলাম একটা দোকানের বাইরে লেখা আছে, "খাদ্য শিল্পালয়"।

নিতাই আবার ব'লে উঠল, "এরা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত।"

মন্টু আবার প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, "কেন?"

নিতাই বল্‌লে, "দোকানের নাম দেখে। দেখ্‌ছ না, কেমন নতুন ধরণের নাম?"

নাম দেখে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আশে পাশে চেয়ে দেখি, আরও অনেকগুলো খাবারের দোকান, এবং প্রত্যেকটি দোকানের গায়েই ঐ রকম সব নাম লেখা। কতকগুলো নাম কবিতায় লেখা, কতকগুলো তাদের কোন মানেই করা গেল না, সেগুলো গভীর ভাবপূর্ণ নাম।

নিতাই একটা নাম পড়ল, 'বাঁচতে যদি চাও—এই দোকানে খাও'—এবং বললে, "এরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উন্নত।"

মন্টু এবারে খুব চটে গিয়ে বল্‌লে, "তুই থাম্ নিতাই, বাজে কথা আর শুনতে চাই না। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। এখন আর কারো উন্নতি দেখার সময় নেই।"

গোলমাল শুনে অনেকগুলো লোক 'চোর চোর' ব'লে চীৎকার করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।—তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি। বোধ হয় যে পাহারাওলা আমাদের প্রথম দেখেছিল সেই গিয়ে এদের সঙ্গে ক'রে এনেছে।

এদের প্রত্যেকেই খুব রোগা এবং মনে হ'ল প্রত্যেকেই খুব ভীরু। কেবল দলের সর্দারটিকে বেশ বলবান এবং সাহসী ব'লে মনে হ'ল। তার গায়ে নানা রঙের পোষাক। সে বেশ সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, "তোমরা কে?"

আমি বল্‌লাম, "আমরা বিদেশ থেকে তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি।"

"দেশ দেখতে এসেছ, না চুরি করতে এসেছ?"

"চুরি করতে নয়। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছ, তাই খাবারের দোকানে কিছু পাওয়া যায় কি না দেখছিলাম।"

সর্দার গম্ভীরভাবে বল্‌লে, "হুঁ! কিন্তু গোলমাল করছিলে কেন?"

"চোর হ'লে গোলমাল করতাম না। আমরা যে চোর নই, গোলমালটাই তার একটা প্রমাণ।"

"কেন গোলমাল করছিলে বল ?"

"একটা তর্ক বেধে উঠেছে আমাদের মধ্যে।"

সর্দার আরও গম্ভীরভাবে বললে "হুঁ !" তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললে, "কিন্তু তর্ক করতে তো বুদ্ধি চাই—তোমাদের কি বুদ্ধি আছে ?"

নিতাই খুব গর্বিতভাবে বল্‌লে, "কিছু আছে বৈ কি !"

সর্দার আবার বল্‌লে "হুঁ।" তার মুখ এবারে আরও গম্ভীর হ'য়ে গেল। সে খুব চিন্তিতভাবে হাত নেড়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "তোমরা এদেশে এলে কি করে ?"

মণ্টু এ কথার জবাব দিলে। সে বল্‌লে, "বুদ্ধি থাকলেই আসা যায়।"

সর্দার কিছুক্ষণ মণ্টুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লে, "বুদ্ধির কথা কিছু ব'লো না। যদি বেঁচে থাকতে চাও তা হ'লে চুপ ক'রে থাক। কেন জান ? বুদ্ধির কথা বললে আমরা তা সহ্য করতে পারি না, যে বলে, তাকে আমরা মেরে ফেল্‌তেও পারি। কত লোক বাইরে থেকে আমাদের দেশে এসেছে, এবং এসেই নানা রকম উপদেশ দিতে চেয়েছে, কিন্তু তাদের আমরা উপযুক্ত শাস্তিও দিয়েছি।"

আমি বল্‌লাম, "তা হ'লে আমরা চুপ ক'রে থাকব, কিন্তু কোনো কিছু বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দেবে তো।"

সর্দার বললে, "তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই, তা ছাড়া তোমাদের দেখে আমার মনটা বদলে গেছে। তোমাদের উপর কেমন যেন একটা মায়া জন্মে গেছে।—তাই আমার হাতে তোমাদের কোনো অনিষ্ট হবে না। কিন্তু আমাদের রাজার কাছে তোমাদের একবার যেতেই হবে, এটা আমাদের দেশের একটা নিয়ম।"

সর্দারের কথায় আশ্বস্ত হ'য়ে বললাম, "তুমি যে রকম বলবে, আমরা সেই রকমই চল্‌ব। তা হ'লে চল এখন তোমার সঙ্গেই যাওয়া যাক।"

সর্দার তার সঙ্গের লোকগুলোকে বিদায় ক'রে দিয়ে একা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে খাওয়ার কথাটা আমরা যেন ভুলেই গেলাম। রাত্রি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে এল, পূব দিকে দিনের আলো জেগে উঠল।

আমি ভাবতে লাগলাম, এ কোথায় আমরা এলাম বাড়ি-ঘর ছেড়ে ! কোথায়, কতদূর ! আর কখনো কি ফিরে যেতে পারব ? কত পাহাড় বন, কত নদী মাঠ পার হ'য়ে এসেছি এই নতুন দেশে ! আবার কেমন ক'রে ফিরব কে জানে ! যে পথে এসেছি সে পথে তো আর ফেরা যাবে না। যেখানে বাঘ ব'সে ব'সে তপস্যা করছে সেখানে গেলে



পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা উঠতে পারব না, কাজেই নতুন পথ খুঁজতে হবে। এই সব কথাই কেবল মনে আসতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, নতুন দেশে এসেই ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছি কেন ! যখন এসেই পড়েছি তখন এ দেশটা ভাল ক'রে দেখে তবে যাব। যদি কষ্ট হয়, আমাদের তিন জনেরই হবে। যদি বিপদে পড়ি তা হ'লে বাঘকে ডাকলেই সে এসে আমাদের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

একমাত্র ভয় নিতাইকে নিয়ে। নিতাই নিতান্তই ছেলেমানুষ। ও যে আমাদের সঙ্গে কেন এল বুঝতে পারছি না। যে কোনো জিনিস দেখলেই ও ভয়ে অস্থির হ'য়ে পড়ে। তবে মণ্টু খুব সাহসী। আমার একমাত্র জোর মণ্টুর জন্যে।

নিতাই আমাকে বল্‌লে, "এই নতুন দেশের লোকেরা যদি আমাদের মেরে ফেলে !"

মণ্টু একথা শুনে বিরক্ত হ'ল। সে বল্‌লে, "মেরে ফেলে তো আপদ চুকেই গেল।"

নিতাই বল্‌লে, "দেখ্ মণ্টু, তুই আমাকে ভয় দেখাস্‌নে। বেশি ভয় পেলে আমি কিন্তু হেঁটে যেতে পারব না।"

এই কথায় এবারে আমার ভয় হ'ল। বল্‌লাম, "না নিতাই, এরা আমাদের কোনো অনিষ্ট করবে না। দেখছ না, সর্দার আমাদের সঙ্গে কেমন ভাল ব্যবহার করছে ! অন্য কেউ যদি আমাদের আক্রমণ করে, তাহ'লে সর্দারই আমাদের বাঁচিয়ে দেবে, সর্দারও যদি না পারে তাহ'লে বাঘ আছে।"

নিতাই বল্‌লে, "বাঘ তো আছে অনেক দূরে—তাকে তখন ডাকবে কে ?"

নিতাই কথাটা ঠিকই বলেছে। ভয়ে ওর বুদ্ধি খুলে গেছে। আমরা আগে কেউ এ কথাটা ভাবিনি।

মণ্টু বল্‌লে, "আমার কিন্তু বিশ্বাস, বাঘকে অতদূরে ডাকতে যেতে হবে না।"

নিতাই বল্‌লে, "আমার তাই বিশ্বাস।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার এই বিশ্বাস কি ক'রে হ'ল ?"

মণ্টু বল্‌লে, "বাঘ যে তপস্যা করছে তাতে ও মনে মনে ধ্যান ক'রে সব জানতে পারবে। আমরা যদি কোনো বিপদে পড়ি, আর সে সময়ে বাঘকে মনে মনে ডাকি, তাহ'লে বাঘ বুঝতে পারবে।"

মণ্টুর কথাটা উড়িয়ে দেওয়া গেল না। আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা হয় তো মিথ্যা নয়। কিন্তু তখুনি আর একটা কথা মনে জাগ্‌ল। আমরা মাত্র তিনজন, এই তিনজনে আমরা বেশি লোকের আক্রমণ ঠেকাব কি ক'রে ? পাঁচ ছজনকে পর্যন্ত বাঘ ঠেকাতে পারবে,—দু চারশো হ'লে কি হবে ?

মণ্টু বল্‌লে, "তা হ'লেও আমাদের ভয় নেই, বাঘ সব অবস্থাতেই আমাদের বাঁচাতে পারবে।"

সর্দার আমাদের আগে আগে চল্‌ছিল, আমাদের কথা সে শুনতে পাচ্ছিল না।

মণ্টুর কথায় আমার মনে হ'ল যেন কথাটা সে একটু বাড়িয়ে বললে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ বিশ্বাস তোমার কি ক'রে হ'ল?"

মণ্টু বললে, "ঐ একই কারণে। বাঘ তপস্যা করছে এবং তার ফলে একা বাঘ হাজার বাঘের শক্তি লাভ করবে।"

কথাটা শুনে সত্যিই অবাক হ'য়ে গেলাম। মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, তপস্যা করলে এত ক্ষমতা লাভ হয় কি ক'রে জানলে?"

মণ্টু সহজভাবেই বললে, "আমার তাই বিশ্বাস। আমার বিশ্বাস, তপস্যা করলে সবারই ক্ষমতা বাড়ে। তারা তখন যা ইচ্ছে করতে পারে। তা ছাড়া আমি এ বিষয়ে অনেক গল্প পড়েছি।"

এ নিয়ে আর তর্ক করলাম না। মণ্টু যদি তার বিশ্বাস নিয়ে সুখে থাকে থাক। তবে অসম্ভব কিছুই নেই, এইটে আমার জানা ছিল। কি জানি হ'তেও পারে।

ক্রমশঃ

## বিচার কাহিনী

শ্রীরমাপ্রসাদ দাসগুপ্ত

একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, যে সব সব চাইতে ঘৃণ্য অপরাধ যা ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত ক'রেছে, মানুষ তা করেছে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র জিনিষের নাম নিয়ে—ধর্ম্মের নামে, স্বাধীনতার নামে, ন্যায় বিচারের নামে। এ কথাটা যে কত বড় সত্য, তার সাক্ষ্য পৃথিবীর ইতিহাস দেবে। আজ তোমাদের শুধু একজন হতভাগ্য ইহুদির গল্প ব'লব।

সে আজ প্রায় ৫০ বৎসর আগের কথা—১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাস! ফ্রান্সের এক সামরিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে বিশেষ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়েছে। আধুনিক সমরসাজে সজ্জিত এক বৃহৎ সৈন্যদল নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন তাদের সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষায়। চক্‌চকে তক্‌মা আঁটা সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিশেষ ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা



কচ্ছে। সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও সেনাপতিরা গম্ভীর মুখে বসে আছেন, যেন সারা দুনিয়ার ভাবনা চিন্তা তাদের মাথার উপর ভর করেছে। দূরে বিক্ষুব্ধ জনতা কি দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে সম্মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে—মাঝে মাঝে তাদের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমন সময় বিউগল্ বেজে উঠ্‌ল। সৈন্যাধ্যক্ষদের ব্যস্ততা হঠাৎ বেড়ে গেল। সেনাপতি ও সামরিক শিক্ষকগণ নিজ নিজ আসনে ঠিক হয়ে বসলেন। সৈনিকেরা একসঙ্গে বন্দুক কাঁধে তুলে নিল। উদ্বেলিত জনতার গুঞ্জন ধ্বনি থেমে গেল। এতক্ষণ প্রতীক্ষার পর সবাই যেন চরম মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হ'ল।

ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের এক দিকের দ্বার খুলে গেল। সেখান দিয়ে সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে এক বন্দী প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে এসে দাঁড়াল। তার পরিধানে গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেনের পোষাক। উন্নত তার শির—চক্ষু তার ভয় লেশহীন। অপরাধীর কোন চিহ্নই তার মুখে ছিল না। কিন্তু তাকে দেখেই জনতা ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠল—যেন পেলে তাকে তারা সেখানেই টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে। চারিদিকে একটা হিস্ হিস্ শব্দ উঠল—কেউ কেউ চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "বিশ্বাস ঘাতকের শাস্তি মৃত্যু।"

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁর আসন পরিত্যাগ করে বন্দীর কাছে এগিয়ে গিয়ে ব'ল্লেন—"আলফ্রেড দ্রেফু, তুমি যে কতদূর ঘৃণ্য অপরাধ করেছ তা বলা যায় না। তুমি সৈনিক ব্রতের অপমান ক'রেছ—এই বিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করেছ—তুমি—তুমি দেশের কলঙ্ক ফরাসীজাতির কলঙ্ক।"

নির্ভীক কণ্ঠে বন্দী উত্তর দিল, "আমি—আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। দেশদ্রোহী আমি নই।"

অধ্যক্ষ বল্লেন—'চুপ কর। বিচারে তোমার অপরাধ প্রমাণিত হ'য়েছে। কোন কথা এখন তোমার বলবার অধিকার নেই। বিশ্বাসঘাতক—বিদেশী শত্রুর কাছে দেশের সামরিক গুপ্ত তথ্য বিক্রী করার মত হীন প্রবৃত্তি যে কোন ফরাসীর থাকতে পারে এ স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। ছিঃ ছিঃ ঐ সামরিক পোষাকের অপমান তুমি করেছ—ও পোষাক পরবার তোমার কোন অধিকার নেই।" তারপর তিনি তাঁর একজন অনুচরকে কি ইঙ্গিত কল্লেন। তখন কয়েকজন সৈন্য বন্দীর সামরিক পোষাক টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌ল এবং তার তরবারী ভেঙ্গে ফেল্‌ল। বন্দী কিন্তু তবু গর্ব্বিত শিরে দাঁড়াইয়া রহিল এবং 'ফ্রান্স দীর্ঘজীবি হউক' বলে চীৎকার ক'রে উঠল। এইবার জনতা বিকট উল্লাসধ্বনি কর্ত্তে লাগল যেন তারা কোন বিজয় উৎসবে মত্ত হ'য়েছে।

* * * * * *

আলফ্রেড দ্রেফু ছিল আলসেস্ প্রদেশের এক্‌জ নইহুদি। সে সৈন্যবিভাগে গোলন্দাজ

বাহিনীর কাপ্টেন ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হঠাৎ একদিন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সামরিক বিচারালয়ে গোপনে তার বিচার হয়। তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ করা হয়—বলা হয় সে নাকি জরুরি সামরিক দলিলপত্র কোন বিদেশী শক্তির কাছে বিক্রী করেছে। কিন্তু প্রমাণ প্রকৃতপক্ষে কিছুই ছিল না। শুধু সমর বিভাগের হাতে একখানা দলিল পত্রের লিষ্ট আসে—তাতে কোন নামধাম তারিখ কিছুই ছিল না। তবে হাতের লেখা নাকি দ্রেফুর বলে মনে করা হয়। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে দ্রেফুর অপরাধ সব্যস্ত হয় এবং তাহার এই শাস্তি বিধান করা হয় যে তাকে সৈন্য বিভাগ হতে অপসারিত করা হবে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ কর্ত্তে হবে। তারপর সামরিক বিদ্যালয়ে খুব ঘটা করে তাকে পদচ্যুত করা হয় এবং শয়তানের দ্বীপে ( ডেভিল্‌স্ আইল্যাণ্ড ) নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হয়।

দ্রেফুর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গরা কিন্তু জোর গলায় বললে যে ভয়ানক অবিচার করা হ'য়েছে—কারণ সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সে কথায় কেউ কর্ণপাত করলে না। বছর খানেক পরে কর্ণেল পিকার্ত নামে সৈন্য বিভাগের একজন ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী নিঃসন্দেহরূপে বুঝতে পার্লেন যে দ্রেফু নির্দ্দোষী এবং গুপ্তদলিলের লিষ্টটি মেজর এষ্টারহাজি নামে একজন বদমায়েস সৈন্যাধ্যক্ষের লেখা। তিনি একথা যুদ্ধ মন্ত্রিকে জানালেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। কারণ সামরিক নেতারা এ ব্যাপারটা ধামা চাপা দেবার সিদ্ধান্ত কর্ল্লেন। পিকার্তকে ফ্রান্স থেকে সরিয়ে আফ্রিকায় পাঠান হ'ল। তার জায়গায় কর্ণেল হেন্‌রীকে নিযুক্ত করা হ'ল।

বছর দেড়েক পরে সেনেট সভার ভাইস প্রেসিডেণ্ট কেস্তনার প্রকাশ্যভাবে দ্রেফু নির্দ্দোষ বলে মত প্রকাশ কল্লেন। ব্যাপারটাকে আর চেপে রাখা অসম্ভব দেখে প্রধান মন্ত্রী মেলিন দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত কর্ল্লেন যে দ্রেফু বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হ'য়েছে, তার বিষয় আর বিবেচনা করা যেতে পারে না। এখন থেকে দুই পক্ষে ঘোর বাদানুবাদ আরম্ভ হ'ল। প্রতিপক্ষদলের মুখ বন্ধ করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট পক্ষ এষ্টারহাজীকে এক সামরিক আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত ক'রল। তাতে যা হ'ল তা বিচার নয়—বিচারের এক প্রহসন মাত্র। এষ্টারহাজীকে নির্দ্দোষী বলে আদালত তাকে সসম্মানে মুক্তি দিল। এবং তার অভিযোগমত পিকার্তকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল।

এইবার ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক এমিল জোলা দ্রেফুর পক্ষ অবলম্বন কর্ল্লেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে একখানা চিঠি লিখে দ্রেফুকে সমর্থন কল্লেন এবং সামরিক বিচারালয়ের বিচারকদের নির্ম্মমভাবে আক্রমণ ক'রে দেখালেন যে তাঁরা ন্যায় বিচার করেন নাই। এবার এল জোলার পালা। তাঁরও এক বিচারের প্রহসন হ'ল। বিচারে তাঁকে দোষী সব্যস্ত ক'রে



অর্থ ও কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হ'ল। যদিও উর্দ্ধতর আদালতের বিচারে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিছুদিন পরে তাঁর আবার বিচার হয়। এবারও তিনি দোষী সব্যস্ত হ'লেন, কিন্তু ইংলণ্ডে পলায়ন করে দণ্ড থেকে অব্যাহতি পান।

এখানেই গোলমাল মিট্‌ল না। কিছুদিন পরে সমর মন্ত্রী কাভেইনাক ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার এক বক্তৃতায় তিনটি নতুন দলিল উপস্থিত করে, দ্রেফুর অপরাধ সপ্রমাণ করেন। সভা তাঁর প্রমাণ গ্রহণ করে ফ্রান্সের গ্রামে গ্রামে তাহা প্রচারিত কর্ব্বার আদেশ দেয়। আবার কিন্তু গোল বাঁধাল কর্ণেল পিকার্ত। তিনি কাভেইনাইককে জানালেন যে তাঁর হাতে এমন জিনিষ আছে, যাতে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ কর্ত্তে পারেন যে প্রথম দুটী দলিলের কোন মূল্য নেই এবং তৃতীয়টী জাল। এবারও ফল হ'ল উল্টো। পিকার্তকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এ সংবাদ প্রচারিত হ'ল যে কর্ণেল হেন্‌রী স্বীকার করেছে যে পিকার্ত সত্যি কথাই ব'লেছে, সে নিজে তৃতীয় দলিলটী জাল করেছে। এই স্বীকারোক্তি করে হেন্‌রী আত্মহত্যা করে।

এইবার সমগ্র ফ্রান্সময় ভীষণ সাড়া পড়ে গেল। লোকের মনে দ্রেফুর অপরাধের বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হল। জনমতের চাপে কাভেইনাক পদত্যাগ করেন কিন্তু তিনি এই কথা বলেন যে হেনরী জালিয়াত প্রমাণ হলেও দ্রেফুর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হয় না।

ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদালতে এবার দ্রেফুর বিষয় উত্থাপিত করা হয়। এই সময়ে আবার আর একটী চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। এস্তারহাজী ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে পালিয়েছিল। হঠাৎ সে স্বীকার করে যে সে নিজে প্রথম লিষ্টটি তৈরী করেছিল। দ্রেফুর শত্রুরা অবশ্যি বল্‌তে থাকে যে ঘুষ খেয়ে সে ঐ স্বীকারোক্তি করছে। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদালত দ্রেফুর বিরুদ্ধে সামরিক আদালতের রায় নাকচ করে পুনর্বিচারের আদেশ দেন। দ্রেফুকে সয়তানের দ্বীপ থেকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং প্রায় ৫ বৎসর পরে আবার নতুন সামরিক বিচারালয়ে তাহার বিচার হয়। এবারও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নানাভাবে চেষ্টা কত্তে লাগল, কি করে দ্রেফুর শাস্তি হয়। এবারও বিচারকেরা অধিকাংশই তাকে দোষী সব্যস্ত করলেন এবং তাকে দশ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড প্রদান কর্ল্লেন। কিন্তু ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট লুবে তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন। তবে যাতে তার শত্রুদের শাস্তি না হয়, সেজন্য গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় একটা আইন পাশ করে তার শত্রুদের ভবিষ্যতে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল।

এই নাটকের যবনিকা পতন হয় আরও তিন বৎসর পরে। এবার ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় দ্বিতীয় সামরিক বিচারালয়ের রায় নাকচ করে দ্রেফুকে নির্দ্দোষী বলে ঘোষণা করেন ও বলেন, তার প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়েছে।

গভর্ণমেণ্ট এবার দ্রেফুকে সৈন্যবিভাগে পুনর্নিযুক্ত করে তাকে মেজর পদে উন্নীত

করে। তাকে ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—"লিজিয়ন্ অফ অনার" দেওয়া হয় এবং এই অভিষেক হয় সেই সামরিক বিদ্যালয়ে যেখানে এগার বৎসর আগে তাকে অপমান করে সৈন্যবিভাগ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

কর্ণেল পিকার্তকেও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। আর জোলা এর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। তবে তাঁর মৃতদেহের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দেখিয়ে এক বিশেষ স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

কিন্তু এতেও কি সত্যসত্যই এঁদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল, তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হয়েছিল ?

---

## বন-বধূ শেফালী

শ্রীনকুলেশ্বর পাল

শেফালী—শেফালী—মধু-বন দুলালী !
ঝরা ফুল মালিকায় প্রাণ মন ভুলালি !
শরতের সোনালী রৌদ্রের বর্ণে ;
রক্তিম ঠোঁট দুটী যেন গড়া স্বর্ণে।
অস্ফুট কথা কও—আকুলিত গন্ধে ;
কার পথ চেয়ে চেয়ে এল, রাঙ্গা সন্ধ্যে।
টিপ্ টিপ্ শিশিরের অশ্রুর ঝর্ণা ;
বেদনার তুলি দিয়ে আঁকা হেম ঝর্ণা।
বন বধূ-শেফালী, রামধনু চক্ষে
মিলনের স্মৃতি টুকু এঁকে নিয়ে বক্ষে—
অবেলায় ঝরে যাও,—বরি প্রিয় মরণে ;
ঝরা ফুল ডালি দিয়ে দয়িতের চরণে।

# ছুটির ঘণ্টা

খেলার মাঠে — কে ভট্টাচার্য্য

লীগের খেলার পর এখন আই এফ-এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছে এবং অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছে। শীল্ডের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিয়ে দিয়ে এবছরের বিশেষ বিশেষ খেলার কথা লিখব। এই শীল্ড খেলা আরম্ভ হয় ইংরাজি ১৮৯৩ সালে। এই শীল্ড প্রথম জয় করে রয়াল আইরিশ রাইফল্‌শ ! প্রথম দুবছর পর পর জেতে তারাই। এখনও পর্য্যন্ত কেবলমাত্র তিনটি দল তিনবৎসর উপরউপরি এই শীল্ড জিতেছে। এরা হচ্ছে গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স, শেরউড ও ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব। হাইল্যাণ্ডার্সরা নিয়েছে ১৯০৮, ১৯০৯ ও ১৯১০ সালে, ক্যালকাটা নিয়েছে ১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৪ এবং শেরউড নিয়েছে ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে। সব থেকে বেশীবার শীল্ড জিতেছে ক্যালকাটা ক্লাব। এই দল সবশুদ্ধ নয় বার জিতেছে। মোহনবাগান ক্লাব হল প্রথম ভারতীয় দল যারা এই শীল্ড জেতে। তিনটি ভারতীয় দল এ পর্য্যন্ত এই শীল্ড নিতে পেরেছে, এরা হল মোহনবাগান, মহামেডন স্পোর্টিং ও এরিয়ান্স।

গত কয়েক বছর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই খেলার ভাল মিলিটারী দল আর আসছে না। জানি না এদের খেলার অধঃপতনের কারণ কি। তবে ভাল মিলিটারী দল না খেলায়, আমাদের ভারতীয় দলের খেলার একটু ভাঁটা পড়েছে বলে মনে হয়। শুধু মিলিটারী কেন, এখানকার অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইউরোপীয়ান ফুটবল দল সমূহের অর্থাৎ ক্যালকাটা ডালহাউসী ইত্যাদির খেলায় আর কোনও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। এই সব দল এখন কোনও রকমে যেন প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখা গোছের ফুটবল খেলছে। কখনও কখনও একটা ভাল গোলকিপার, কি ব্যাক, কি হাফব্যাক, কি ফরওয়ার্ড দেখা যায়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, ভাল দল এরা আর কিছুতেই গড়ে উঠতে পাচ্ছে না। এতে হয়েছে কি, এখানকার লীগ ও শীল্ড খেলাতে ভারতীয় দলের প্রাধান্য ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। ভারতীয় দলেরা লীগ বা শীল্ড জয় করলে অবশ্য দুঃখের কিছু নেই কিন্তু ভাল খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে না খেললে খেলার উন্নতি হওয়ার আশা একেবারে থাকে না, সব খেলারই এই নিয়ম। হয়েছেও তাই, আমাদের ভারতীয় ফুটবলের যেন কেমন একটা মন্থর গতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ! বছর পাঁচেক আগেও

দেখা যেত যে সমস্ত ভারতীয় দলগুলিতেই অনেক ভাল খেলোয়াড় খেলত অর্থাৎ যাকে কিনা সকলে একবাক্যে সত্যিই ভাল খেলোয়াড় বলে থাকে। এই থেকে কেউ যেন না মনে করেন, যে এখানকার খেলোয়াড়রা খেলতে জানে না, আমি এমন কথা বলতে চেষ্টা করছি। খেলতে জানেনা এরকম খেলোয়াড় এখনও অনেক অনেক আছেন, কিন্তু একটা গোষ্ঠ পাল, একটা সামাদ, একটা রবি গাঙ্গুলী, একটা সূর্য্য চক্রবর্ত্তী, একটা নুরমহাম্মদ, একটা রসিদ, কি একটা ছনে মজুমদার আর আমরা মাঠে দেখতে পাই না। এঁদের খেলা ত বেশী দিনের কথা নয়। এই অল্পদিন আগে বাঙ্গলায় এই সব এবং আরও অনেক ভাল খেলোয়াড় তৈয়ারী হয়েছে। কিন্তু এখন আর হচ্ছে কৈ? এর কারণ নিশ্চয় একটা আছে। তারই খোঁজ করতে গিয়ে দেখতে পাই, যে ভাল খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলতে না পাওয়া এর একটি প্রধান কারণ। আরও অনেক কারণও আছে কিন্তু আমি এখন সে সব কথার আলোচনা করতে চাই না। তবে যাঁরা নিয়মিত খেলা দেখে থাকেন, তাঁরা হয়ত দেখে থাকবেন যে এখানকার খেলায় যেন উৎসাহ অনেক কমে গিয়েছে! সেই আগেকার মত ক্লাবের জন্য প্রাণ দিয়ে খেলা আমরা আর দেখতে পাই না। খেলাটা একেবারে প্রাণহীণ হয়ে গিয়েছে। দর্শকদের উৎসাহও সঙ্গে সঙ্গে অনেক কমে গিয়েছে। খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে, ক্লাবে ক্লাবে সদ্ভাবের বড় অভাব হয়েছে। বেড়েছে খেলার পক্ষে মস্ত ক্ষতিকর জিনিষ—ঝগড়া। কথায় কথায় গালাগালি ও মারামারি। খেলার ভিতর এই সব জিনিষ দেখলে দুঃখ হয়, তাই এইগুলো কথা বলে ফেললাম।

যাইহোক, এখন শীল্ড খেলার কথা একটু আলোচনা করা যাক্। এখানকার সব দলই খেলছে তবে বাইরের ভাল দল নেই বললেই চলে। মিলিটারী দল অন্যান্য বছর যাও বা এক আধটা থাকৃত, এবছর যুদ্ধের জন্য তাও নেই। বাইরের ভাল দলের মধ্যে নাম করা যেতে পারে কেবল মহীশূর রোভার্স ও খুলনা ইউনিয়ন স্পোর্টিং এর। মহীশূরের দলে কয়েকটি নাম করা খেলোয়াড় আছে, যথা লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশ ইত্যাদি। এই দলের ফরওয়ার্ড বিভাগটি বেশ ভাল কিন্তু মনে হয় সেই তুলনায় অন্যান্য বিভাগ তত ভাল নয়।

এদের ফরওয়ার্ডদের খেলা দেখে আনন্দ হয়! খেলার কথা বলা যায় না, তবে এই দল ফাইনাল অবধি গেলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। খুলনার ইউনিয়ন স্পোর্টিং দল সম্পূর্ণ ভাবে খুলনার খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈয়ারী। এই দলটি কয়েকটা খেলা বেশ ভাল খেলে জিতে চতুর্থ রাউণ্ডে মহামেডন স্পোর্টিংয়ের কাছে হেরে যায় ০-২ গোলে। সেদিনকার খেলায় মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে দেবার সুযোগ পর্য্যন্ত এরা পেয়েছিল। কিন্তু ফরওয়ার্ডদের খেলার দোষে সে সুযোগে নষ্ট করেছে এরা। যাইহোক মহামেডনদের কাছে হারায় দুঃখ করার কিছু নেই। এদের আগেকার রাউণ্ডের খেলা দেখে আনন্দ হয়েছিল।



কলকাতা ছাড়া, বাঙ্গলার অন্যান্য জেলায়ও যে ভাল ফুটবল খেলা এখনও হয়, তা এঁরা দেখিয়ে গিয়েছেন। আর একটী খুলনার দলও খেলতে এসেছিল। দুটি দল না করে যদি এঁরা একটী দল ভাল করে গড়ে খেলতে আসেন, তাহলে ফল নিশ্চয় এর থেকে ভাল হবে। মোহনবাগানের এবার শোচনীয় হার হয়েছে রেঞ্জার্সের কাছে। আর যারা এখনও বাকী আছে তারা হচ্ছে মহামেডন স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, ভবানীপুর, রেঞ্জার্স ও মহীশূর রোভার্স। সমস্ত কলকাতার দল নিয়ে সেমি-ফাইনাল বা ফাইনাল খেলা হওয়া আই এফ এ শীল্ডের ইতিহাসে অতি বিরল। এটা ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে গৌরবের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখ হয় এই গৌরবের কথা মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় ভাল বিপক্ষের অভাবের কথা। তারা যদি আজ এই খেলায় যোগ দিত এবং তাদের হারিয়ে দিয়ে আমাদের দলেরা শীল্ড জিততে পারত, তাহলে সেটা কত বড় গৌরবের কথাই না হত। যাইহোক সকলেই আশা করছে, হয় মহামেডন স্পোর্টিং কিম্বা ইষ্টবেঙ্গল এই দুই ক্লাবের একটী এবার শীল্ড জিতবেন। তবে খেলার অনিশ্চয়তার কথা বলা যায় না। তাই মনে হয় মহীশূর রোভার্স এদের মধ্যে থেকে শীল্ড জিতে না চলে যায়। এই দলের একটা মস্ত অসুবিধা হচ্ছে এখানকার মাঠের অবস্থা। জলে কাদায় এরা তত ভাল খেলতে পারে না, যতটা পারে শুক্‌নো মাঠে। হ্যাঁ এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে, এই মহীশূর রোভার্সই হল আগেকার বাঙ্গালোর মুস্‌লিম দল। সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খেলায় যাতে না থাকে সেইজন্য এরা নিজেরাই নিজেদের দলের নাম বদ্‌লে মহীশূর রোভার্স নাম দিয়েছে। এই সুবুদ্ধি আমাদের কলকাতার দলেদের মধ্যে কবে হবে জানিনা। কেননা নীচ সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ এখানকার খেলার মাঠ পর্য্যন্ত কয়েক বছর হল এসে পৌঁছে খেলার ও খেলা দেখার আনন্দ প্রায় শেষ করতে বসেছে।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে ১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কন্‌ট্রাকটার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

# দুর্ধর্ষ চীনা চেনলিং

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জাপানীদের আক্রমণে চীনারা কেন যে আজ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নাই, তাহা জানিতে নিশ্চয়ই তোমাদের কৌতুহল জাগে। ইহার সোজাসুজি উত্তর এই যে চীনাদের দুঃখকষ্ট সহ্য করার অমানুষিক ক্ষমতা ও অদম্য মনের শক্তি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, নতুবা এতদিনে চীন হয়ত জাপানী কামানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইত। দুর্ভিক্ষ মহামারী, জলপ্লাবন, অসহনীয় দারিদ্র্য, মারাত্মক দৈহিক আঘাত সব কিছু উপেক্ষা করিয়া তাঁহার মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখিবার সাহস রাখে। কে যেন জীয়ন কাঠির স্পর্শে তাহাদিগকে শত মৃত্যুর মধ্যে বাঁচাইয়া রাখে। চীনের তিয়েন্‌সিন্‌বাসী চেনলিংএর জীবনের ঘটনাবলি হইতে তোমরা চীনদের কষ্টসহিষ্ণুতার একটি পরিচয় পাইবে।

চেনলিং এর ছিল এক অদ্ভুত খেয়াল! খেয়ালী লোক সব দেশেই আছে কিন্তু চেনলিং এর মত অদ্ভুত খেয়াল খুব কম লোকেরই দেখা যায়। যেখানেই চীনা সৈন্যেরা গুলিগোলা ছোড়া শিক্ষা করিত, সে সেখানেই গিয়া সৈন্যদের ব্যবহৃত গুলি গোলার রক্‌মারি অংশগুলি কুড়াইয়া নিয়া সংরক্ষণ করিত। এই কাজে সে প্রচুর আনন্দ লাভ করিত। বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে এই বিপদজনক কাজ হইতে নিবৃত্ত থাকার উপদেশ দিলে সে কোন কথা না বলিয়া শুধু মুচকি হাসিত। একদিন একটি বড় রকমের গোলা পাইয়া চেনলিং যেই হাতে তুলিয়াছে অমনি উহা সশব্দে ফাটিয়া গিয়া তাহার বামপায়ের কতকাংশ উড়াইয়া নিয়া গেল। তাহাকে হাসপাতালে দেওয়া হইলে, অস্ত্রচিকিৎসকগণ তাহার বামপাখানি একদম কাটিয়া ফেলিলেন এবং ভবিষ্যতে চেনলিংকে এরূপ মারাত্মক কাজে হাত দিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু চেনলিং আরোগ্য লাভ করিয়াই আবার ঐরূপ বিপজ্জনক কাজে অগ্রসর হইতে বিলম্ব করিল না। একপার কতকাংশ নাই, ইহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে মহানন্দে সৈন্যদের চাঁদমারিস্থলে গমন করিয়া আবার গোলা কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। ছয়মাস অতিবাহিত হইল- চেনলিংও নিরুদ্বেগে তাহার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

একদা বৃহদাকারের আর একটি গোলা পাইয়া সে অন্যান্য নানাবিধ গোলাগুলির টুকরাগুলির মধ্যে সেইটিকে সযত্নে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই বড় গোলাটি সশব্দে ফাটিয়া গিয়া চেন লিংএর দেহের নানাস্থানে নির্ম্মম



ভাবে আঘাত করিল। তাহার বাম হাতখানি কব্জি সমেত উড়িয়া গেল। তাহার নাকের, গালের, উপরের ওষ্ঠের, চোখের পাতার, ডানহাতের কব্জির নানাস্থানে এরূপ গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিল যে আঘাতের প্রচণ্ডতায় ও প্রচুর রক্তস্রাবে সে অর্দ্ধ চেতন ও অসহায় অবস্থায় রাস্তার উপরে পড়িয়া গেল। তাহার ডানহাতের কনুই ও ডান পায়ের গোড়ালির হাড় পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে জনৈক উচ্চপদস্থ চৈনিক রাজকর্মচারী চেনলিংকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাস্তার উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কয়েকজন কুলির সাহায্যে তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া কুলিরা যেই দেখিতে পাইল যে উক্ত রাজকর্ম্মচারী তাহাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, অমনি তাহারা হতভাগ্য চেনলিংকে রাস্তার ধারে একটা ছোট গর্তের ভিতরে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। কুলিরা ভাবিল, এ লোকটা তো মরিয়াই যাইবে, সুতরাং বৃথা পরিশ্রম করিয়া কী ই বা লাভ হইবে? কিন্তু চেন্‌লিং এই অবস্থায় কী কাণ্ড করিয়া বসিল, শুনিলে তোমরা অবাক হইয়া যাইবে। সে হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে পাঁচশত গজ পথ অতিক্রম করিল এবং এক মুদির দোকানে আশ্রয়লাভ করিল। সেখানে একটা ঝুড়ির মধ্যে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাইয়া সে তাহার ক্ষত বিক্ষত বাহু দ্বারা ধাক্কা দিয়া ঝুড়িটিকে কাত করিয়া তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। দোকানদার ঘরে ফিরিয়া চেনলিংকে দেখিতে পাইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া দোকানদারের চক্ষু স্থির! সে তাড়াতাড়ি কোনমতে ব্যবস্থা করিয়া চেনলিংকে হাঁসপাতালের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিল।

পুরা একটি দিন বিনা চিকিৎসায় ও বিনা খাদ্যে চেনলিং হাসপাতালের সম্মুখেই পড়িয়া রহিল। এ হেন নিদারুণ অবস্থাতেও তাহার কথা বলার ক্ষমতা বা মানসিক শক্তি অটুটই ছিল, কারণ হাঁসপাতালে গমনোদ্যত লোকদিগকে ইসারায় নিকটে ডাকিয়া নিজের অবস্থা তাহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদের মারফতেই শেষে সে হাঁসপাতালে স্থানলাভ করিল।

মাস খানিক পরে হাঁসপাতাল হইতে দিব্য একখানা কাঠের পা লইয়া খট্‌খট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিয়া সে তাহার আত্মীয়স্বজনদের প্রশ্নে হাসি মুখে শুধু বলিল—'না, এমন কী হইয়াছে, এতে কী হয়?'

---

Arthur Smith—Chinese characteristics দ্রষ্টব্য।

এবারের চীন-জাপান যুদ্ধেও চীনা নরনারীর কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহসের কাহিনী শুনিয়া আরও অবাক হইতে হয় —সঃ।

## মেঘে ডুবুডুবু ভাদ্র-আকাশ

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

মেঘে ডুবু ডুবু ভাদ্র-আকাশ, জল ঝরে অবিরাম,
গাছপালা সাথে দাঁড়াইয়া ঠায় ভিজিছে বিহগ্‌দাম।
দ্বিপহরে যেন নামিয়াছে সাঁজ,
কৃষাণী বধূর হাতে নাহি কাজ,
আরাম শয়নে শুয়ে শুয়ে শুধু বেলা করে দেয় ভোর,
ক্ষেতে আলি-বাঁধ ভেঙে ছুটে জল তুলি গরজন ঘোর।

কৃষাণ শিশুর মন চঞ্চল চাহিছে বাহির পানে,
খেলা যেন ভালো লাগেনাকো আজ বসিয়া ঘরের কোণে।
সাধ যায় নামি পথের উপর
কাদা-মাটি নিয়ে গড়ি খেলাঘর,
মায়ের শাসন কড়া যে ভীষণ ভেবে চোখে ঝরে জল,
চমকে অশনি, দেয়া গুরু গুরু, কাঁপিছে ধরণীতল।

দোলে বেনুবন, সুপারি কানন, লতা-পাতা বায়ে দোলে,
বিষ্টির জলে কিল্‌বিল্ করি' পুনামাছ হেঁটে চলে।
তিড়িং তিড়িং ফড়িং লাফায়
ঝোপ্ ঝাড়্ হ'তে পথ কিনারায়,
ফুলে নাহি অলি ফুটিয়াই কলি খসে' খসে' ঝরে সব,
গাছ চুপ্‌সিয়া জল বেয়ে পড়ে, ভেক্ করে কলরব।

মাঠ ঘাট হ'ল ভরা ডুবু ডুবু, জলে থলে একাকার,
খেয়া তরী আছে খেয়া ঘাটে পড়ে, মাঝি নাহি আজি তার।
পার হ'বে বলে পারের পথিক
কখন এসেছে নাহি তার ঠিক,
সাথে সারাদিন তামাম্ দুনিয়া ভ্রূক্ষেপহীন খুব,
মেঘে ডুবু ডুবু ভাদ্র আকাশ, ঝরে জল টাব্‌টুব্॥

---

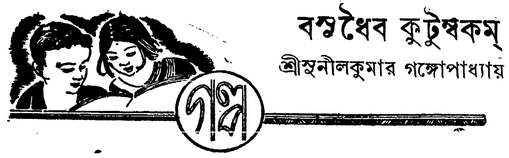


## বসুধৈব কুটুম্বকম্

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

চোরটা জানালা দিয়ে অন্ধকার ঘরে লাফিয়ে প'ড়ে একবার থামলো। যে চোর চুরি কাজটাকে সম্মান করে, সে-ই কাজে নামবার আগে একটু দম নেয়।

দোতালা বাড়ী। চোরটি আগে থেকেই খবর পেয়েছিল বাড়ীর সকলে বাইরে গেছে। তার বিশেষ ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। সে আরো জানতো যে তারা আজ একটু বেশী রাতেই বাড়ী ফিরবে। পা টিপে টিপে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। অন্ধকারের মধ্যেও তার কোমরের ছোরাটা চক্ চক্ করছিল।

আস্তে আস্তে সে পাশের ঘরের দরজাটা খুললো। এই ঘরেই বাড়ীর যাবতীয় টাকা কড়ি থাকে, সে আগে থেকেই খবর পেয়েছিল। হাতড়িয়ে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালানো মাত্র সে চমকে উঠলো। ঘরে খাটের উপর বিছানায় একটি লোক শুয়ে আছে!

চোরটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, লোকটি ঘুমিয়ে আছে। তার জাগার আগেই টেবিল এবং ড্রয়ারে রাখা টাকা, ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি যাবতীয় দামী জিনিষ সরাতে হবে!

সে আস্তে আস্তে টেবিলের দিকে এগোল। হঠাৎ সেই লোকটি চীৎকার ক'রে উঠলো, ভয়ে তার চোখ দুটো অসম্ভব বড় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সে ওঠবার চেষ্টা করলো না।

চোরটি ছোরা দেখিয়ে গর্জ্জন ক'রে উঠলো—চুপ ক'রে শুয়ে থাক। কথা বলো না।

লোকটি একবার তার ছোরার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

চোরটি আবার চীৎকার ক'রে বলে উঠলো—এবার মাথার উপরে হাত তোল।

লোকটি একবার করুণভাবে চোরের দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে বিছানায় উঠে বসলো। তারপর সুবোধ ছেলের মত তার ডান হাত মাথার উপর তুললো।

চোরটি রাগে গর্জ্জন ক'রে উঠলো—বাঁ হাতও তোল। তাড়াতাড়ি দু' হাতই তোল।

অনেক কষ্টে সেই লোকটি বললো—বাঁ হাত তুলতে পারছি না।

—কেন, বাঁ হাতে কি হ'য়েছে?

—কাঁধে বাত হ'য়েছে।

—বাত জ্বর হয়?

—হয়।

চোরটি একটু ইতস্ততঃ করলো। তারপর টেবিলের উপর টাকাকড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বিরক্তভাবে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর সেও মুখ বিকৃত ক'রে উঠলো।

—ও রকম ভাবে মুখ বেঁকিও না, লোকটি এবার খেঁকিয়ে উঠলো,—চুরি ক'রতে এসেছ, চুরি করে চলে যাও। এখানে চুরি করার জিনিষের তো অভাব নেই।

চোরটি বললো—সাধে কি আর মুখ বেঁকাই? আমারও যে বাঁ হাতে বাত। তুমি যখন বাঁ হাত তুললে না, তখন আমি ছাড়া অন্য কেউ হলে তোমাকে খুন ক'রে ফেলতো।

লোকটি জিজ্ঞাসা ক'রলে—তোমার কতদিন হলো বাতে ধ'রেছে?

—চার বছর। একবার যদি বাতে ধরে, তবে আর নিস্তার আছে?

—কখনো সাপের চর্ব্বি ব্যবহার ক'রেছ?

—মনের পর মন। যে সব সাপের চর্ব্বি ব্যবহার করেছি, তাদের একসঙ্গে করলে একশ' বার সূর্য্যকে ছোঁয়া যেত।

—কেউ কেউ 'বৃহৎ বাত বটিকা' ব্যবহার করে।

চোরটি এবার মুখ বেঁকিয়ে উঠলো—দূর! পাঁচ মাস ব্যবহার ক'রেছি, কিচ্ছু হয় না। 'সর্ব্ববাত হুতাশন' ব্যবহার ক'রে তবু কিছুটা উপকার পেয়েছি।

লোকটি বললো—আচ্ছা, তোমার বাতের বেদনা কখন বাড়ে, দিনে না রাতে?

চোরটি আস্তে আস্তে বললো—রাতে, যখন আমার আবার কাজকর্ম্ম থাকে। সব ভগবানের মার দাদা। হ্যাঁ, তোমার হাত নামাতে পার। তুমি আর বিশেষ কিছু হ্যাঁ - আচ্ছা, তুমি হরি কবিরাজের 'রক্ত-শোধক বটিকা' খেয়েছ?

—অনেক, অনেক। আচ্ছা, তোমার ব্যাথাটা ধীরে বাড়ে না হঠাৎ বাড়ে?

চোরটি আস্তে আস্তে ছোরাটা বিছানার উপরে রেখে ভাল ক'রে বসলো। তারপর বললো—হঠাৎ বাড়ে। এমন এক একদিন হ'য়েছে, জলের পাইপ বেয়ে দোতালায় ওঠার জন্যে মাঝামাঝি গেছি, হঠাৎ বাতের ব্যথা হ'লো। আর সঙ্গে সঙ্গে পাইপ থেকে পড়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছি। ডাক্তারদের আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

—সত্যিই! কত হাজার টাকা যে বাতের জন্য খরচ করলাম।

ছোরাটা আবার চোরটির কোমরে উঠলো। বিছানার উপর থেকে হঠাৎ সেদিনকার খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে সে লাফিয়ে বলে উঠলো—তুমি 'বাত নীরোগ তৈল' ব্যবহার করেছ?

লোকটী বললো—না, ওইটাই করিনি।

চোরটি খবরের কাগজের দেখে বলতে লাগলো—'বাত-নীরোগ তৈল'র বিজ্ঞাপন দিয়েছে। একজনের নাকি এক সপ্তাহের মধ্যে বাত সেরে গেছে। জামা কাপড় পর নাও। বেরোতে হবে। দেরী হ'লে দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে!

লোকটি কঁকিয়ে উঠলো—এক সপ্তাহের মধ্যে আমি নিজে নিজে জামা কাপড় পরতে পারি নি। বাড়ীর সকলে বাইরে গেছে—

চোরটি চীৎকার ক'রে উঠলো—আগে বিছানা থেকে নেমে পড়! আমি-ই তোমাকে জামা কাপড় পরিয়ে দেব।

তাকে আর কোন কথা বলতে না দিয়েই চোরটি বললো—এই পরো তোমার জামা এখন "বাত নীরোগ তৈল" মাখতে হবে। একজনের এক সপ্তাহে সমস্ত বাত সেরে গেছে

দু'জনে বাইরের দরজা পর্য্যন্ত যাওয়া মাত্র সেই লোকটি হঠাৎ থেমে বললো—তুমি যে কাজ করতে এসেছিলে তাই তো ভুলে গেলে। টাকাকড়ি নেবে না? আমার টাকাকড়ি সব টেবিলের উপরই তো র'য়েছে।—

চোরটি তার সার্টের কলার ধ'রে টানতে টানতে বাইরে বের করে বললো—চলে এস, দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে। তেল কেনবার মত টাকা আমার আছে। আজ দুজনে একসঙ্গে পরীক্ষা করে দেখি, "বাত-নীরোগ তৈল"টা কেমন?

তারা দুজনে দোকানের দিকে জোরে পা চালালো।

---

# সম্পাদকীয়

গত ২২শে শ্রাবণ শুক্রবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ভারতের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হল। গত বছর থেকে এই দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কলিকাতা টাউনহলে একটি বিরাট সভা করে রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। নানা স্কুল কলেজেও এবং অন্যত্র এই স্মৃতিবার্ষিকী সভা হয়। আমাদের রংমশাল দলও এইদিন কলিকাতা রেডিয়োতে 'ছোটদের আসরে' গান, অভিনয় ও প্রশস্তি পাঠে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারত গগনের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। বৎসরের পর বৎসর ধরে আলো ও আঁধারে নক্ষত্রটি ভারতীয় জনসাধারণকে জ্ঞান ও শান্তির কিরণ বর্ষণ করে আসছিল। কিন্তু বুঝি বিধাতার কোন নিষ্ঠুর পরিহাসেই অস্তরবির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরব রবিও অস্তমিত হলেন।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর আঁকা ছবিগুলি ভারতের শিল্পক্ষেত্রে এক বিশেষ ধারা এনে সবারই সমাদর পেয়েছে। ছেটেদের গল্প লেখাতেও তিনি নিপুণ। তাঁর লেখা 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'ক্ষীরের পুতুল', 'খাজাঞ্চির খাতা', 'রাজকাহিনী', প্রভৃতি বইগুলি সবার অতি প্রিয়। রংমশালেও তাঁর চমৎকার চমৎকার লেখা বেরিয়েছে ও সম্প্রতি একটি লেখা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর লেখার কায়দা অপরূপ ও অননুকরণীয়। সম্প্রতি তিনি এক অদ্ভুত খেয়ালে বিচিত্র খেলনা তৈরী করছেন। শুকনো ডাল ভাঙা, ভাঙা চোরা কাঠ, নানা আকারের কাঁচ, পাথর, মাটি ও রাজ্যের জিনিষের টুকরোর ভেতর থেকে 'জীবন্ত পুতুল' তৈরী করছেন। এবার আগামী জন্মাষ্টমীর দিনে (৩রই ভাদ্র বুধবার, ১৩৪৯) তাঁর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড গত ১লা আগষ্ট শনিবার পরলোকগমন করেছেন। নানা আশ্চর্য্য দুঃসাহসিক ঘটনায় তাঁর জীবন পরিপূর্ণ। এঁর জন্মস্থান ভারতবর্ষ। প্রথম জীবনে ইনি সৈনিক ছিলেন। পরে স্বীয় কর্ম্ম

প্রতিভায় ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হন। ইনি মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পামির উপত্যকা তিব্বত প্রভৃতি দেশে অভিযান করে বহু বিচিত্র ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন। হিমালয় পর্ব্বতে ইনি একবার অভিযান করেন। ইনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগেও কিছুকাল কাজ করেন। দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য এঁকে বহু স্বর্ণপদক ও উপাধি দান করা হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সভাতে যোগদান করেছিলেন। মৃত্যু কালে স্যার ফ্রান্সিসের বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। মৃত্যুর আগে তিনি শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজি বই 'Life Divine' পড়ে বলেছিলেন,—শ্রীঅরবিন্দকে 'নোবেল-প্রাইজ' দেওয়া উচিৎ. এ যুগের পৃথিবীর এটি শ্রেষ্ঠ বই।

মিশরের যুদ্ধ এখন অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। দু'পক্ষের মধ্যে কোন রকম কর্ম্ম তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। কেবল বোমাবর্ষণের দ্বারাই এখন মিশর যুদ্ধ চলছে। ব্রিটিশ বিমান লিবিয়ায় ইতালীয় ও জার্ম্মাণ ঘাঁটিতে বোমা ফেলছে ও এক্সিস-পক্ষ কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া ইত্যাদি মিত্রপক্ষীয় ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে আসছে। মাঝে দু'একটা কামানযুদ্ধ ও টহলদারী বাহিনীর সঙ্ঘর্ষের কথা শোনা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে 'টেল্-এল-ইসা' ( যীশুর পাহাড় ) নামে একটা জায়গায় দু'দলের সঙ্ঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত! তারপর আর কোন উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া যায় নি।

এখন পৃথিবীর সব রণাঙ্গনেই ঢিমে তালে যুদ্ধ চলছে, কেবলমাত্র রুশ রণাঙ্গন ছাড়া। সারা পৃথিবীর দৃষ্টি এখন ককেশাসের দিকে নিবদ্ধ! ২৮শে জুলাই রষ্টোভ শহরের পতন হওয়া মাত্রই ককেশাসের পাদদেশে যুদ্ধ সুরু হয়ে গিয়েছে। ষ্টালিনগ্রাদ অভিমুখেও নাকি জার্ম্মাণরা প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণরা ককেশাস সীমান্ত ভেদ করে কুবান নদী পর্য্যন্ত পৌঁছে আর্ম্মাভির অধিকার করেছে। বাকু রেলপথেও প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, সোভিয়েট সৈন্যেরা প্রাণপণে বাধাদান করেও শত্রুকে ঠেকাতে পারছে না ও পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই ককেশাসের যুদ্ধে ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া ও পারস্য, এই দেশগুলির ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করছে।

রাশিয়া দীর্ঘকাল ধরে জার্ম্মাণীকে বাধা দিয়ে আসছে। একমাত্র চীন ছাড়া কোন দেশের জন্যে এত আত্মত্যাগ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আর কোন দেশ দেখাতে পারে নি। সাম্যবাদী রাশিয়ার যুদ্ধ আজ কেবল সৈনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এই যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ার প্রত্যক অধিবাসী প্রাণপণ চেষ্টা করছে, নিজের দেশকে শত্রুর কবল হতে বাঁচাবার জন্যে। আশা করি ভারতবর্ষও শত্রুর হাত থেকে নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্যে রাশিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।



সম্প্রতি সোভিয়েট রিপাব্লিকের পূর্ব্বাংশ আর একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। চীনদেশ থেকে বলা হয়েছে, যে জাপান সাইবেরিয়া মাঞ্চুকুও সীমান্তে বিরাট সৈন্য সমাবেশ করতে আরম্ভ করেছে ও সোভিয়েটও এর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ইতিমধ্যে সীমান্তে দু'একবার ছোটখাট সঙ্ঘর্ষ যে দুইদলে হয় নি, তা নয়। এ থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে জাপান বোধ হয় রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এ ধারণাটা ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে ও একজন চীনা মুখপাত্র বলেছেন যে ১৬ই আগষ্টের কাছাকাছি জাপান সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। তাহ'লে জাপান আপাততঃ ভারতের ওপর নজর দেবে না নাকি।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস বোম্বাইর অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে এক গণ-আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতিকে পুনায় কারারুদ্ধ করা হয়েছে। কংগ্রেসের এই গণ আন্দোলনের প্রস্তাব ও নেতাদের কারাবরণ ভারতের সর্ব্বত্র এক বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

চাল ডাল, তেল নুন, চিনি দেশলাই প্রভৃতি দ্বিগুণ দাম দিয়েও পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দোকানগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে বলে প্রকাশ, সেখানে এত ভীড় হচ্ছে যে ফুটবল ম্যাচ ও সিনেমার টিকিট ঘরের ভীড়ও তার কাছে হার মানে! টিকিট ফুরিয়ে গেলেও যেমন চড়া দামে রাস্তার আনাচে কানাচে টিকিট পাওয়া যায়, চাল ডালের ব্যাপারেও তেমনি অনেক সুবিধে বুঝে কিছু দাঁও মেরে নিতে ছাড়ছে না। লোভীদের সাজাও হচ্ছে বটে কিন্তু খোদ্দেরের অবস্থা এখনও হা-অন্ন হয়ে আছে। সম্প্রতি সুখবর প্রকাশ যে কলিকাতা কর্পোরেশন ও গভর্ণমেণ্ট এঁরা উপায় ঠাওরেছেন, শীঘ্র যাতে সমস্ত বড় বড় বাজারে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা হবে।

## চুটকি খবর ঃ—

জাপান নিউগিনির উপকূলে বহু সৈন্য নামিয়েছে ও পোর্ট মর্সবির বিরুদ্ধে নূতন অভিযান আরম্ভ করেছে। ওদিকে অষ্ট্রেলিয়ার নিউক্যাস্‌ল্ শহরেও জাপ বিমান কয়েকবার বোমাবর্ষণ করে গেছে।

কিছুদিন হল বঙ্গোপসাগরে বৃটিশ জাহাজের অনুসরণ রত একটি জাপানী ফ্লাইং বোট্‌কে গুলী করে সমুদ্রে নামিয়ে ফেলা হয়েছে।

ব্রিটিশ জনসাধারণ দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার জন্যে বৃটিশ মন্ত্রী সভার কাছে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও তাঁরা এ বিষয়ে একেবারে নিস্তব্ধ আছেন।

অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপানী অধিকৃত কিস্‌কা ও সোলোমন্ দ্বীপের উপর সম্মিলিত মার্কিণ বাহিনী আক্রমণ সুরু করেছে।

সিন্ধুনদে প্রবল বন্যার ফলে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং আরো হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বহু সহর গ্রাম ও 'মহেঞ্জোদড়ো'র প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিও বন্যার জলে ডুবে যাবার আশঙ্কা আছে।

গত ২৯শে জুলাই কলিকাতায় নানাস্থানে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ৮১ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে গত ৩রা আগষ্ট বহু জায়গায় তাঁর জন্মোৎসব হয়েছে।

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনালের এক অর্দ্ধে উঠেছে ইষ্ট বেঙ্গল ও রেঞ্জার্স এবং অপর অর্দ্ধে উঠেছে মহামেডান স্পোর্টিং ও মাইসোর রোভার্স। ইষ্টবেঙ্গল অথবা মহামেডানস এই দুই দলের একটি দল শীল্ডজয়ী হতে পারে। তোমরা যখন পত্রিকাখানি পড়বে তখন এই বিষয় মীমাংসা হয়ে গিয়েছে।

হাওয়াই দেশীয় এক সাঁতারু লিয়ো নাকামা এক মাইল সাঁতারে পৃথিবীর এক নতুন রেকর্ড করেছেন। তিনি মাত্র ২০ মিনিট ২৯ সেকেণ্ডে এক মাইল সাঁতরে শেষ করেছেন। এর আগের রেকর্ড ছিল ২০ মিনিট ৫৭'৮ সেকেণ্ড, ১৯৩৪ সালে জ্যাক মেডিকা (আমেরিকান) এই রেকর্ড করেছিলেন।

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় পুরো এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ১লা সেপ্টেম্বর রাত ঠিক ১২টার সময় সমস্ত ঘড়ির কাঁটা ১টার ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে ও তারপর থেকে ভারতের সর্ব্বত্র এই নতুন সময় চালু হবে। এর উদ্দেশ্য 'দিনের আলো বাঁচানো।'

---

## বেহালার ডাকাত

(পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা)

শ্রীঅজয়কুমার দাসগুপ্ত

বেহালার তেপান্তর মাঠের মাঝখানে একটা বিশাল বাড়ীতে আমরা আস্তানা নিয়েছিলাম। ওখানে তখন ভীষণ ডাকাতের ভয় ছিল। আমাদের বাড়ীর আশে পাশে কোন জনমানবের বসতি ছিল না।

সেজকাকা প্রায়ই ভয় দেখাতেন যে ডাকাতরা নাকি মানুষ খুন করে বেমালুম মাটির নীচে পুঁতে রাখে। সেজকাকার এই কথাগুলি রাতের অন্ধকারে শুনে আমরা ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যার আগেই দরজায় খিল এঁটে দিতাম।

বিকেল তিনটার সময় যখন দূর বস্তি থেকে মেয়েরা আমাদের বাড়ীর কল থেকে জল নিতে আসত, ওখন আমার ঠাকুমা তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁর পাঁচ ছেলের পাঁচটি মানুষ মারা কল (বন্দুক) আছে। তাই দিয়ে তাঁর বীর ছেলেরা ডাকাতদের চৌদ্দ পুরুষকে ঘায়েল করতে পারবে। এই শুনে বস্তির মেয়েরা ভয়ে ভয়ে জল নিয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরে যেত। এখানে আমি চুপি চুপি বলে রাখছি, সত্যই আমাদের কোন বন্দুক ছিল না। নইলে সন্ধ্যার অগেই দরজার কেউ খিল এঁটে দেয়!...এ রকল ভয়াবহ সময়ে আমার বড়দির খুব বাড়াবাড়ি অসুখ চলছিল। বড়দি এত দুর্ব্বল হয়েছিল যে তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইতে দিতে হত। আমি ঠাকুমার সঙ্গে বড়দির পাশের ঘরে ঘুমোতাম।

হঠাৎ একদিন ঝন্ ঝন্ শব্দে ছ্যাঁৎ করে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল্। জেগেই শুনতে পেলাম বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেছে। ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমা থেকে সুরু করে দাদা দিদি এমন কি সেজকাকা পর্য্যন্ত হাউ হাউ করে কাঁদতে লেগেছেন। এত কান্না শুনে আমিও কাঁদতে যাবো, এমন সময় শুনতে পেলাম, বাবা ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করছেন, "মা তুমি কাঁদছ কেন?" ঠাকুমা কান্না থামিয়ে বল্লেন, "কি জানি সবাই কাঁদছে আমিও তাই..." বলেই আবার কান্না সুরু কর্লেন। বাবা ঠাকুর্দ্দার কাছে গিয়ে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর্লেন! ঠাকুর্দ্দা জবাবে বল্লেন, "কি জানি প্রীতির (বড়দি) বোধ হয় কিছু হয়েছে।" বাবা ভুরু-কুঁচ্‌কে রেগে বল্লেন, "বোধ-হয় নিয়েই তোমরা কান্না সুরু করেছ?" আমি তখন চমকে দেখি আমার পাশে বড়দি উপুড় হয়ে শুয়ে যেন কাঁদছে। ব্যাপার কি! বড়দি নিজের ঘর থেকে এ ঘরে আসলো কি করে? যাকে নাকি পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিতে হয়, সে কি করে এ ঘরে এসে, কেবল পাশ ফিরে নয়, একেবারে উপুড় হয়ে কাঁদছে। স্বপ্ন নাকি? আমি চোখ রগড়ে দেখলাম্।

তখন আবার শুনতে পেলাম, বাবা পাশের ঘরে ছোড়দি ও দিদিকে রেগে জিজ্ঞাসা করছেন্ "তোরা আবার কাঁদছিস কেন?" ছোড়দি ভয়ে ভয়ে বলল "ছাদ পড়ে গেছে।" সেজকাকা দরজার কোন থেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললেন—ডা—কা—ত!

বাবা তখন একটা লণ্ঠন সম্বল নিয়ে দৌড়ে নীচে নেমে গেলেন। নীচের সদর দরজার কাছে গিয়ে দেখেন, আমার সদ্য বিলাত-ফেরৎ কাকামণি একটা রাম-দা নিয়ে সার্টের আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এখানে যে?" কাকামণি বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললেন, "ডাকাতরা সব উপরে গেছে। সবাইকে মেরে যখন নীচে নামবে আমি তখন এক ঘায়ে সাবাড় করবো।" বলে রাম-দা টা বাবাকে দেখালেন। মুচকি হেসে বাবা বললেন, "হয়েছে, খুব বীরত্ব বোঝা গেছে। এখন উপরে চল্ দিকিন্। দেখা যাক আসল্ ব্যাপার কি?" লণ্ঠন নিয়ে তখন বাবা এঘর ওঘর খুঁজে বেড়াতে লাগলেন্। বড়দির পাশের ঘরে গিয়ে বাবা হা হা করে খুব হেসে উঠলেন ও চিৎকার করে সকলকে বল্লেন, "দেখে যাও তোমাদের ডাকাত।"

সবাই ছুটে গিয়ে দেখি, ঘরে ঝুলোন দেওয়াল আলমারিটা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আলমারিটার মধ্যে অনেক ওষুধের শিশি বোতল ফ্লাস্ক ছিল। সেইগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ঘরের মেঝেতে লাল নীল ওষুধের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তখন বুঝতে পারলাম কি রকম ডাকাত আমাদের বাড়ীতে হানা দিয়েছিল। এত কান্নার পর চোখের জল প্রায় শুকিয়ে এসে ছিল। হঠাৎ আবার হাসির হুল্লোড়ে পেট ব্যাথা সুরু হওয়ার যোগাড় হলো। সে রাত্রিটা আমাদের কান্নার পর হাসতে হাসতে কেটে গেল।

সেই হাসির চোটে আমাদের ডাকাতের ভয়ও একেবারে কেটে গেল।

---

# চুরি

( পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা )

জয়শ্রী সেন

দুই বন্ধু। অরুণা ও মেনকা।

মেনকারা বড়লোক! মস্তবড় বাড়ী, দু তিনটে গাড়ী।

অরুণারা গরীব। মেনকাদের বড় বাড়ীর ঠিক পাশেই যে ভাঙ্গাচোরা ছোট বাড়ীটা, সেটাই অরুণাদের। কিন্তু তাহলেও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। অরুণাদের বাড়ীতে মাত্র দুজন লোক! অরুণা ও তার বাবা। অরুণার বাবা অফিসের সামান্য কেরাণী।

অরুণার স্বভাব খুব ভাল, স্কুলের সবাই তাকে ভালবাসে। শুধু বেলা, চাঁপা, কমলা ও অমিতা ছাড়া। বেলা হচ্ছে সর্দ্দার। তাঁর দলের মেয়েরা, মানে চাঁপা, কমলা ও অমিতা তার প্রত্যেকটি কথা শোনে। অরুণা স্কুলে ফ্রী পড়ত। অরুণা স্কুলে ফ্রী পড়ছে শুনে মেনকাও অরুণার স্কুলে ভর্ত্তি হ'ল। দুজনেই এক ক্লাশে পড়ত।



অরুণা বাড়ীর সমস্ত কাজ করে স্কুলে আসত। সেজন্য স্কুলে পৌঁছতে তার প্রায় দেরী হয়ে যেতো। অরুণাকে সকলেই ভালবাসত বলে বেলাদের দলের ভারী হিংসে হত।

তারা চুপিচুপি ঠিক করল অরুণাকে স্কুল থেকে তাড়াতে হবে এবং এই কাজটা মেনকাকে দিয়ে করাতে হবে।

একদিন টিফিনের সময় বেলা মেনকাকে ডেকে বল্লে—তুই ওই ছোট লোকটার সঙ্গে মিশিস কি করে? ফ্রীতে পড়ে আবার স্কুলে আসবে দেরী করে! জানিস ও সেদিন অমিতার একটা টাকা নিয়ে নিচ্ছিল, ভাগ্যিস দেখতে পেলো! ও একটা ভীষণ চোর—ওকে স্কুল থেকে তাড়াতে হবে।

এই রকম করে রোজ একটা না একটা মিথ্যে বানিয়ে বলে বেলার দল মেনকার মাথায় ঢোকালে অরুণা খুব খারাপ মেয়ে।

মেনকাও তখন সব সময় ভাবতে লাগল কি করে অরুণাকে তাড়ান যায়। অরুণা ও মেনকা ক্লাশে পাশাপাশি বসত। একদিন টিফিনের সময় অরুণা জল খেতে গিয়েছে, অন্য সব মেয়েরা খেলা করতে ব্যস্ত। কেবল দুজন মেয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে গল্প করছে। মেনকা তখন করলে কি তার 'ফাউণ্টেন পেন্'টা বের করে অরুণার ডেস্কে রেখে দিল। কিন্তু সে বুঝতে পারলে না যে সেই দুজন মেয়ে দেখলে সে কি কাণ্ডটা করলে!

অরুণা ক্লাশে আসতে মেনকা বল্ল, চল আফিসে চল। অরুণা অবাক্ হয়ে বল্লে, কেন আমি কি করেছি?

কি করেছি!—বেলা ব'লে উঠল,—চুরি করে লজ্জা হচ্চে না? আবার বলা হচ্চে আমি কি করেছি। ওসব ন্যাকামি আমাদের কাছে চলবে না। চল হেড্ মিস্ট্রেসের কাছে চল।

অরুণা বল্লে, আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। আমি কার জিনিষ চুরি করেছি?

অমিতা বল্লে, কার আবার, তোমার বন্ধু মেনকার।

অরুণা বল্লে, আমি মেনকার জিনিষ চুরি করেছি?

চাঁপা বল্লে, মেনকার ফাউণ্টেনটা তুমি চুরি করোনি বলতে চাও?

অরুণা বল্লে, না আমি বলতে পারি আমি চুরি করিনি!

কমলা বল্লে, তাহলে তোমার ডেস্কে পাওয়া গেল কি করে শুনি?

অরুণা বল্লে, নিশ্চয় আমার ডেস্কে—

মেনকা বল্লে, থাক থাক ঢের হয়েছে আর বলতে হবে না।

ওদিকে চাঁপা গিয়ে হেড মিস্ট্রেসকে লাগিয়েছে যে তাদের ক্লাশে চুরি হয়েছে।

হেড্ মিসট্রেস বল্লেন, চুরি? বল কি, কি চুরি হয়েছে? কে চুরি করেছে? কোন্ ক্লাশ? চাঁপা বল্লে, ক্লাশ এইট্। হেড্ মিস্ট্রেস বল্লেন, আচ্ছা তুমি ক্লাশে যাও।

১৬ বছর এই স্কুলে কাজ তিনি করছেন, তিনি থাকতে এ স্কুলে একবারও চুরি হয়নি। আর আজ কিনা তাঁর স্কুলে চুরি। তিনি ভাবতেও পারছেন না।

টিফিনের পর ক্লাশ আরম্ভ হয়েছে। সমস্ত স্কুল নিস্তব্ধ। স্কুলে চুরি হয়েছে সমস্ত ক্লাশে ক্লাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই ভাবছে, কি জানি কি শাস্তি হবে। এমন সময় নোটিশ এল, অরুণাকে অফিসে হেড্ মিস্ট্রেস ডেকেছেন।

অরুণা চলে গেল। আর কোন পিরিয়ডেই অরুণা ক্লাসে এল না। দারোয়ান আর একটা নোটিশ নিয়ে এল—ছুটির পর ক্লাশ এইট্এর মেয়েরা যেন অফিসে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে ছুটি হয়ে গেল। সকলের বুক দুরদুর করছে। কি জানি কি শাস্তি দেবেন। অরুণাকে অফিসে আটকে রাখা হয়েছিল। হেড্ মিসট্রেস এলেন। এসেই বল্লেন, অরুণা আর এ স্কুলে পড়তে পাবে না। তারপর অরুণাকে জিগ্যেস করলেন, তোমার কিছু বলবার আছে? অরুণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে, আমি চুরি করিনি। তখন হেড্ মিস্ট্রেস্ সকলের দিকে চেয়ে বললেন, কেউ প্রমাণ করতে পারো? তখন সেই দুজন মেয়ে বল্লে, আমরা নিজের চোখে দেখেছি, মেনকা অরুণার ডেস্কে ফাউণ্টেন পেনটা রেখেছিল। তখন হেড্ মিস্ট্রেস আরো রেগে উঠে বললেন, মেনকা! তুমি স্বীকার কর তুমি এ রকম বিশ্রী কাজ করেছ?

মেনকা মাথা নীচু করে রইল।

তখন হেড মিস্ট্রেস বললেন, আজ থেকে তুমি এ স্কুলে আর পড়তে পাবে না আর তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

তখন সেই দুইজনের মধ্যে একজন বল্লে, মেনকার দোষ নেই, বেলা, অমিতা, চাঁপা আর কমলা ওর মাথায় এসব ঢুকিয়েছিল। তখন অরুণা বল্লে, দয়া করে মেনকাকে এ স্কুলে থাকতে দিন, ওতো ইচ্ছে করে করেনি, বেলারাই ওর মাথায় ঢুকিয়েছিল।

হেড্ মিস্ট্রেস তখন সব বুঝতে পারলেন। অরুণাকে আদর করে নিজের কাছে নিয়ে এসে বসালেন আর মেনকাকেও আদর করে নিয়ে এলেন। তারপর বল্লেন, বেলা, চাঁপা, অমিতা, কমলা তোমরা এমন বিশ্রী কাজ করতে পারো জানতাম না। আজ থেকে তোমরা এ স্কুলে পড়বে না, আর তোমাদের প্রত্যেকের পাঁচ টাকা করে জরিমানা হল আর সে টাকা পাবে অরুণা।

তখন অরুণা ও মেনকা একসঙ্গে বল্লে, ওদের প্রথম দোষ, এবার দয়া করে ওদের ছেড়ে দিন, আর ওরা কখনো এমন কাজ করবে না। স্কুলে ওদের থাকতে দিন।

ওদের কথায় হেড্ মিসট্রেস তখন একটু নরম হয়ে বল্লেন আচ্ছা অরুণা ও মেনকা তোমাদের কথা রইল। কিন্তু ওদের একটা কিছু শাস্তি হওয়া দরকার। পাঁচ টাকা করে জরিমানা ওদের দিতে হবে। তখন অরুণা বল্লে, দেখুন ও টাকা কিন্তু আমি নিতে পারি না। ওটা গরীব দুঃখীদের আশ্রমে দিয়ে দেবেন।

তারপর ওদের সকলের সঙ্গে সকলের খুব ভাব হয়ে গেল। আর মেনকা ও অরুণা আগের মত এক সঙ্গে আনন্দে থাকতে লাগল।

---

রংমশাল বৈঠক

## বিতর্ক আসর

যুদ্ধ না শান্তি এই নিয়ে তোমাদের মাঝে বিতর্ক আসর বসিয়েছিলাম। তোমরা অনেকেই প্রবন্ধ পাঠিয়েছ, অনেকের লেখা আমার ভালো লেগেছে। তোমাদের মাঝে যারা যুক্তির দিক থেকে বিতর্কে যোগদান করেছ, তাদের কয়েক জনের রচনার বাছাই অংশ তোমাদের উপহার দিলুম। এগুলির মধ্যে সব চেয়ে আমার ভালো লেগেছে হিমানী রায় ও তড়িতকান্ত রায়ের রচনা। হিমানী সমর্থন করেছে শান্তি আর তড়িতকান্তি সমর্থন করেছে যুদ্ধ। তারপর যাদের বক্তব্য ভালো লেগেছে—তাদেরও বক্তব্যের আভাষ এর ভিতর পাবে। যুদ্ধকে সমর্থন করে অনেকেই লিখেছে, যদি এই বিতর্কের ভোট নেওয়া যেত, তাহলে হয়তো যুদ্ধ সমর্থকদের জয় হতো। কিন্তু কতকগুলো সমস্যা এ জগতে আছে, যার সমাধান কেবল মাত্র ভোটাভুটির জোরে হয় না—যুক্তি তর্কের ধূলিজালে হয় না।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করি না। অন্যায়, অসাম্য, অবিচার, অত্যাচারের প্রতিকারের জন্যই যুদ্ধ। কিন্তু এই অন্যায়ের, অসাম্যের, অবিচারের ও অত্যাচারের প্রতিকার করতে যদি আরো অন্যায়, অসাম্য, অবিচার ও অত্যাচারের উদ্ভব হয়, তাহলে যুদ্ধের সার্থকতা যায় শূন্যে মিলিয়ে। শান্তি আমি চাই—কিন্তু যে শান্তি মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস, জড়ত্বের বন্ধু, কর্ম্মহীনতার দোসর—তাকে আমি ঘৃণা করি॥

—দিদিভাই

### শান্তির পক্ষে

আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আমি যুদ্ধের পক্ষপাতী না শান্তির? আমি স্পষ্ট গলায় বলব আমি শান্তির পক্ষপাতী। "বর্ত্তমান যুদ্ধ" সৈনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যুদ্ধের ফলে পঙ্গু, বৃদ্ধ, শিশু এবং নারীও অমানুষিকভাবে বোমাবর্ষণের ফলে নিহত হচ্ছে। যেখানে সেখানে বোমাবর্ষনই এই যুদ্ধে জনসাধারণের ওপর অত্যাচারের একমাত্র নিদর্শন নয়। বিজিত দেশগুলোর ওপর অত্যাচারও এই যুদ্ধের একটা বিশেষ অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের খাতিরে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে হারিয়ে দিন দিন পশু হয়ে পড়েছে। মানুষকে মারবার

জন্যে মানুষই অস্ত্র আবিস্কার করছে। যার এতটুকু মনুষ্যত্ব আছে, এত সব জেনেশুনেও কি সে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করতে পারে ?

বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে বাধ্য হয়েই একটী জাতি বা সম্মিলিত জাতিকে যুদ্ধের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। হয়ত এই যুদ্ধের ফলে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হবে, হয়ত আমাদের দেশে একটা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন আসবে। হয়ত আমাদের মনোবৃত্তিও উন্নততর হবে। কিন্তু তবুও আমি বর্ত্তমান বা অন্য কোন যুদ্ধকে সমর্থন করতে পারি না। যুদ্ধের পেছনে যে বর্ব্বর অত্যাচার, যে নৃশংস হত্যা-কাণ্ড লুকোন রয়েছে, তাকে কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

তা ছাড়া, শান্তি শত শত বছরের চেষ্টায় যে সভ্যতা, ঘরবাড়ী, সমৃদ্ধি গড়ে তোলে, যুদ্ধ একদিনে তা ধুলিসাৎ করে দেয়।

—হিমানী রায়

## যুদ্ধের পক্ষে

সৃষ্টির গোড়া থেকে দেখা যায় যে যুদ্ধ বা দ্বন্দ জিনিষটা সেই আদিকাল থেকে বিদ্যমান, হিন্দুধর্ম্মের সুরাসুরের যুদ্ধ, খৃষ্টধর্ম্মের ভগবান ও শয়তানের যুদ্ধ। সেইকাল থেকে সুরাসুরের অর্থাৎ সৎঅসতের, সত্যমিথ্যার, ন্যায় অন্যায়ের যুদ্ধ চলে আসছে। অন্যায়, অধর্ম্ম, অসত্য যখন প্রলয় নাচন সুরু করে, তখন ন্যায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার একদিন না একদিন সংঘর্ষ বাধবেই। হতে পারে সে যুদ্ধ অন্যায়ের দ্বারাই প্রারব্ধ কিন্তু যুদ্ধ অন্যায় দমণের জন্য, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দেখা যায়, যুদ্ধ কখনই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নয়, অন্যায়কে পিষে মারবার জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য্য।

শান্তিকামী বলবেন, যুদ্ধে শক্তিক্ষয়, লোকক্ষয়, যুদ্ধ মনুষ্যঘাতী, শান্তির ব্যাঘাতকারি ইত্যাদি। কিন্তু এটাও সত্য যে যুদ্ধেরই শেষ পরিণাম শান্তি। অন্যায়ের প্রতিকারেই প্রকৃত শান্তি আসে। যুদ্ধ পরিণামে মঙ্গলকামী।

রাশিয়ার মজুরের ওপর জারের অত্যাচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয়েছিল আর তারই ফলে আজ রাশিয়ার অন্তরে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচার জর্জ্জরিত ফ্রান্স একদিন বিপ্লব করেছিল, তার ফলে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গণশক্তি।

নিরবচ্ছিন্ন শান্তি একমাত্র জড়ত্বেই সম্ভব। যুদ্ধ অপরিহার্য্য। যুদ্ধ ছাড়া জীবন ধারণ অসম্ভব, হউক সে যুদ্ধ ব্যক্তিগত জীবনে বা সমষ্ঠিগত জীবনে।

—তড়িতকান্তি রায়



## যুদ্ধের পক্ষে

কবি লিখেছেন—

"একবৃন্তে পুষ্পদ্বয়, ফুটে সুখ দুঃখময়, কেহ না তুলিতে পারে একটী কমলে।"

আমি এখানে সুখকে শান্তি এবং দুঃখকে যুদ্ধ বলে পরিগণিত করছি। যুদ্ধ বা জীবন সংগ্রাম না করলে মানুষ কখনও মানুষ হতে পারে না। পৃথিবীর যে সমস্ত ব্যক্তি আদর্শস্থানীয়, তাঁদের উন্নতির মূলে ছিল সংগ্রাম। বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর চেষ্টা করাই যুদ্ধের সামিল। এমন কি পৃথিবীর সব কিছু জিনিষের মূলই হচ্ছে যুদ্ধ। কীট পতঙ্গ প্রাণী জগতেরও তুলনা দেয়া যায়।

স্বর্ণকে আগুনে দিলে যেমন তার খাদ পরিষ্কার হয়ে সে খাঁটী হয়ে উঠে, তেমনি মানুষ জীবন সংগ্রামে নির্ম্মল ও পবিত্র হয়। মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও শান্তি পেতে হলে, অনুরূপ আদর্শে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ স্বাবলম্বী, সাহসী ও একতাবদ্ধ হবার সুযোগ দেয়।

—অজিতকুমার রায়

## যুদ্ধের পক্ষে

মানুষ দেবতা নয়, মানুষ মানুষ ; দোষগুণের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। তাই মানুষ মানুষে সংঘাত, জাতিতে জাতিতে অমালিন্য। কোন যুগ এর হাত থেকে রক্ষা পায় নি। জীবনের প্রারম্ভ হতে শেষ নিঃশ্বাস নেবার দিন পর্য্যন্ত চলে এই যুদ্ধ। এর প্রয়োজন আছে। পাপ যখনই পুঞ্জিভূত হয়, তখনই যুদ্ধ আসে পাপ ধ্বংস করবার জন্য। এ কথা ঠিক বটে, যুদ্ধের সময় কত শান্তির নীড়, কত সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কিন্তু যখন জাতির উপর জাতির অত্যাচার, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার সুরু হয়, তখন যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। পূর্ণ-শান্তির অগ্রদূত রূপেই যুদ্ধ আসে। যুদ্ধে পৃথিবীর পাপ ধুয়ে, ধর্ম্ম ও সাম্যভাব জেগে ওঠে।

শান্তির যত কিছু রচনা, যত কিছু অধিকার সমস্তই যুদ্ধের পেছনে এসে পড়ে। শান্তির পরম মাধুর্য্য আমরা যুদ্ধের পরই স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি।

—কুমারী অমিয়া চ্যাটার্জ্জি

**রংমশালধারী বন্ধুরা আমার।**

তোমাদের কাছে আজ আমি কি কথা বলবো? সারা পৃথিবী জুড়ে জ্বলছে অশান্তির আগুণ, আহত স্বার্থের শ্বাস শুনতে পাচ্ছি আমাদের চারিদিকে। ধ্বংস মুখর পৃথিবীর মাঝে শ্বাপদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—মানুষকে আর মানুষ বলে চেনা যায় না।

মানুষ আর সুন্দর নেই, পৃথিবী হয়ে উঠেছে ঘৃণ্য আর ক্লেদাক্ত। সারা পৃথিবীতে যখন আগুণ জ্বলেছে তার আঁচ যে আমাদের এদেশে লেগেছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। পৃথিবীর অগ্নি পরীক্ষা সুরু হয়েছে, ভারতবর্ষকেও এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

অসুন্দর মানুষ আর পৃথিবী এই স্বার্থ সংঘাতের পর, এই হানাহানির পর আবার সুন্দর হয়ে উঠবে বলে আশা করি। পৃথিবীর দীর্ঘ যুগের পুঞ্জীভূত পাপ, তাপ, অত্যাচার, অনাচার, শোষনের শেষ হবে, মানুষ পাবে মানুষের অধিকার। এতকাল একদল মানুষ আর একদল মানুষকে অন্যায় ভাবে নানা বিধি নিষেধ আরোপ করে, জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে, সুখ থেকে, শিক্ষা থেকে, জীবনের প্রতিটি দিক থেকে বঞ্চিত করে এসেছে। এই শোষণের ঘৃণ্য ইতিবৃত্তে পৃথিবীর ইতিহাস ভরে উঠেছে। অসাম্য আর অভাবে ভরে ছিল পৃথিবী। মানুষের রক্তে মানুষের পাপ পৃথিবী থেকে ধুয়ে মুছে যাবে।

সুন্দর হবে মানুষ, সুন্দর হবে পৃথিবী। মানুষের যা প্রাপ্য মানুষকে তা দেওয়া হবে—ধ্বংস ও হানাহানির মাঝে, মৃত্যুর মাঝে জীবনের দ্রুত পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

আজকের দিনে তোমাদের আমি আগামী দিনের কথা শুনিয়ে গেলাম। তোমাদের প্রত্যেকের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হোক—আগামী দিনের ও আগামী যুগের জন্য এখন থেকে দেহ আর মগজকে শক্ত করতে শেখো, দেশকে ভালবাসো।

প্রার্থনা করি—আমরা যে সম্মান পাইনি, তোমরা সে সম্মান পাও—স্বাধীন ভারতের সৈনিকদের জন্য আজকের দিনে আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধা তোমাদের মাঝখানে পাঠিয়ে দিলাম।



**অবনীন্দ্র উৎসব—**

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাদ্রে সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করলেন। শিল্পে ও সাহিত্যে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বাংলার কিশোর কিশোরী ও শিশু-সাহিত্য সেবীর তরফ থেকে তাঁর জন্ম উৎসব অনুষ্ঠান হবে আগামী ২রা আশ্বিন। বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র পাবে। আশা করি রংমশালধারীদের রংমশালে সে দিনের আনন্দ-উৎসব আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

**প্রশ্নোত্তর**

গতবারে তোমাদের যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছিল, এবারে দু তিন জন মাত্র তার উত্তর দিয়েছে এবং কয়েকজন লিখেছে পরে জানাচ্ছি। এ ব্যাপারটা অনেক দিনের জন্য রাখা যায় না—ভবিষ্যতে একমাসের বেশী রাখা হবেও না—কিন্তু এরপর এ কথা আমায় বলো না।

**রবীন্দ্রনাথ হাজরা**—গ্রাহক নং ঠিকানা কিছু নেই—কতবার বলেছি তোমাদের। ছোট গল্প ছাপা হয় বৈকি, তবে দেখে শুনে ছাপতে হবে তো। যারা গ্রাহক তারাই ষ্ট্যাম্প পাঠালে লেখনী বন্ধু পেতে পারে। ধাঁধাঁ তো দেওয়া হচ্ছেই।

**বিনীতা ঘোষ** ( রাঁচী ) ১৪৮৯ ইন্দিরাদি জানিয়েছেন তোমরা যা জানতে চেয়েছ, তিনি এবার যখন আসবেন জানাবেন।

**অতুল চন্দ্র মাহাত** ( ঝাড়গ্রাম ) তোমার প্রশ্নের উত্তর—কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা একজনের নাম করা যায় না। তবে একটা কোম্পানী ওটার উদ্বোধন করে।

**রথীন্দ্রনাথ** ( খাগড়া ) ১৫২৫ তোমার চিঠির উদ্দেশ্য বুঝলাম না—তুমি যা বলেছ অর্থাৎ তোমার চিঠির প্রথমাংশ ঠিক নয়।

**সাধনা ও রেণু** ( চট্টগ্রাম ) ১৬৬২ তোমার বাবাকে বলো আমার জন্য আশীর্ব্বাদ আনতে—আর কিছু নয়।

**আশীষ নাথ রায়** ( পাটনা ) ৫১০ ষ্ট্যাম্প পাঠিয়ে লেখনী বন্ধু নিও। যা শুনেছিলে তা কাজে করতে না পারার জন্য আমিও দুঃখিত।

**মীরা** ( রাজসাহী ) ১২৮৩ রান্নার ফরমাসের কথা ইন্দিরাদিকে বলে দিয়েছি। জন্মদিনে আশীষ জানাই। যার জন্মদিনের কথা বলেছ, তা আমি জানি না। তিনি বলেছিলেন মুছে গেছে।

**অমরেন্দ্র ও মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য** ( হরদই ) ১৬৫৪ লেখক-লেখিকাদের ছবি ছাপা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়।

**রেখা বসু** ( কিষানগঞ্জ ) ১৩৩৬ সুজাতা রক্ষিতের খবর আমরা কিছু জানি না। শুনেছি, মধুদি—কোন পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদিকা। ইন্দিরাদিকে এক খামেই লিখতে পারো এই দুর্মূল্য বাজারে পৃথক ভাবে চিঠি দেবার প্রয়োজন নেই।

**দেওয়ান নছিফা খাতুন ও তড়িৎকান্তি বসু** (মোরনাই) তোমরা যার সঙ্গে আলাপ করতে চাও, তার নাম আর ডাক টিকিট পাঠিয়ে চিঠি লিখলে অফিস থেকে তাদের ঠিকানা পাঠান হবে—তোমরা বন্ধুত্ব করতে পারবে—বোনের সঙ্গে বোন, ভাইএর সঙ্গে ভাই।

**মীরা রায়** (মোরাদাবাদ) ইন্দিরাদি আমায় জানাতে বলেছেন তোমার কথামত কাজ হবে।

**বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য** (মোগলসরাই) 'পরশমণি'র লেখা ষ্ট্যাম্প পাঠিয়ে ও পরিষ্কার করে ঠিকানা লিখে নেবার বন্দোবস্ত করো রংমশাল অফিস থেকেই। 'লেখনীবন্ধু'র নিয়ম বলেছি। তোমাদের ক্লাবের উন্নতি হোক।

**জ, না, দা** (পাটনা) ১৮০৪ তোমার সুন্দর চিঠি, বেশ লাগে। ভাইবোনদের উপহার দিলাম।

ও দিদিভাই, বলনাকো
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ
যুগ ধরে কি চলবেই এ
হবে না কি রুদ্ধ

যুদ্ধ ব্যাধির নেই কি ওষুধ
জ্বলে শুধু চিত্ত
দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ঘুচে যায়
বেটে দিলেই বিত্ত।

'এগিয়ে চল'টা কিন্তু সম্পাদক মশাইর মনোনীত হয়নি।

**সাধনা ভট্টাচার্য্য** (ইসিবপুর) তোমার জিজ্ঞাস্য জানতে পারলে একেবারে উত্তর যাবে।

**নিখিলেন্দ্রনাথ ঘোষ, লালমোহন ভট্টাচার্য্য, উমা, প্রতিভা, আভারাণী চক্রবর্ত্তী, সত্যব্রত বসু, গীতা দে, অমিয়া চ্যাটার্জ্জি, অক্ষয়কুমার, রণজিৎকুমার চৌধুরী শ্যামসুন্দর মাইতি, বৈদ্যনাথ শেঠ, অজিতকুমার রায়**—তোমাদের চিঠি পেয়েছি।

আমার শুভেচ্ছা তোমাদের জন্য জানালাম। তোমাদের—

দিদিভাই

## অবনীন্দ্র-উৎসব

এই ভাদ্রে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপ্ততিতম বৎসরে পদার্পণ করিলেন। ভারতীয় শিল্প-কলার শ্রেষ্ঠ উদ্বোদ্ধা এবং শিশু-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টারূপে তিনি ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালাদেশকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের জাতীয় শিল্পে ও সাহিত্যে অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে। অবনীন্দ্র নাথ নীরব কর্ম্মী, একনিষ্ঠ সাধকের জীবন তাঁহার, কিন্তু সাহিত্যে ও শিল্পে তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহা এই নিপীড়িত ভারতের শুষ্ক অন্তরের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাণীর মুক্তধারার মত বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালী মাত্রেই তাহা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিলেও প্রকাশে ও সঙ্ঘবদ্ধরূপে আমরা তাঁহার এই জয় গৌরবে অভিনন্দন জানাইতে পারি নাই। দেশের এই কর্ত্তব্য-চ্যুতির গ্লানি অন্তরে বাজিয়াছে এমন কয়েকজন শিশু-সাহিত্য সেবী আগামী ২রা আশ্বিন অবনীন্দ্রনাথের জন্ম উৎসব করিয়া দেশের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়া একটি অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এজন্য ডাঃ কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে আহুত একটি সাধারণ সভায় একটি অভ্যর্থনা সমিতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং উক্ত সমিতি একটি পরিচালক সমিতি গঠিত করিয়াছেন। সভ্যদের নাম সংবাদ-পত্রে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী প্রেমঘনানন্দ, বিমলবসু ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন যথাক্রমে সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষ্যধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, এই জন্ম-উৎসব অনুষ্ঠানের সাফল্য শিল্পি, সাহিত্যিক ও অবনীন্দ্র অনুরাগীদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। এজন্য পরিচালক সমিতি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের সহায়তা প্রার্থনা করেন। উৎসবে শিল্পাচার্য্যকে একটি টাকার তোড়া উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে প্রদত্ত হইবে। এজন্য সমিতি সকল শিল্পি, সাহিত্যিক ও অবনীন্দ্রনাথের অনুরাগী মাত্রেরই নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। উৎসব সম্পর্কে দুইটি প্রদর্শনী করিবার ব্যবস্থাও করা হইতেছে। একটি প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্র নাথের শিল্পকলা প্রদর্শিত হইবে আর একটিতে তাঁহার রচিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণগুলি প্রদর্শিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টসের যে কক্ষে অবনীন্দ্রনাথ অধ্যাপনা করিতেন সেই কক্ষে প্রদর্শনী দুইটি করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত মুকুল দে ও শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই প্রদর্শনীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি ভারতবর্ষীয় সকল শিল্পিদের নিকট এই প্রদর্শনী দুইটি সফল করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন। তাঁহাদের নিকট অবনীন্দ্রনাথের স্বহস্ত খচিত চিত্রাবলী বা তাহার ছাপা অনুলিপি যাহা আছে তাহা সাদরে প্রার্থনা করেন এবং তাহার জন্য যথাসাধ্য দায়ীত্বভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যের চাঁদা বড়োদের জন্য ১৲ টাকা ও কিশোর কিশোরীদের জন্য ॥০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। কেবলমাত্র সভ্য ও দাতারাই উৎসবে যোগদান করিতে পারিবেন। যাঁহারা সভ্য হইতে চান তাঁহারা সত্বর এই ঠিকানায় চাঁদাসহ পত্র লিখুন—সম্পাদক অবনীন্দ্র উৎসব সমিতি, ৮৯ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। উৎসবে আসন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইবার জন্য এখনই তৎপর হউন।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ, সম্পাদক।
অবনীন্দ্র উৎসব সমিতি।

# নূতনা ধাঁধা

( মঞ্জুশ্রী ও সমরেন্দ্রর সৌজন্যে )

( ১ ) কোন্ জাতি প্রেরণ করতে বলে ?
( ২ ) কোন্ খাবারের দাম বেশ ?
( ৩ ) কোন্ নদী সাগর সম ?
( ৪ ) কোন্ হ্রদ চিলের হ্রদ ?
( ৫ ) কোন্ দেশের কান্ আছে ?

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

( ১ ) ত্রিচীনাপল্লী ( ২ ) লালমণির হাট ( ৩ ) চন্দ্রগুপ্ত ( ৪ ) সন্দেশ
( ৫ ) একশটা বা ৯৯

### নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

মঞ্জুশ্রী ও অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বুবু, বাণী, গোপাল, মা ও বাবা ( হারদোই )

### একটি ভুল উত্তরদাতাদের নাম

শেখরেন্দ্র, অমরেন্দ্র, সমীরেন্দ্র, প্রবীর, শেফালী, সোনালী, অরুণা গাঙ্গুলী (পুরুলিয়া) ; তরেন্দ্রনাথ ঘোষ ( নিউ দিল্লী ) ; গীতা, উমা, অনিন্দা, রবি, ফণী, অবনী, অতিন ও অরুণ মুখোপাধ্যায় ( হাওড়া ) ; বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ( বেনারস ) ; রেখা বসু ( কিষাণগঞ্জ ) ; রঞ্জিত ঘোষ ( মুর্শিদাবাদ ) ; অহিভূষণ, সত্যগোপাল, (রাজসাহী ) ; রূপবাণী রায় ( কলিকাতা ) ; সৌরভ সনাতনী ( পূর্ব্ব খন্দেশ ) ; সতীনাথ ভট্টাচার্য্য, ( নৈহাটি ) ।

অনেকেই দুইটি ভুল করিয়াছে ।

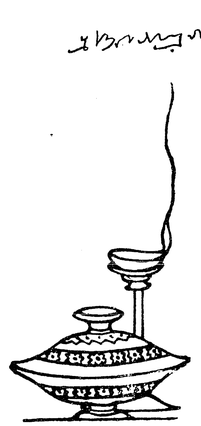

## সোনার পাখী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

সোণারপাখী গেছে গেয়ে কী যে সুরে,
হঠাৎ যেন হাসিয়ে দিয়ে সব কিছুরে!
বৃষ্টিতে আর বাজে ছিল সৃষ্টিটে কী গর্জ্জনে আর কান্না ভরা,
রদ্দুর আর জ্যো'স্নাতে মুখ মেজে খুসী আর কিছু কেউ চান্‌না ওঁরা!
রূপোর কাটীর ঘুম ভেঙে যায় গলে' রূপো ছড়িয়ে জলে, কাশের বনে,
লম্বা ছুটির সোনার কাটী বুক ছুঁয়ে যায় সব কিছু হায় ভুলিয়ে মনে!

সোনার পাখীর সোনার গানে
সোনালী রঙ্‌ লাগল হাটে, লাগল ঘাটে, লাগল মাঠের সোনার ধানে!

বাজাল শাঁখ দোরে দোরে
নৌকো জাহাজ দোকান পসার আসার পথের আকাশ ভ'রে!
সোনায় সোনায় মেশামেশি!
সোনার আলো ঝরছে ঝুঁকে, ঝলো মলো দেশের বুকে
যা এল তা
ঠিক স্বদেশী!

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন্দোদরী এক হাত জিভ কেটে চুপ হলেন। তখন রাবণ মন্দোদরীকে বল্লেন—"মন্দোদরী যন্ত্রনার উপরে কেন যন্ত্রণার কুটকাট। প্রেমিলেকে বল গা' বীরত্বের লীলে রঙ্গমঞ্চে করুন! যুদ্ধসজ্জে হোক সোনার তলোয়ার, কাঠের ঘোড়া, তুণ হোক বাঁশের চুঙ, বান হোক ফুলের তোড়া! এই নিয়ে যুদ্ধের খেলা খেলুন, যত পারেন মায়া সীতা কাটুন অন্দরে বসে এতে আমার কোনো আপত্তি নেই, ইন্দ্রজিত জিদ্ ধরলেই গেছি।

কুমার ইন্দ্রজিত নামে ইন্দ্রজিত
দেদার খেতাবে মণ্ডিত,
নারী ভাগ লয়ে পাশা খেলাতে পণ্ডিত।
মেঘ ডাকলে কানে তুলো মেঘনাদ,
নারীর আঁচল ধরে কাঁপেন কলাপাত্।
মজবুদ্ পাষ্টি খেলতে, খুঁটি করতে চিৎ,
আসল যুদ্ধের জানেনা রীত ভিৎ।"

মন্দোদরী মুখ বেঁকিয়ে বল্লেন—

"বয়েস হয়েছে তার যুদ্ধে যাবার—
যাওয়া তো উচিৎ!"

রাবণ বল্লেন—"যুদ্ধ বিদ্যা না শেখায়ে যুদ্ধে পাঠালে যা হবে তাই হবে ঠিক! মন্দোদরী—

কুমার ইন্দ্রজিৎ খেতাব পেয়েছে, কেতাব লিখে ইন্দ্রজালের,
গৈবী যুদ্ধে মজবুত হয়েছে সতরঞ্চের।
অজা যুদ্ধে বাজী ধরে করে জিদ্,
আসল যুদ্ধে অনুপযুক্ত ইন্দ্রজিৎ,
বৌটা পেকেছে বাক্-যুদ্ধে কিঞ্চিৎ!"

এই কথা হচ্ছে এমন সময় ভগ্নি দূতী এসে খবর দিচ্ছে 'বীরবালা প্রেমিলা গেল শুন লঙ্কেশ্বর!"



"—আরে গেল কি? কোথায় গেল বৌটা!"
"—মায়া সীতা কাটতে গিয়ে নিজে পড়েছে কাটা!"
"—ও ভগ্নি, গেল আর মলো অমনি? বেওরাটা আগাগোড়া খুলে বলো!"

তখন ভগ্নি-দূতী বলছে—

"কি বলব রাণী আশ্চর্য্য কথা,
নার্কেল মালা, ছেঁড়াকানি কলা-পাতা।
এই দিয়ে গড়লে পুতুল,
রূপেতে অতুল
চুল তফাৎ নেই হুবহু সীতার গা'টা!
তারপরে বৌরাণী
কি কল জুড়লে কি জানি
পুতুল যুবোজানি কয় মেয়েলি মেয়েলি কথা!
'দশরথ শ্বশুর, জনক মোর বাপ,
রাবণ আনিলে ধরে দিয়ে বড় তাপ—
রক্ষা কর রাম, কাটা যায় মাথা!"
জীবাজীব দুই বাজী কালো আর সাদা,
তারই পরে সওয়ার হলো রাত যখন আধা।
বেরিয়ে গেল বউ তোমার প্রেমিলা সুন্দরী,
হাতে খাণ্ডা ঝিকি মিকি; বলে আসি তো দেখা হবে সহচরী!
প্রেমিলার রূপ আর মায়া সীতার কায়া—
অপরূপ দেখে তো আমি ঝুরে মরি।
খেলিয়ে গেল ছুটিতে যেন মেঘেতে বিজুরী লতা!"

"—তারপর?"

—'তারপর মা—স্বপন না সত্যি দেখচি

পঞ্চশব্দ বাদ্য বাজিল কতক্ষণ,
শুনতে কান ঝন্‌ঝন্ রগ টন্‌টন্
হঠাৎ দেখি হনুমান ধার উৎ রড়ে
দুই চক্ষু বেয়ে তায় বারিধারা পড়ে।
বৃক্ষ হতে হনু বাক্য নাই মুখে,
'শুনহে রাম,' বলে সীতা নেপথ্যে কান্দে দুখে।
এ হস্তে ধরিয়েছে অজয় পাথর,
আর হস্তে আঁখি-জল সম্বরে বাণর।

আগু হতে নাহি পারে পবন নন্দন—
নেপথ্যে মায়া সীতা জুড়িল ক্রন্দন—
হাহা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ,
এ সময়ে একবার দেহ দরশন।
রাজার নন্দিনী আমি রামের বলিতে
বিপাকে হারায় প্রাণ অভাগিনী সীতে!"

"—তারপর?"

"—তারপর মা, 'রক্ষা কর হনুমান পবন-নন্দন' যেমন মায়া সীতা বলা আর লম্ফ দিয়ে হনুমান সেই দিকে চলা।"

—"আ লো, কোন দিকে? বোয়ের দিকে না সীতার দিকে?"

—"কেমন করে বলি মহারাজ! অন্ধকারে কি কিছু দেখা গেল ভাল করে? নেপথ্যের দিকেই গেল বোধ করি হনুমান!"

—"তারপর?"

—"তারপর মহারাজ—

যুদ্ধ করে হনুমান, উপ্ হাপ্ শুনি,
ভাবে বুঝলাম, জুড়েছে বানর অনেকগুনি।
রাম কান্দে, হারালাম প্রাণের জানকা
লক্ষ্মণ কান্দে, সব পরিশ্রম বৃথা গেল কি!
সীতা দেবী কাটা গেল, কে করিবে রণ,
দেশে চল কেঁদে বলে বুড়ো জাম্বুবন!"

—"হঃ হঃ, তারপরে?" বলে রাবণ অট্টহাস্য।

ভগ্নিদূতী তখন ভয়ে গুটি সুটি হয়ে বলছে—

"তৎপরে কই মহারাজ, যা হল শ্রবণ
বিভীষণ বলেন, রাম না কর রোদন
সীতারে কাটিতে দেখেছে কোন জন?
—দেখেছে পবন নন্দন!
অঙ্গদ বল্লে—না।
সুগ্রীব বল্লে—বুঝলেন না।
বিভীষণের উত্তর হল, হনু তো পশুতে গনন!
যে সীতারে রেখেছে রাবণ পাহারার মধ্যি
সে সীতারে কাটবার আছে কার সাধ্যি!



মায়া-সীতা কাটি বৌটা করল দুইখান
সে মায়াতে ভুলেছে বানরা হনুমান।
প্রত্যয় না হয় যদি আমার কথার
হনুমান গিয়ে দেখে আসুক সীতায়!"

—"এই মরেছে, আবার হনুমান!" বলে রাবণ যেমন তেড়ে উঠেছে চৌকি ছেড়ে, অমনি দোরে দোরে ঘরে ঘরে চৌকিদার ছুটেছে—সাবধান সাবধান, আবার হনুমান!

জমাদার ফিরান মহলে মহলে টহল,
লস্করদার বলেন, হুঁসার খবরদার লঙ্কার আড়তদার সকল!
হরকরা বলে—ঘরপোড়া এলো বলে,
চাল চুলোয় ঢালো জল।
ভিস্তি বলে—সাবধান সাবধান, গিরিস্তি সকল!
'এলো এলো' বলে অপ্সরী সব এলোকেশী
'খেলো খেলো, বলে কেশিনী অলোকেশী।

এয়োমুখী, অয়োমুখী, আলকটক্কটা ছাদে উঠে কটমটায়ে চায় আর খটখটায়ে বলে—ঐ এলোরে, ঐ গেলোয়ে। ঐ যাঃ সই, পলোনা খাঁচা কলে!

কেউ বলছে, এলো। কেউ বলছে, এলোনা। কেউ বলছে, এসে গেল। সে রাত সবার ভয়ে-ভয়ে গেলো। সকালে মহোদর জল ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বল্লেন—"নাঃ, এলোনা!" মহোদরী কলঘর থেকে বেরিয়ে ঘড়ি ঘড়ি হাঁচি আর কাশি! কালনেমী মামা কুয়ো-তলা থেকে বল্লেন—"ইন্দ্রজিতের বৌটা এলো না মলো, এই খবরটা নিয়ে আসি।" এই বলে ভিজে কাপড় ছেড়ে শামলা আর জামাজোড়া এঁটে কুমার কাননের দিকে প্রস্থান।

এইখানের কথা রহিল এইখানে,
বাকি কথা কাল শুনিবা কানে।

—এই বলে চাঁই-বুড়ো কুমার টুলিতে খুরি-গেলাস কিনতে গেলেন।

## আজব দেশের একশ' খবর

শ্রীসতীকান্ত গুহ

হল্‌দে আলোয় বাণভাসি আজ, বাতটা যেন সং,
কে আনে আজ লুঠ ক'রেরে রামধনুকের রং !
কোন্ পরীদের পাখার হাওয়ায় ঘুম উড়ে যায় দূরে !
ঘুম্‌তি নদীর ঢেউ থেমে যায় আজকে জাগন্ সুরে।
আছে তোমার মাটির সেপাই ? কাঠের তলোয়ার ?
জল্‌দি এসো, সাত সমুদ্র হবোই হবো পার।
পার হবে তো !. তেরো নদীর খবর জানো কি ?
তাও জানিনা, খবর জানি এমন এমন কি,
খবর জানি, অশোক বনে ছিলেন জানকী।

তেরো নদীর তেরো খেয়ায় তেরো কাহন পুরো
আদায় করে আদ্যিকালের পাটনি তেরো বুড়ো,
'কে আসে রে, পার হবে কে,' মেঘের মত হাঁক ;
ধম্‌কে বলি 'পার করে দাও' পাটনিরা অবাক ;
তেরো নদীর ঘুম ভেঙে যায় কোন্ দেশে কোন্ ভোরে
হীরামনের ঝুঁটি জ্বলে বুনো পথের মোড়ে
কোন গহনের কোন্ হীরামন খবর জানো কি।
তাও জানিনা, খবর জানি এমন এমন কি,
খবর জানি, অশোকবনে ছিলেন জানকী।

তেরো নদীর ঢেউ কাটিয়ে মেঘবরণের দেশ,
লতায় পাতায় লুটোপুটি সবুজ-কালো রেশ,
সেইখানে কোন্ অচিন বামন চোখটি টিপে চায়,
কথার জবাব না দিলে তার ছাড়ান পাওয়া দায়।



যে কথা সে শুধোয় উতোর মেলাই তৎক্ষণাৎ
পথ করে দেয় আদ্যি বামন তফাৎ একশ হাত।
কোন্ বামনের কোন্ কথা সে, খবর জানো কি ?
তাও জানিনা, খবর জানি এমন এমন কি,
খবর জানি, অশোক বনে ছিলেন জানকী।

এমনি করে নানান দেশে নানান্ ছুতোয় যাওয়া
যেখানেতে দক্ষিণে বয় উল্‌টো পূবের হাওয়া !
যেখানেতে হঠাৎ বনের হঠাৎ অজগর,
যেখানেতে জলপরীদের সায়র খেলাঘর,
যেখানেতে ঝিনুক-তরী মণিমালার নাও,
যেখানেতে জলের ঘোড়া ঢেউয়েতে উধাও,
যেখানেতে জ্যোছ্‌না রাতে লুপ্ত চরাচর,
যেখানেতে সাত সাগরের ঢেউয়ের খেলাঘর,
সাত সাগরের শেষে যেথায় অনেক অনেক দূর,
যেখানেতে রূপকথা আর রূপ-তরাসের পুর,
যেখানেতে নেই-ছেলে আর নেই-মেয়েদের ঘর,
যেখানেতে নেই-পৃথিবীর রঙীন আড়ম্বর,
সেখানেতে চাঁদ্‌নি রাতে চোখের লহমায়,
আসবে তুমি ? এসো তবে, রাত পুহিয়ে যায়।
সেইখানেতে মাটির সেপাই কাঠের তলোয়ার
ফুস্ মন্তর পড়ে' তারা হবে সত্যিকার।
ফুস্ মন্তর ! কোন্ মন্তর ? খবর জান কি ?
তাও জানি না, খবর জানি এমন এমন কি,
খবর জানি, অশোকবনে ছিলেন জানকী !

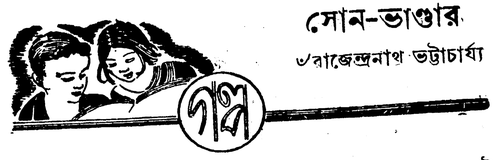


# সোন-ভাণ্ডার

৺রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শীতকাল, অমাবস্যার রাত্রি। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ; টুপ্‌টুপ্‌ শিশির পড়ছে—মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার জমাট বেঁধে, কালো বরফ হ'য়ে, গলে' গলে' ঝরে' পড়ছে।

সারা দুনিয়া যখন বিছানায় আরাম করে' লেপ মুড়ি দিয়ে মহা সুখে নিদ্রা যাচ্ছে, আমি তখন আলো জ্বেলে দোকানের হিসাব মেলাচ্ছি। খেয়ে দেয়ে রাত দশটায় বসেছিলুম, কখন যে রাত তিনটে বেজে গেছে, কিছুই হুঁস ছিল না। সাতান্ন টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা গরমিল ; রাশি রাশি বিল, রসিদ ঘেঁটে ঘেঁটে প্রায় সব গরমিল মিল্‌লো, কিন্তু সাতটাকা তিনআনা কিছুতেই ধরা পড়ল না। কেমন জিদ হ'ল, হিসাবের সঙ্গে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করলুম। রাত জেগে মাথা গরম, মন অস্থির। যোগে, বিয়োগে ভুল হতে লাগল ; শেষে মনে হ'ল খাতা পত্তর ছিঁড়ে ফেলে দি !—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জানালায় টোকা মেরে কে ডাক্‌লো—"রামপ্রসাদ দোর খোল।"

চমকে উঠলুম ; এত রাত্রে কে ? এই নিঝুম রাত্রে পথে যে মানুষ বেরুতে পারে তা' ধারণা কর্‌তে পারি নি। তবে এ কি মানুষ, না—? রাম, রাম, রাম ! আমার নামই বা জানলে কেমন করে ? ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো !

ফের ডাকলে, "রামপ্রসাদ, ভয় নেই দোর খোল।"

এবার সাহসে ভর করে' উঠে জানালাটা খুলে ফেল্‌লুম ; লণ্ঠন ধরে' জানালার ধারে এসে দেখলুম, একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী বললেন, "রামপ্রসাদ, তোমার কোনও ভয় নেই, দোর খোল।"

—"আপনার কি প্রয়োজন ?

—"পরে বলবো, বলবার জন্যেই এসেছি। চোর নই, ভূত নই, যা দেখছো তাই, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তোমার ভালর জন্যেই এসেছি—ভয় ছাড়—দোর খোল।"

আমাকে আপনারা মন্দই বলুন আর বোকাই ভাবুন, কেমন বিশ্বাস হ'ল, ভক্তি শ্রদ্ধা এল, আমি দোর খুলে দিলুম। পায়ের ধূলো নিতে আশীর্ব্বাদ করলেন ; একটু পরে নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটি বললেন।

শোন, রামপ্রসাদ, এমন কিছু তোমায় বলবো যা জগতে কেউ কখন শোনেনি। সাত রাজার ধন এক মাণিক, এমন হাজার হাজার মাণিকের সন্ধান তোমায় দেবো। আমি



মহাপ্রস্থানে যাবো, আর লোকালয়ে ফিরবো না ; মানস সরোবরের নিকট কোন এক গিরিগুহায় সারাজীবন যোগ সাধনা করবো। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এই সহরে আজ রজনীর শেষ প্রহরে যা'কে জাগরিত দেখবো, তাকেই এই অগাধ ঐশ্বর্য্যের গুপ্ত সন্ধান বলে', নিশ্চিত মনে অভীষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করবো। সহরে ঘুরে ঘুরে দেখলুম সকলে ঘুমুচ্ছে। সকলের ঘরে আলো নির্ব্বাপিত ; এতবড় সহরে কেবল তুমি আলো জ্বালিয়ে জেগে আছ। তাই তোমার কাছে এলুম। মনে ভাবছো কি করে তোমার নাম জানলুম। পঁয়তাল্লিশ বৎসর যে লোক ব্রহ্মচর্য্যের সহিত যোগ অভ্যাস করেছে, তার পক্ষে এসব কিছুই বিচিত্র নয়, জেনো।

দু'বছর হ'ল, দু'জন সন্ন্যাসী রাজগিরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে অপরাহ্ণ হ'ল, দুজনে পরামর্শ করে স্থির করলে পাহাড়ের ওপর রাত্রি যাপন করবে। নীচে ভয়ানক গরম, হাওয়া নেই। ওপরে হাওয়া পাবে এই আশায় পাহাড়ে উঠতে লাগল। মাঝামাঝি উঠেছে, এমন সময় ওপরে যে জৈন মন্দির আছে, তার পুরোহিত নেমে আসছে দেখতে পেলে। পুরোহিত সন্ন্যাসীদের উপরে যেতে নিষেধ করলে। সন্ন্যাসীদের ভয়টয় ছিল না ; এতটা ওপরে উঠে নেমে যাওয়া তারা পছন্দ করলে না। পুরোহিত নেমে এল, তারা ওপরে উঠে গেল।

রাজগিরে গিয়েছ কখন ? যে শৃঙ্গে সন্ন্যাসীরা উঠেছিল, তার নাম বৈভার গিরি, ওপরে জৈন মন্দির ; ঠিক তারই নীচে বিরাট গুহা—নাম সপ্তপর্ণী।

সন্ন্যাসী দুজনের একজন আমি, অপরটি আমার বন্ধু, গিরিধারী। আমরা জৈন মন্দিরের নীচেই এক একটি শিলার ওপর শয়ন করলুম। ঝিরঝির হাওয়া, সারা দিনের শ্রান্তি, শিগ্‌গিরিই ঘুমিয়ে পড়লুম।

গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। চোখ মেলে দেখলুম গিরিধারী নেই। গেল কোথা ? বাঘে নিয়ে যায় নি ত' ? মনটা অস্থির হ'ল। পূর্ণিমার জোছনায় আকাশ, পাহাড় বন সব শাদা হয়ে গেছে। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বসে বসেই বাকি রাতটুকু কেটে গেল। ভোর হ'ল, রোদ্দুর উঠলো, পুরোহিত এল, যাত্রীরা এলে হৈ চৈ পড়ে গেল। সারাদিন চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। একমাস রাজগিরের পাহাড়, বন, গুহা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার চিহ্ন দেখতে পেলুম না !

দু'টি বৎসর ধরে' ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে বেড়ালুম। কত গৃহস্থ, সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশলুম, কিন্তু গিরিধারীর সন্ধান কেউ দিতে পারলে না। হতাশ হলুম, এ জীবনে আর তাকে দেখতে পাবো না।

মাত্র তিন দিন আগে এই সহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক বিস্তীর্ণ আখ ক্ষেতের মাঝ দিয়ে

যাচ্ছিলুম। একজন কৃষক দূর থেকে আমার দিকে ছুটে আসছে দেখতে পেলুম। কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, "ঠাকুর, একবার আসুন একজন সাধু মরণাপন্ন।"

গিয়ে দেখি ক্ষেতের মাঝে, একখানি ক্ষুদ্র ফুসের ঘরের ভিতর চ্যাটাইয়ে শুয়ে আমার সেই হারানো বন্ধু গিরিধারী! বন্ধু আমাকে দেখবামাত্র উঠে বসতে গেল, না পেরে ঢলে পড়ে গেল। মুখে চোখে জল, মাথায় বাতাস, একটু গরম দুধ দিতে অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে চাইলে। পাছে কষ্ট হয় এই ভয়ে কথা বলতে নিষেধ করলুম।

অতিথি পরায়ণ কৃষক আদর যত্নে আমার খাবার-দাবার যোগাড় করে দিলে। আমি আহার সমাপন করে, বন্ধুকে পথ্য দিয়ে, তার কাছে গিয়ে বসলুম। ধীরে ধীরে অতিকষ্টে বন্ধু তার দুই বছরের কথা বললে। তিন দিন তিন রাত্রি পরে তার কথাও শেষ হ'ল, প্রাণটিও তার দেহ ছেড়ে চলে গেল। আজ বেলা বারটার সময় তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে এসেছি—বৈরাগ্যে মন ভরে গিয়েছে, লোকালয়ে আর থাকবো না। এখন শোন, গিরিধারী কি বলে গেল—

"শোন, সোমানন্দ, তুমি আর আমি দেখতে দেখতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে গেলুম। মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখলুম পাথরখানা আমাকে নিয়ে 'বোঁ বোঁ' করে ঘুরছে। মনে হ'ল স্বপ্ন, কিন্তু সে ভ্রম শিগগীর ঘুচে গেল। জোছনা-মাখা আকাশের তলায় শুয়েছিলুম; বেশ বুঝতে পারলুম এখন এক দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় গর্ত্তে, পাথরে শুয়ে, ঘুরতে ঘুরতে নেমে যাচ্ছি। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ওঠবার শক্তি নেই, কি যে হচ্ছে বুঝতে পারলুম না। সহসা পাথরখানা থেমে গেল। জলদগম্ভীর স্বরে আমাকে কে আদেশ করলে, "উঠো!" উঠে বসলুম। দেখি প্রকাণ্ড একটি গোলাকার কুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত এবং আমার সম্মুখে মহা তেজপুঞ্জ কলেবর ঋষি পদ্মাসনে উপবিষ্ট।

—'বিস্মিত হয়ো না; আমিই তোমায় এখানে এনেছি। তুমি চিহ্নিত, বিশেষ লক্ষণযুক্ত মানব। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার, তোমার হাতে এই গুহার ভার অর্পণ করে' আমি দেহ রাখবো। তোমারি প্রতীক্ষায় আমি দ্বাপর হ'তে এখানে বসে আছি।'

তারপর যা' শুনলুম আর দেখলুম, তা' মহা বিস্ময়কর। দ্বাপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীম-অর্জ্জুনকে সঙ্গে করে' জরাসন্ধ বধ করান। জরাসন্ধের গুপ্ত ধনভাণ্ডার এই বৈভার গিরির তলদেশে সপ্তপর্ণী-গুহা নিম্নে রক্ষিত। তখন যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন মত ধন সংগ্রহ করা হয়েছিল। যে গুহাটি পাণ্ডারা যাত্রীদের দেখিয়ে থাকে, সেটি 'সোন-ভাণ্ডার' নামে এই প্রবাদেরই বাহ্যিক নিদর্শন। আসল ভাণ্ডারটি পর্ব্বত নিম্নে, অতি সুরক্ষিত গোপন স্থানে।

ঋষির কৃপায় আমি যুগযুগান্তর সঞ্চিত সম্পদরাশি স্বচক্ষে দেখেছি—স্পর্শ করেছি।



মণি, মাণিক্য, মুক্তা, রাশি রাশি স্তূপে স্তূপে রক্ষিত। পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করে' যা' কিছু পেয়েছিলেন, দুই হাতে দান করেও শেষ করতে পারেন নি। তাঁর দানাবশেষ ধনরত্ন এইখানেই আছে। কত রকমের অলঙ্কার, মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, পুঁথি যে এই গিরি নিম্নে আছে, তার ইয়ত্তা নেই।

তরল গলিত গন্ধকস্রাব অনন্ত নাগের মত ফণা বিস্তার করে' পাতাল থেকে উর্দ্ধে উঠ্‌ছে। কতক মধ্যগুহার স্থানে স্থানে কুণ্ডে সঞ্চিত হ'য়ে অনন্ত কালের জন্য দিন-রাত ধুনীর মত জ্বলছে। কতক শীতল বারি প্রস্রবনের সঙ্গে মিশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এরাই পর্ব্বত গাত্র থেকে ঝরে' বাহিরের বহু কুণ্ডে উষ্ণজল যোগান দিচ্ছে।

নয়টি মণিমাণিক্য খচিত কারুকার্য্যময় থামের ওপর একটি গোল গম্বুজ। সপ্তপর্ণীর এই মধ্যগুহা। প্রত্যেক থামের নীচে স্প্রিংযুক্ত শিলার সিঁড়ি। তার নীচে তামার তারের দড়ি ধরে' খানিকদূর ঝুলে নেমে যেতে হয়। পরে শীতল জলের একটি প্রশস্ত পুকুর সাঁতার দিয়ে ডুবে পুকুরের ধারে পর্ব্বত গাত্রে বড় বড় লৌহময় কড়া ধরে' গুপ্তগৃহে প্রবেশ করতে হয়। সে যে কত নীচে ধারণা হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মহর্ষিকে ধন ভাণ্ডারের রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ঋষির ইচ্ছামৃত্যু। বছরের মধ্যে নয় মাস যোগমগ্ন থাকেন; খাদ্য সংগ্রহ করবার জন্য তাঁকে বাইরে আসতে হয় না; খাদ্য পর্ব্বতগাত্রজাত ঔষধির মূল—সুগন্ধী, সুস্বাদু, পুষ্টিকর, আয়ু ও বলবর্দ্ধক। ঋষি বলেন, দীর্ঘকাল এই মূল খাদ্যরূপে ব্যবহার করলে মানুষ চিরযৌবন লাভ করতে পারে। আমি যে দুই বৎসর ঋষির সেবায় অতিবাহিত করেছি, সেই সময় নিত্য এই মূল খেতুম, কোন দিন সিদ্ধ করে, কোন দিন কাঁচা। সে আস্বাদ অমৃতময়!

ঋষির নিকট অনেক বিদ্যা শিক্ষা করেছি—বিশেষ নিধি বিদ্যা। এই বিদ্যাবলে আমি মাটির ওপরের গাছপালা দেখে, তার আস্বাদের ওপর নির্ভর করে বলে দিতে পারি, নীচে কোন ধাতু কত হাত গভীরে পাওয়া যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে এই বিদ্যা জন সাধারণে জানত, কিন্তু কলিতে ইহা লুপ্ত।

কিন্তু মহর্ষির এত করুণা, এত যত্নের শিক্ষা, আমার ইহজন্মের স্বভাবজাত দোষে ব্যর্থ করে' দিলুম। দুবছরের শিক্ষার ফলে অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে দেখে', আমার মহা অহঙ্কার জন্মাল। দর্প-রাক্ষস আমার সর্ব্বনাশ করবে বলে একদিন ঋষির নিকট আমার স্বরূপ ধরিয়ে দিলে। দ্বাপরে আমি নাকি যুধিষ্ঠিরের সভাসদ একজন রাজা ছিলুম; মহর্ষি একদিন শিলাময় সরায় মন্ত্রপুতঃ জলে আমাকে আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পরিচ্ছদ পরা আকৃতি দেখিয়েছিলেন। সেই সব স্মরণ করে দয়াময় মহর্ষি আমার অপরাধ ক্ষমা করলেন, কিন্তু আমার মনে এত তীব্র অনুতাপ এল যে, আমি তাঁর পায়ে ধরে' মৃত্যুবর ভিক্ষা করে নিলুম।

এ ঘটনার পাঁচ দিন পরে দেখি আমি এই বিস্তীর্ণ আখের ক্ষেতে শুয়ে আছি। শরীর উত্তপ্ত, মাথায় যন্ত্রণা, গায়ে অসম্ভব ব্যথা। কৃষকের দয়ায় তার কুটিরে স্থান পেলুম। আজ বুঝতে পারছি আমার বরলাভ সার্থক হয়েছে—কেন না আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমার মৃত্যু নিশ্চয়। যা' হো'ক ভাই, আমার মরণেও সুখ, কেন না তোমায় দেখতে পেলুম। পরজন্মে আমি আবার ঋষির নিকট উপস্থিত হ'ব। মহর্ষি বলেছেন, সেবার আমি ভুল করবো না। সোমানন্দ, বুকে হাত দাও ভাই—বল ওঁ শান্তি, শান্তি শান্তি।.....”

সন্ন্যাসী সোমানন্দ বললেন যে, তিন দিন ধরে' গিরিধারী আরও কত কি বলেছিল, পর্ব্বতগুহার এত নিখুঁত সংবাদ দিয়েছিল, যে তিনি যেন প্রত্যেক জিনিষটি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন।

রজনী প্রভাত হতেই সন্ন্যাসী আমায় আশীর্ব্বাদ করে চলে গেলেন। গিরিধারীর নিকট তিনি সেই পার্ব্বত্য ঔষধির মূল খানিকটা পেয়েছিলেন, তা'রির কতক অংশ আমায় দিয়ে গেলেন। এখনও তা' যত্নে রেখেছি, কি জানি কি হবে বলে ভয়ে খাই নি। সহরের দক্ষিণাংশে সেই বিস্তীর্ণ আখের ক্ষেতের সেই কৃষককেও সন্ধান করে বার করেছি। গিরিধারী যে তার ঘরে ছিল এবং আর একজন সন্ন্যাসীকে সে যে এনেছিল, একথা বর্ণে বর্ণে মিলে গিয়েছে।

এক বছর পরে খোঁজ করে দেখলুম, সেই কৃষক আখের ক্ষেতে বিস্তর লাভ করেছে—অবস্থা ফিরে গিয়েছে। যেখানে পীড়িত গিরিধারী আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে একটি মন্দির স্থাপিত করেছে—সাধু, সন্ন্যাসী, অনাথ, আতুর যে যায়, সেই আহার ও আশ্রয় পায়।

জিজ্ঞাসা করলুম, “সাধু কি কিছু দিয়ে-টিয়ে গিয়েছে ?”

কৃষক একটু হেসে চুপ করে রইল। আমি তখন বললুম, “আমিও জানি, সাধু গিরিধারীর বন্ধু সেই সন্ন্যাসী, যাকে তুমি ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে, তিনি আমায় সব বলে গিয়েছেন।”

কৃষক চিন্তিত হ'ল ; ইঙ্গিতে জানাল চুপ করতে। কৃষকের নাম রামগোলাপ, এই সহরেই সে এখন চিনির বিখ্যাত আড়তদার।

---

# সেজকাকা দি সেকেণ্ড সালক্ হোম্‌স্

শ্রীমতী অপর্ণা সেন

গল্প

আমাদের মধুঠাকুর রথের মেলা থেকে বারোটা মনুয়া কিনে এনেছে। এতোটুকুটুকু পাখী, টুক্‌টুকে ঠোঁট আর পুটপুটে চোখ। সেজকাকা দেখে বল্লেন, বিউটি! বৌদি ই, দেখে যান। মা হাসি-হাসি মুখ বাড়িয়ে বল্লেন, কই দেখি? নাকটা একটু বেশী লম্বা, নাকটাই আগে এগিয়ে গেল। পিসিমা বল্লেন, কি মিষ্টি পাখীগুলো। পাখীগুলো অন্ধকারে কি বল্লে বোঝা গেল না।

গোবদাগাব্বু, আমাদের বাড়ীর ছোট্ট একটি মেয়ে, কুতুর কুতুর ছোট্ট কালো চোখ, গালফুটো ফুলো সেও এলো। হাত দুটো পেছন দিকে করে পাখী দেখতে লাগলো, কিন্তু কিছু বললে না। গোবদাগাব্বুর দিদি, সিঁটকে পানা, মোটেই সে গোবদাগাব্বুর মত সুন্দর নয়, খবর পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। একটু আগেই সে পিসিকে লুকিয়ে ছাতের ওপর দড়ি দিয়ে লাফ দিচ্ছিল।—ওমা, সেজ-কাকা! কে পাখী আনলে—বলে ধাক্কা টাক্কা মেরে একেবারে সামনের সীটে জায়গা করে নিলে। কি দস্যি মেয়ে বাবা—বলে মা সরে পড়লেন। বাবলুও এলো, এসে বল্ল, জানিস পাখীওয়ালা বলেছে ওরা শিষ দিতে পারে।

পরদিন শনিবার। ওদের ইস্কুল নেই, বাড়ীতে দুষ্টুমী করবার জন্যে শনিবার ছুটি দেয় যে। ঠিক দুপুর বেলা, মা একটা পুরাণো ‘প্রবাসী’ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন; পিসিমা বাড়ী নেই। গোবদাগাব্বুর সেই সিঁটকেপানা সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে-নামা দিদি আর তার লং লেগ দিদান আচার চুরির মতলবে রান্নাঘরে ঢুকেছে। গোবদাগাব্বু শান্ত মেয়ে, সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামলো। চারিদিক চুপ, এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে গোবদাগাব্বু যেই খাঁচার দরজাটি খুলে পাখীগুলোকে একটু কেবল আদর করতে যাবে, বলা নেই কওয়া নেই তিনটে দুষ্টু পাখী উড়ে পালালো। চোরের মন বোঁচকার দিকে। গোবদাগাব্বুর দিদি আর তার লং লেগ্ দিদান, যারা আচার চুরি করবার জন্যে ঘুরঘুর করছিল, পায়ের শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখে এই কাণ্ড। তিন বোনে ফিসফিস করে পরামর্শ সুরু হয়ে গেল, ঠিক হল পিসিমাকে বলা হবে না। পিসিমা যা রাগী ভুরু কুঁচকেই আছেন। দেখলেই মনে হয় কিছু বুঝি দোষ করে ফেলেছি। আর সমস্তক্ষণই বসে বসে, কারণে অকারণে বকেন, যখন তখন বকেন, ভীষন বকেন। কাজেই এমন বকা পিসিমাকে লুকোন ছাড়া উপায় কি? মায়ের মেজাজ যখন বেশ খুসী তখন মাকে বলা হ'ল। মা পিসিমাকে বল্লেন না। সেজকাকার আসতে রাত্তির হয়। সকালে কলেজের তাড়ায় পাখী দেখার সময় পান না। আর পাখীগুলো যা দুষ্টু, কেউ কাছে গেলেই এমন ব্যস্ত হয়ে উঠে এদিক ওদিক উড়তে আরম্ভ করবে, যে গোণে সাধ্য কার? ব্যাপারটা সহজেই চাপা পড়ে গেল।

যাইহোক হারাধনের বারোটি বাছার তিনটি খসলো। পিসিমা বাবি সেজকাকা কেউ জানলেন না, গোবদাগাব্বু এণ্ড কোম্পানীর কীর্ত্তি! আবার দু চারদিন যায়। সেজকাকার পাখপাখালীর সখ থাকলে কি হবে, যত্ন করার সখ নেই তো। কয়েকটা পাখী পেটের অসুখে মরে গেল। গোবদাগাব্বুদের গোপন ব্যাপারটিও প্রকাশ হয়ে পড়লো। এমনি করে যখন রেঙ্গুনে জাপানী বোমা পড়লো, তখন মাত্র দুটো পাখী অবশিষ্ট আছে! একের পিঠে দুই বারো, কালের দ্রুত গতিতে তার ‘এক’-টা গেছে মুছে। গোবদাগাব্বুদের

দল পশ্চিমে পালিয়েছে জাপানী-বোমার ভয়ে। সেখানে তিন ইঞ্চি পুরু ধুলো ওড়ান রাস্তায় তারা হিন্দুস্থানী গান গেয়ে পেতলের কলসী কাঁখে করে জল আনতে যায় কিনা জানিনা তবে তারা হিন্দুস্থানী ছড়া মুখস্থ করছে। এমন কি তাদের পুতুলগুলো পর্য্যন্ত বাঙালী সাড়ী পরতে ভুলে গেছে।

আরো কয়েকমাস গেল। জাপানী ধূমকেতুর ল্যাজের ঝাপটানি ভারতবর্ষেও লেগেছে। ক'লকাতার ভীড় আরোও পাতলা হয়েছে। এখনো কিন্তু সেই ছোট্ট দুটো পাখী, সে-এ-ই যাদের টুক্‌টুকে ঠোঁট আর পুট্‌পুটে চোখ, তারা evacuate করেনি। আকাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এরোপ্লেন ঘুরে বেড়ায়, শিকারের খোঁজে, ঠিক যেন বদরাগী বাজপাখী। সাইরেন বাজে, রাত্তিরের স্তব্ধতা চিরে তীক্ষ্ণ হুইশ্‌ল্‌ শোনা যায়। পিসিমা বাবি, সেজকাকা, দাদু, মা সবাই আশ্রয় কক্ষে হাজির হন। দাদু কেবল ঘড়ি দেখেন. চাকররা মুখ চুণ করে বেড়ায়। 'ফার্ষ্ট এড্‌ বক্স' আনতে ভুলে গেছেন বলে বকুনি খান, পিসিমা বলেন, কিছু হবে না যত সব তোমাদের ইয়ে, বেশ ঘুমোচ্ছিলাম। পাখী দুটো কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত আছে, খাঁচার এধার ওধার ওড়ে, ডানা ঝটপটায়, দানা খুটে খুটে খায়, দানার হালকা খোসাগুলো হাওয়ায় উড়ে যায়, কোথায় যায় কে জানে—

এমন সময় একদিন—এই হল আমার গল্প সুরু—গোবদাগাব্বুদের বাড়ীতে নয়, খাস কল্‌কাতা সহরে। ওই যে গো ট্রাম লাইনের ওপারে যেখানে তিনটে নারকোল গাছ আলাপ জমাবার চেষ্টায় আছে, তারই দক্ষিণদিকের সেই লাল বাড়ীটাতে যেখানে গোবদাগাব্বুরা থাকতো। মোটে তখন সকাল বেলা, পিসিমা গরম গরম খবর নেই দেখে কাগজ পরিত্যাগ ক'রে গিয়ে খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছেন। ইস্কুলও নেই তাড়াও নেই। খবরের কাগজগুলো সব চাপিয়েছেন দাদুর ঘাড়ে। বাবি খাতার সঙ্গে নাক মিলিয়ে হিসেব মেলাচ্ছেন, সেজকাকা চা আর রুটি নিয়ে ভাবছেন, রাজভোগ খাচ্ছি। মা খবর দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রডকাষ্ট হয়ে গেল, একের পিঠে দুই বারো, তার দুইটাও গেছে মুছে, শূন্য পড়ে খাঁচা।

পিসিমার ঘরে একটিই কড়িকাঠ, সেটা না গুণেই তিনি উঠে পড়লেন। সেজকাকার ব্রেকফাষ্ট করা হল না, বাবির হিসেবে ভুল হয়ে গেল। আর দাদু বল্লেন, 'ইয়ে করে'। ওটা দাদুর মুদ্রা দোষ।

ছোট্ট পাখীর ছোট্ট খাঁচা, জালের ফাঁকগুলো আরো ছোট্ট, এত ছোট্ট যে একটা আঙ্গুল গলানো মুস্কিল। খাঁচার দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি আছে, কিন্তু পাখী নেই! তার নরম বুকের ছোট্ট ছোট্ট আঁশের পালকগুলো জালের গায়ে লেগে রয়েছে, আরো কয়েকটা পালক খাঁচার পাশেই বাইরে ছড়ান এলোমেলো করে। অন্য পাখী সেটা কিন্তু পালায়নি, কি করে জানি মরে গেছে। খাঁচারই একটা কোনে পড়ে রয়েছে ডানা এলিয়ে দিয়ে, ঘাড়টা একপাশে করে। সে এক করুণ দৃশ্য। খাচার দরজা যখন বন্ধ, এক নম্বর পাখীটা পালালো কোথা দিয়ে? আর গেলই বা কোনখানে? মধুঠাকুর ত বলছে কাল শুতে যাবার আগে বেশ ভালো করে দেখেছে, পাখী দুটো ছিল। এদিকে সকাল থেকেই ত পাখীর পাত্তা নেই। তবে ভোরের দিকেই উড়ে পালিয়েছে নাকি? রাত্তিরে ত পাখীরা দেখতে পায় না, না দেখতে পায়? এ যেন সেই কালিদাসের জানালা দিয়ে ঘর পালালো! আর একটা পাখী মরলো কেমন করে? পালাতে গিয়ে বোধহয় সকলেরই মন খুঁৎখুৎ করতে লাগলো। ব্যাপারটা যত সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ হয় নয়।

গবেষণা সুরু হয়ে গেল। সব জিনিষকে হালকা করে দেখা পিসিমার স্বভাব। তিনি বল্লেন, কাল ঝড়ের সময় খাঁচাটা উল্টে দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে গিয়ে থাকবে। ওইটুকু জায়গাতে পালাতে গিয়ে পাখীটার পালক ছিঁড়ে গেছে। মা এতক্ষণ কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শুনতে পেয়ে গম্ভীর গলায়



বল্লেন, বোধহয় তা নয়, আমি মরা পথটার গলায় দাঁতের দাগের মত দেখতে পেলাম, তারের দাগও হতে পারে, জানিনা। আমার ত অন্যরকমই মনে হচ্ছে। পিসিমা চুপ করে গেলেন। তাহলে পিসিমা নীচে নেমে আর কষ্ট করে দেখতে যাননি, ওপরে বসেই মতামত প্রকাশ করছিলেন। বাড়ীতে ইঁদুরের গতিবিধি আছে, বেড়ালও আছে কয়েকটা, তাদেরই কেউ নয় তো? বাবির এত হেঁয়ালী পছন্দ হচ্ছিল না, বাচ্চা একটা পাখী, তাকে একটা বেড়াল বা ইঁদুর কামড়ে ধরেছে আর সে ঝটপট কর্চ্ছে, এ যে কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। তার চেয়ে ঝড়ে উড়ে যাওয়াটাই ভাল। বনের পাখী বনেই না হয় গেল। ক'টা পালকই খসেছে এই তো! তাই তিনি বল্লেন, উড়েই যদি না যাবে ত ওর হাড় ঠোট সব গেল কোথায়? বেড়াল বা ইঁদুর কি হাড় ঠোঁট, খেয়ে দেয়ে সব নর্দ্দমায় ফেলে দিয়েছে? মা ঝাঁকানী দিয়ে উঠলেন,—কে বললে কে তোমাকে, বেড়ালে খেয়েছে? বেড়াল ঢোকবার জায়গা আছে নাকি? সেজকাকা কাজের লোক, কিছুতেই উৎসাহের অভাব নেই। তাড়াতাড়ি খাচাটা ওপরে এনে বল্লেন, এই দেখ খাঁচার দরজাটা টেনে ধরলে তবে এক ইঞ্চি ফাঁক হয়, বেড়াল ত আর হাত বাড়িয়ে পাখী ধরবে না। এ রীতিমত শার্লক হোমসের ব্যাপার, ভেবে চিন্তে এগোতে হবে। দুটির একটি পাখী তখনো খাঁচার এক পাশে পড়ে ছিল, সেজকাকা তার মুখের এক্সপ্রেসন্‌ পড়তে চেষ্টা করলেন, ভয়ের কোন চিহ্ন তার মুখে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু হায় সে বেচারী সেজকাকাকে কোন হদিসই দিতে পারলে না। তার মুক্তোর মত স্বচ্ছ চোখ দুটি একেবারেই ভাবলেশ হীন। ওগো ছোট্ট পাখী, বলতে পারলে না কোন দুষমণ এসে রাতের আড়ালে তোমাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে তোমার সাথীকে নিয়ে পালালো?

বাবির আপিসের তাড়া ছিল, তিনি পাখীটাকে একবার দেখে নিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, পিসিমা তার আগেই বলে উঠলেন, তাহলে সাপের কাণ্ড। সত্যি বলতে কি সবাইর ভাবনার ধারাটা এইদিকেই চলেছিল কিন্তু কেউই মুখ ফুটে বলছিল না। সাপ যে পাখীটাকে সাবাড় করেই সরে পড়েছে তার তো কোন গ্যারাণ্টি নেই। বাবি সাপের থিয়োরী মানতেও রাজী নয়, বল্লেন, সাপ আবার আসবে কোত্থেকে?—কেন ওই ত কলাবাগান রয়েছে; কালকের ঝড়ে সাপের উড়ে আসা কিছু আশ্চর্য্য নয়;—পিসিমা এখনো ঝড়ের দাপট কাটিয়ে উঠতে পারেন নি! শার্লকহোমস সেজকাকা, ক ভাগ্যিস, পিসিমার কথা মেনে নিলেন, হুঁ, তাহলে হাড়টাড় গুলো কোথায় অদৃশ্য হল বোঝা যায়।

বাবির এতেও মনঃপুত হল না; তিনি পূর্ব্ব কথার জের টেনে বল্লেন, সাপগুলো ব্যাং গিলে কিরকম ফোলে দেখোনি? নড়তেই পারে না। ধরে নিচ্ছি সাপটা দরজা দিয়ে ঢুকেছে কিন্তু বেরোবে কি করে?—তোমাদের এক কথা বাপু—মা বলে উঠলেন, ওইটুকু ত এক পাখী তাই খেয়ে সাপের এমন পেট ফুলবে যে সে আর বেরুতেই পার্ব্বে না? সেজকাকার শার্লক হোমস পড়া বুদ্ধিটা একটু ধারালো, তিনি বল্লেন আমার কিন্তু মনে হয়, ইঁদুরই—চল দেখে আসি তো।

শার্লক হোম্‌স্‌ পড়তে পিশিমাও ওস্তাদ, কিন্তু হলে কি হয়, শার্লক হোম্‌সের গল্পলব্ধ বুদ্ধি তিনি ছোট্ট দুটো পাখীর ব্যাপারে খরচ করতে বিশেষ উৎসুক নয়, তবে সিচুয়েশনটা একবার নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি?

প্রকাণ্ড একটা লোহার র‍্যাক, তারি একটা 'তাকে' খাঁচাটা বসান ছিল; আলমারীর গা ঘেঁসে রাখা আছে গিনিপিগদের সবুজ বাক্স। গিনিপিগদের দল অবিশ্যি বহুদিনই অন্তর্ধান করেছে। তারি উপর বসে আমাদের

মধু ঠাকুর সিচুয়েশন পরীক্ষা করতে ব্যস্ত ছিল, মুখ শুকনো করে বললে, এই দেখুন দিদিমণি, কিরকম লম্বা একটা দাগ ঘসে ঘসে গেছে। তাইতো—তাহলে নিশ্চয়ই সাপ! এইতো ধুলোতে কিরকম দাগ। পিসিমা র‍্যাকের মাথায় যেখানে রাজ্যের লোহা লক্কড় জড় করা আছে সেদিকে একবার ভয়ে ভয়ে দেখলেন, কে জানে কোথায় লুকিয়ে আছে সাপটা, লাফিয়ে পড়লেই ত হয়েছে! শার্লক হোম্‌স্ সেজকাকা একটা লেন্‌স আনতে ওপরে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে নেমে এলেন। বাঞ্চর ওপর উঠে লেন্‌স্ নিয়ে দেখতে লাগলেন,—ওমা, এই দেখ ঠাকুর! স্পষ্ট করে পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ; এই দেখো এই যে, ওইযে পাঁচটা গোল গোল দাগ। ঠাকুরের মাথায় তখনো সাপ ঘুরপাক খাচ্ছে, দেখতে অনেকক্ষণ দেরী হল। আরে! এদিকেও ত রয়েছে, ঐ কোনের দিকে, ওই ত! লেন্‌স্ নিয়ে দেখো, কত বড় বড় দেখাচ্ছে। আমি বলেছিলাম আগেই ত ইঁদুর। ব্যাটা কি পাজী। পাখীটাকে টেনে এনেছে, তারই ওই লম্বা দাগটা। আহা বেচারী! ইঁদুরটা শুধু পাখীটাকে সাবাড়ই করেনি, তাকে হজম করে তার পরবর্ত্তী কর্ম্মটীও করে গেছে। সেটি আবিষ্কার করলো আমাদের মধু ঠাকুর। ইঁদুরের থিয়োরীর একেবারে টাটকা প্রমাণ। যাক সকল সন্দেহের অবসান হল, পাখীর জন্যে যত না হোক নিজেদের জন্যে। কিন্তু ইঁদুর আলমারীতে উঠলোই বা কি করে আর বন্ধ খাঁচার ভেতর থেকে একটা পাখীকে বার করলো কি করে ও আর একটা পাখীকে মারলেই বা কি করে?

শার্লক হোম্‌স্ সেজকাকা এর কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি।

---

# মহাপুরুষদের খেয়াল

( সংগ্রহ )

শ্রীঅমিয়কুমার বসু

আজ কয়েকজন ইউরোপীয় মনীষীর অদ্ভুত খেয়ালের কথা তোমাদের কাছে বলিব। ইঁহাদের কথা পড়িয়া আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের খামখেয়ালী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে তাঁহারা সকলে সাধারণ মানুষের মাপকাটিতে আদৌ বিচার্য্য নন্। তাঁহাদের চরিত্রে যে সকল উদ্ভট লক্ষণ দেখা যায়, তাঁহাদের পক্ষে হয়ত তাহা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

এই সম্পর্কে আজ তোমাদের কাছে (১) ভিক্টর হিউগো (২) রুশো (৩) ভল্‌টেয়ার (৪) শিলার (৫) ব্যাফুন (৬) ব্যালজ্যাক্ প্রভৃতি কয়েকজন মনীষীর খেয়ালের কথা বলিব।



প্রথমতঃ বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগোর কথা ধরা যাক্। হিউগো না দাঁড়াইয়া কোন কিছু রচনা করিতে পারিতেন না। তাই তিনি নিজের কাজের সুবিধার জন্য ফরমাস দিয়া একটি ডেস্ক তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া উপন্যাস রচনা করিতেন। "লে-মিজারেবল" এর মত বিরাট গ্রন্থও তিনি এইরূপে সমাধা করিয়াছিলেন। তিরাশী বৎসর বয়সে প্রত্যুষে উঠিয়া, তাঁহার সু-উচ্চ ডেস্কের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি দশ বার ঘণ্টা সময় লেখার কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতে ইহাই ছিল হিউগোর অদ্ভুত অভ্যাস।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশোও বেশ লিপি বিলাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি তো আর ধনী ছিলেন না। তবু নিজের মনের মত তিনি ঘরটি সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। অরণ্যের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাই ঘরের মধ্যে অরণ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি টেবিলের উপর বিচিত্র ছবি, জানালায় ফুলের স্তবক ঝুলাইয়া রাখিতেন। খাঁচার মধ্যে সযত্নে পুষিয়া রাখিয়াছিলেন নানান রকমের পাখী। এইরূপে ঘরের মধ্যে একটা নকল আবহাওয়া রচনা করিতে না পারিলে, তাঁহার লেখনী হইতে কোন ভাব বাহির হইত না।

ইহার পর যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহার নাম ভল্‌টেয়ার। তিনি আবার অন্য প্রকারের মানুষ ছিলেন। লিখিবার সময় তিনি অতি মাত্রায় বিলাসী ছিলেন। অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় তাঁহার কল্পনা আদৌ খুলিত না। তিনি নিজের সুসজ্জিত পাঠাগার ব্যতীত অপর কোন স্থানে কোন কিছু রচনা করিতে পারিতেন না। এই গৃহে নানা প্রকার সৌখীন আসবাবপত্র ও চিত্রাদিতে সজ্জিত থাকিত। গৃহের মধ্যে একটা সৌখীন আবহাওয়া সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কলম ধরিতেন না।

জার্ম্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শিলারের এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। একটি পাত্রে বরফ গুঁড়া করিয়া তাহার মধ্যে পা ডুবাইয়া তিনি কাব্যের অনুপ্রেরণা পাইতেন। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, সকল ঋতুতেই তিনি কবিতা রচনা করিবার পূর্ব্বে এই কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন।

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ব্যাফুনের খেয়াল ছিল আরও অদ্ভুত ধরণের। অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত না হইলে তিনি লেখার প্রেরণা পাইতেন না। লিখিবার ঝোঁক চাপিলে তিনি পরচুলা ও পালকের পোষাক পরিতেন। কোমরে ঝুলাইতেন কোষবদ্ধ তরবারি, তারপর টেবিলের উপর কাগজপত্র রাখিয়া লিখিতেন।

ফরাসী গল্প-লেখক ব্যালজ্যাক্ লিখিবার সময় পেয়ালার পর পেয়ালা কফি পান করিতেন। একবার তিনি নিজের সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"I will die of ten thousand cups of coffee"

---

## রাখাল রাজা

শ্রীসিতাংশুশেখর দাশ

রূপালী মেঘের মেলা,
নদীর বক্ষে নীরবে চলিছে স্তব্ধ দুপুর বেলা।
কুলকুল করি কোথা থেকে আসি ছুটে যায় কোন্ দূরে,
'আয়! আয়!' করি ডাক দিয়ে যায় নিবিড় মায়ার সুরে।
অলস পাথায় ভর দিয়ে উড়ে শঙ্খচিলেরা কাক,
বটশাখ হ'তে ভেসে ভেসে আসে শ্রান্ত ঘুঘুর ডাক!

তরুণী নদীর তীরে,
ঘন বনছায় কে তুমি বসিয়া বাঁশরি বাজাও ধীরে?
মাঠের মাঝারে যুবতীদিনের মূরতি ঝুরিয়া মরে,
বৈশাখী রোদে গরুগুলি ঐ সবুজ ঘাসেতে চরে।

অনেক দিনের স্মৃতি,
গোকুলের সেই রাখাল রাজার যমুনার কূলে গীতি!
এই যে তোমার স্তব্ধ দুপুর, সুদূর প্রসারী মাঠ,
বাঁশরির গানে এই যে বহিছে সুরের মোহন হাট,

দেখিয়াছি বহুদিন,
কবির লেখনী তোমাদের কাছে করেছে অনেক ঋণ।
গোধূলির বেলা ফিরে যাও ঘরে উড়ায়ে রঙীন ধূলা,
তোমাদের এই সহজ যাত্রা, জীবনের পথ খোলা!

## বুড়োরাও মরতে জানে

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

বৃদ্ধ সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোতেই ছেলেদের মাঝে গুঞ্জন ওঠে—"দাদু আসছে, দাদু!" তাদের মধ্যে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও হাসির বিনিময় হোতে থাকে।

পাড়ার বারোয়ারী দাদু তিনি। জাপানী আক্রমণ ঠেকাবার জন্য গ্রামের সব কার্যক্ষম পুরুষই প্রাণ দিয়েছে, কেবল বেঁচে আছেন তিনি। বয়স হয়েছে তাঁর পঞ্চান্ন বছর। কিন্তু একজন চীনা চাষীর পক্ষে বয়েসটা এমন বেশী কিছু নয়।

তিনি এগিয়ে চলেন গ্রামের রাস্তা দিয়ে। ধারের বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আস্‌তে চায়। জাপানী আক্রমণের আগে কি শান্তিময় কি জম জমাটই না ছিলো গ্রামটা! আর এখন? যে বাড়ীটার দিকেই চাওয়া যায়, তাতেই প্রথমে চোখে পড়ে জাপানী অত্যাচারের চিহ্ন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর বুক ভেঙ্গে। আপন মনে বলেন, "ছোঁড়াগুলোও মর্‌চে। এখনো সব বিষ দাঁত বেরোয় নি, তবু ছোবল মার্‌তে ছাড়বে না। আরে বাপু, তোদের বাপ দাদাদের রক্তের গন্ধ এখনো হাওয়া থেকে যায় নি, আর তোরা কিনা মিকাডোর বিরুদ্ধে লাগতে গেছিস্! যেদিন জাপানী সৈন্যরা এসে সব কটাকে গুলি কোরে মার্‌বে, সেদিন বুঝ্‌বি। মর্‌গে যা সব, মর্‌গে যা। বুড়োর কথা তো কেউ শুন্‌বি নি। মর্‌গে যা। একটা চীনেও বাঁচবে না, এই আমি বলে দিলুম।"

ততক্ষণে ছেলেরা তাঁকে ঘিরে ধরে। সকলে মিলে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয়। একজন বলে, "শুনেছো দাদু, শুনেছো? জাপানী সৈন্য ভর্তি দুটো ট্রেন উড়ে গেছে?" বৃদ্ধ তাঁর মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকান। পাশ থেকে তখন আরেক জন আরম্ভ করে, "জাপানীদের রসদ ভর্তি পাঁচটা লরী রাস্তার মাঝে লুঠ হয়ে গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে আর একজন বলে, "শোনোনি বুঝি, আমাদের গেরিলা সৈন্যরা ওদের একটা বারুদের গুদোম উড়িয়ে দিয়েছে?" বৃদ্ধ ক্ষেপে ওঠেন।—"আমাদের গেরিলা সৈন্য কিরে বাপু, আমাদের গেরিলা সৈন্য কি? আমরা তো সব জাপ-সম্রাটের প্রজা! তোদের মর্‌বার পালক উঠেছে, নয়! এই সেদিন তোদের বাপ দাদারা জাপানীদের গুলি খেয়ে মরেছে—তবু তাদের হুঁস হোলো না! পালা সব পালা, এখান থেকে।" ছেলের দল হাসতে হাসতে রাস্তা ছেড়ে দেয়। তিনি আপন মনে গজ্ গজ্ কর্‌তে কর্‌তে পথ চলা শুরু করেন।

ক্রমে বৃদ্ধ গ্রামের বাইরে গিয়ে হাজির হন। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখেন, যেখানে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে গ্রামের লোকেরা প্রাণ দিয়েছিলো, সেইখানে ছেলেরা পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে বেশ খানিকটা উঁচু বেদীর মত তৈরী করেছে। তার গায়ে অপটু হাতে ছেনী দিয়ে লিখে দিয়েছে—

"যারা মাতৃ-ভূমির স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছে, তাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে"

তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বেদীর নীচে একটা পাথরের ওপর বসে পড়েন। সেই পবিত্র সন্ধ্যায় বীর প্রতিবেশীদের স্মৃতি স্তম্ভের তলায় বসে তাঁর মনে বিস্ময় জাগে। তিনি এতদিন ছেলেদের যা বলে এসেছেন,—নিজেকে যা বুঝিয়ে এসেছেন, সেইটেই কি তা'র মনের কথা? মন বললে,—না, তা নয়। তিনিও দেশকে

ভালোবাসেন, ঠিক অন্য সকলে যেমন ভালবাসে। যারা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, তাদেরও তিনি ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। এতদিন যা বলে এসেছেন, তা' তাঁর দেশভক্ত মনের কথা নয়,—আরাম প্রিয়, শান্তিকামী মনের। 'চীন স্বাধীন হোক,' এ তিনি অন্যান্য চীনাদের মতই চান—কিন্তু শান্তির বিনিময়ে নয়।

হঠাৎ কতকগুলো পায়ের শব্দ শোনা যায়। বৃদ্ধ চমকে উঠে দাঁড়ান। জাপানী সৈন্য নাকি? আসে পাশে চেয়ে, তিনি তাড়াতাড়ি আব্‌ছায়ায় ঢাকা একটা ঝোপের পেছনে লুকিয়ে পড়েন।

জাপানী সৈন্য নয়। পাড়ার গুটি ছয়েক ছেলে সেখানে এসে হাজির হয়। সকলে গিয়ে সেই বেদীর তলায় বসে পড়ে। সন্ধ্যার পর ভূতের ভয়ে কেউ আসেনা এ ধারে। তবু নিচু গলায় তাদের মধ্যে একজন আরম্ভ করে, "কম্‌রেড্‌স্! দূরের ঐ পাহাড়গুলোর মাঝে জাপানীদের গুলি বারুদের প্রধান আস্তানার সন্ধান আমরা পেয়েছি। রাস্তার ম্যাপও একটা তৈরী করা হয়ে গেছে। কে যাবে ঐ গুদাম ধ্বংস কর্তে?" সকলে এক সঙ্গে বলে ওঠে, "আমি, আমি।" সর্দার ছেলেটী ওদের থামিয়ে দিয়ে বলে, "দলের কর্মী সংখ্যা আমাদের খুব কমে এসেছে। আমি মাত্র এক জনকে যেতে দিতে পারি ঐ কাজে। একথা মনে রেখো কম্‌রেড্‌স্, ঐ অভিযানে যে যাবে, সে আর ফির্‌বে না। গুদোমে আগুন লাগালেই, হাজার হাজার মণ বারুদের সঙ্গে সঙ্গে, সেও রেণু রেণু হয়ে যাবে। এ সময়ে অযথা লোকক্ষয় কর্‌তে আমরা পারি না। তোমাদের মাঝে যার মর্‌বার সাহস আছে, এগিয়ে এসো। বেদী ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে পড়ো।"

ঝোপের আড়ালে বৃদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠেন। দুরন্ত যৌবনের মৃত্যু ভয়হীন মনটা আবার জেগে ওঠে তাঁর বুকের মাঝে। তিনি বেদীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বেদী স্পর্শ করে বলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি কম্‌রেড্‌।" ছেলেরা সচকিত হয়ে চুপ করে থাকে। তারা ব্যাপারটা তখনো ঠিক বুঝতে পারে না। বৃদ্ধ আবার বলেন, "দেশকে ভালবাসা, তার জন্যে মর্‌বার দাবী আমারও তো আছে কম্‌রেড্‌স্।' ছেলেরা তাদের দাদুর এই আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, "নিশ্চয়ই, দাদু, নিশ্চয়।" বৃদ্ধ মৃদু হেসে আপত্তি করেন, "বলো, কম্‌রেড্‌।" তারা কলস্বরে একমত হয়ে বলে, "হাঁ, আজ থেকে তুমি কম্‌রেড্‌।"

রাত্রি গভীরতর হয়। দূরের পাহাড়গুলোর ওপর চাঁদের আলো ঝরে পড়ে' সে গুলোকে স্বপ্নময় কোরে তোলে। বৃদ্ধ তার প্রিয় গ্রামের দিকে একবার চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান। প্ল্যানটা পকেটে গুঁজে, তিনি তাঁর কিশোর বন্ধুদের দিকে ফিরে শুধু বলেন, "বিদায়।" তারপর খুব দ্রুত পায়ে পথ চলা শুরু করেন। ছেলেরা সমস্বরে বলে, "কম্‌রেড্‌ দাদু, জয়যুক্ত হও।" তারা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে গতিশীল বৃদ্ধের দিকে। আত্মত্যাগের গর্বে আর নিজেকে নতুন কোরে ফিরে পাওয়ার আনন্দে, তাঁর পা দুটো যেন মাটি স্পর্শ কর্‌তে চাইছে না।

( পূর্বানুবৃত্তি )

আমরা এতক্ষণ যে কতটা পথ হেঁটেছি তা খেয়ালই নেই, পায়ে এত ব্যথা হয়েছে যে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। সর্দারকে বল্‌লাম, "এইবার চল্‌তি পথে আমাদের শহরটা বেশ ভালো ক'রে দেখিয়ে দাও।"

সর্দার বল্‌লে, "চলতি পথে শহর দেখানো যাবে না। শহর দেখতে বেশ ক'রে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। দেখতে সমস্ত দিন লাগবে। পারবে অতটা হাঁটতে?"

আমরা পায়ের ব্যথা সত্ত্বেও রাজি হ'লাম হাঁটতে। বেলা এতক্ষণে সাতটা কি আটটা হবে। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয়েছে। পথের লোকেরা আমাদের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে। কেউ কেউ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একপাল ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মজা দেখবার জন্যে। কেউ কেউ আমাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ছে, কিন্তু সর্দারের ভয়ে কেউ কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

সর্দার বললে, "আমাদের এই শহরের লোকগুলো বড় ভাল, আমাকে খুব মেনে চলে।"

ভাল লোকের নমুনা দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। লোকগুলো এত নোংরা আর অসভ্য যে কি বলব!

সর্দার বল্‌লে, "শহরের বাইরে একদল লোক আছে তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লাগে তা হ'লে একটু ভয়ের কথা। তারা আমাকেও বড় একটা মানে না। তারা কোনো আইনই মানে না, যখন যা খুশী তাই করে, রাজাও তাদের খুব খাতির ক'রে চলেন। কিন্তু থাক, এসব কথা আর আলোচনা করব না, যখন যেমন হয় তাই বুঝে ব্যবস্থা করব।"

আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের এই ভ্রমণ-ব্যাপারটা খুব নিরাপদে শেষ হবে না। অনেকগুলো নতুন ধরণের বিপদ আমাদের সামনে যে আসবেই এ বিষয়ে আমাদের আর কোনো সন্দেহ রইল না। হঠাৎ এখন ফিরে যাবারও উপায় নেই। বিপদ উত্তীর্ণ হ'তে পারব কি না সেইটেই হ'ল সমস্যা। মন ভয়ে ভ'রে উঠল, অথচ বাইরে কিছুই প্রকাশ করতে পারলাম না।

এই সময় আর একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ দেখি পথের ধারে একটি লোককে সবাই মিলে শাস্তি দিচ্ছে। এমন নিষ্ঠুরতার দৃশ্য এর আগে কোথায়ও দেখিনি। কালিপূজোয় যেমন সবাই মিলে উৎসব ক'রে পশুবলি দেয়—এখানেও সেই রকম বহু লোকের উৎসবের মধ্যে একটা মানুষকে যেন বলি দেওয়া হচ্ছে।

প্রকাণ্ড এক আসর বসেছে পথের ধারে। অনেক রকম বাজনা অনেক লোক এক সঙ্গে বাজাচ্ছে। একটু এগিয়ে ভাল ক'রে ব্যাপারটি দেখতে লাগলাম। যাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সে সবাইকে ভেংচি কাটছে আর দুখানা হাতে ক্রমাগত শূন্যে ঘুঁসি ছুঁড়ছে। যে সব বাজনা বাজছে তার তালে তালে সে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, হাঁ ক'রে গলা কাঁপাচ্ছে এবং উপস্থিত সবাইকে কি যেন বলতে যাচ্ছে কিন্তু গলা থেকে কেবল একটা অস্পষ্ট ভাঙা আওয়াজ বেরুচ্ছে, কোনো কথা বেরুচ্ছে না। তার কপাল থেকে বৃষ্টির মতো ঘাম ঝরছে, সেই ঘামে তার সকল গা ভিজে যাচ্ছে।

শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, সে ঐ আসরে বসে গান কচ্ছে

কি তার অন্যায় যার জন্য এই নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা! আসরের লোকগুলো কি নিষ্ঠুর! লোকটির যত কষ্ট হচ্ছে ততই তারা আনন্দে চীৎকার করছে!

সর্দার আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে বললে, "লোকটি একজন বিখ্যাত ওস্তাদ গাইয়ে। তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, সে ঐ আসরে ব'সে গান গাইছে।"—

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, "গান গাইছে তা হ'লে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না কেন?"

সর্দার আমার প্রশ্ন শুনে বললে, "গানের ঐ টুকুই তো আসল।"

মন্টু উত্তেজিতভাবে বলল, "ঐ টুকুই আসল, তার মানে? কণ্ঠ নেই তবু গান?—গান যেন আমরা কখনো শুনিনি!"

সর্দার বলল, "উত্তেজিত হয়ো না, শোন। গান গাইতে গাইতে প্রথম গলা ভেঙে



যাবে, তারপর গলায় পাঁচ সাতটা সুর একসঙ্গে বেরুবে, তারপর খালি সোঁ সোঁ আওয়াজ বেরুবে—শুনে মনে হবে হাঁপানি হয়েছে।—তারও পরে সব বন্ধ, কোনো আওয়াজই বেরুবে না কিন্তু হাত নাড়া, ভেংচি কাটা, ঘাড় ঝাঁকানো এসব ঠিক রাখতে হবে।"

"বল কি সর্দার!"

"হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি, আর যারা গান বোঝে তারাও ঐ কথাই বলে। তারা বলে গানে ঐ সবেরই দাম, আর কিছুর দাম নেই।"

মন্টু প্রশ্ন করল, "তা হ'লে যারা বাজাচ্ছে তাদের বাজনার শব্দ হচ্ছে কেন?"

সর্দার বলল, "সে কথা আর এক সময় বুঝিয়ে দেব, তবে আপাতত এইটুকু মনে রাখ যে সঙ্গীত একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, চট্ করে এর মানে বোঝা যাবে না।"

সর্দারের কথায় আমাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস হ'ল না। কেবল নিতাই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, "তা হ'লে যে-কোনো লোক হাত নাড়লে আর ঘাড় ঝাঁকালে তোমাদের দেশে ওস্তাদ গাইয়ে হ'তে পারে?"

সর্দার গম্ভীর গলায় বলল, "মোটেই তা নয়, ওস্তাদ হওয়া যার তার কাজ নয়। ঐ হাত নাড়া আর ঘাড় ঝাঁকানো তুমি সহজ মনে করছ? সহজ নয়, ভয়ানক কঠিন। আমি যদি ঐ রকম মিনিট দশেক করি তাহ'লে আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা ধ'রে যাবে, নড়বার শক্তি থাকবে না।—বছর দশেকের অভ্যাস না থাকলে ও রকম করা যায় না।"

নিতাই কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। ভয়ে নয়, ক্ষুধায়। কাতর কণ্ঠে নিতাই বলতে লাগল, "আর যে দাঁড়াতে পারছি না সর্দার, ক্ষিধেয় পেট জ্বলে গেল।"

কিন্তু আমরাও যে কোন্ মন্ত্রবলে এতক্ষণ সোজা ছিলাম তা জানি না, হঠাৎ নিতাইয়ের কথা শুনে মনে হ'ল আমাদেরও পায়ে কোনো জোর নেই। আমরাও সর্দারকে আমাদের অবস্থা জানালাম। সর্দার আমাদের তাদের শহরের হোটেল পাড়ায় নিয়ে গেল।

পাড়াটা ছোট নয়। সারি সারি হোটেল। বহু লোকের ভীড়। কেউ খেয়ে বেরিয়ে আসছে, কেউ ঢুকছে। এই পাড়ায় হোটেল ভিন্ন অন্য কোনো বাড়ী আছে ব'লে মনে হ'ল না; কিন্তু একটা জিনিস দেখে ভারি মজার মনে হ'ল। সবসুদ্ধ প্রায় পঁচিশটি হোটেল, কিন্তু কোনোটির গায়েই 'হোটেল' কথাটি লেখা নেই। কোনোটির গায়ে "বিশুদ্ধ"—আবার কোনটির গায়ে 'পবিত্র' কথাটি শুধু লেখা আছে। আগে যে খাদ্য শিল্পালয় দেখেছি সেটা মিষ্টান্নের দোকান।

একটা "বিশুদ্ধ" ঘরে গিয়ে ওঠা গেল। হোটেলের মালিক জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কি খাবে—ভাত না রুটি না চা?"

আমরা ভাত খাওয়াই ঠিক করলাম, হোটেলের মালিক আমাদের তিনটে আসন দেখিয়ে দিল। চেয়ে দেখি আমাদের আগে যারা খেয়ে গেছে, তিনটে আসনে তাদের খাওয়া থালা পড়ে আছে, আর তারা ভাত ডাল তরকারী যা খেতে পারেনি তাও ঐ থালাগুলোয় পড়ে আছে। হোটেলের মালিক বলে কি! আরও বহু লোক সেই ঘরে ব'সে খাচ্ছিল, তারাও তার কথায় বিস্মিত হ'ল না!

আমি বললাম, "থালাগুলো তুলে নাও, ওখানে বসব কি ক'রে?"

আমার এই প্রশ্নে ঘরসুদ্ধ লোক আমাদের দিকে চেয়ে হেসে উঠল। ব্যাপার কি? প্রশ্নটা যে অন্যায় হয়েছে এমন তো বোধ হ'ল না, তবে ওরা হাস্‌ল কেন?

হোটেলের মালিক গম্ভীরভাবে (হয়তো তারও হাসি পেয়েছিল কিন্তু ব্যবসার খাতিরে হাসি চেপে) বলল, "থালা তুলে নেব কেন? থালায় যা আছে খেতে থাক, আরও যদি লাগে চেয়ে নিও।"

বললাম, "এ কি রকম কথা! আমরা পরের উচ্ছিষ্ট থালায় খাব না।"

এ কথায় হোটেলের মালিকও এবারে হেসে উঠল। তার ভাবখানা এই যে আমাদের মতো অদ্ভুত লোক লোক সে এর আগে আর কখনো দেখিনি। সে হাসতে হাসতেই বলল, "দেখ তোমরা এই নতুন দেশে এসেছ, এখানে এসে এখানকার নিয়মটাই মেনে চল।"

সর্দার আমাদের কাছে বসেছিল, সে হোটেলের মালিককে বলল, "এরা আমার লোক, এদের সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বল।"

এ কথায় হোটেলের মালিকের মুখখানা হঠাৎ ভাল মানুষের মতো হ'ল, সে মাথা চুলকিয়ে বলতে লাগল, "তোমরা যে রকম খেতে চাইছ, আগে আমরা সেই রকমই দিতাম। কেউ খেয়ে উঠে গেলে, তার পাতের এঁটো ভাত আ৲ালে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করতাম, তারপর সেইগুলোই নতুন থালায় সাজিয়ে নতুন লোককে দিতাম।—ক্রমে দেখা গেল সেই এঁটো ভাতই লোকে বেশি পছন্দ করছে। তারপর আস্তে আস্তে কথাটা সবার কানে গেল—আর ক্রমে আমাদের খদ্দের বাড়তে লাগল। আমাদের এখানকার সব হোটেলেই এখন এই ব্যবস্থা হয়েছে।

মণ্টু প্রশ্ন করল, "এই যে এরা সব খাচ্ছে, এরা কি সবাই এঁটো ভাত খাচ্ছে?"

হোটেলের মালিক বলল, "শুধু এঁটো নয়, বাসীও বটে। সকালে যারা খেতে আসে তারা প্রায় সবাই কাল রাত্রে যারা খেয়ে গেছে তাদের এঁটো ভাত খাচ্ছে।—আজ সেইটে গরম ক'রে দিয়েছি মাত্র।"



দেখলাম যারা খাচ্ছে তারা এসব কথায় ভ্রূক্ষেপও করছে না। মণ্টু অবাক হ'য়ে বলল, ভারি মজার লোক তো এরা।"

সর্দার ব'লে উঠল "তোমরা এই সব বাজে কথায় অকারণ অনেক সময় নষ্ট করছ। আর কিছু প্রশ্ন ক'রো না, এইটে কেবল জেনে রাখ যে এরা এই রকম খেয়েই তৃপ্তি পায়—কেন পায় তা ভগবান জানেন। এদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় হ'লে সব বুঝতে পারবে,—এখন যা হয় কিছু খেয়ে নাও।"

মণ্টু বলল, "শুধু একটা প্রশ্ন বাকী রইল—এদের এই রকমই যদি প্রবৃত্তি, তা হ'লে হোটেলের গায়ে "পবিত্র" বা "বিশুদ্ধ" লেখা আছে কেন?"—কিন্তু সর্দারের দিকে তাকিয়ে তার আর উত্তর শোনবার ইচ্ছে হ'ল না, কেননা সর্দার ইতিমধ্যেই বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল, আর তার সেই বিরক্তির ভাব তার চোখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার এই বিরক্তি দেখে আমার মনে হ'ল, তাদের দেশে এর চেয়েও অনেক ভাল ভাল জিনিস দেখবার আছে, অতএব একটা জিনিস নিয়ে অনেক সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। আমার এ ধারণাটা যে ঠিক তা পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

নিতাই বলে উঠল, "ভাত খাব না, চা খাব।" বলতে না বলতেই তিন পেয়ালা চা এল—কোনো রকমে তাই খাওয়া গেল, কিন্তু গোল বাধল দাম দেওয়ার সময়। তিন পেয়ালা চায়ের দাম শোনা গেল তিন টাকা। দিতে আমাদের সবারই আপত্তি হ'ল, মণ্টু বল্‌ল এটা নিছক জোচ্চুরি—এক পেয়ালার দাম এক টাকা হ'তেই পারে না। কিন্তু সর্দার গোলমাল থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমাদের দাম দিতে হবে না, তোমরা আমার অতিথি, তোমাদের খাবার খরচ আমিই দেব।"

নিতাই বলল, "কিন্তু তাই বলে এত দাম হবে কেন?"

সর্দার বলল, "সকালের চায়ের ঐ রকমই দাম এখানে; কিন্তু দামের কথা এখন থাক, চল, আমাদের বড্ড দেরি হ'য়ে যাচ্ছে—এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

আমরা সর্দারের নির্দেশ মতো সেখান থেকে রওনা হ'লাম। মণ্টু এই সব কথা তার ডায়েরিতে লিখবে ব'লে কল্পনা করছিল, কিন্তু সকালে চায়ের দাম এক টাকা কেন এই সমস্যায় তার কাল্পনিক লেখাটাও আর এগোচ্ছিল না, তাই সে কাতরভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, "নতুন দেশে এসে কিছু ভাল ক'রে না জেনে মিছিমিছি ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি? তা হ'লে এত কষ্ট ক'রে এলাম কেন?"

খুব দুঃখ হ'ল মণ্টুর জন্য, তাছাড়া ওর উদ্দেশ্য যে খুব ভাল এতে তো আর সন্দেহ নেই, কাজেই মণ্টুর কথাটা ফেলা গেল না। চায়ের দাম সম্বন্ধে কথা পাড়তেই হ'ল, কিন্তু খুব ভয়ে ভয়ে, কি জানি যদি সর্দার চটে যায়! কিন্তু আমাদের ভাগ্যবশত সর্দার মোটেই

চট্‌ল না বরঞ্চ আরও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। আসলে ব'সে ব'সে আলাপ করাতেই তার আপত্তি—চলতি পথে কোনো আপত্তিই নেই।

চায়ের দাম সম্বন্ধে সর্দারের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানা গেল, সকালে যারা চা খেতে আসে তারা প্রায়ই পয়সার লোক, তারা বেশি দাম দিয়ে চা খেতে পারে, সুতরাং তাদের কাছ থেকে যতটা পারি আদায় ক'রে নেওয়া হয়। হোটেলে চায়ের পেয়ালা ধোয়ার জন্য প্রকাণ্ড এক বালতি জল রাখা হয়। একজন চা খেয়ে উঠে গেলে তার পেয়ালা সেই বালতির জলে ডুবিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে একই বালতির জলে সকাল থেকে পেয়ালা ধুতে ধুতে সেই জল চায়ের মতো লাল হ'তে থাকে। তারপর বিকেলের দিকে সেই পেয়ালা ধোয়া জল বালতি থেকে নিয়ে গরম ক'রে চা বলে বিক্রি করা হয়। এই বিকেলের চা খুব সস্তায় বিক্রি হয়—এক পেয়ালা দুপয়সা। তা ছাড়া কেউ যদি সন্দেহ করে, ঐ চা পেয়ালা-ধোয়া জল নয়, তা হ'লে সে ভিতরে চা তৈরীর জায়গায় গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারে। কেউ কেউ নাকি সন্দেহ করেছে—এবং এখনও করছে, তাই সর্দার বলল, এখন থেকে ওরা নাকি কাপ ধোয়ার বালতিটা সবার সামনেই রাখবে।

ক্রমশঃ

---

## আমার দোসর

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

কচি ঘাস পাতা ছোট মাঠখানি আমার আঙিনা ধারে—
চোখে চোখে রোজ দেখাদেখি ক'রে দোসর ক'রেছি তারে।
বুনো ঘাস ফুল ঝরায় গাছের সাজায় তাহার মাটি,
ছোট ঝোপে ঝোপে নিতি দেখি তার সুন্দর পরিপাটী।
ভোম্‌রা ফড়িং প্রজাপতিগুলি পরাণ ভরিয়া সুখে
গান করে তারা মধু করি' পান তাহার সে ছোট বুকে।
করবী ফুলের নীচু ডালে পাখী দিল্ ভ'রে ডেকে যায়,
পরাণের মোর সুর ভেসে চলে উদাসী মধুর বায়।

পৃথিবীর বুকে জগৎ কাঁদিছে নয়নের জলে ভাসি—
ধুয়ে ধুয়ে সব জমাট বাঁধিছে মনের বেদনা রাশি।

…আমার এ ছোট মাঠে চেয়ে দেখি দুনিয়ার প্রিয়রূপ—
সেই পৃথিবীর জগতেরে বসি করিতেছে বিদ্রূপ।
দোসর করেছি তাই তারে আমি হৃদয়ের সুধাদানে,
বিলাইছে তার স্নেহ ভালোবাসা সকলের প্রাণে প্রাণে।

---

## অবনীন্দ্র-সন্দর্শনে

জন্মাষ্টমী। এননই এক মেঘমেদুর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এমনই আর এক অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। সেদিনও আকাশে সেই পবিত্র জন্মাষ্টমীরাত্রির মত ঘনঘটা ছিল কি না জানি না, তবে নবজাত শিশুর ললাটে যে ভবিষ্যৎ মহাপুরুষের লেখন লিখিত হয়েছিল ভাগ্যদেবী আজ আর সে কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। এই শুভঘটনাটী ঘটেছিল একাত্তর বৎসর আগে, ১৮৭১ সালের ৭ই আগষ্ট।

বাঙলার ছেলেমেয়েরা, এবং তাদের যাঁরা সাহিত্যরস পরিবেশন করছেন তাঁরাও, এই মহাপুরুষকে তাঁদের অভিনন্দন জানাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন সে খবর তোমরা পেয়ছ। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত ২৯শে আগষ্ট শনিবার অবনীন্দ্র-উৎসব-সমিতির একটি অধিবেশনে স্থির হয় যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়া এইরূপ একটি উৎসবের পক্ষে অনুকূল নয়, কাজেই যতদিন না এই পরিস্থিতির উন্নতি হয় ততদিনের জন্য এই উৎসব অনুষ্ঠানটী স্থগিত রাখা হোক, কিন্তু তার আয়োজন যথাসম্ভব চলতে থাকুক।

কিন্তু কিশোর বাঙলার মনে অবনীন্দ্র-উৎসবের যে মধুর সুরটি বেজে উঠেছে তাকে ত এ ভাবে নিরস্ত করা সম্ভব নয়। কাজেই শনিবারের মিটিংএ যখন উৎসব সমিতির সম্পাদক স্বামী প্রেমঘনানন্দ প্রস্তাব করলেন যে আগামী বুধবার অষ্টমী তিথিতে বরানগর "গুপ্তনিবাস"-এ অর্থাৎ যেখানে অবনীন্দ্রনাথ সম্প্রতি আছেন সেখানে, একান্ত ঘরোয়া ভাবে মিলিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হোক, উপস্থিত সকলেই আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। শ্রীমান্ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পকেট টাইম টেব্‌ল্ বার করে বললেন যে সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেণ, ঐ ট্রেণেই যাওয়া সুবিধা, একেবারে ষ্টেশনের ধারেই বাড়ি।

সময়টা শুনে কেউ কেউ একটু মুষড়ে পড়লেন। সাড়ে সাতটা মানে শয্যাত্যাগ করতে হবে আরও আগে। ছুটীর বার, বিছানাটা চট করে ছাড়তে একটু মায়া হওয়া স্বাভাবিক। সহানুভূতির স্বরে কেউ কেউ বল্লেন, দেখুন না, বুধবার ত ৩রা সেপ্টেম্বর, তখন ত নতুন টাইম—নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, অর্থাৎ আগেকার বেঙ্গল টাইম। সাড়ে সাতটা মানে সাড়ে আটটাও ত হতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় শ্রীমান মোহনলাল এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত করতে পারলেন না।

তারপর দুদিন কেটে গেল। ভেবেছিলাম সাড়ে সাতটা কি সাড়ে আটটা, এরই সংশয়ের ধাক্কাতেই বুঝি এই ঘরোয়া মিলনটাও বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু কথা আছে, হোয়্যার দেয়ার ইস্ এ উইল্ দেয়ার ইস্ এ ওয়ে; ইচ্ছা থাকলেই কাজ হয়। মঙ্গলবার রাত্রে বাড়ী ফিরে আমার ছোট মেয়ের কাছে শুনলাম, 'দিদিভাই' ফোণ করেছিলেন, স্বামিজী নাকি তিনবার ওঁর বাড়ি গিয়েছিলেন, সব ঠিক, কাল (অর্থাৎ বুধবার) সকাল সাড়ে সাতটায় গাড়ি, শিয়ালদহে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম্ থেকে ছাড়বে ইত্যাদি। বেচারী পাছে ভুলে যায় এই ভয়ে একটা কাগজে বড়ো বড়ো হরপে সব লিখে রেখেছিল। তারপর মুখেও সেটা মোকাবিলা করে নিয়েছিল এবং দিদিভাই যে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন যে কথাও জানাতে ছাড়ে নি।

সে যাক, সাড়ে সাতটাই তাহলে ঠিক। আমার বাড়ি থেকে শিয়ালদা প্রায় ৪৫ মিনিটের পথ, তা ছাড়া প্রাতঃকৃত্য, চা-পান ইত্যাদি ধর আধ ঘণ্টা, তারপর আরও মিনিট পনেরো হাতে রাখলে হয় গিয়ে প্রায় দেড়

ঘণ্টা। তাহলে উঠতে হবে আমাকে সাড়ে সাতটা মাইনাস দেড়, মানে, সকাল ছটা। আগেকার টাইম অনুসারে হল ৫টা। সত্যি, ভাবনার কথা। ৫টায় ওঠা কি সোজা কথা!

কিন্তু এই মহাপুরুষ মিলনী, সেও তো ছাড়া যায় না। এমন শুভদিনটিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো একি একটা কম সৌভাগ্যের কথা। খুব একটা উইল ফোর্স নিয়ে মঙ্গলবার রাত্রে শুতে গেলাম।

ঘুম ভাঙলো যখন তখন রাতের বেশ একটা আমেজ রয়েছে। খোলা জানলার ভিতর দিয়ে চোখদুটি অর্দ্ধেক খুলে দেখলাম, কালো আকাশ, দু একটা তারা যেন জ্বলছে কি জ্বলছে না। বজ-বজ লাইনে একটা মালগাড়ি ঘটাং ঘটাং করতে করতে যাচ্ছে, ইঞ্জিনের আগুনে আকাশটা যেন একটু লাল হয়ে উঠলো, তাও দেখলাম। মাথার কাছ থেকে টর্চ্চটা নিয়ে হাতঘড়িটায় আলো ফেলে দেখলাম সাড়ে চারটা!

ভাবলাম এখনও একটু শোয়া যাক। এত সকালে দাড়ি কামানো যাবে কি না ভাবতে ভাবতে কখন যেন আবার একটু তন্দ্রা এসে গেছে, জেগে দেখি ৬টা বেজে গেছে। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। মুখ হাত ধুয়ে বারান্দায় এসে দেখি ইজিচেয়ারের কাছে খবরের কাগজ খানা দিয়ে গিয়েছে। মনে করলাম, কতক্ষণই বা লাগবে, একবার চোখ বুলিয়ে নিই। রোমেল আবার অষ্টমবাহিনীকে আক্রমণ করেছে!

কিন্তু কবি বলেছেন, আর্ট ইস লঙ্ বাট্ লাইফ ইস্ শর্ট, খবরের কাগজ পড়া মানে আরো ১৫ মিনিট গেল। শেষে যখন বেরোলাম তখন ৭টা। সাড়ে সাতটায় গাড়ি। যেতে ৪৫ মিনিট!

অবশ্য না গেলেও হয় তো চলতো। কিন্তু এত কষ্ট করার পর না গেলে বাকি দিনটা যে কি রকম করে কাটতো তা এখন ভাবতেও ভয় হয়। হিসাব করে ট্রামে চেপে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত গেলাম, তখন সওয়া সাতটা। ট্রেণ ধরতে গেলে সেখান থেকে একখানা ট্যাক্সি না নিলে উপায় নেই। কিছু খরচের বরাদ্দ ছিল, পরিত্রাণ নেই, মনে মনে রোমেলের শ্রাদ্ধ করতে করতে একটা চল্‌তি ট্যাক্সি ধরলাম, বললাম, জোরসে চালাও!

ট্যাক্সি যখন শিয়ালদায় পৌঁছুল তখন দেখি ঘড়িতে ৬-২৬মিঃ আর মিটারে ১৸০। কোনো রকমে তাড়াতাড়ি ভাড়াটা দিয়ে টিকিট ঘরের দিকে দৌড়োচ্ছি এমন সময় দেখি স্বামিজী হাসতে হাসতে আসছেন। বললেন, একটু ভুল হয়েছে, ৮-১৫ মিনিটে গাড়ি, নতুন টাইমটেব্‌লে একটু অদল বদল হয়েছে।

হায়, হায়, হায়, তা হলে ত ট্যাক্সিটা না করলেও চলতো! ঠিক এই আক্ষেপ যখন করছি তখন সভয়ে অনুভব করলাম, আমার বাঁ হাতে যেন কি একটা ছিল, সেটা এখন নেই।

নাঃ, বিশেষ কিছু নয়, ছাতা খানা!

ট্যাক্সিওলা ভাড়ার সঙ্গে ওটাও লাভ করেছে।

ষ্টেশনে দেখলাম অনেকেই এসে পৌঁছেচেন। একটা ট্যাক্সি থেকে নামলেন দিদিভাই, অবনীন্দ্র-উৎসব সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীবিমল বসু, এবং শ্রীমান্ অরুণ ও অলক। একটা গ্রুপে দাঁড়িয়ে আছেন, শ্রীখগেন্দ্র লাল মিত্র, শ্রীমনোজিৎ বসু, শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, শ্রীমান্ নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার ইত্যাদি। অনেকেই আসতে পারেন নি। তবুও দলটি নেহাৎ ছোটো হয় নি। ছোটোরাও অনেক ছিল; ওদের না নিয়ে কি ঠাকুরদাদা অবনীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া যায়! শিয়ালদাতে আমরা ছিলাম প্রায় ১৪।১৫ জন, শুনলাম বরানগরেও অনেকে এসে মিলবেন। সঙ্গে অজস্র ফুল ও মালা নেয়া হয়েছিল, সাদা পদ্ম, রজনীগন্ধা কেয়া মল্লিক ইত্যাদি। দু বাক্স সন্দেশও নেয়া হয়ে ছিল।



স্বামিজীর মুখখানি অল্পতেই হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সকল বিষয়েই উৎসাহী ও কর্ম্মী। বল্লেন, এবার টিকিটগুলো করে আনি। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বল্লেন, একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। মুখে আর সে হাসি নেই। ব্যাপারটা এই যে বরানগর রোড ষ্টেশন যাবার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া আগে ছিল সাত পয়সা। কাল স্বামিজী এসে বুকিং ক্লার্কের কাছ থেকে জেনে গেছেন ভাড়া বেড়ে হয়েছে ন' পয়সা। আজ টিকিট করতে গিয়ে শুনলেন এগারো পয়সা এবং ঐ দামেই টিকিট করতে হয়েছে। স্বামিজী না কি প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু টিকিট-ঘরের বাবুটি তখন এত ব্যস্ত যে তাতে বিশেষ সুফল হয় নি।

হয় ত স্বামিজী কাল শুনতে ভুল করেছেন এই মনে করে বললাম, যাক, দু পয়সা বেশী লেগেছে তা' আর কি হবে! এখন ট্রেণটা ছাড়লে বাঁচি!

ষ্টেশনের কাছেই 'গুপ্ত নিবাস'। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নীচের বসবার ঘরেই একটা আরাম কেদারায় বসে ছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, কী ব্যাপার, এ সব কী!

স্বামিজী আমাদের মুখপাত্র, বল্লেন, আজ জন্মাষ্টমী, আপনার দর্শন লাভের আশায় আমরা এলুম।

—তা- সঙ্গে ও-সব কী।

—কিছু না, একটু ফুলটুল।

অবনীন্দ্রনাথের হাসি মুখ, কিন্তু একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, ফুল? ফুল কী হবে! খাবার দাবার সঙ্গে থাকে ত বলো। এই তরীতরকারী, শাকটা মুলোটা, কিছু পেঁয়াজকলি—

—কিছু সন্দেশ আছে।

হাঁফ ছেঁড়ে যেন বাঁচলেন, বললেন, তাই বলো, দাও, দাও, ছেলেমেয়েদের হাতে সব দাও।

দেয়া হোলো। বাড়ি থেকে পাঁপর-ভাজা এলো। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও কিছু মুখে দিলেন।

বল্লেন, আমার দিদিমণি কে তোমরা দেখেছো? বলে' ডাক দিলেন, ওরে আমার দিদিমণিকে নিয়ে আয় তো!

দিদিমণি অবনীন্দ্রনাথের ৬।৭ মাস বর্ষীয়া ছোট্ট নাতনী, ভালো নাম ধারা। সুন্দর, ফুটফুটে মেয়ে। ঠাকুর্দ্দার কোলে চড়ে সন্দেশ খাওয়া হল। কয়েকদিন আগে অন্নপ্রাশন হয়েছে, শরীরটা ভালো নেই। তার মা দ্বারের অন্তরালে দাঁড়িয়ে দিলেন, দিদিভাই কোলে করে' দিদিমণিকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। দিদিমণি অবাক, বড়ো বড়ো চোখ করে হয়তো বা ভাবছে, এতদিন এরা সব কোথায় ছিল!

আর একটি সাহিত্যবিখ্যাত ব্যক্তি চুপে চুপে এই দৃশ্য উপভোগ করছিল, সে হোলো তোমাদের পরিচিত বাদশাবাবু, অবনীন্দ্রনাথের পৌত্র। রংমশাল যারা পড়ো, তাদের সকলের কাছেই বাদশাবাবু চেনা। 'চট জলদী' লেখা গুলো মনে আছে ত?

পাকড়াও করে কাছে এনে বসালাম। বললাম, আমাকে চিনতে পারো?

বললে, না।

তখন আত্ম পরিচয় দিতে হল। বললে, ও আপনিই এবারে রংমশালে লিখেছেন না?

একটু পরেই আর্ট সম্বন্ধে কথা উঠলো।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ও-সব স্পিরিচুয়্যালিজম্ টিরিচুয়্যালিজম্ কিছু নয়। সব সেন্সের ব্যাপার! চোখ খুলে দেখো, আকাশ আলো, ফুল, পাখি, দেখে আঁকো! আর্ট চোখ বুজে সাধনা করবার জিনিস নয়। এমনই এক সাধক একবার এসেছিলেন আমার কাছে, বললেন, 'ছবি আঁকা শিখছি, অন্তরের প্রেরণার জন্য সাধনা করছি।' যৌবনে তিনি আরেক ধরণের সাধনা করেছিলেন. এখন ছবি আঁকতে শিখছেন শুনে বললাম, 'সে কি হে? ছবি আঁকা তো চোখ বুজে সাধনার জিনিষ নয়। হ্যাঁ, সাধনার বটে, কিন্তু সে চোখ খুলে। তা' তুমি কি একেছো একবার দেখিও ত।' এই কথা বলার পর থেকে আর তাঁর দেখা পাইনি। বলে, হাসতে লাগলেন।

তার পর বলতে লাগলেন—

খ্যাতি হবে এ জন্য ছবি আঁকি নি। শোন তবে বলি। অনেকদিন আগেকার কথা। প্যারিস এগজিবিশনে ছবি পাঠিয়েছি, আমার কয়েকটি বিলাতী বন্ধুদের অনুরোধে। ওরা সব বিদেশী ধনী ব্যক্তিদের কাছে ছবি বিক্রী করে লাখ লাখ টাকা পায়, আমিও আমার ছবির হাজার হাজার ফ্রাঙ্ক দাম ধরে পাঠালাম। মনে আছে একটা ছবির জন্যই প্রায় ২৫০০০ ফ্র্যাঙ্ক দাম ধরে দিলাম, 'ক্যামেল' ছবিটার জন্য। ২৫০০০ ফ্রাঙ্কে কত টাকা হয় তখন হিসাব করিনি। দর বেশী হওয়ায় বিক্রী হোলো না। বন্ধু জানালেন, কিছু টাকা কম হলে ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম লুভ্ ছবিটা নিতে পারে। আমার আর্টিষ্ট মনে ঘা লাগলো! আর্টিষ্টের কাছে তার ছবি আত্মজ ছেলেমেয়েদের মতো, তাকে নিয়ে দর কষাকষি করতে হবে ফরাসী জাতীয় মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে?—বললাম, আমি বিক্রী করবো না। ওরা যদি আমার কাছে ভিক্ষা করে চেয়ে নিতো, হয় ত এমনই দিয়ে দিতাম। বন্ধু বললেন, ইউ আর এ ফুল। লুভ্ এ ছবি রাখলে কতলোক তোমার ছবি দেখবে, কত নাম হবে। ইউ আর এ ফুল। আমি বললাম, তা হোক আমি এক পাইও দর কমাবো না, ছবিও বিক্রী করবো না। আর একজন ইয়োরোপীয় বন্ধু ছিলেন, তিনি কিন্তু বললেন, ইউ হ্যাভ ডন্ রাইট্—ঠিক করেছো। তাঁর এই কথার পেছনে একটি বড় সত্য ছিল, কারণ আমার এই বন্ধুটিও আর্টিষ্ট।

এই কথা বলে, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নির্ব্বাপিত সিগারটি আবার ধরালেন। বল্লেন, দেখো আমার আর এক বন্ধু এটি দিয়েছেন, রিয়েল ম্যানিলা সিগার, এখন আর পাওয়া যায় না।

স্বামিজী বললেন, হ্যাঁ আমিও জানতুম আপনি সিগার ভালোবাসেন কিন্তু আসবার সময় আমাদের মনে ছিল না। তা হলে আমরাও নিয়ে আসতুম!

অবনীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন, তার পর কি হোলো জানো? সব ছবিগুলো বন্ধুদের দিয়ে দিলাম।

দিয়ে দিলেন? আমি বলে উঠলাম।

হ্যাঁ দিয়ে দিলাম। এমনি অনেক ছবি আমার বন্ধুদের কাছে আছে। কখনও পয়সার জন্য চেষ্টা করিনি। ভারী ত একটু খানি কাগজ ও ক' পয়সার রং, তার আবার দাম!

কোথায় যেন একটু ব্যথার সুর.....

সিগারটা দু একবার টেনে বলতে লাগলেন, তাই নন্দলালকে বলেছিলাম, যা, পোটো হোগে যা,



কালীঘাটে বিক্রী করে' দুচার খানা যা' হয় দিন চলে যাবে। আমার ছাত্রদের মধ্যে নন্দলাল সত্যি সত্যিই কালীঘাটে রাস্তায় বসে' পট বিক্রী করেছে, দু চার আনা পেয়েওছে। আমি তখন ওকে বললাম আমার কাছে পট গুলো দিয়ে যা' আমি সংগ্রহ করবো।

দু-এক মিনিট স্থির থেকে বলতে লাগলেন, আমার সেই 'নালক' বইখানার গল্প শুনেত চাইছিলে, না?

—শোনো। তখন যুদ্ধ বেধেছে। এই যুদ্ধ। পোল্যাণ্ড থেকে হাজার হাজার লোক পালাচ্ছে। প্রায় দুই হাজার ছাত্রের সঙ্গে আমার এক বন্ধু—সেখানকার টীচার—তাঁকেও পালাতে হল। সঙ্গে কিছুই নিতে পারলেন না; কেবল নিলেন আমার 'নালক' ও 'ক্ষীরের পুতুল' বই দুখানা। ঐ বই দুখানা তখন ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হয়ে গিয়েছে কি না। সুদীর্ঘ পথ যেতে হবে, খিদে আছে তেস্টা আছে,' তারই মধ্যে মাঝে মাঝে থেমে ছেলেদের জড়ো করে 'নালক' থেকে তাদের গল্প বলতেন, ছেলেরা গোল হয়ে শুনতো, তাদের পথশ্রম লঘু হোতো। বুঝলে? এই হচ্ছে আর্টিষ্টদের পুরস্কার, মানুষকে আনন্দ দিতে পারা। তাদের দু-এক টাকার জন্য ছবি বিক্রী করতে হয় একথা ভাবলে দুঃখ হয়। এ-যেন খেতে না পেয়ে ছেলে বিক্রী করার মত। তবুও খেতে হবে ত!

বল্লেন, আমাকেও যে রোজগার করতে হয় নি তা নয়! পাঁচশ' টাকা মাইনে পেয়েছি আর্ট স্কুলে। কিন্তু হ্যাভেল সাহেব যখন আমাকে বলেছিলেন তোমার কত টাকা মাইনে চাই, গবর্ণমেণ্টকে লিখতে হবে, অনায়াসেই বলতে পারতুম, এবং হ্যাভেলসাহেব বললে তা' হোতো। কিন্তু তাঁকে বল্লাম, আপনার বিবেচনায় যা হয় তাই হবে, ছাত্র পড়াতে হবে, ও নিয়ে দরদস্তুর করতে পারবো না। কখনও টাকা পয়সা হোক এ কথা ভাবিনি। যশ যে হয় নি তা' নয়।

তারপরই হেসে বল্লেন, দেখলে তো, এতক্ষণ ধরে' নিজের পুণ্যগান নিজেই করছি। রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প জানো ত? পুণ্যবান্ রাজা, স্বর্গে যাবেন। স্বর্গের দেবতারা ত ব্যতিব্যস্ত। কারণ হরিশ্চন্দ্রের 'গণ' ও সঙ্গে যাবে—রাজ্যের যত ইতর প্রাণী, ডোম, চণ্ডাল, এমন কি মুরগী, শূয়ার পর্য্যন্ত। স্বর্গরাজ্যে শূয়ার ঘুরে বেড়াবে, বংশবৃদ্ধি করবে, দেবতারা কেমন করে সহ্য করেন! নারদ তখন বল্লেন, ভয় নেই। হরিশ্চন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন, 'কে হে তুমি? কোন পুণ্যবলে এই পাল নিয়ে স্বর্গে আসতে চাইছ?' হরিশ্চন্দ্র তখন চটে গিয়ে বলতে লাগলেন, আমি অমুক করেছি, তমুক করেছি, অর্থাৎ আত্মস্তুতি আরম্ভ করলেন। এবং যত বলেন, তাঁর রথও তত পিছিয়ে আসতে থাকে। রথ যখন প্রায় মাটি ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা তখন জ্ঞান হোলো। বুঝতে পারলেন, আত্মস্তুতি একটা পাপ। তখন হরিশ্চন্দ্র ক্ষমা চাইলেন। ক্ষমা করা হোলো কিন্তু স্বর্গে যেতে পেলেন না। যতদূর এসে থেমেছিলেন সেইখানেই তাঁর এবং তাঁর দলবলের আস্তানা হোলো। কিন্তু সেখানে খাবেন কি? সে তো ধূ ধূ করছে জায়গা! তখন ব্যবস্থা হোলো যে পৃথিবীর লোকদের খাবার পর যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকবে সেইটুকুই তাঁরা খেতে পারবেন। এর একটা উদ্দেশ্য এই যে উদ্বৃত্ত অন্ন অপচয় না করে গরীব দুঃখীদের দান করা উচিত।

স্বামিজীকে বললেন, তুমি তোমার ছেলেদের এই গল্পটা বোলো, বুঝলে?

তোমরা হয় ত অনেকে জানো না যে আজকাল অবনীন্দ্রনাথ নানারকম গাছের ডাল, গুঁড়ি, কঞ্চি, ডাবের শীষ ইত্যাদি নিয়ে নানারকম অদ্ভুত পুতুল তৈরী করছেন। অদ্ভুত সে সব সৃষ্টি! সে সব সৃষ্টি বেশীর

ভাগই প্রকৃতির নিজের কারুকার্য্য, কিন্তু শিল্পীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাদের আবিষ্কার করেছে, আর তাঁর নিপুণ হাতে তিনি সেগুলি সাজিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ওরা আমার 'কুটুম কাটাম', পুতুল নয়। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে, ওদের আমি সাজাই, যত্ন করি, তাই ওদের আমি কাউকে দিতে পারি না!

কেবল শ্রীমান অলক এবার তার ব্যতিক্রম ঘটালো। বুড়ো শিল্পীকে প্রণাম করে' সে দিল তাঁর হাতে পুরি থেকে তার সংগ্রহ করা এক তাড়া ঝিনুক ও গুপ্‌লি। বুড়ো শিল্পী, তাঁর মনের বয়স বোধ করি অলকেরই মত, ভারি খুসী, বল্লেন, তা হলে ত তোমাকেও আমার একটি কুটুমকে দিতে হয়।

এই বলে বৃদ্ধ এই আট বছরের বালককে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে তাঁর সব কুটুমদের দেখাতে লাগলেন। এই সুবিধায় আমাদেরও পরিচয় হোলো এই যশমান্য প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর নূতন সৃষ্টির সঙ্গে। শুকপাখী, গঙ্গাফড়িং বেরাল, হংসযাত্রী, ইত্যাদি নানা প্রকারের অদ্ভুত সৃষ্টি গুপ্তনিবাসের ঘরে ঘরে এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার নীরব সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারই মধ্য থেকে একটি শ্রীমান্ অলকের করতলগত হোলো। তার এই বাল্যকালীন সৌভাগ্য যে উত্তরকালে একটি মহামূল্য সম্পদে দাঁড়াবে তার আর সন্দেহ কি!

এবারে উপরেই বসা হোলো। দোতলার প্রশস্ত বারান্দা। আব্বার হোলো, গল্প বলুন।

তথাস্তু।

ঠাকুর্দ্দার চারপাশে যেমন তাঁর নাতিনাতনীরা বসে তেমনি আমরা বারান্দায় মেঝের উপরই গোল হয়ে বসে পড়লাম।

তখনকার মত যেন আমরা সকলেই শিশু হয়ে গিয়েছি।

ঠাকুর্দ্দা শোনালেন আমাদের রূপকথা। হুশ্যাম্ যাদুকরের কথা। স্থানাভাব, তাই আর তার পুনরাবৃত্তি করলাম না। রূপ কথার পর শোনালেন তাঁরই লেখা একটি অপ্রকাশিত গল্প, কঞ্জুসবুড়োর গল্প। ইচ্ছা আছে একদিন সে গল্পটি তোমাদের পড়াবো। গল্পটি চমৎকার।

এদিকে বারোটা বাজে। আমাদের বারোটা-আটএ ফেরবার গাড়ি। উঠতে হোলো। আমাদের মধ্যে অনেকগুলি ছোটো ছোটো ছেলে ছিল। অলকের কথা ত বলেইছি। তা' ছাড়া ছিল অরুণ, সঞ্জিত, রঞ্জিত, রণজিত, জীবনকৃষ্ণ, সুনীল ইত্যাদি আরও অনেকে। সেই ভোরবেলা বেরিয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে, এরা যে এতক্ষণ এখানে আছে, নির্ব্বাক বিস্ময়ে, কোনোরূপ চাঞ্চল্য না দেখিয়ে, দেখতে পেলে যে কোনো হেডমাষ্টারমশাই ঈর্ষান্বিত হতেন। অটোগ্রাফ নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। শিল্পাচার্য্য রংমশালের গ্রাহক-গ্রাহিকাকে যে আশীর্ব্বাণী দিয়েছেন তা ত এ সংখ্যাতে ছাপাই হোলো।

ফোটোগ্রাফও তোলা হল। তারপরই ষ্টেশনে দৌড়লাম।

একটু পরেই কলকাতাগামী ট্রেণ এসে তার জঠরে আমাদের পুরে শিয়ালদায় এনে ফেললে।

নূতন একটা আনন্দে মন তখন ভরপুর।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি যে আসবার সময় টিকিটের ভাড়া ৯ পয়সা করেই লেগেছিল। স্বামিজীর মুখের ভাব ইচ্ছা করেই দেখিনি। এবারেও তিনি টিকিট করলেন কি না!

—শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

# ভগবানের চাবুক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

## পঞ্চম অধ্যায়

### মুকুট ও সিংহাসন

"মদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের সময় এসেছে! নৃত্যের ক্ষেত্র হচ্ছে রণক্ষেত্র; সঙ্গীত হচ্ছে অস্ত্রের ঝনৎকার আর যোদ্ধার জয়নাদ; এবং মদ্য হচ্ছে শত্রুর রক্ত!"—এই হ'ল তৈমুরের উক্তি।

কিন্তু এই অপূর্ব্ব 'মদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীত' উপভোগের শক্তি হ'ল না তৈমুরের। মহান খাঁ ইলিয়াজের সঙ্গে লড়াই করতে পারে, তাঁর অধীনে এমন সৈন্য আড়াই শতের বেশী নেই। অতএব তৈমুর অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করলেন না।

দিনের বেলায় যথাসময়ে নমাজ করা এবং মসজিদে গিয়ে কোরাণ-পাঠ শ্রবণ করা হ'ল তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য। রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে ব'সে থাকেন দাবার ছকের সামনে। প্রতিপক্ষ না থাকলেও একলাই ঘুঁটি সাজিয়ে খেলা করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দাবা-খেলোয়াড়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া যেত না।

তৈমুর একদিন একা-একা দাবা খেলছেন, এমন সময় সমরখন্দ থেকে একদল মোল্লা এসে হাজির।

—"খবর?"

—"বড় শুভ খবর! ভগবান তাঁর ভক্তদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন!"

—"তার মানে?"

—"অবিশ্বাসীদের হাতে সমরখন্দ এখনো আত্মসমর্পণ করে নি। যদিও আমীর হুসেন আর তৈমুরের সাহায্য পায় নি, তবু সমরখন্দের যোদ্ধারা শত্রুদের বাধা দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে এসেছে। আজ চেষ্টার ফল ফলেছে?"

—"যুদ্ধে জয় হয়েছে?"

—"বিনা যুদ্ধে জয় হয়েছে! ভগবানের প্রেরিত কি এক মহামারীর কবলে প'ড়ে জাট-মোগলদের অধিকাংশ ঘোড়া মারা গিয়েছে!"

তৈমুরের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি জানতেন, ঘোড়া হারালে জাট-মোগলদের আর কোন জারিজুরিই থাকে না—এমন কি তারা যুদ্ধ করবার সমস্ত শক্তিই হারিয়ে ফেলে।

মোল্লারা সানন্দে জানালেন, "জাট-মোগলরা অস্ত্রশস্ত্র কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে এর আগে কেউ কোন জাট সৈনিকদের পায়ে হেঁটে চলতে দেখে নি। তাতার অশ্বারোহীরা সুযোগ পেয়ে শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে!"

তৈমুর বুঝলেন, আবার তাঁর আলস্যের দিন হ'ল গত। এসেছে তাঁর অপূর্ব্ব 'মদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীত' উপভোগের সময়।

খবর পেয়ে আমীর হুসেনও সমরখন্দে ছুটে এলেন। সমরখন্দের উপরে তাঁর দাবি সর্ব্বাগ্রে। তিনি এখানকার ভূতপূর্ব্ব আমীরের নাতি। সমরখন্দের বাসিন্দারা মহোৎসবের ভিতর দিয়ে সাদরে তাঁকে গ্রহণ করলে। খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে তৈমুর ছিলেন হুসেনের সমযোগ্য, কিন্তু তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নি, তাঁকে তুষ্ট রাখবার জন্যে হুসেন তাঁকে সবুজ সহর ও তার আশ পাশের অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিলেন।

চল্‌তি নিয়ম অনুসারে জেঙ্গীজ্‌ খাঁয়ের এক বংশধরকে সিংহাসনে বসিয়ে হুসেন তাঁর নামেই রাজ্য চালাতে লাগলেন।

তৈমুর মুখে কোন প্রতিবাদ করলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে জানতেন, হুসেনের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব বজায় থাকা অসম্ভব। হুসেন তাঁর শ্যালক হ'লেও আলজাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক চুকে গিয়েছে। হুসেন তাঁকে ছোট-নজরে দেখেন, বহুবার তাঁকে অপমান বা অবহেলা করেছেন, বিপদে ফেলেছেন। তারপর হুসেনের জন্যে তাঁর শেষ-পরাজয়ের জ্বালা কখনো তিনি ভুলতে পারিবেন না।

এক আকাশে হাজার হাজার ছোট তারা থাকতে পারে, কিন্তু কে কবে শুনেছে দুর সূর্য্যের কথা?

কিছুদিন পরেই ছোট-বড় এটা-ওটা-সেটা নিয়ে মনান্তর আর মতান্তর হ'তে লাগল। দুজনেই যেখানে প্রভু হ'তে চায়, সেখানে গৃহ কলহ বাধতে কতক্ষণ?

কি নিয়ে যে আসল ঝগড়া বাধল, ইতিহাসে তা লেখা নেই। কিন্তু আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ। কেউ নিলে হুসেনের পক্ষ, কেউ নিলে তৈমুরের পক্ষ এবং দুই পক্ষেই রক্ত পিপাসা সমান প্রবল! দেশ জুড়ে জেগে উঠল অস্ত্র ঝঞ্ঝনা এবং তারই মাঝে মাঝে হঠাৎ জাট-মোগলরা আবির্ভূত হয়ে দুই পক্ষেরই উপরে দুরন্ত ঈগলের মতন ছোঁ মেরে চ'লে যায়! এই ভাবে কেটে গেল দীর্ঘ ছয় বৎসর!

বলা বাহুল্য, প্রথম-প্রথম তৈমুরের চেয়ে হুসেনের পক্ষই ছিল সমধিক প্রবল। কিন্তু বীরত্বে, সাহসিকতায়, বুদ্ধি চাতুর্য্যে ও যুদ্ধ কৌশলে তৈমুরের সঙ্গে যে হুসেনের তুলনাই হয় না, তার প্রমাণ এর আগেও পাওয়া গিয়েছে বারংবার। দেখতে দেখতে তৈমুর কেবল



দলে ভারিই হয়ে উঠলেন না, যুদ্ধের পরে যুদ্ধ জয় ও কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে লাগলেন। এ-সব ছোট ছোট যুদ্ধের আলাদা আলাদা বর্ণনা দেবার দরকার নেই।

হুসেনের ব্যবহারও ভদ্র ও মিষ্ট ছিল না। সে জন্যেও অনেক সর্দ্দার তাঁর পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

একদিন তৈমুর সদলবলে উপবিষ্ট। হঠাৎ একটি মানুষ নিতান্ত ঘরের লোকের মতন সভায় এসে, অন্যান্য সভাসদদের মাঝখানে গিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে ব'সে পড়লেন।

সবাই সবিস্ময়ে চিনলে তিনি হচ্ছেন হুসেনের দলের এক মস্তবড় মাতব্বর ও মাথাওলা লোক, তাঁর নাম সর্দ্দার মঙ্গলা বোগা, জাতে মোগল। তৈমুরের এক প্রধান শত্রু! তৈমুর কিন্তু ব্যাপারটা বুঝলেন। কোনরকম বিস্ময়- প্রকাশ না করে মঙ্গলীর দিকে দিলেন খাবারের থালা এগিয়ে।

খাবার খেয়ে মঙ্গলী বললেন, "আজ আমি আমীর তৈমুরের নূণ খেলুম। আজ থেকে আমি আর কারুর দিকে ফিরে তাকাব না।"

কিছুকাল পরে এই সর্দ্দার মঙ্গলী বুদ্ধির জোরে তৈমুরকে একটি যুদ্ধে জয়ী করেছিলেন।

তৈমুরের তাতারীদের সঙ্গে কারা য়ুসুফ নামে এত তুর্কী সর্দ্দারের সৈন্যদের বিষম লড়াই বেধেছিল। তুর্কীরা এমন ভাবে তাতারীদের ঘিরে ফেলেছিল যে, তৈমুরের জয়লাভ করবার কোন সম্ভাবনাই আর দেখা গেল না।

হঠাৎ মঙ্গলী করলেন কি, মাটির দিকে হেঁট হয়ে প'ড়ে এক মৃত তুর্কীর দেহ থেকে তার দাড়ী গোঁফওয়ালা মাথা কামানো মুণ্ডটা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের বর্ষা দণ্ডের আগায় বসিয়ে দিলেন।

তারপর শূন্যে বর্ষাদণ্ড নাচাতে নাচাতে তাতারীদের দলে ঢুকে বিকট চীৎকার করে বললেন, "জয়, জয়! দেখ—দেখ, আমি কারা য়ুসুফকে বধ করেছি! এই দেখ তার মুণ্ড!"

তাতারীরা বিপুল আনন্দে যেন ক্ষেপে উঠে দ্বিগুণ উৎসাহ লড়তে লাগল এবং সেনাপতির মৃত্যু সংবাদ শুনে তুর্কীরা হতাশ হয়ে বেগে পালাতে আরম্ভ করলে। তারা এমন অন্ধের মতন পালাতে লাগল যে, তাদের দেহের ঠেলার চোটে অত্যন্ত জীবন্ত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করা য়ুসুফকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে পলায়ন করতে হল!

ছয় বছর পরে দেখা গেল, তৈমুরের দল যেমন ভারি, হুসেনের দল তেমনি হাল্‌কা। হুসেন শেষ যুদ্ধ দিলেন ইতিহাসখ্যাত বাল্ক সহরে। সেখানেও বিজয়লক্ষ্মী হলেন তাঁর প্রতি

বিমুখ। তৈমুরের কাছে হুসেন তখন আর্জ্জি জানালেন, "আমি পরাজয় স্বীকার ও রাজ্য-ত্যাগ করছি। তুমি আমাকে মক্কায় যেতে অনুমতি দাও।" তৈমুর নারাজ হলেন না।

তারপর কি হল সঠিক জানা যায় নি। তবে শোনা যায়, তৈমুরের দুইজন সেনানী প্রভুর মতামতের অপেক্ষা না রেখেই গোপনে হুসেনকে হত্যা করে। খুব সম্ভব, তৈমুর ব্যাপারটা আগেই জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টা করেন নি।

তৈমুর বাল্ক্ সহর ত্যাগ করলেন না—স্থির করলেন, এই সহরে বসেই তিনি দূর করবেন ভবিষ্যতের সমস্ত অনিশ্চয়তা। তাঁর একমাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দী পরলোকে, নিজেকে জাহির করবার এত বড় সুযোগ ত্যাগ করা হচ্ছে মূর্খতা। তিনি বুঝেছিলেন, হুসেনের অবর্ত্তমানে তাতার সর্দ্দাররা একত্র সমবেত হয়ে নূতন এক আমীর নির্ব্বাচন করতে আসবেন।

বাল্ক্ হচ্ছে আফগানিস্থানের অতি পুরাতন সহর। ইতিহাস পূর্ব্ব যুগে এই নগরে পারসী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জোরোয়াস্তরের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছিল। এক সময়ে এখানে যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল, একটি বুদ্ধমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সে প্রমাণ দেয়। গ্রীকদের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যাক্ট্রিয়ার রাজধানী হয়ে এই নগর বাবিলনের মতন সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। আলেক-জাণ্ডার দি গ্রেট খৃঃ পূর্ব্ব ৩২৮ অব্দে এই নগর আক্রমণ ও অধিকার করেছিলেন। ১২২০ খৃষ্টাব্দে মোগল দিগ্বিজয়ী জেঙ্গীজ্ খাঁর হস্তে বাল্ক্ পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে। তারপর তৈমুর আবার একে গড়ে তোলেন। লোকে একে ডাকে 'নগরমাতা' ব'লে।

চারিদিক থেকে বাল্ক্ সহরে এসে জড়ো হলেন দলে দলে তাতার সর্দ্দার। মস্ত সভা বসল। চলল তর্কাতর্কি। তৈমুর কিন্তু সভায় যোগ না দিয়ে তফাতে ব'সে দেখতে লাগলেন, বাতাসের গতি কোন্‌দিকে!

এই কিছুকাল আগে তৈমুর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন নিরাশ্রয় ভবঘুরের মত। তিনি বড় বংশের ছেলে হলেও তাঁর দেহে নেই রাজরক্ত। কাজেই তাঁর প্রতিপক্ষের অভাব হল না।

তৈমুরের দলভুক্ত সর্দ্দাররা বললেন, রাজ্যকে সুশাসিত করতে হলে একজন যোগ্যতম প্রধান ব্যক্তির দরকার। তৈমুরের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কেউ নেই।

আর একদল বললেন, প্রচলিত বিধি অনুসারে কোন তাতারই মুকুট ধারণ করতে পারবে না। সিংহাসনে বসাতে হবে জেঙ্গীজ খাঁয়ের কোন বংশধরকে।

মোল্লারা বললেন, মোগলরা হচ্ছে অবিশ্বাসী—ইসলামের বিরোধী। পুরণো নিয়ম চুলোয় যাক্—তৈমুর হচ্ছেন মুসলমান, তিনি বিধর্ম্মীর অধীন হতে যাবেন কেন? জেঙ্গীজ্ খাঁয়ের তরবারির চেয়ে তৈমুরের তরবারি ছোট নয়!

তৈমুরের দলই জয়ী হলেন। আজ থেকে তিনি হলেন স্বাধীন নৃপতি। ভারতবর্ষ থেকে অ্যারাল সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিশাল রাজ্য হল তাঁর হস্তগত।

তৈমুরের দৃষ্টি ফিরতে লাগল পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তরে দক্ষিণে! এইবার আরম্ভ হবে তাঁর দিগ্বিজয়ী জীবন!

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী

**আমার ছোট বোনেরা—**

চীনের মেয়েরা জেগেছে, জেগেছে রাশিয়ার মেয়েরা, আজ হাতিয়ার নিয়ে তারা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখী হয়েছে। অন্তরে তাদের জয়ের বাসনা, 'জীবন কিম্বা মৃত্যু অধীনতা নয়'—তাদের মূলমন্ত্র। ইংলণ্ড, আমেরিকার মেয়েরাও পেছিয়ে নেই। অন্তঃপুরে যারা ছিল বন্দিনী, বাস্তবের সমস্ত কঠোরতার ঊর্দ্ধে ছিল যারা—তারাই দেশের এই দুঃসহ দিনে বেরিয়ে এলো শত্রু নিধনের মহামন্ত্র নিয়ে। দেশ, জাতি ও সভ্যতার শত্রু যারা তাদের নিধন-যজ্ঞে মেয়েরা দিলো আহুতি, শত্রু নিধনে পাঠাল স্বামীকে, ভাইকে, পুত্রকে, প্রিয়জনকে। মরণের মুখে প্রিয়জনদের হাসিমুখে পাঠানো যে কত বড় কাজ, কত বড় ত্যাগ, তা নারীই জানে। পুরুষের কাজ তুলে নিলো তারা, তুলে নিলো কলকারখানার কঠিনতম কাজ, তুলে নিলো দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার দায়িত্ব।

আজকের ইতিহাসে মেয়েদের এই নব জাগরণ দেখি। দেখি প্রয়োজন বোধে কোমলা নারীও ভীষণা হতে পারে—প্রিয়জনকে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে নারী অশ্রু বিসর্জ্জন করে না বরং নিজহাতে বেশভূষা পরিয়ে দেয়। এই দৃশ্য দেখেছি রাজপুতানায়, দেখেছি মেবারে। আজকের এই দুঃসহ দিনে মেয়েদের যে কোমল কঠোর মূর্ত্তি দেখছি, এই সংহার মূর্ত্তি দেখেছি রাজপুতানায় বীর রমণীদের মুখে। আজ চীনের মেয়েদের, রাশিয়ার মেয়েদের দেখি হাতিয়ার হাতে শত্রু নিধনে চলেছে—চোখে তাদের ঘৃণা ও প্রতিশোধের তীব্রতা, অন্তরে তাদের বজ্রবাণী, 'জীবন কিম্বা মৃত্যু, অধীনতা নয়।' তাদের এই বীরদর্পে চলার ভঙ্গীতে, শত্রু নিধন বাসনার ভিতর দেখি অতীত ভারতের একটি মেয়ের ছায়া, একটি মেয়ের ছবি।

এসো, অতীতের যবনিকা সরিয়ে ফিরে যাই সেই দিনে।

সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিন। শালিবাহন তখন রোটা ও মহোবার রাজা—এই শালিবাহনের কন্যা দুর্গাবতী যাঁকে দেখতে আমরা

ফিরে এসেছি অতীতে। অসামান্য সুন্দরী সে। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যই তার সব নয়, নারী হয়ে পুরুষের সমস্ত বিদ্যাকে সে আয়ত্ত করেছে। যুদ্ধ বিদ্যায়, অস্ত্রশস্ত্র চালনায়, মৃগয়ায় তার জোড়া মেলা ভার। শালিবাহন ভাবেন এমন স্বর্ণময়ী প্রতিমাকে কার হাতে সমর্পণ করবেন।

বিজন অরণ্যে ফুল ফুটলে বাতাস সে ফুলের সুবাস বুকে করে চারিদিকে নিয়ে যায়। গড়মণ্ডলের বীর রাজা দলপতি সাহের কাছে দুর্গাবতীর অসীম খ্যাতির কথা পৌঁছেছিল। তিনি দুর্গাবতীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শালিবাহন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ দলপতি সাহ ছিলেন শালিবাহনের চেয়ে নীচবংশ।

কিন্তু বংশ মর্য্যাদার হার মানলো শেষ পর্য্যন্ত—দলপতি সাহ ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন তিনি ক্ষত্রিয়, শালিবাহনের কন্যা দুর্গাবতীকে তিনি জয় করে আনবেন। দুর্গাবতীর অন্তরে জাগলো আনন্দ—এই রকম বীর স্বামীই তাঁর কাম্য ছিল। শক্তির কাছে, বীরত্বের কাছে বংশ গৌরব হার মানলো।

কিন্তু এ আনন্দের আলোর পরই ছিল গভীর অন্ধকার। খুব অল্প দিনের মধ্যেই দলপতি সাহ পরলোক গমন করলেন। দুর্গাবতীর ওপর রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ভার পড়লো। একটি অল্পবয়স্কা, স্বামীহীনা মেয়েকে গড়মণ্ডলের সিংহাসনে বসতে দেখে আশে পাশের রাজাদের গড়মণ্ডল আত্মসাৎ করবার প্রতিযোগিতা পড়ে গেল। কিন্তু রাণী দুর্গাবতীর বীরত্বের কাছে তাদের লোভ লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরালো। গড়মণ্ডলের পাশের রাজ্যটির নাম পান্নারাজ্য। আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ সে রাজ্য জয় করে তা শাসন করতেন। গড়মণ্ডলের প্রতি তাঁরও দৃষ্টি পড়লো—গুপ্তচর পাঠিয়ে গড়মণ্ডলের সমস্ত তথ্য, পথঘাট তিনি জেনে নিলেন। গড়মণ্ডলের আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগলো। গড়মণ্ডল শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা কথা দিল্লীশ্বরের কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন এবং সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আসফ খাঁর অনুরোধে আকবর সৈন্য পাঠালেন।

রাণী দুর্গাবতীর কানে এ সংবাদ পৌঁছল। কুমারী জীবনের অধীত বিদ্যা, জ্ঞান, শিক্ষা কাজে লাগাবার সুযোগ তাঁর জীবনে দেখা দিল। তিনি নিজে সেনাপতি হয়ে আসফ খাঁর অগণিত সৈন্যের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাতে মুক্ত তরবারী, মুখে বজ্রমন্ত্র—'জীবন কিম্বা মৃত্যু কিন্তু অধীনতা নয়।'—যে মন্ত্র শুনি আজ চীন, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মেয়েদের মুখে।

পুরুষের পরাজয় ঘটলো নারীর কাছে।

একটি পতিহীনা, অল্প বয়স্কা নারীর কাছে তাঁর সেনাপতি ও সেনাদলের পরাজয় সংবাদ দিল্লীশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছল। দুর্গাবতীর অসামান্য বীরত্বের কাহিনী শুনে আকবর স্তম্ভিত হলেন—আর পরাজিত আসফ খাঁর পৌরুষে লাগলো আঘাত।



এই পরাজয়ের লজ্জা ও গ্লানি মুছে ফেলার জন্য আসফ খাঁ আবার আকবরের কাছে দরবার করলেন সৈন্যের জন্য। এবার চতুর্গুণ সুশিক্ষিত সৈন্য তিনি লাভ করলেন।

দুর্গাবতীও এলেন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে, সঙ্গে তাঁর কিশোর কুমার বীর নারায়ণ। তাঁরও কিশোর কোমল হাতে শত্রু নিধনের তরবারী, তরবারীর তীক্ষ্ণতা তাঁর কিশোর আননে।

বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলতে লাগলো। সংখ্যায় ও শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যের বিরুদ্ধে সংখ্যাল্প সৈন্য নিয়ে অসীম সাহসে তাঁরা যুদ্ধ করতে লাগলেন।

রাণী দুর্গাবতী পণ করলেন গড়মণ্ডলে একটি প্রাণী জীবিত থাকতে মোগল যেন গড়মণ্ডলে প্রবেশ করতে না পারে।

এই বজ্রবাণী আজ রাশিয়ার ষ্টালিনের মুখে—"We would fight to the last man".

যুদ্ধের মাঝখানে কিশোরকুমার বাণ বিদ্ধ হয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। দুর্গাবতী তাঁর কুমারকে সেইখানেই রেখে আরো ভীষণা মূর্ত্তিতে শত্রু নিধন করতে লাগলেন। অশ্রু মোচন করবার অবসর নেই। পুত্রের চেয়ে বৃহত্তর কর্ত্তব্য সামনে। সহসা একটি বাণ এসে তাঁর গলায় বিদ্ধ হলো। বাণ দিয়ে সে বাণ উপড়ে ফেলে তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি—রক্তে লাল হয়ে গেছে দেহ, পুত্রহারা, স্বামীহারা রাণী দুর্গাবতী ক্রমশঃ মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে এলেন। ক্রমশঃ শরীর অবসন্ন হয়ে এলো। মন্ত্রী অধরকে পাশে ডেকে তাঁর হাতে তরবারী দিয়ে বল্লেন: "মোগলরা আমার রাজ্যে প্রবেশ করবার আগে আমায় শাস্তি ও স্বস্তি দিন। শত্রু আমাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে না পায়। মন্ত্রী অধর ইতঃস্ততঃ করছেন দেখে দুর্গাবতী স্বহস্তে নিজমুণ্ড ছেদন করলেন।

'জীবন কিম্বা মৃত্যু অধীনতা নয়'—আজকের দিনে শত্রু নিধনে প্রতিটি দেশের প্রতিটি নারীর মনে এই মন্ত্র বজ্রের মত দৃঢ়তর হোক্—॥

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে ১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাকটার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান।

## ব্যর্থ-শরৎ

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা

শরৎ এসেছে ধরণীর পরে
একটি বছর পরে
হেসে গিয়েছিল, এল ফিরে আজ
জল নিয়ে আঁখি ভ'রে।
কোথায় তাহার বন্দনা-গীতি
কোথা সে ললিত-ছন্দ
আজ শরতের আগমনী গান
ভাষাহীন নিরানন্দ!
শ্যামল সজ্জা সুনিপুণ করে
কে পরাবে তার অঙ্গে,
কার বীণাতানে বিশ্ব জানিবে
শরৎ এসেছে বঙ্গে।
নদী জলভার পারেনা বহিতে
কোথায় পড়িল ধরা?
ধান্যের-মাঠে এত অপরূপ
আগে কি জানিত ধরা?
দোয়েল কোয়েল মৌন আজিকে
কার ইঙ্গিত পেয়ে,
শরতের বন সভাতে সকলে
উঠিবে হর্ষে গেয়ে?
বরষের পরে আসে নবান্ন
কত আনন্দে নেয়ে
সে কথা জগতে এতদিন কেহ
শুনায়নি গান গেয়ে।
নতুন ধানের গন্ধ বহিয়া
পবন উতল নয়
জলহারা মেঘ শুভ্র-নবনী
ভ্রমে না গগনময়।
শির্শির ছিটায়ে তপ্ত ধরণী
যে করেছে সুশীতল
সে আজিকে নাই তাই বুঝি হায়,
তপ্ত এ ধরাতল।
শীতের আভাসে আম্‌লকী বনে
কার হিয়া দুরু দুরু
পাতা খসাবার সময় বুঝিয়া
উতলা কানন তরু।
যৌবন তার ফুটিয়া উঠিতে
আর কত দেরি আছে
মধুকর খোঁজ করিতে যায় না
মালতী ফুলের কাছে।
ব্যর্থ-শরৎ ভগ্ন হৃদয়
ব্যর্থ এ অভিযান
সে মধুকণ্ঠ মৌন আজিকে
চির তরে অবসান॥

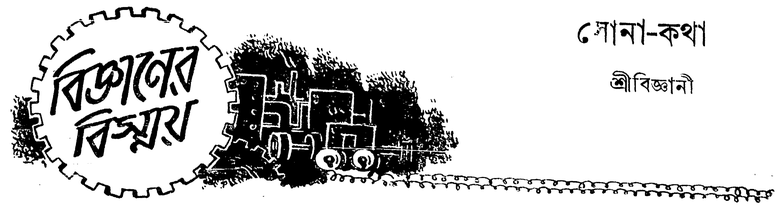


## সোনা-কথা

শ্রীবিজ্ঞানী

পৃথিবীতে কত রকমের ধাতু আছে। কিন্তু সোনাই সব প্রথম মানুষের নজরে আসে। সে আজ কত হাজার আগে ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। এত রকম ধাতু থাকতেও সোনা যে কেন মানুষের প্রথম নজর পেল তার কারণ সুস্পষ্ট; রূপে গুণে সোনা অতুলনীয়।

সোনার আবিষ্কার যে বহুকালের তাতেও কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর বহু প্রাচীন সভ্যতায় সোনার কাজ দেখতে পাওয়া যায়। মিশরীয়, মিনোয়ান, এসিরিয়ান্ ইট্রস্কান্ প্রভৃতি অতি প্রাচীন সভ্যতায় সোনার নানা বিচিত্র জিনিষপত্র, যেমন গহনাগাঠি, মুদ্রা, খোদাই করা সোনার প্রতিলিপি প্রভৃতি আরো কত কি পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষেও, যেমন মোহেন-জো-দড়োতে সোনার বিচিত্র নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

রূপে গুণে সোনার খুব দাম আছে কিন্তু সোনা দুর্লভ নয়। দুর্লভ নয় বলেই এ এতো রকম কাজে লাগছে। প্রকৃতির নানা জায়গায় নানা অবস্থায় সোনার দেখা মেলে। সোনার অস্তিত্ব প্রায় সব রকম পাথরেই আছে। একেবারে খাঁটি সোনা অবশ্য কম, প্রাকৃতিক সোনায় কিছু রূপো মিশ্রিত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রূপো ছাড়াও, অল্প বা অধিক পরিমাণে অন্য ধাতুও সোনার সঙ্গে মিশে থাকে- যেমন লোহা, তামা, পারা, টেলুরিয়াম ইত্যাদি। প্রাকৃতিক সোনা-রূপো মিশ্র ধাতুকে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ electrum বলতেন -এর রং হল্‌দে থেকে সাদা হতে পারে।

সাধারণতঃ প্রকৃতিতে দু'রকম অবস্থায় সোনা পাওয়া যায়। মাটির নীচে পাথরের গভীর খাঁজে বা শিরায় এবং নদীর বালুর মধ্যে। প্রথমটিকে বলে reef gold আর দ্বিতীয়টি alluvial gold। 'সিষ্ট্' বা 'শ্লেট্' জাতীয় শিলার গভীর খাঁজে সোনার আকরের সন্ধান মেলে। এর কাছাকাছি আগ্নেয় পাথর থাকে। যে অঞ্চলে পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় সোনা মেলে সেখানে 'এ্যাণ্ডেসাইট্' নামে এক রকমের আগ্নেয় পাথর প্রায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় যে সোনা পাওয়া যায় অর্থাৎ যাকে alluvial gold বলা হয়, সেই সোনা পূর্ব্বে ভিন্ন অঞ্চলে হয়ত প্রথম অবস্থায় ছিল, পরে জলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে বালুতে মিশে রেণু বেণু

ভাবে এদের নদীর জলে পাওয়া যায়। যেমন সুবর্ণরেখায় আজও জল ছেঁকে, বালু চেলে সোনা শীকার করা হয়। আগে সুবর্ণরেখায় সোনা সংগ্রহ করে অনেকে বেশ অর্থ করেছে কিন্তু আজ কাল শুনতে পাওয়া যায়, ভাগ্যে যদি থাকে খুব জোর ।/০ সোনা মেলে। আমেরিকায় ( যেমন ক্যালিফরনিয়াতে ) অনেক নদনদীতে কিন্তু আজও সোনা বেশ ভাল রকম পাওয়া যায়।

এ দুই অবস্থা ছাড়া, সমুদ্র জলেও সোনা মেলে কিন্তু সামুদ্রিক সোনার ব্যবসা চালান লাভের নয়। কয়লা খনিতেও সোনা পাওয়া যায়, আমেরিকার ওয়োমিন্ অঞ্চলে ও জাপানে কয়লা খনিতে সোনা পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় উদ্ভিদ মাটির নীচে পচে স্তরীভূত হতে হতে যখন প্রস্তরীভূত হয় তখন তারভেতরে সোনা জন্মাতে পারে। হয়ত এমনও হতে পারে যে জীবন্ত উদ্ভিদ জগতেও সোণার কারবার আছে! উদ্ভিদের রসে বা রক্তে কি সোণার বীজ আছে!

সোনা তাহ'লে কোথায় নেই? অণু পরমাণু হয়ে তার অস্তিত্ব প্রায় সব রকম পাথরে আছে, মাটি বালুতে আছে, জলে আছে স্থলে আছে, ওপরে আছে নীচে আছে আবার উদ্ভিদ জগতে আছে। প্রকৃতির এ কি সুন্দর রহস্য লীলা!

সাধারণের কাঁচা সোনার রং হল্‌দে হয়। সোনার তালের রং গাঢ় হল্‌দে হয়। আলোতে লেবু বা লাল রংএর ঝিলিক মারে। রূপোর ভাগ বেশী থাকলে সবুজ আভা দেয়; তামা থাকলে বেশী লাল্‌চে হয়। নদীর জলে বা বালুর মধ্যে যে সোনার রেণু পাওয়া যায় তার রং বাদামী হয়, কখনও কখনও কালো বেগুনী, নীল ও গোলাপী রংএরও আভাষ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কষ্টি পাথরে ঘসে সোনার রং দেখে তার দাম কষা হয়।

সোনার মস্ত গুণ যার জন্য এর এত কদর, যে জলে ও হাওয়ায় ফেলে রাখলে এর কোন অনিষ্টই হয় না, কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। সোনা আগুনে পোড়ে না ( অবশ্য হাজার ডিগ্রীর ওপরের তাপে গলে যায়) য়্যাসিডে গলে না, কেবলমাত্র সেলেনিক্ য়্যাসিড ও এ্যাকোয়া রিজিয়াতে ( হাইড্রোক্লোরিক+নাইট্রিক য়্যাসিড ) সোনা গলে। আরো একটা মস্ত গুণ যে খাঁটি সোনা বেশ নরম, তাকে পিটিয়ে লম্বা ও পাতলা করা যায় ও সেই অবস্থায় এ অনেক উপকার করে। টীন্, দস্তা, এ্যলুমিনিয়ম্ প্ল্যাটিনাম্ প্রভৃতি ধাতুও পিটিয়ে সোনার মত পাতলা করা যায় না। ফিন্‌ফিনে কাগজ বা শিল্কের চেয়েও একে পাতলা করা যায়। শোনা যায় যে এক আউন্স সোনা থেকে ৭৪০ পাতার বই তৈরী করা হয়েছিল। আজকাল কোন্ দেশে নাকি সোনার পোষাকও তৈরী হচ্চে। এ তো গেল, সোনাকে কত পাতলা করা যায়। কিন্তু কত লম্বা করা যায় বলতে পারো? একবার একগ্রাম্ সোণাকে



পিটিয়ে দু মাইল লম্বা সোনার তার করা হয়েছিল! আমরা জানি যে সোনার কেবল গহনা হয়, বাসন-পত্র হয় বা মুদ্রা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সোনার গহনা পরেন না বা সোনার বাসনে ভাত খান না কিন্তু তাঁর কারখানায় সোণার নূতন নূতন রূপ সৃষ্টি হচ্চে। আজ ডাক্তার বা চিকিৎসক নানা দুরারোগ্য অসুখে সোনার ইনজেক্‌সন্ দিয়ে রুগীকে নিরাময় করছেন।

প্রাচীন সোনার খনির মধ্যে মিশরের নাম উল্লেখযোগ্য। রোমানরা ট্রানসিলভেনিয়া থেকে সোণার আমদানি করত। কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপ আমেরিকা থেকেই সোনার আমদানি সুরু করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফর্‌নিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া অঞ্চলের সোণা উত্তোলন ইতিহাসের বিষয় হয়ে আছে। সেই সময় ইউরোপ ও আমেরিকা সোণার নেশায় মেতে (Gold rush) উঠেছিল। সোনা অভিযানকারীদের সে দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসের অতি স্মরণীয় ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্লনডাইক ও আলাস্কা অল্পকালের জন্য হলেও বিশেষ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। আজকের সবচেয়ে বড় সোনার খনি ও এ পর্য্যন্ত সবচেয়ে বেশী সোনা পাওয়া গিয়েছে বোধ হয় ট্রান্‌স্‌ভাল্‌এ। পৃথিবীর অর্দ্ধেক সোনা এইখান থেকে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, ভারতবর্ষ, রোডেসিয়া, পশ্চিম-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে সোণা পাওয়া গিয়েছে ও এখনও আছে।

কিন্তু এ সব দেশেও সোণার খনি অফুরন্ত নয়, এরাও যে চিরকালই সোনার যোগান দিয়ে যেতে পারবে, তাও হয় না। অতি লোভের ফলে অনেক দেশে সোনার খনিতে আর সোনা নেই।

আজ নতুন সোনার খনি আবিষ্কারের সময় এসেছে। ভারতবর্ষে কোনও কোনও অনতিগম্য অঞ্চলে গুপ্ত সোনার খনি আছে বলে অনেকের বিশ্বাস। তবে ভারতে অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক ধনসম্পদ যে প্রচুর আছে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহল নিশ্চিত। এক সময় যে এ দেশে প্রচুর সোনা ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নইলে, রাজারা দেবদেবীর সোনার মূর্ত্তি, সোনার দেহসজ্জা, সোনার মুকুট, সোনার মন্দির, সোনার সিংহাসন, সোনার সিংহ দরজা, সোনার পালঙ, সোনার দানছত্র প্রভৃতি পরম ঔদার্য্যে কেমন করে তৈরী করতেন!

---

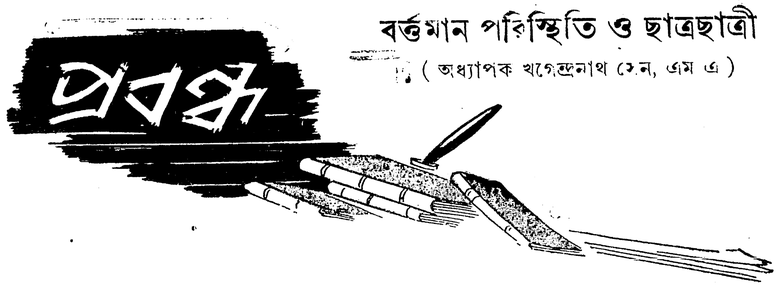


# বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও ছাত্রছাত্রী

( অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন, এম এ )

আজ দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ জেগে উঠেছে তার কালো ছায়া ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের মনকেও যে আলোড়িত করে তুলেছে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। সকলের কাছেই আজ প্রশ্ন জেগে উঠেছে, ভারতবর্ষের এই সঙ্কটময় অবস্থায় আমাদের কী কর্ত্তব্য। সকল দেশের মুক্তি সংগ্রামেই দেখা গিয়েছে যে সে দেশের কিশোর-কিশোরীরা, যুবক যুবতীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই সংগ্রামের অগ্নিশিখায়। আজও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়ে আমরা যেটুকু খবর পাচ্ছি তাতে মনে হয় ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে এই জাতীয় বিক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। তারাও আজ নিজেদের অন্তরে এই প্রশ্নই করছে যে দেশের এই অবস্থায় আজ তাদের কী ভূমিকা। যতদূর বোঝা যায়, তাদের শিক্ষায়তনগুলি পরিত্যাগ করে' বাইরে চলে আসাটাই তারা তাদের প্রথম কর্ত্তব্য বলে' স্থির করেছে। কিন্তু তাদের এই সিদ্ধান্ত কি ঠিক ?

'রংমশাল' রাজনৈতিক পত্রিকা নয়, তাই আমরা আমাদের ভাইবোনদের সর্ব্বপ্রকার দলাদলির বাইরে রেখেছি। সেইজন্যই আজ দেশজোড়া যে রাজনৈতিক বিক্ষোভের তরঙ্গ উঠেছে তার ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের মধ্যে আমরা যেতে চাই না। আমাদের শুধু দেখতে হবে, এই যে স্কুল কলেজ ছেড়ে বাইরে চলে আসা, অর্থাৎ শিক্ষার পথ প্রতিরোধ করা, কোনোরূপ স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হওয়া উচিত কি না। এই প্রশ্ন আমাদের স্বাভাবিক অধিকারগত প্রশ্ন।

প্রশ্নটি কঠিন। তবুও এর উত্তর চাই। কিন্তু উত্তর দেবার আগে একটা কথা বলে রাখি। যাঁরা শিক্ষায়তনগুলি বন্ধ রেখে বাইরে কাজ করার পক্ষপাতী, এবং তাদের বড়োরা যাঁরা এই নীতি সমর্থন করেন, তাঁরা যদি সকলেই বলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয় একটা গোলামখানা, এখানে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার সঙ্গে দেশের নাড়ীর কোনো সংযোগ নেই, অতএব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে শিক্ষায়তনগুলি আছে, ভেঙে দাও তাদের এবং গড়ো নূতন করে জাতীয় শিক্ষার মন্দির, আমি প্রার্থনা করবো তাঁদের এই সাধু প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক। কিন্তু আজ যারা স্কুল কলেজ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায়, তারা সকলেই যে এই মনোভাবে প্রণোদিত হয়ে কাজ করছে তা' নয়, বেশীর ভাগই একটা উদগ্র উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে, কিছু-একটা-করবার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তাদের যৌবনসুলভ আত্মত্যাগের অনুভূতির তৃপ্তিলাভের বাসনায়, জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে, ভালোমন্দ বিবেচনা না করেই, ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। আমি জানি তারা সকলেই তাদের শিক্ষায়তনগুলিকে ভালোবাসে, তবুও কর্ম্মীর অভাবে দেশের যেন কোনো অগৌরব না হয় এই ধারণায় হয়তো পরিচালিত হয়ে তারা তাদের শিক্ষালাভের কথা আজ আর যেন ভাবতে পারছে না।



তাদের এই আত্মত্যাগের মনোবৃত্তি যে দেশের কত বড়ো সম্পদ তা বলবার নয়। তাই আজ আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য যাতে এই অমূল্য সম্পদের অযথা অপচয় না হয়, কারণ তাতে জাতীয় শক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ছাত্রদের মধ্যে যারা চিন্তা করতে শিখেছে, দেশের ভালোমন্দ বিচার করার শক্তি যাদের হয়েছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি তাদের স্বদেশ-নিষ্ঠা দেশমাতৃকার পূজায় সার্থক হোক। এটা শুধু তাদের অন্তরের প্রেরণা নয়, একে প্রাণ দিয়েছে তাদের শিক্ষা ও বিচারশক্তি। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, বিশেষ করে' যারা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক বা তরুণ বয়স্কা, তাদের সকলেরই যে এই বিচারশক্তি—যা বহু তপস্যার ফলে অর্জ্জন করতে হয়—আছে বা থাকতে পারে, তা' ধরে' নেওয়া যায় না। আমি অনেক সময় দেখেছি যে ৭।৮ বছরের ছোট ছোট ছেলেরা স্কুল কলেজের ধর্ম্মঘটের দিন শোভাযাত্রায় বেরিয়েছে। তাদের বড়োদের শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে। দেখে মনে ব্যথা পেয়েছি। এতে শুধু যে তাদের শিক্ষার বাধা হচ্ছে তা নয়, দেশের যেটা তপস্যার ধন তাকে হাল্কা রকমের হাসি ঠাট্টার পর্য্যায়ে ফেলা হচ্ছে। জোর করে' তাদের শিক্ষা বন্ধ করাই কি দেশের কল্যাণের পথ ? আর যে সব দেশ আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে হাজার হাজার লোককে রণদেবতার যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছে তারাও কি তাদের শিক্ষায়তনগুলি বন্ধ রেখেছে ? অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে কি পড়াশুনা চলছে না ? চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি আজ দ্বার বন্ধ করে' বসে আছে—তাদের ছেলেমেয়েরা কি আজ সকলেই হাতিয়ার ধরেছে ?

এই যুদ্ধ কতকাল চলবে জানা নেই। তিন বছর হয়ে গেছে, চতুর্থ বছর চলছে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আশুসম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই দীর্ঘকাল আমাদের শিক্ষায়তনগুলি যদি নিস্পন্দ হয়ে থাকে, তা হলে' দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে কারা ? তখন দরকার হবে বৈজ্ঞানিকের, ইঞ্জিনিয়ারের, অর্থনীতিবিদ্‌কে, দরকার হবে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষিত লোকদের সাহায্য, অর্থাৎ আজ যারা স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করছে, তাদের। কিন্তু তারা যদি সকলেই আজ বিদ্যালয় ছেড়ে বাইরে চলে আসে, দেশের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের কাজে কোথায় পাবো সেই সব শিক্ষিত লোকদের ? তোমরা হয় তো বলবে আমাদের এই সব স্কুল কলেজ ছাড়া ত একটা অস্থায়ী, সাময়িক ব্যাপার ; বৃটিশ রাজ আমাদের দাবী পূরণ করলেই আমরা আবার স্কুল কলেজে ফিরে আসবো। এ কথার অর্থ হয় যে শিক্ষার মূল্য তোমরা অস্বীকার করো না ; এবং তা যদি সত্য হয় তা হলে বলবো আমার মূল বক্তব্যটাও তোমরা স্বীকার করে নিয়েছ। সেটা এই যে যার মূল্য আছে তাকে অস্থায়ীভাবেও বর্জ্জন করা চলে না। কারণ এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে স্থায়িত্ব বা অ-স্থায়িত্বের মাপকাটি কী ? যদি এক বছর ঘুমিয়ে জেগে ওঠো, দেখবে বিশ্বজগৎ কতদূর এগিয়ে গিয়েছে, আর তোমরা পড়ে আছো বহুদূরে। সেই চলে-যাওয়া বছরকে কি ফিরিয়ে আনতে পারবে ? তা' ছাড়া শিক্ষা একটা তপস্যা ; ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ। আজ ছ'মাস স্কুলে পড়লাম, তারপর তিনমাস ক্লাসে গেলাম না. আবার পাঁচ সপ্তাহ ক্লাস হোলো—এই মনোবৃত্তি নিয়ে দেবী সরস্বতীকে তুষ্ট করা যায় না। অস্থায়ীভাবে, হাল্কা মনোবৃত্তি নিয়ে, বিদ্যানুশীলন হয় না। যা' যায় তা আর ফেরানো যায় না, একেবারেই যায়।

তোমরা হয় তো বলবে, শিক্ষা মূল্যবান্ বটে, কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান্ স্বাধীনতার আদর্শ যে, আদর্শের সাধনায় আর সকল মূল্যবান্ বস্তুকে আহুতি দেওয়া যায়, এবং তাতে ব্যক্তিগত ক্ষতি হলেও জাতির লাভ।

খুব দামী কথা। কিন্তু তোমরা কি স্থির জেনেছো যে স্বাধীনতা সংগ্রামে কেবল হাতিয়ার হলেই

চলবে? সে হাতিয়ার তৈরী হয় কোথায়? কে সেই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনাকে রূপ দেয়? আধুনিক যুদ্ধের কতখানি গোড়াপত্তন হয় বৈজ্ঞানিকের ল্যাবোরেটরীতে তা' কি জানো না; জানো না কি উপযুক্ত মনোবৃত্তি থাকলে জাতীয় জাগরণে দেশীয় শিক্ষায়তনগুলির মত বহুমূল্য সম্পদ আর নেই? দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপারেও যে কতটা সহায়তা করে তার মূল্য নিরূপণ করা যায় না। বিপ্লবেরও একটা প্রস্তুতি কার্য্য আছে, তারও মূলে আছে একটা সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপদ্ধতি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ত কথাই নেই। নিরস্ত্র ভারতবর্ষে যাঁরা জাতীয় দাবীকে সার্থক করতে চান তাঁদের প্রত্যেকেরই কর্ম্মী, সাধক, হওয়া দরকার। তোমাদের জীবনে এখন এসেছে সেই সাধনার সময়। শিক্ষার ভিতর দিয়ে সেই সাধনা সার্থক হয়।

শুধু তাই নয়, আজ যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তাঁরাই হবেন নেতৃস্থানীয়, তাঁরাই তাদের বুঝিয়ে দেবেন তাদের পথ, ঠিক করে দেবেন তাদের কর্ম্মপদ্ধতি। কিন্তু যাঁরা নিজেরা সে শিক্ষা পান নি, যাঁদের শিক্ষার ও সাধনার অনেক বাকি, তাঁদের আহ্বান করলে নীতি শক্তিশালী হবে না, উপরন্তু শিক্ষার অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়ে' দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। বাতি জ্বাললে ঘর আলো হয় তাই বাতি আমাদের উপকারী, কিন্তু না জেনে যখন পতঙ্গপাল সেই বাতির আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তখন তাতে বাতির তেজ বাড়ে না, কিন্তু সর্ব্বনাশ হয় সেই পতঙ্গপালের।

এই নীতি অনুসরণ করেই চীনের ছাত্রছাত্রীরা অশেষ দুর্দ্দিনের মধ্যেও লেখাপড়ার কাজ বন্ধ রাখেনি। যারা তৈরী হয়েছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা রণাঙ্গনে, তাদের দেশনেতাদের নেতৃত্বে। হাল্কা মনোবৃত্তি নিয়ে নয়, একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে। যারা তা পারে নি, তারাও জাপানী বোমার ধ্বংসলীলাকে তুচ্ছ করে' জাগিয়ে রেখেছে তাদের শিক্ষায়তনগুলিকে। তার জন্য তাদের যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে নব চীনের ইতিহাসে তা' এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অধ্যায়। ছাত্রছাত্রীদের তার জন্য হেঁটে যেতে হয়েছে শত শত শত মাইল, বোঝা ঘাড়ে করে; দুর্গম অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে, দুরারোহ শৈলপুঞ্জ অতিক্রম করে'—যাতে তাদের সাধের বিশ্ববিদ্যালয় জাপানী বোমায় বিধ্বস্ত না হয়। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ তাদের যে কত প্রবল তা একটি চীনা ছাত্রের লেখা প্রবন্ধে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ছেলেটি লিখছে—

"In spite of the physical hardships and material insufficiency, our venerable University is still going strong, undaunted and undeterred. We are all proud to be her students, though to be her students means to suffer. We care not if life is but an ordeal to us. We may not have the opportunity to enjoy, but we can and do study and carry on with our pursuit of knowledge that counts. We are determined to preserve our study spirit under all circumstances, just as our comrades at the front are determined to keep up their fighting morale. We will not allow ourselves to be daunted in the slightest degree by the possibility that one day our small cluster of mud-houses with all our worldly possessions in them may be razed to the ground by Japanese bombs."

ছেলেটি National South West Associated Universityর ছাত্র, নাম, কুও সিং চাং Kuo-Sing Chang। তার এই বাণী আজ তোমাদেরও কণ্ঠে ধ্বনিত হোক। এর মতো তোমরাও আজ গৌরবান্বিত হও—তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গৌরবে। তাদের তোমাদের জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ করো, মনে করো যে তারাও তোমাদের জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতীয় মহাজাগরণে তাদেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কুও-সিং চাং'এর মত তোমরাও বলো যে যেমন আমাদের সঙ্গীরা জাতীয় সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য তাদের নৈতিক বলকে সুদৃঢ় করে রেখেছে, তেমনি আমরাও যে-কোনো অবস্থাতেই পড়ি না কেন বিদ্যানুশীলনের অভ্যাসকে জাগিয়ে রাখবো। আজকের জাতীয় মহানাট্যে এই-ই তোমাদের ভূমিকা।

# চলতিকা

আমেরিকায় ওয়াশিংটনএ ত্রিশটী জাতির প্রতিভূস্বরূপ আন্তর্জাতিক যুবসম্মেলন এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করেছেন যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ভিত্তি করে এখনই ভারতকে স্বাধীনতা দান করে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের পাশে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবাসীদের উদ্যোগী করার জন্য বৃটেন ও ভারতবাসীদের মধ্যে পুনরায় কথাবার্ত্তা সুরু করা হউক।

আমরা পৃথিবীর আটত্রিশটি জাতির যুবসম্মেলনের এই প্রস্তাব আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি।

লণ্ডণে ইণ্ডিয়া লীগও এক সভায় এই মর্ম্মে বলেন যে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার ও জাতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সুরু করা হউক। তাহলে স্বাধীন ভারত নিজ আত্মরক্ষার ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠবে।

আন্তর্জাতিক যুব সম্মীলনীর অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন্ রুজভেণ্ট কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আজ নাৎসী ও ফাসীদের ইউরোপের তরুণদের মৃত্যু ছাড়া আর দেবার কিছু নেই। কিন্তু অপর পক্ষে মিলিত মিত্র জাতিদের অভীষ্ট ও পৃথিবীর সমস্ত তরুণদেরও অভিষ্ট এক। তাদের কাম্য—এক নূতন জীবনের আদর্শ যার ভিত্তি স্বাধীনতায়, ন্যায় বিচারে ও শিষ্টতায়। আজ নাৎসীরা ইউরোপে যে তরুণের দল গড়ে তুলেছে ও তুলছে সে ছাঁচ নাৎসীদের, হিটলারের, তা ইউরোপের তরুণদের তৈরী নয়, তরুণদের জন্যও নয়। মিলিত মিত্র জাতিদের তরুণ তরুণী মাথা তুলে থাকবে ও নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে—এই চিন্তায় আমরা গর্ব্ব অনুভব করছি। আমরা সেই মত কাজ করব ও তজ্জন্যে যুদ্ধ করব, যার দ্বারা আগামী পৃথিবী তার মতামতের মুক্ত প্রকাশে, তার ধর্ম্মের স্বাধীনতায়, তার সকল অভাব থেকে মুক্তি ও সকল ভয় থেকে পরিত্রাণে, তার জীবন যেন পরম শান্তিতে উপভোগ করতে পারে। আশাকরি প্রেসিডেণ্টের এই সুন্দর বাণী ভারতবর্ষের ব্যাপারেও খাটবে।

রুষিয়াতে ষ্টালিনগ্রাদের প্রতি জার্ম্মানদের আক্রমণ ভীষণতম হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, পদাতিক সৈন্য সামন্তবাহিনী একত্রে এই ভীষণ আক্রমণ

চালিয়েছে। এত বড় যুদ্ধ ইউরোপে বোধ হয় কোনদিন হয়নি। এত নির্ম্মম যুদ্ধও কোন দন হয়নি। রুশদেশ বিশাল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেই তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে ও জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য তারা মৃত্যুপণ যুদ্ধ করছে। এমন যুদ্ধ তারাও বোধ হয় কোনদিন করেনি। ডন্ ও ভল্গা নদী রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। ষ্টালিনগ্রাদ রাশিয়ানরা রক্ষা করবেই তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে, যেমন তারা মস্কৌ ও লেলিনগ্রাদ রক্ষা করেছে। যদিও ষ্টালিনগ্রাদের অবস্থা যে খুবই সঙ্কটজনক সে বিষয় সন্দেহ নেই। এই সহরটিকে tank city বা ইস্পাত সহর বলা হয় কারণ এখানে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক ও ইস্পাতের সরঞ্জাম তৈরী হয়, তা ছাড়া সহরটির অবস্থান এরূপ যে সহরটি উত্তর ও দক্ষিণ রুশিয়ার যোগাযোগের কেন্দ্রস্বরূপ, হাত ছাড়া হয়ে গেলে উত্তর দক্ষিণ ছাড়াছাড়ি হবার আশঙ্কা আছে আর ভল্গা নদী দিয়ে রুশিয়াতে মাল সরবরাহও বন্ধ হবে। ঠিক এই সব কারণেই জার্ম্মানদের সমস্ত বিক্রম গিয়ে পড়েছে ষ্টালিনগ্রাদের ওপর।

জার্ম্মানরা ককেসাস্ অঞ্চলেও যুদ্ধের প্রকোপ ভীষণ বাড়িয়েছে এবং রুশ জার্ম্মানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে। এই জায়গায় প্রোখলাদ্‌নায়া অঞ্চলে যে তৈলখনিগুলি আছে, তাদের প্রতিই জার্ম্মানদের শ্যেন দৃষ্টি ও সেই পথেই যুদ্ধ চালিয়েছে। কৃষ্ণসাগরের সোভিয়েটের শেষ নৌবহর নভরসিস্ক বিশেষ বিপদগ্রস্ত। এই আক্রমণের ফলাফল যদি রুশিয়ার বিপক্ষে বিপরীত হয়, যদি ষ্টালিনগ্রাদ ও ককেসাসের কয়েকটি তৈলখনি জার্ম্মান করতলগত হয়, তাহলে রুশিয়া যে রসাতলে যাবে তা নয়, কারণ এ খেলা ফাইনাল নয়, এর মীমাংসা চূড়ান্ত নয়। রুশের অগুন্‌তি লোক, অশেষ সাহস ; শীতের প্রারম্ভে তারা পাল্টা আক্রমণ করে জার্ম্মানদের কাবু করতে পারে এমন তেজ তাদের আছে। বর্ত্তমান অবস্থা রুশের পক্ষে খারাপই মনে হচ্ছে কিন্তু ভবিষ্যত তাদের অন্ধকার নয়। শীত পড়লেই জার্ম্মান সৈন্যদের যে অবস্থা কাহিল হয়ে উঠবে সে বিষয় জার্ম্মানরা ভাল রকমই জানে।

পৃথিবীতে অপঘাতে কত লোক নিত্য মারা যাচ্ছে তার খবর কেউ রাখে না। কিন্তু রাজা রাজড়াদের অপঘাতে মৃত্যু সে ভীষণ ব্যাপার তখনই রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজা রাজড়া হলে তো কথাই নেই। গত মঙ্গলবার ২৫শে আগষ্ট ইংরাজ সম্রাটের আপন ভাই ডিউক অফ্ কেণ্ট আইসল্যাণ্ডের পথে এক এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। সেই সঙ্গে একটিমাত্র যাত্রী বাদে বাকি সকলেই মারা গিয়েছেন। প্রকাশ এরোপ্লেনখানা মাত্র মাইল ৬০ উড়ে ছিল, তারপর নাকি উত্তর স্কটল্যাণ্ডে এক পাহাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধ্বংস হয়। ডিউকের এই শোচনীয় মৃত্যুতে সমস্ত সাম্রাজ্য শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। ডিউক্ অফ্ কেণ্ট ছিলেন সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বয়স চল্লিশ এবং বিবাহ করেছিলেন গ্রীসের প্রিন্স ও প্রিন্সেস্ নিকোলাসের কনিষ্ঠা কন্যা মেরিণাকে। এঁদের তিনটি



ছেলেমেয়ে, তিনটি এখনও শিশু। রাজ পরিবারের মধ্যে ইনি সকলের চেয়ে বেশী এরোপ্লেন বিলাসী ও পাকা পাইলট ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি বহুবার হাজার হাজার মাইল বিশেষ দক্ষতায় এরোপ্লেন চালিয়েছিলেন ও রয়াল এয়ার ফোর্সএর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধের পর অষ্ট্রেলিয়ার বড়লাট হয়ে এঁর যাবার কথা ছিল। আমরা রাজপরিবারের এই নিদারুণ শোকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

জাপানীরা কি ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসবে ? আপাততঃ মনে হয়, না। কিন্তু কলকাতায় দু' পাঁচবার বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি করা হয়েছে ইতিমধ্যে। অবশ্য কাছাকাছি কোথাও বিমান আক্রমণ হলে কিম্বা অজ্ঞাত বিমানের শব্দ পাওয়া গেলে, বিমানহানার সঙ্কেতধ্বনি করা হয়। কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই।

সম্প্রতি মস্কোতে চার্চ্চিল ও ষ্টালিনের চুপিচুপি সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গত বছরের প্রশান্ত মহাসাগরে চার্চ্চিল রুজভেল্টের সাক্ষাৎকার। দুটি ঘটনাই আগষ্ট মাসে ঘটেছে, বোধ হয় আগষ্ট মাসটাই এই সব আলাপ আলোচনার পক্ষে সুবিধাজনক সময়। যাক্ তাতে ভারতবর্ষের পক্ষে কোন সন্তোষজনক সংবাদ আছে কিনা, তাই আমাদের দরকার।

কয়েকদিন আগে একটি দুঃখজনক সংবাদ আমরা পেয়েছি, সেটি শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই'র মৃত্যু সংবাদ। শ্রীযুক্ত দেশাই দশ বছরেরও বেশী মহাত্মা গান্ধীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ও তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভাল বাঙলাও তিনি জানতেন। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা তর্জ্জমা করে তিনি গান্ধীজিকে শোনাতেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে জেলেতে আটক ছিলেন।

আই এফ এ শীল্ড ফ্যাইনালে মহামেডানস্ স্পোর্টিং ইষ্ট বেঙ্গলের সমস্ত আশা ভরসা চূর্ণ করে তাদের এক গোলে পরাজিত করে শীল্ড জয়ী হয়েছে। গত বছরেও এঁরাই শীল্ড জয়ী হয়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে এই দলের মত এত চমৎকার রেকর্ড কোন ভারতীয় দল করতে পারেন নি। আমরা এই দলটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। খুব আশ্চর্য্য যে পুরাণো খেলোয়াড় দিয়েই এঁরা অনেক নামজাদা তরুণ দলকে হারিয়ে দিতে পেরেছেন। ইষ্ট বেঙ্গলের কোন অগৌরব নেই, তাঁরা গড়ে যে এবছর সবচেয়ে ভাল দল তাঁদের ছিল, সে বিষয় কারুর সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের সেদিনকার খেলা নাকি তাঁদের উপযোগী হইনি বলে অনেকে বলেছেন। হাফ্ ও ফরোয়ার্ড লাইন তাঁদের উপযুক্ত খেলা খেলতে পারেন নি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে, যে গোলটি দিয়ে সেদিন মহামেডানস্ শীল্ড জিতেছে সেটি একটি পেনাল্‌টির গোল। ইষ্ট বেঙ্গলের দুর্ভাগ্য !

১৫ বছর আগের এক সাঁতারের প্রতিযোগিতায় ১০০ গজ ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে জনি ভাইসমুলার ( ফিল্মষ্টার, টারজানের ভূমিকায় যিনি নাম করেছেন ) ৫১ সেকেণ্ডে যে রেকর্ড করেছিলেন, সেই রেকর্ড দ্বিতীয়বার করলেন এক নতুন সাঁতারু—তাঁর নাম বিল প্রিউ। অভ্যাস করলে বিল প্রিউ হয়ত একদিন এই রেকর্ড ভেঙ্গে একটি নতুন রেকর্ড করবেন। ১৫ বছরের রেকর্ড আজকের এই প্রগতির যুগে আর কতকাল চলতে পারে? কিন্তু জনী যে পাকা সাঁতারু ছিলেন সে বিষয় সন্দেহ নেই। আজও তিনিই এক নম্বর চ্যাম্পিয়ান আছেন, তবে এতদিন একমেব দ্বিতীয়ম্ ছিলেন, আজ বিল প্রিউ নামে একজন ভাগীদার জুটল।

টালিগঞ্জের মেয়ে সওয়ারদের এক ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতায় সকলকে হারিয়ে একটি ছোট মেয়ে সওয়ার প্রথম হয়েছে। এই মেয়েটির নাম রিটা, বয়স তার মাত্র ১৪ বছর। যে ঘোড়াটি সে ছুটিয়েছিল, তার মালিকও হ'ল আরো একটি ছোট্ট মেয়ে, তার নাম পামেলা, বয়স মাত্র ৮ বছর। ঘোড়াটির নাম হ'ল পরমা। পরমা সমস্ত রাস্তাটা তার ক্ষুদে সওয়ার রিটার তত্ত্বাবধানে নিজেকে বরাবর প্রথম রেখে দৌড়েছিল। পরমা এর আগে কখনও প্রথম হয়নি। এত ছোট সওয়ার ও এত ছোট মালিক টালিগঞ্জ ঘোড়-দৌড়ে এই প্রথম। দৌড়ে প্রথম হয়ে এরা সমস্ত দর্শকদের সেদিন বিস্মিত করেছিল।

এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন, কলিকাতা টাউন স্কুলের ছাত্র শ্রীমান আশীষ প্রসাদ মিত্র। দ্বিতীয় হয়েছেন, সিলচর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র শ্রীমান রঞ্জনকুমার সোম এবং তৃতীয় হয়েছেন, বালিগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ছাত্র শ্রীমান অজিতকুমার দাশগুপ্ত। আমরা এই তিনটি ছাত্রকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথম নয়জনের মধ্যে কোন ছাত্রী এবার স্থান পায়নি।

কয়েক সপ্তাহ ধরে সারা ভারতের বুকে অশান্তির যে দুর্দ্দান্ত ঝড় বয়ে গেল, তার ধাক্কা কেউ এখনও সামলে উঠতে পারেনি, পারা সম্ভবও নয়। ঝড়ের প্রকোপ হয়ত মাত্রায় কিছু কমেছে কিন্তু এখনও থামেনি। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে, মধ্যপ্রদেশে ও বোম্বাইতে, বাংলা ও উড়িষ্যাতে এখনও অশান্তি চলেছে। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য দেশে অভূতপূর্ব্ব আইন কানুন ও শাস্তির সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান জানেন, কবে কোন্‌দিন ভারতে আবার শান্তি ফিরে আসবে। অনেকের বিশ্বাস ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হ'লে আজকের এই অশান্তি অচিরে দূর হবে। নানা প্রদেশে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। কলিকাতাতেও আবার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি বন্ধ করা হ'ল। শিক্ষামন্দিরগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়া দেশের পক্ষে যে কতদূর অমঙ্গলের বিষয়, তা সহজেই অনুমেয়।

ভাইবোনেরা!

লিখবো ভাবছি—কিন্তু লেখার, বলার ও তোমাদের জানবার যা আছে তা জানান যায় না। দেশের যাঁরা প্রাণ ও যাঁরা প্রিয়—দেশকে ভালবাসার অপরাধে তাঁরা রইলেন কারাগারে। জহরলালের কথায় বলতে ইচ্ছা করে 'বৃহৎ কারাগার থেকে ক্ষুদ্র কারাগারে।' বৃহৎ কারাগারে বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন জানো? বৃহৎ কারাগার পরাধীন দেশ। দেশের সর্ব্বত্র বিক্ষোভ হয়েছে সুরু। এ বিক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক, যাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি তাকে বা তাদের তোমাদের কাছ থেকে আমাদের মাঝ থেকে হঠাৎ কেউ ছিনিয়ে নেয় তাহলে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে, কেঁদে প্রতিকারের পথ খোঁজ তোমরা—নয় কি?

দেশের এই বিক্ষোভের ও অশান্তির ঢেউ তোমাদের কিশোর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেবে এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? ঝড়ো বাতাসের আহ্বান অরণ্যের লতাপাতার বুকে আগে কাঁপন লাগায়।

দেশকে আমরা ভালবাসি, ভালবাসো তুমি, আমি এবং সবাই। দেশকে ভালবাসো কারুর একচেটিয়া নয়। দেশ বলতে কি বুঝবে তোমরা, কি বুঝবো আমরা? দেশ কি শুধু মাটিময় দেশ—জড় পদার্থ? দেশ বলতে বুঝি দেশের মাটি-আঁকড়ে দেশের মানুষদের। তাদের সকলের ভাল মন্দ, উন্নতি অবনতি, দেশের ভালমন্দ, উন্নতি অবনতি। কাজেই দেশের যারা ভাল চাও, দেশকে যারা ভালবাসো তাদের উচিৎ হচ্ছে দেশের লোকদের ভালবাসা। তোমার ঘরের পাশে যারা আছে, আমার পাশে যারা আছে, যাদের আমরা নানাভাবে বঞ্চিত করেছি জীবনের আনন্দ ও সর্ব্ব সম্পদ থেকে সরিয়ে রেখেছি আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে। এই শিক্ষাহীন, অভাবগ্রস্ত দেশের ছেলে মেয়েদের—নিজের ভাই বোন বলে শ্রদ্ধা দিতে হবে—সে শ্রদ্ধা সে ভালবাসা যেন তোমাদের মনের মুখোস না হয়! বিদেশী জিনিস, সর্ব্বপ্রকার বিদেশী পণ্য যেন না কিনি আমরা। দেশের পণ্য, দেশের শিল্প সামগ্রী শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠুক। পরের উপর আমরা কোনদিক থেকেই নির্ভর করবো না। আগামী মাসের স্বাধীন দেশের সেনা তোমরা। পরাধীন দেশের অন্ধকারে তোমরা এসেছো, স্বাধীনতার আলো এসে তোমাদের পথের অন্ধকার দূর করুক। এবার তোমাদের সকলের চিঠির উত্তর আলাদাভাবে দেওয়া সম্ভব হ'ল না, সেজন্য দুঃখিত হোয়ো না। অপেক্ষায় থাকো, আগামী মাসে নিয়মিত দেওয়া হবে।

তোমাদের জন্য প্রীতি রইল।

শুভার্থিনী—

দিদিভাই

# নূতন ধাঁধা

নিম্নলিখিত চিঠির মধ্যে ১৫টি পশুপাখির নাম লুকানো আছে। দেখি তোমরা তাদের খুঁজে পাও কি না :—

ভাই রাঙা-বৌ—

কথা কও বা না কও, আমার ভারী বয়ে গেল। কিন্তু অসুখে বিছানায় শুয়ে বুঝি গান গাইতে হয়? আমার কিন্তু অসুখ হলেই কান্না পায়। রামুরও তাই। এবার আমাদের বাগানময় নাসপাতি, হাসবে না বলছি নইলে ১টাও পাবে না। জানো ছোট খুকীর গাল যদি কেউ টেপে বা কেউ বকলে অমনি অভিমানে ওনার সুশ্রী গাল দুটি ফুলে উঠবে। আচ্ছা, সংযুক্তাই তো স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন, না? সেজকাকা 'তুয়ারি বাৎ ঠিক হায়' নাক উঁচু করে কেবল কেবল বলবে। অনেক বকলাম আজ বাজে বাজে। ব্রাহ্মণীদি কি এখনও তোমাদের বাড়ী বাঁধছেন? ইতি, মিনু।

## মানহানি

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

রোগ্‌নি ধোপার বুদ্ধিটা নয় সরু
রাগেতে তাই বল্‌লে গাধায়—'গরু'
আন্‌ল গাধা মানহানি মাম্‌লা—
উকিল দিল বড় দেখে শাম্‌লা!
বল্‌লে সবে জজ্‌ জুরী আম্‌লা,
'রোগ্‌ণির এ অন্যায় হামলা'।
রায় বেরুলো—তিন বড় গাম্‌লা
রোগ্‌নি খাবে গাধার দুধের চরু।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) পাঠান (২) দরবেশ (৩) সিন্ধু (৪) চিল্কা (৫) কানপুর বা আরাকান

## ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

**নির্ভুল উত্তর দাতাদের নাম :—**

অরুণ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা ; সুব্রত সিংহ, রংপুর ; গীতা দে, কটক ; রূপবাণী রায়, কলিকাতা ; কানু, অমি, আনু, হাসু, মিনু ইত্যাদি পুরুলিয়া ; অক্ষয়কুমার, সুবিমল, পারুল, অশোকা, অনিমা, মেদিনীপুর ; রেখা বসু, কিশানগঞ্জ ; মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়, ফরিদপুর ; উমা, গীতা ও দীপা,— ; দেবকুমার চৌধুরী, বেনারস ; দীপেশ, অঞ্জলী, রংপুর ; সুবির সেন, শান্তিনিকেতন ; যতীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, বর্দ্ধমান ; সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ; অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত, নদীয়া ; অসীমদেব গোস্বামী, কলিকাতা ; বেলারাণী গাঙ্গুলী, হবিগঞ্জ ; গিরিন্দ্রনাথ রায়, নৈহাটী ; লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, কলিকাতা ; আশীষ দত্ত, সীলেট ; খোকন, কৃষ্ণা, বাচ্চু ও আভা রায়, সালিখা ; ১৩৪৬ নং গ্রাহকবৃন্দ, সালিখা ; অমরনাথ, অসিতকুমার, বৈদ্যনাথ ইত্যাদি, বাহিরগাছি ; বিশ্বজিৎ নাগ, দিনাজপুর ; প্রতিমারাণী সাঁতরা, আমবনি ; সুবিমল চট্টোপাধ্যায় বালিগঞ্জ ; জয়ন্তি সেন মজুমদার, ও দাদা দিদিরা, আটালিয়া ; সুজিতকুমার দত্ত, চট্টগ্রাম ; দীপক ও আত্রেয়ী চৌধুরী, কলিকাতা ; সাধন, শিবু, দেবী, আভা ও শক্তিময় গুহ, ঢাকা ; মিহিরকুমার চৌধুরী, রাজসাহী ; সুনীলকুমার সিদ্ধান্ত, রাজসাহী ; শেখরেন্দ্র, সমীরেন্দ্র, অমরেন্দ্র, প্রবীর, শেফালী, ইত্যাদি পুরুলিয়া ; মীরা সান্যাল, রাজসাহী ; জগদীশ ও জ্যোতির্ম্ময় দাশ, তেলিনীপাড়া ; বাসন্তী, শরৎশ্রী, ঊর্ম্মিলা, বাণী, দাদারা ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ বারাসত ; জগদীশ চন্দ্র সেন, দারভাঙ্গা ; নরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, সুজাতা ও রবীন্দ্রনাথ হাজরা, নিউদিল্লী ; অরুণচন্দ্র বসু, কলিকাতা ; যামিনীকান্ত স্মৃতিসমিতির সভ্যবৃন্দ, বনগ্রাম ; প্রদীপ, জয়শ্রী, মঞ্জুশ্রী, কলিকাতা ; শঙ্করকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়া ; চিত্রা, সুধীর ও পুকু মুখার্জ্জি, কলিকাতা।

কথাসাহিত্য সম্রাট

পৃথিবীর মেঘলোক
নিখিল-ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
(ঠাকুরদাদার ঝুলি)
দুই টাকা

# দক্ষিণারঞ্জনের

পৃথিবীর সবুজ সাথী
চিরতরুণ কথা
সবুজ লেখা
(শোভন চিত্রে)
দেড় টাকা

—পথিবীর চিরসুন্দর বই—

# ঠাকুরমার ঝুলি
## বাংলার রূপকথা

—উষারাগের মত উজ্জ্বল নতুন রাজসংস্করণ ১৸০—

## দেশগৌরব উপন্যাস সিরিজ

কিশোর জগত
কিসে শক্তি ও সাহসে
অতুল হয়?

কার জ্বলন্ত নাম
ফাষ্ট বয়?

কিশোর-বিশ্ব
কিসে চিন্তায় ও কাজে
বিস্মিত করে?

অমৃত ঝর্ণা
স্তব মুকুল
ছয় আনা

জীবন্ত বই
বাংলার সোনার ছেলে
সোনালী রাজসংস্করণ আট আনা

দুধের সাগর
আমাল্ বই
পাঁচ আনা

উপন্যাস সিরিজ
প্রতিখানি আট আনা

জগতের বাংলা বই
দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র

জাতিকে এবং নিজেকে
জাগাবার দীপ্ত কামনা

"বিশ্বজননী"

শিল্পী নন্দলাল বসু

বংগশাল

সপ্তম বর্ষ
৭ম সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৪৯

# বাংলার ধূলোয়

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

## এক

লিকলিকে চেহারা হলেও গায়ের জোরের খ্যাতি ছিল জয়ন্তের।

গুণ ছিল তার। সে তার খ্যাতিকে বাড়াতে চাইত। কিন্তু শরীরকে চারপাশে বাড়াবার দিকে মন ছিল না একেবারে।

দৌড়নোর অভ্যেসে, রাঙা রঙ্ টকটকে হয়ে উঠছিল। কিন্তু শরীর চলল দড়ির্ মত পাকিয়ে।

অতুল বললে, মাংস আর ডিম খা জয়ন্ত।

রমেন বললে, জয়ন্ত, ছাতু খা।

জয়ন্ত তার পা রাখলে ঠিক, দৌড়ে। কিন্তু ওদের কথার একটিও, সে রাখলে না কানে।

শেষে বীরেন ওকে ধরে একটা ব্যায়াম সংঘে ভর্ত্তি করে নিলে। তার মামা ছিলেন সেখানকার অধ্যক্ষ। সেখানে কুস্তি শিখত সে। জয়ন্তও বোধ হয় কুস্তির ক্লাসেই ভর্ত্তি হয়েছে, কেন না, ভোরে তার হঠাৎ-সাথী হল আদা আর ছোলা ভিজে।

মামার আদেশ ও-ক্লাসে।

## দুই

বোধ হয় ছ'মাস হবে। জয়ন্তের চেহারা ফিরে গেল। সে যে খুব মোটিয়ে গেল, তা নয়। দৌড়য় সে তখনো। তাজী ঘোড়ার মত কাণায় কাণায় পূরো শরীর যখন উঠন্ত রোদ মেখে বাতাস ভেদ করে ছো'টে, ভিতরের তেজ যেন টগবগ করে ফুটছে মনে হয়।

মামা একদিন তা দেখতে পেলেন।

পরীক্ষায় সে বছর বীরেনকেও হারিয়ে, কুস্তির দলের দাঁড়াল, জয়ন্ত—প্রথম।

জড়িয়ে তাকে, বীরেন নোটবুক বার করলে, "মেডেল আগেই তোর জন্যে বাছা রয়েছে দেখছিস্!"

বীরেন কুস্তির ক্লাসের সম্পাদক।

মেডেল পেলে জয়ন্ত। কিন্তু মামা তাকে কুস্তির ক্লাস থেকে সরিয়ে নিলেন।

## তিন

ম্যাট্রিকে জয়ন্ত ফার্ষ্ট হল। রেকর্ড নম্বর রেখেছে ইংরেজী আর বাংলাতে।

তার চেয়েও তার নাম হল সেকেণ্ড ইয়ারে।

যে বিরাট ব্যায়াম প্রদর্শনী হল পাঞ্জাবে, তাতে একজন বাঙালীর ছেলে, এই বয়সে, কুস্তিতে, মাংসপেশীর খেলায় আর কয়েকটি অসীম শক্তির কাছে কি ভারতবর্ষের কি বিদেশী সব দর্শককে আশ্চর্য্য করে দিলে।

মামার এ ক্লাসে সে দেড় বছর শিখেছিল।

আনন্দে ভিজে গেল বীরেনের চোক।

মামা আর প্রধান বাঙালী ক'জনই যে শুধু জয়ন্তকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, তা নয়, বাঙালী-অবাঙালীর অঝোর অবাক দৃষ্টি প্রশংসা গুঞ্জনের ভিতর দিয়ে জয়ন্ত তাঁদের বুকের আদরের আসনে পৌঁছে গেল।

জয়ন্ত দেশের পায়ে রাখলে মেডেলের মালার উপহার। স্কলারশিপ, প্রাইজ আর এক সভায় ১০০১৲ টাকার তোড়ায় কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ তাকে ঢেলে দিলে বাংলা দেশ।

বীর জয়ন্ত, বিখ্যাত হয়ে গেল।



## চার

জয়ন্ত ফিরল গ্রামে।

কেউ ছিল না তার। এক কাকীমা মাঝে মাঝে তাকে খরচ দিতেন। প্রণাম জানাতে এল সে কাকীমাকে।

সুদূর গ্রাম। জয়ন্তের নতুন চেহারা দেখে সারা গ্রাম অবাক হয়ে গেল। তিন বছর পরে, গাঁয়ের সবহারা প্রবাসী ছেলে, কাকীমার দুলাল, নিস্তব্ধ গ্রাম খানিকে হঠাৎ কোলাহলে সজীব করে তুললে। সব কথা জেনে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল গ্রামখানা।

জয়ন্তের মনের সব চেয়েই সত্য দেশ ছিল এই গ্রাম। এ গ্রাম আর পাশের তিন চারখানা গ্রামের ছেলে আর তরুণদের নিয়ে—গ্রামের ব্যায়াম মন্দির গড়ে উঠল আপনিই দু'এক মাস।

তার সম্পাদক, বন্ধু সমরের বাড়ী চলেছে জয়ন্ত।

"কে?"

সন্ধ্যে ঘোর। অন্ধকার ঝোপের নীচে লম্বা একটা ছোকরা। হাতে ছোট্ট লাঠি।

"আমি বিল্লু। নমস্কার, বাবু।"

"নমস্কার; এই গাঁয়েই বাড়ী—ভাই?"

"না তো বাবু; ও-ওও—ই-ই চরে।"

"ফিরছ?"

"না বাবু, আমি বাঁশী বাজাই কিনা? গয়লা-দার কাছে যাব শিখতে।"

শুনে খুসী হয়ে উঠল জয়ন্ত।

"চোর! জয়ন্তদা, এই ছোকরাই একবার ধরা পড়েছিল।"

একটু মোটা গলার আওয়াজ।

"আমি বিল্লু। নমস্কার, বাবু।"

জয়ন্ত ফিরে দেখলে আধ-অন্ধকার পথে, নিতাই।

"বাবু, গাল দেবেন না। সে তো আমি নই।" ধীরে হাতের লাঠি বগলে তুলে, বিরক্ত মুখে পা বাড়াল সে।

নিতাই এগলো ভাল করে দেখতে, "তুই ন'স্!"

"না। সে ঝিনগাঁয়ের ঈশান।" একটু ঘাড় ফিরিয়ে বললে চলতে থেকে।

"মিথ্যে কথা! কোথা তোর বাঁশী?" নিতাই বললে।

"একটু দাঁড়াও," বললে জয়ন্ত।

একটুও দাঁড়াল না সে।

শেষে, এগলো জয়ন্তও।

"একি", লাগল বিষম' জয়ন্তর। সে বেশ্ অবাক হল। হাত একটু এগিয়ে নিতেই 'উহ্ হ' বলে সে আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়ন্ত।

নিতাই।

"উঃ!" "উঃ!"

লাফিয়ে, যন্ত্রণায় চোকে বিষম আঁধার দেখে,' নিমেষে পথের ধূলোর মধ্যে পড়ে গেল নিতাই, জয়ন্ত, বুকে আপন আপন হাত জোরে চেপে ধরে'।

আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল বিল্লু। তার ছোট্ট লাঠির চিহ্ন দুজনের বিশটে আঙ্গুলে রেখে।

অবশ হাত দুজনে তুলতে পারছে না।

শুধু কালো জঙ্গলের ঝিঁ ঝিঁ পোকাতে বোধ হয় বিল্লুর বাঁশীর সুর বেজে চলল!

## পাঁচ

সূর্য্য লাল থেকে সাদা হল।

প্রায় সাত মাইল দূরে, নদীর তিনটে বাঁক পেরিয়ে বড় বাঁকের ওপারের চরে জয়ন্তেরা চলেছে।

ধূ ধূ চর।

অসীম মরুর কোলে নিরুদ্দেশে চলা জল, হাওয়া-হাসা আকাশ আর দুরন্ত কাশবনের এক নতুন দেশে তারা পাড়ি দিচ্ছে। ঝাউ রাজ্যের পাশ দিয়ে দিয়ে।

বকের পাখায় রোদ তখন রূপো হয়ে গলে পড়ছে। কলাবনের হালকা সবুজ রং জ্বলে উঠেছে যার চারদিকে, চরের মোড়লের বাড়ী অনেকটা তার মাঝখানে।

সেখান থেকে বেরিয়ে তারা চলেছে জোর পায়ে। পূব দিকে।

জয়ন্তের দলের সহর হেরে গেল তাদের চরের খেলার হাতে, ভাবতে বুকে তাদের লাগছে। পায়ে চলতে চলতে ভাবছে তারা।

কালাবন পেরিয়ে ছোট আর একটী কাশবন। তার অল্প দূরেই আবার ছোট কলাবন। এসেই দেখলে, পূব চরের বালি খুঁড়ে কলাগাছের চারা পুঁতছে, বিল্লু।

দেখতে পেয়ে, ফিক্ করে বিল্লু হেসে দিলে।



গর্ত্তে হাতের চারাটা খাড়া করে রেখে, সেই হাসিতে মাথা নমস্কারটা করে, বললে এগিয়ে "চলতে যে হবে বাবুদের পিছু পথে মোড়লের ঘর, এখানে কোন্ ঠেঁয়ে বসবেন!"

ঘিরলে জয়ন্তের দল বিল্লুকে।

জয়ন্ত এগিয়ে এল। এসে তার হাতখানা ধরলে "মোড়লের কাছে সব কথা শুনেছি ভাই, মাপ চাইতে এলেম।"

চাকার মত চোক দুটো হল বিল্লুর। হাত গুটিয়ে, বুকে রাখলে সে।

জয়ন্ত তার পাশে গেল। তার কাঁধে হাতটা ফেলে, বললে "সর্দ্দার বিল্লু। ভাই, তোকে আমাদের ওস্তাদ হতে হবে।"

বিল্লু লাফিয়ে গেল সরে। হাত মাটী ছুঁয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললে, "বাবু, কি বলছেন! ও কথা তুলবেন না।"

বললে জয়ন্ত টেনে তাকে বুকে এনে "সর্দ্দার! কথা রাখতে হবে। ও-কথা হবে না।"

বিল্লু যেন নুয়ে গেল সুতোর মত।

ঢোক গিলে, থামলে।

তা'পর মাথা উঁচু করলে, বললে, "বাবু! তা যা হ'ক না, ওস্তাদের মানা, বাঁশীর এক ফেরতা শেখা না হবে তো না বাঁশী আনব, না লাঠি আনব। হুকুম।"

"হুকুম গয়লা-দার?" নিতাই, সমর, অনিল বললে পাশে এসে।

দুটি হাত জোড় করে মাথার উপরে ছোঁয়ালে বিল্লু।

হাত নামিয়ে হাসি মুখে চেয়ে রইল।

দুটো হাতই টেনে নিলে জয়ন্ত, "ভাই সর্দ্দার! চল আমাদের গাঁয়ে, তুমি একদিন খেলবে, আমরা দেখব।"

"তা হলে বাঁশীটে আগে, বাবু, পেয়ে নি!"

"কিন্তু বিল্লু, ভাই সর্দ্দার, তোকে আমরা দেরী করতে দেব না!"

ওদের কথা কেড়ে নিয়ে চরের হাওয়া চলে গেল আগে আগে।

## ছয়

একটা তার পেয়ে জয়ন্ত হঠাৎ কলকেতায় চলে এসেছে।

কলকাতার বিরাট ব্যায়াম সংঘের বার্ষিক উৎসব এখনই হবে এটা হঠাৎ-ঠিক হয়েছে। জয়ন্তকে না হলে কি করে চলবে?

কিন্তু জয়ন্ত আসাতে, উৎসব হবে, কি উৎসব এখন বন্ধ করা হবে, এই নিয়ে সভা চলছে।

জয়ন্ত বললে, "আমরা যা-ই কিছু করছি, ছোট্ট একটা দেড়ফুট লাঠির কাছে তা মিছে হয়ে গেছে। আমি তার সাক্ষী।

জয়ন্ত তার দু'হাতের আঙ্গুলগুলো সবার সামনে ধরলে। তখনও তাদের উপরের একটা কালো দাগে যেন প্রমাণটা লেখা রয়েছে।

ঝুঁকে বললে দীপঙ্কর, "য্যু-যুৎ-সুতে যাঁরা একটু এগিয়েছেন, আমি কি তাঁদের হয়ে একটু বলব?"

সভাতে খুব সোর গোল উঠল।

চুপ করেছে জয়ন্ত।

শেষে সে বললে, "ভাই! তোমরা যা বলবে আমি তাও জানি। কিন্তু সব যখন শুনবে, তোমরাও বুঝবে যে জাপান আমার বাংলা দেশের ধূলোতে তার য্যু-যুৎ-সু নিয়ে একটুও যুৎ করতে পারবে না।"

চোকের সারি সভাতে বড় হয়ে উঠল। একেবারে নীরব হয়ে গেল সভার ঘর।

একঘণ্টার উপর জয়ন্ত বলে গেল, ধীরে ধীরে, কি কি সে জেনেছে মোড়লের কাছে, কি কি শুনেছে—কোথায় কি অনুপম শক্তি ছিল বাংলারি পাড়াগাঁয়ে, কতটুকু তার এখনো রেখেছে ওই ছোট্ট সর্দ্দার বিল্লু, যার কাছে বুক আপনিই এগিয়ে গেল।

সভা ভাঙ্গল যখন সন্ধ্যের আলো প্রায় জ্বলবে।

বার্ষিক উৎসব চারমাস পিছিয়ে গেল।

ঠিক হল সভাপতি, সম্পাদক, দীপঙ্কর আরো প্রায় পঁচিশ জন যাবেন জয়ন্তদের গ্রামে।

## সাত

দীপঙ্কর বললে, "ভাই জয়ন্ত, ওদের যেতে তাহলে দেরীই হবে?"

"হত না। সর্দ্দার বিল্লু তার বাঁশী না পেলে যে সত্যিকারের লাঠি ছোঁবে না, ভাই দীপু!"

"দীপুও তাহলে জয়ন্তের সাথী, এটা তো জানা আছে?"

জয়ন্ত গলা জড়িয়ে ধরলে দীপঙ্করের, "সত্যিই কথা?"



আট দশ দিনে, সুটকেস আর হোল্ডল ভরে উঠল ফর্দ্দ করা জিনিষে দীপঙ্করের।

হাসতে লাগল জয়ন্ত "আমার পাটগাঁ যে একদিনেই হাট-গাঁ হয়ে যাচ্ছে, দীপু!"

দীপঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "সব সেখানে পাওয়া যায়, জয়ন্ত?

"কিছু না। সেখানে যারা থাকে তাদের ওসব চাইনে বলেই এখন মনে হয় যে সহর ওদের কাছে হেরে যায়।"

"ভাই জয়ন্ত, আমি আস্তে অভ্যেস করব।"

ডিঙি যে-রাত্রে এসে লাগল ঘাটে, জ্যো'স্নায় আকাশ, নদী, বন ভেসে যাচ্ছে। আর ভেসে যাচ্ছে যেন চাকভাঙা মধুতে।

জ্যো'স্নার উপর দিয়ে বাঁশীর সুর।

বিল্লুর বাঁশী।

## আট

দীপঙ্কর ধনীর ছেলে। তাতে পাড়াগাঁয়েতে সে কখনই আসে নি। সে শুনেছে, স্বর্গ আছে সাতটি। তার মনে হল, এ হয়তো তারই কোন একটি। সহরে মানুষ দুঃখে অস্থির হয়, এখানে খোলা আলোতে, সবুজ বনে, রূপোলী জলে, দুঃখ যেন মানুষে আঁচল দিয়ে, না হয় তো, শক্ত মুঠিতে মুছে ফেলে। দশটা দিক, শরীর, মন, সব যেন স্বাধীন! এখানে জয়ন্তের ব্যায়াম মন্দির, কিন্তু দীপঙ্করের মনে হতে লাগল, তা যেন কোন কাজের মন্দিরও নয়, শরীরের দেবতার মন্দিরও নয়, শুধুই যেন কোন অসীম পরিশ্রমের আর খেলার মন্দির।

কিন্তু সর্দ্দার বিল্লুর খেলার দিন না এলে এখনো সে কিছু ঠিক করতে পারছে না। ডন, কুস্তি, মাংসপেশীর খেলা এ সবকে না হয় কসরৎ বলব, য্যু-যুৎ সু ও?

"দীপঙ্করেরও কি দীপ চাই?"

আলো জ্বেলে এসে ঢুকল জয়ন্ত। উঁচু হয়ে বসে দীপঙ্কর বললে, "কিন্তু কাকীমার ছেলেবেলার তাঁর দেশের কথা তাঁর মুখে যা শুনলেম তাও তো কম আশ্চর্য্য নয়, জয়ন্ত!"

"তাঁর বাপের বাড়ীর—মানে দাদাম'শায়ের দেশের?" বললে জয়ন্ত "শুনেছিলেম, দীপু সেটাও কি কম আশ্চর্য্য?"

রইল চুপ করে, দীপঙ্কর।

সমস্ত গাছের পাতাগুলোকে যেন শিউরে দিয়ে পূব দিকে বাঁশীর সুর আপনিও কেঁপে চলল।

"শুনেছ ?" জয়ন্ত যেন চমকে উঠল—"ও যে বাঁশী পেয়েছে !"

"পেয়েছ !"

"বিল্লু আসছে এদিকে।"

দুজনে উঠে পড়ল।

তারা ক'পা যেতেই থেমে গেছে বাঁশী। নিতাই, প্রতাপ, ছুটে আসছে, "বিল্লু এসেছে !" আরো কয়েক পা।

সমর, বিল্লু, বাঁশবন পেরিয়ে এল।

"সর্দ্দার বিল্লু !"

কেউ উত্তর দিলে না। একটা মানুষ শুধু দু'ভাঁজ হয়ে পড়ল, মনে হল, যে বাঁশের বাঁশী, সেই বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে।

আধ জ্যোস্নায়-আঁধারে চিক্ চিক্ করে উঠল সে লাঠি, একটা সাপ না হয় জমাট বিদ্যুতের মত।

## নয়

"রে রে রে রে রে রে রে রে" দিক কাঁপানো দারুণ শব্দের ভিতরে অন্ধকার চিবিয়ে কামড়ানো কয়েকটা মশালের আলো, হুড়দাড় দুম দাম শব্দ আর কোলাহল !

দু'নৌকো ভিড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল তীরের গ্রামে ব্যায়াম সংঘের দল—ডাকাত পড়েছে। চা'রের বাঁশে, পালের বাঁশ, তাঁবুর খুঁটি, দাঁড়, কুড়ুল, লাঠি, যা কিছু পাওয়া গেল, নিয়ে। আ'লের পথ ভেঙ্গে ছুটে চলেছে আগে চার মাঝি। বেড়ার বাঁশ, কাঠ, উঠে গেল - প্রায় ত্রিশজনের হাতে, গ্রামে ঢুকতেই—তুমুল লড়াই সুরু হল।

বোধ হয় একটা বড় জোতদার কি ছোট জমিদারের বাড়ী, হিন্দুস্থানী আর হয়তো নানা মিশেলী ডাকাত ত্রিশ চল্লিশ জন হবে, অস্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, মুখোসে বিকট বিষম সব অদ্ভুত জোয়ান—কী ভীষণ দেখা গেল লোহার মত অন্ধকারে আর তীব্র মশালের আলোতে ! তারা ঢুকে পড়েছে বাড়ীর দেউড়ি ভেঙ্গে, বাড়ীর দিক থেকে চীৎকার আসছে, খুলে পড়েছে দোর কপাট, পড়েছে এসে গ্রামের লোকেরাও এদিক থেকে।

"ড্রম্ !"

"ড্রম !" "ড্রম !" "ড্রম ! "ড্রম !" "ড্রম !" দুদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ হতে থাকল।

ব্যায়াম সংঘের সভ্যদের সরে আসতে হল ডান দিকে।



গ্রামের লোকদের একটি বন্দুক, বোধ হয় ডাকাতদের দু'তিনটে। এতক্ষণে তারা বন্দুক ধরলে।

বড় বাড়ী, আস্‌ছিল চীৎকারের শব্দ কিন্তু বন্দুকের কোন আওয়াজ আসছে না সেদিক থেকে। বন্দুক ধরবে এমন লোক কি সেখানে আজ নেই, না সে রোগের শয্যায় ? ব্যায়াম সংঘের কতকে তাড়াতাড়ি, পাঁচিল টপকে বাড়ীর ভিতরটায় যেতে পারে কিনা, ছুটলে। সে পথেও পাঁকপুকুরে তাদের প্রায় কোমর পর্য্যন্ত ডুবে গেল।

ড্রম, ড্রম. ড্রম, বন্দুকের পর বন্দুক দুদিক থেকে আঁধার ছিঁড়ে ফেলছে। একটা হিন্দুস্থানী গলার চীৎকার। তারপর আর একটা চীৎকার। আর একটা। হঠাৎ ডাকাতদের সব বন্দুক থেমে গেল। পড়ল কয়েকটা দস্যু উঠোনে, দালানে। সিঁড়ির ধাপে। মশাল পড়তে লাগল। ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ল দু'তিনটে দস্যু, কট্ কট্ খট্ খট্ চট্ চট্ রট্ রট্ শব্দে যেন প্রেতের পুরীর মত হয়ে উঠল আজকার বাড়ী, পাগলের মত হয়ে ছুটল দস্যুরা দেউড়ির দিকে। কিন্তু সেখানেও শিলাবৃষ্টির মত পাথর বৃষ্টি।

ব্যায়াম সংঘের দল এসে চেপে ধরল, গ্রামের দল এসে পড়ল, কিন্তু সেখানে দাঁড়াবে, কার সাধ্য ?

"ড্রম !"

আর চর্চ্চ লাইট, গ্যাস লাইট পেছনে। দূরের থানা থেকে আসছে দল। অন্ধকার সেখানে টুকরো টুকরো হতে লাগল। ধরা পড়ল অনেক দস্যু। সারা গ্রামে সোরগোল।

কোথায় সে পাথর বৃষ্টি ? কিসের পাথর ?

তার কোনো সাড়া নেই।

সমস্ত বাড়ী, গাছ পালা, টর্চ্চে মশালে আলোতে যতদূর দেখা যায় দেখা হল। কোন কেউ নেই। শুধু ইঁটের কাঁকরের মত পোড়া মাটির টুকরো আর মার্ব্বেলের মত গুলি উঠোনে, বারান্দায়, ঘরে, দেউড়িতে, তার শেষ নেই।

হাতে তুলে, কপাল তাতে ঠেকিয়ে চৌকীদার শঙ্কর বললে,—"তাই বলি, কি হল ! এতো ডাকাত, বিল্লু সর্দ্দারের বাঁটুলের গুলি, হজুর, যম এড়াতে পারে না।"

"কে বিল্লু সর্দ্দার !',

"কোথায় বিল্লু সর্দ্দার কোথায় ?"

নূতন দারোগা, সংঘের সভ্যেরা যেন অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"ঐ পুবের বড় আমগাছটাতে হয় তো বা ছিল, হুজুরে।—"

"নেই ?—

ত্রস্তে আলোর ভিড় চলল আমগাছের দিকে।

প্রায় আধ মাইল দূরে বেজে উঠল বাঁশী।

বিল্লু সর্দ্দারের বাঁশী।

## দশ

ক'দিন হবে?

এগারো বারোদিন গিয়ে থাকবে তারপর!

জয়ন্তদের গ্রামে ব্যায়াম সংঘের তাঁবু। একটা বটগাছের নীচে সংঘের দল, পাশের গাছের নীচে পুলিশের দল, তারই পাশে ছোট রঙিন্ সামিয়ানার নীচে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। ক' গ্রামের তিন চার হাজার লোক নদীর পাড়ে।

পুরাণো চরের একটা দিক শব্দের ঝড়ে আর ধূলোর ঝড়ে আচ্ছন্ন, খটাখট্ খটাখট্ শব্দের সঙ্গে কালী কালী কালী কালী কালী রা রা রা রা রা রা রা রা রা শব্দের আকাশ যেন কেঁপে দুলে পড়ছে ধূলোর অন্ধকারে, উঁচু পাড়ের অবাক লোকের দৃষ্টি থমকে যাচ্ছে, কেউ শিউরোচ্ছে, কেউ গাছের ডাল ধরে সামলাচ্ছে নিজেকে, বসে পড়েছে অনেক লোক। প্রায় আধ ঘণ্টায় যখন সেই ধূলোর মেঘের জটা নেমে এল, ছবির চোকের মত অপলক চোকে লোকেরা দেখল চরের ঘাস মাটি উচ্ছন্ন হয়ে গেছে, দেড়শ' লাঠিয়ালের লাঠি দু'চীর, চৌচীর, কোনটা উড়ে গেছে, কোনটার কতটা নেই, অর্দ্ধেক লাঠিয়াল বসে হাঁপাচ্ছে, আর অর্দ্ধেক পড়ে আছে, কেবল একটা ধূসর লাঠি দাঁড়িয়ে আছে যেন আর একটা লাঠি আঁকড়ে ভর করে, সব জায়গাটা কাঁপছে থর্ থর্ থর্ থর্ থর্ থর্ সর্ সর্ করে—ছিন্ন ভিন্ন হাওয়ার আগুনের হলকায়।

দাঁড়িয়ে সর্দ্দার বিল্লু, ধূলোর পৃথিবীর বিদ্যুৎপাহাড়, কতক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলে, চরের ধারে এসে নমস্কার করে হাসিমুখে, দাঁড়াল একটুক ঢিলে করে।

তার পরেই গিয়ে গলা কাঁধ আগলে ধরে' তুলতে লাগল লাঠিয়ালদের।

চার হাজার লোকের যেন চমক ভেঙ্গে গেল। নদীর ধার জুড়ে শব্দ উঠল "বিল্লু।"

"সর্দ্দার বিল্লু!"

"সর্দ্দার বিল্লু!"

## এগারো

সাতদিন ধরে বিষম খেলা চলল একদিন পর পর।

যেন একটা মেলা বসে গেল।



সর্দ্দার বিল্লুর সতের খানা লাঠি চলে গেল। কিন্তু তার তেলো লাঠিগুলোর কাছে বন্দুকের গুলি, বল্লম, চোখা চোখা বাঁশের লম্বা বর্শা, শূল, ছোরা, তরোয়াল, সঙ্গীন, শর, সা'রে সা'রে এল যত কিছু, তার কোনটিই টিঁকল না একঘণ্টার সিকিও কি আধঘণ্টাও। হাঁটু জলে, বুক জলে, ডুব জলে, চরে, চরের উঁচু বালিয়াড়িতে, শক্ত মাটীর টিলায়, ধানক্ষেতে, উলুবনে, কাশবনে, সবখানে সমান। মুক্ত হাওয়া যেন হুকুম শুনে তাকে ঘিরে ঘূর্ণী পাকে পাকে দুলে ওঠে—চারদিকের বাতাস তার লাঠি ছুঁয়েই এক সেকেণ্ডে বজ্র হয়ে যায়।

চার হাজার লোকের মুখে কথা বন্ধ হয়ে যায়। আবার জয়ধ্বনির ঝর্ণা ছোটে।

শেষ দিন তার অপরূপ লাঠি এল। দেড় হাত ছোট্ট লাঠি। য্যু-য়ুৎ-সুর দল দাঁড়াল প্রথমে তার সামনে লাইন করে। তারপর আপনিই গেল তাকে ঘিরে। কিন্তু মাঠের বিশ গজের মধ্যে সংঘের একটিও বীর হাত কি পা বাড়িয়ে দিতে পারলেন না, একটিবার সর্দ্দার বিল্লুকে কোনখানে এক পলক স্থির দেখে, কোনখানে এক ইঞ্চ্ পেলেন না তাঁরা, যেখানে আঙ্গুল রাখবে কারো হাত—সেই গণ্ডীর মধ্যে যেন অজানা ইলেট্রিকের অসহ্য ব্যাটারী অবশ করে দিচ্ছে আকাশ, অবশ করে দিচ্ছে আঙ্গুলের হাড়, একটা যেন কোন্ জাদুর হাড়ের স্পর্শ রয়েছে তার অতটুকু লাঠিতে, যে লাঠিও একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

দাঁত মুখ চেপে, হাতের আঙ্গুল হাতে চেপে, সভ্যেরা চলে এলেন নীরবে।

কিন্তু তারপরেই গর্ব্বে জয়ধ্বনি করে উঠলেন তাঁরা সর্দ্দার বিল্লুর, যে বিল্লু মাঠের মাটীতে চারবার প্রণাম করে, বসে আছে হাসিমুখে মাঠটার মাঝখানে ছেলে মানুষের মত।

নদীর ধার গাছের তল তোলপাড় হয়ে উঠল। গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে লোক ছুটে আসতে লাগল।

রুখে রাখা যায় না ভিড় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামিয়ানার তিন দিকে।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি একটা রাইফেল হাতে। ধূলোবিভূতি মাখা, শিবের ছায়ার মত প্রফুল্ল বিল্লুকে তিনি হাত বাড়িয়ে বুকের কাছে টেনে আনলেন, "তোমার হাতে গেলে যে জিনিষ ধন্য হবে, সর্দ্দার বিল্লু, সে জিনিষ তোমাকে দিচ্ছি।"

একজনে ছোট টেবিলের উপরের চাপা তুলে নিলে, দুখানা নোট হাতে নিয়ে তিনি বললেন,—

"এই পাঁচশত একটাকা আমরা সর্দ্দারের সম্মানের নজরানা দিলুম।"

কয়েক মিনিট ধরে চারদিকের কলরব থামল না।

বিল্লু নমস্কার করলে। আস্তে আস্তে সে দুখানা নোট থেকে একটাকার নোটখানাকে মুঠোতে নিলে। যেন আশীর্ব্বাদে মাণিকটিকেই সে নিয়ে নিলে মুঠোতে নয়, বুকে।

ছোট্ট লাঠিটি কোমরে গোঁজা রয়েছে বাঁদিকে। ডানদিকে সে চাইলে, ওষ্ঠে যেন কথা আঁকা, জয়ন্ত যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল উজ্জ্বল চোকে, বিল্লুর হাত গেল সেইখানে তার কাছে—জয়ন্তের হাতে সে রাইফেল আর নোট দুই-ই তুলে দিলে।

## শেষ

ওস্তাদ বিল্লুর ফটোর নীচে রাইফেল রয়েছে যত্নে পাটগ্রামের ব্যায়াম মন্দিরে। সমস্তটার তৈলচিত্র কলকাতায় ব্যায়াম সংঘের হলের মাঝখানে। ক' হাজার শিষ্য-বন্ধু সাথীর ভালোবাসার চন্দনমাখা মালা-ও।

ব্যায়াম সংঘের বার্ষিক সভা গিয়েছিল পিছিয়ে, আরো আট মাস। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে লোকারণ্য। তার প্রদর্শনীতে দেশের আসন নূতন উল্লাস আর দেশের মন অনেকখানি জুড়ল।

একটি ছোট সুন্দর ঘাটলা। জয়ন্ত, দীপঙ্কর, আর ক'জন। গ্রামের পুকুর। চৈত্র মাসে যখন নদীর জল বহু দূরে চলে যায়, এদিকটার আশে পাশের জল প্রায় শুকিয়ে যায়—এই নতুন পুকুর প্রায় দু' তিনটে গ্রামের সম্বল।

ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নাতে গ্রাম রূপোলী হয়ে গেছে; পুকুরের জল যেন দুধের মত হয়ে আছে, দীপঙ্কর বললে, 'ভাই জয়ন্ত, সমর, আমাদের সর্দ্দারের সবটা টাকাই এখানে দুধ হয়ে উঠেছে, দেখছিস্?"

"তা যে হবেই ভাই! শুনেছিস তো আরো হত ওর দাদুর লাঠিতে। সে ছিল অন্য জেলার, তার কাছ থেকেই এক টুকরো আমাদের সর্দ্দার রেখেছে। ওঁদের লাঠি তো ভাই রক্তের জন্যে নয়, জানে দুধ তয়ের করতে।" সুশান্ত, আনন্দের সুরে বললে জয়ন্ত।

একটু চুপ করে দীপঙ্কর বললে, "কিন্তু নিজের জন্য ও কোনদিন ভাবলে না!"

উত্তর কেউ দিতে পারলে না আর।

জ্যো'স্না জড়ানো বাতাস মধুসাগরের ঢেউয়ের মত বেজে উঠল দূরে, গ্রামের শেষ সীমার শেষে।

বিল্লুর বাঁশী।

—ঃ( ০ )ঃ—

# বিশ্বজননী—চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

এদেশে অনেকের ধারণা বিশ্বজননী ও ম্যাডোনার কল্পনা ও রচনা একটা ইউরোপীয় ব্যাপার। এদেশের চিত্রকলার ইতিহাসে এ রকম রচনা অতুলনীয় এবং জগতের কোন কলালীলাই নাকি এ রকমের অনুভূতিকে যথাযথভাবে বর্ণে বা মর্ম্মরে বিকশিত করতে পারে নি। ব্যাপারটি সত্য হলে একটা ভাববার বিষয় ছিল। কিন্তু বলবার সময় হয়েছে কথাটি একেবারে অমূলক। এর চেয়েও অদ্ভুত কথা ইতিহাসে প্রচলিত হয়েছে। পশ্চিমের পণ্ডিতগণের কেউ কেউ এ কথা বলেছেন যে গ্রীক দেশীয় গান্ধার শিল্পীরা এ দেশের বুদ্ধমূর্ত্তি রচনা করেছে এবং সে বিষয়ে ওরাই অগ্রণী। এ কথাও ঠিক নয়—আধুনিক কোন পণ্ডিতই একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করেন না।

রেণাশাঁস যুগের বিশ্বমাতার চিত্র কল্পনা এক সময় এদেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের সমুত্থান যুগ বিশেষ ভাবে বাহবা পেয়েছে। এ সময়কার শিল্পী র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো ও লিয়ানর্দ দা ভিন্সি সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেন হুবহু রচনা করে। র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তির প্রতিলিপি রঙীন ভাবে মুদ্রিত হয়ে সকল জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কালীঘাটের পট ফেলে সকলে এসব মূর্ত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে। মনে হয় সব যেন রঙীন ফটোগ্রাফ—জীবন্ত ও মূর্ত্ত। হৃষ্টপুষ্ট অবয়ব শিশুকে মা কোলে করে আছেন—সমগ্র বিশ্বের মাতৃশক্তির দ্যোতক এ ছবি রঙের বৈচিত্রে ও দেহ লালিত্যে সকলকেই এক সময় মুগ্ধ করে। উনবিংশ শতাব্দী ছিল অন্ধ বিশ্বাসের যুগ, প্রজ্ঞা গৌরবে ও অন্তর্দৃষ্টিতে অতি খর্ব্ব। সম্প্রতি বিচারের মানদণ্ড হয়েছে ভিন্ন।

প্রথমেই বলা দরকার মাতৃ কল্পনা ভারতে অতি প্রাচীন। এ সব শিল্পীর হাজার বছর আগে মাতৃ কল্পনা, মূর্ত্তি ও চিত্র এদেশে রচিত হয়েছে। বৌদ্ধ কল্পনায় হারিতির নাম অনেকের পরিচিত না হ'তে পারে কিন্তু এ কল্পনা অতি প্রাচীন। মিশর সভ্যতার আইসিস ও হোরাস্ (Isis and Horus) কল্পনায়ও বিশ্বমাতার রূপ পেয়েছে। বিস্ময়ের বিষয়, গ্রীক শিল্পে ও চিন্তায় এই ম্যাডোনা কল্পনা নেই। যে জাতির ভিতর বিরাট মাতৃত্ব কল্পনাই হল না, সে জাতি কি করে জগতে বেঁচে থাকে? মাতৃত্বের ত্রিধারা হ'ল—সৃষ্টি, পোষণ ও রক্ষণ, এ না হলে সৃষ্টি হয় না এবং সৃষ্টি রক্ষা হয় না।

ভগবানের মাতৃশক্তি বিস্তীর্ণ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ মাত্র নয়—জড় ও সূক্ষ্ম জগৎকেও সৃষ্টি ও রক্ষা করছে, এজন্য ভাগবত শক্তিকে ভারতবর্ষে জননী বলে সম্বোধন করা হয়। আলোকে, হাওয়ার ভেতরে যা কিছু বেঁচে আছে তা' বিশ্বমাতার বুকেই স্থান পেয়ে রক্ষিত হচ্ছে। এজন্য জগতের ধৃতিশক্তিই মাতৃত্বের ক্রোড়ে উপচিত হচ্ছে—প্রলয়, মৃত্যু ও নির্য্যাতন হল এ তত্ত্বের বিপরীত দিক।

ফরাসী পণ্ডিত ফুসের [ Foucher. A. ] মতে প্রাচ্য দেশে বৌদ্ধ কল্পনার "হারিতি ও পিঙ্গল" মূর্ত্তি প্রায় কুড়ি শতাব্দী পর্য্যন্ত চলে এসেছে। চৈনিক পরিব্রাজক Titsing এর মতে ভারতের প্রত্যেক বৌদ্ধ মঠে হারিতির মাতৃমূর্ত্তি রক্ষিত হ'ত। পরিব্রাজক Hinan Tsing'ও বলেছেন, ভারতবর্ষের বৌদ্ধ বিহারে হারিতি মূর্ত্তি পূজিত হ'ত। এ সব হ'তে দেখা যায় বিশ্বজননী কল্পনার আদি উৎস হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ জনপদ ও বিহারগুলিই হচ্ছে এসব মূর্ত্তি রক্ষার সব চেয়ে প্রাচীন স্থান।

বড়ভুধরে হারিতি মূর্ত্তি শিশু সহ খোদিত অবস্থায় আছে।

চীন দেশে এই মূর্ত্তি Kuon-yin নামে পরিচিত। ইনি এখানে অবলোকিতেশ্বরের প্রতিভূরূপেও পূজিত হ'ন। আনামে Quon-Am নামে ম্যাডোনা বা বিশ্বজননী কল্পিত হয়েছে। জাপানে Ki-Simo-jin নামে মাতৃমূর্ত্তি পরিচিত। এ সব মূর্ত্তিতে আছে মায়ের স্নেহ, করুণা ও ধৈর্য্যের সংযোগ। জড় জগতের আর কোথাও মাতৃ মূর্ত্তির এসব প্রতিষ্ঠা ও ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে চৈনিক তুর্কীস্থান হতে প্রাপ্ত একখানি অতি প্রাচীন চিত্র রক্ষিত আছে। চিত্রখানি রেশমের উপর আঁকা। সে যুগের চিত্রকলার নিদর্শন রূপে এই নমুনাটি অত্যন্ত মূল্যবান! বস্তুতঃ এর চেয়ে প্রাচীন কোন, ম্যাডোনা চিত্র জগতে আর দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই ভারতের কল্পনাই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে প্রাচীন।

ভারতের প্রাচীন চিত্রশালায় আমরা মানবীয় মাতৃশক্তির ক্রীড়া দেখে মুগ্ধ হই। অজন্তার মা ও মেয়েতে আছে বিশ্ব জননীরই মাতৃত্বের প্রতিফলক প্রতিমা। মায়ের পশ্চাতে আস্‌ছে মেয়ে—মা হয়েছে রক্ষা প্রাচীর—দুয়ে মিলে এক তান, এক ভাব। ভগবান তথাগতের নিকট উভয়ের নিবেদন এক সুরে পৌঁছবে। মেয়ে নিস্তব্ধ, বাকাহীন। মায়ের আকুল প্রার্থনা ছাপিয়ে পড়ছে দশদিকে, শিল্পীকে তা' তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে হচ্চে না। মধ্য-এসিয়ার দণ্ডিন ইর্ভলিকেও আমরা নারী মূর্ত্তি শুধু নয়—মাতৃমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই। সে মূর্ত্তিতে আছে সহজ সরলতা, অকুণ্ঠ আসক্তি ও অঙ্গাঙ্গী স্নেহ।

শুধু বৌদ্ধ যুগে এ ধারা শেষ হয়ে যায়নি। পৌরানিক যুগে এল যশোধা ও কৃষ্ণ কল্পনা। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার অফুরন্ত দিক সমগ্র মাতৃ কল্পনাকে যে ঐশ্বর্য্য দান করেছে তা' পাশ্চাত্য জগতের কল্পনার অতীত। বাৎসল্য রসের অশ্রান্ত করুণা বিগলিত হয়েছে



বহু আধারে। ভারতের রাজপুত চিত্রকলার শিল্পীগণ একটি দীর্ঘ অঙ্কে এই কল্পনাকে জীবন্ত রূপ দান করতে অগ্রসর হয়েছে। এ সব চিত্রের করুণা, চাপল্য, গভীরতা ও অধ্যাত্ম আন্দোলন যুগ যুগান্তে বিস্মৃত হওয়ার নয়। ভারতের কীর্ত্তন সঙ্গীতের ও বিশ্বমাতার এই নীল মাণিকের রস প্রসঙ্গ উদ্বেলিত হয়েছে শত ধারে।

এ তত্ত্বের আর একটি দিক পুষ্ট হয়েছে গণেশ জননী কল্পনায়। জগতের চিরন্তন মা এবার যে শিশুকে ক্রোড়ে নিয়েছেন তার মুখশ্রী মানুষের নয় পশুর! বিশ্বমাতার অঙ্কে মানুষের চেহারা সুগঠিত ও সুসম্বদ্ধ—একমাত্র প্রিয় নয়, সকল জীব জন্তুর জননী রূপে তাঁর কাছে সন্তানের মুখ মাত্রই সুখদ ও সুষমাযুক্ত! তথা কথিত কুৎসিৎ গলিত বা অদ্ভুত সৃষ্টির পশ্চাতেও আছে সহাস্য মুখে সে অবিচল ধারায় প্রবাহিত মায়ের স্নেহ! র‍্যাফেলের মানবীয় সুস্থ ও সুগঠিত দেহে পশুর মুখশ্রী যুক্ত শিশু খ্রীষ্টিয় ম্যাডোনার ক্রোড়ে এক বিরোধ সৃষ্টি করবে। ও দেশের তত্ত্বে আছে মানুষে ও প্রকৃতিতে বিরোধ—অধ্যাত্ম্য ও জড়ে সঙ্ঘাত। কাজেই ভারতীয় তত্ত্বের বহুমুখী শোভনতা তাতে নেই।

পরবর্ত্তী লোক কলায়ও এই মাতৃকল্পনা রূপ গ্রহণ করেছে শীতলা দেবী। এ নিয়ে বহু কাব্য ও পুঁথি হয়েছে—ছেলেকে রক্ষা করতে এখনও শীতলা দেবীর প্রসাদ ভিক্ষা করতে হয়। ইউরোপে তত্ত্বের দিক হ'তে এ রকম কোন দেবীকে অন্ততঃ বহু খ্রীষ্টীয় ভক্তগণ মানতে প্রস্তুত নন। বস্তুতঃ ম্যাডোনা কল্পনা এখনও ভাবের অশ্রান্ত স্রোতোভঙ্গে এদেশে জাগ্রত আছে সর্ব্বত্র। কিন্তু সে ম্যাডানা একটি বিলাস-পুষ্ট রমনীর চেহারায় পর্য্যবসিত হয় নি। বিশ্বমাতার এ গেল এক রূপ। অন্য রূপ আরও ব্যাপক, মহৎ ও বিরাট। মায়ের শান্ত দিক্ দেখা গেছে—স্তন্যপান রত শিশু বা শিথিল অক্ষম শিশু ক্রোড়ে। কিন্তু ক্রোড়ে থাকার অর্থ কি? রক্ষা করা ত? জগতের বিশ্ব জননী সংহারের শক্তি নিচয়কে এত সহজে দূরে রাখ্‌তে পারেন না। জগতে প্রতি মুহূর্ত্তেই ধ্বংশ ও প্রলয়ের বিষাণ বাজ্‌ছে—তার সহিত সংগ্রামের প্রয়োজন। পশুশক্তি গ্রাস করতে চায় মানুষকে দশদিক হ'তে—এ শক্তির সহিত যুদ্ধোদ্যম অনিবার্য্য। বিশ্বজননী তাই ভারতে হয়েছেন অস্ত্রেশস্ত্রে ভূষিতা মহাদেবী। দশ দিকে দশ হাতে অস্ত্র নিয়ে দানবিক ও পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে' তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখ্‌ছেন। এটাই যথার্থ বাস্তব রূপ। কোন মাতাই অলস আসনে বসে সন্তানকে রক্ষা বা পুষ্ট করতে পারেন না। রোগ তাপ, আপদ বিপদ হ'তে ছেলেকে রক্ষা করতে অহোরাত্র অনিদ্রায় কাটাতে হয়—মায়ের শরীর হয়ে যায় মলিন ও কৃষ্ণ এবং অনেক সময় সর্ব্বহারা। তাই ম্যাডোনাকে এদেশে বালিকা মূর্ত্তিতে কল্পনা করা হয়েছে। গৃহে গৃহে সেবা ও ত্যাগে সকল মায়ের রূপ হয়ে যায় কালো—ছেলেকে বাঁচাতে মা সর্ব্বত্যাগী হতে প্রস্তুত—শ্মশানও মায়ের পক্ষে ভীতিজনক নয়।

এটাই ত হ'ল যথার্থ মাতার রূপ। লাবণ্যবতী ললনার ক্রোড়ে সুখাদ্য পুষ্ট একটা শিশু রচনা করলেই কি তা' মাতৃত্বের পরিচায়ক হ'ল? বস্তুতঃ মাতৃত্বের বহু রূপ ভারতে কল্পিত হয়েছে। প্রত্যেকটিই বলিষ্ঠ ও জাগ্রত। এদেশে তন্ত্রকারগণ দেবীকেই বলেছেন প্রধান শক্তির আধার—দেবকে দেবীরই শরণাপন্ন হতে হয়। এরকমের একটি কল্পনা ভারতের বৈদিক যুগ হ'তেই চলে এসেছে। ঋক্‌বেদের দেবী সূক্তে দেবী বলছেন তিনিই প্রভু। তন্ত্রকারগণ এই শক্তিকে ত্রি-গুণের আধার বলে ত্রিপুরাসুন্দরী নাম দিয়েছেন বর্ত্তমান যুগে। অপরদিকে বৌদ্ধতত্ত্বও মহাযানের ভিতর দিয়ে বুদ্ধশক্তি কল্পনা অনিবার্য্য মনে করে বুদ্ধের সহিত বুদ্ধশক্তি কল্পনা যুক্ত করেছে।

বস্তুতঃ ভারতীয় তত্ত্বে মাতৃকল্পনা যে বিরাট প্রসার লাভ করেছে এমন আর কোথাও করেনি! এজন্য তত্ত্বের ও কল্পনার একটি সুবিস্তৃত গমককে রূপান্বিত করতে হয়েছে। দশ মহাবিদ্যার ভিতর দিয়ে এই কল্পনা উদ্‌ঘাটন করেছে মাতৃতত্ত্বের দশদিক! পৃথিবীর আর কোথাও তা' সম্ভব হয় নি। মিশরের সেই এক Isis ও Horus কল্পনার মরুভুমিতে একটি পিরামিডের মত দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের অষ্ট মাতৃকা কল্পনাও এই উপলব্ধির আর একটি ঊর্দ্ধদিক। বস্তুতঃ চীনের কানওয়ান, মিশরের আইসিস ও খ্রীষ্টিয় ম্যাডোনার সামান্যতা ও সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি হয় ভারতীয় কল্পনার সহিত একাসনে রাখ্‌লে।

বল্‌তে গেলে গভীরভাবে উপলব্ধ এই মাতৃশক্তিই ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত রেখেছে। ভারতীয় পরিবারের গাঢ় বন্ধন ও নিবিড় যোগ ভারতীয় মাতৃত্বের সাধনা ও তপস্যায় সঞ্চিত হয়েছে। এই মাতৃত্বের আদর্শ এসেছে বিশ্বমাতার কল্পনা হ'তে। ভারতের নরনারী নানা বিপ্লবে মায়ের বন্ধন কখনও ছিন্ন করেনি, ভারতমাতাও সকল অপরাধ ক্ষমা করে সন্তানকে বুকে রাখ্‌তে দ্বিধা করেনি। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের কোথাও নেই। পশ্চিমের দূরদর্শী পর্য্যটকগণ এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

# পুতুল খেলা

শ্রীবিমল ঘোষ

দুই বোন, রুনু আর ঝুনু। দুজনে খুব ভাব! যেন এক বৃন্তে দুটি 'ফুল'—ছোট্ট দুটি বোন—স্নেহ-করুণার মিলিত ঝর্ণা।

—এত ভাবের মধ্যেই ঝগড়ার সৃষ্টি করলে—নেহাৎ বাজে ঠুন্‌কো একটা পুতুল এসে।

—পুতুলটাকে তারা কেউ চায়নি—হলো কি জান? সেবার চেঞ্জে যাবার সময় তাদের দূর সম্পর্কের জাড়তুতো বোন টুনু যখন খোকা-পুতুল, খুকু-পুতুল, বুড়ী-পুতুল, আর রকমারী খেলনাতে বাক্স বোঝাই করলে, তখন সে ঐ পুতুলটাকে এক পাশে সরিয়ে দিলে। পুতুলটা হচ্ছে একটা সেপাই, হাতপা মাথাটা কাঁচের, দেহটা টিনের, কোমরে তরওয়াল, পরণে খাকী কাপড়ের তৈরী হাফ প্যাণ্ট সার্ট, অযত্নে ধূলো জমে ময়লা হয়ে গেছে। কাঁচের চোখ দুটো নীল, আগে নড়তো এখন নড়েনা, টুনুর অযত্নে ভেতরের তারে তারে জং আর মরচে ধরে গেছে কিনা তাই। ভাবছো টুনুর ও পুতুলটার অমন দুরাবস্থা কেন? টুনু ওটাকে একদম দেখতে পারে না—ওটা যে সেপাই, তাই ওর ওকে একটুও পছন্দ নয়। ওর কলকব্জা যখন ভাল ছিল—তখন না'কি ওর কাজই ছিল কথায় কথায় খাপ থেকে তলওয়ার বার করা—টুনুর এ সব একটুও ভাল লাগে না।

সে হলো পুরো সংসারী, তার ভাল লাগে টোপর পরা শান্ত শিষ্ট 'বর' সাজা পুতুলটা, কনে-বউ পুতুলটি, খোকা পুতুল এই সব। তাই তার এত অযত্ন! বেচারা সেপাই কি না?

যাক টুনু যখন সেপাই পুতুলটাকে তার বাক্সে না তুলে ওভাবে একপাশে সরিয়ে দিলে—রুনুর ভারী ইচ্ছে হলো টুনুকে ব'লে সে ঐ পুতুলটা চেয়ে নেয়—কারণ তার দাদাই আসলে ঐ পুতুলটা কিনে এনেছিল একদিন রুনুকে দেবার জন্যই—কিন্তু সেদিন টুনু বায়না করে রুনুর পাওনা পুতুলটা জোর করে দখল করে নেয়—সেই থেকেই রুনুর বদলেই টুনুই পুতুলের মালিক হয়েছে। রুনু ঝগড়া করে টুনুকে কষ্ট দেয়নি কিন্তু সেদিন—এতো লক্ষ্মী মেয়ে! আজ তার আবার লোভ হলো পুতুলটার ওপর।

রুনু পুতুলটার দিকে হাত বাড়িয়েছে যেমনি—ঝুনু অমনি কষে এক চিমটি দিলে রুনুর গায়ে—ঝুনুর চোখের দিকে তাকিয়ে রুনু বুঝলো যে ঝুনুর ইচ্ছে নয় যে, টুনুর কাছ থেকে সে ভিখিরীর মত ঐ পুতুলটা চেয়ে নেয়। ঝুনু ভারী অভিমানী আর তেমনি তেজী মেয়ে!

যাক রুনু আর সেখানে এক মিনিট বসতে পারলে না—তার ভারী কষ্ট হলো মনে—তার পাওনা জিনিষ অপরে বায়না করে কেড়ে নেবে—তা না হয় নিলে নিক, কিন্তু যখন সে জিনিষটাকে অবহেলা করে ফেলে দিয়ে যাবে কেউ, তখনও তার সেটা কুড়িয়ে নিয়ে যত্ন করার অধিকার তার নেই! ঝুনুটা মান অপমান নিয়েই

গেল ! যার যেটা ভাল লাগে সেটা না পেলে যে কত কষ্ট হয়, তা ঝুনুটা একটুও বোঝে না, ছেলেমানুষ কিনা তাই ! টুনুর কাছ থেকে চাইলে দোষটা কি হোত শুনি ? এসব কথা ভাবতে ভাবতে রুনু ছাদের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর কখন যে টুনু তার পুতুলের সংসার গুছিয়ে নিয়ে তার মা বাবা কাকা দাদা দিদিদের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে ইষ্টিশনে তা সে টেরও পায়নি।

—হঠাৎ কার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল—'দিদি'।

রুনু চমকে উঠে চোখ মুছে দেখে 'ঝুনু'—আর তার বুকের মধ্যে লুকোনো সেই সেপাই পুতুলটা। রুনু সেপাই পুতুলটাকে দেখে খুব খুশী হয়ে উঠলো—কিন্তু পাছে আবার ঝুনুর কাছে বকুনী খেতে হয় তাই বললে—"জেঠিমারা চলে গেল, তুই আমায় ডেকে দিলি না ? ওরা কি মনে করবে বলতো ?"

—"ছাই মনে করবে,—আমাদের জন্যে ওদের ভেবে ভেবে ঘুম হচ্ছে না যেন। বাবা নেই, তাই না আমরা ওঁদের আশ্রয়ে থাকি, কত কষ্ট আমাদের তবু ওদের দয়া হয় না দিদি ! টুনুদিটার কি তেজ ! ভজহরিকে ডেকে বললে কি জান ? বললে, 'ভজহরি এই সেপাই পুতুলটাকে ঐ খোলার ঘরের ক্ষেন্তিঝির মেয়েটাকে দিয়ে আয়।'—উঃ তবু আমাদের হাতে তুলে দিতে ওর বুক কর্ কর্ করে !"

রুনু দেখলে ঝুনুর চোখে জল ! বললে "তোর বুকের তলায় ওটা কি লুকিয়ে রেখেছিস রে ?"

ঝুনু চোরের মত ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে 'সেপাই পুতুলটা'।

—রুনু বললে—"কেন আনলি ওটাকে ? ভজহরিকে দিয়ে পাঠিয়ে দে এখুনি ক্ষেন্তিঝির মেয়েটার কাছে—আমার চাই না !"

—"বারে ! বেশ যাহোক লোক তো তুমি—ক্ষেন্তির মেয়ে বুঁচি ওর কদর কি বুঝবে—এমন সুন্দর একটা বীরকে নিয়ে আস্তাকুঁড়ের নর্দ্দমার ধারের খেলাঘরে রেখে দেবে—হয়তো ওর রেশমের মত চুলগুলোতে উকুন এসে বাসা বাঁধবে ! এত তোমার খুব আনন্দ হবে ? ওঃ তবে দেখছি তুমিও টুনুদির মত সেপাই পুতুলটাকে দেখতে পার না ?"

—রাগে রুনু গর্জ্জে উঠলো—"না দেখতে পারি না ! এই সামান্য পুতুলটার লোভেই তো আমার এত অপমান ! যা এখ্খুনি দিয়ে আয় ওকে ক্ষেন্তি ঝির মেয়ের কাছে ! এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।"

ঝুনু ছেলেমানুষ, এসব দেখে শুনে একেবারে অবাক ! দিদিকে ভালবাসে বলেই না সে ঐ সেপাই পুতুলটাকে ভজহরির কাছ থেকে কাকুতি মিনতি করে চেয়ে নিয়ে এসেছে। বেশ ! আজ থেকে তার দিদির সঙ্গে ঝগড়া ! একদম আড়ি ! দিদি যদি নাই যত্ন করে পুতুলটার, সেই করবে যত্ন। তবু কিন্তু কিছুতেই ঐ আঁস্তাকুড়ের খেলাঘরে পাঠাবে না তার দিদির পুতুলটাকে।

—ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝুনু দেখে দিদি ছাদের এক কোণে বসে তার পোষা বেড়াল ছানাটাকে নিয়ে খুউব আদর করছে—সে আর সেদিকে না তাকিয়ে রুনুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—"খবরদার সেপাই পুতুলটার গায়ে কিন্তু আর একবারও হাত দিতে পাবে না—ওটা নিয়ে তুমি একটুও খেলা করতে পারবে না কিন্তু !" বলেই ঝুনু গট্ গট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে।

—রুনু বললে—"হুঁ তাই হবে !"

এই ভাবেই ঝগড়ার সূত্রপাত হলো।

ঝুনুটা ভীষণ অভিমানী—রুনুর অবিশ্যি রাগটা দুঃখেরই তাই সে ভাব করতে চায়। ছলছুতো করে



একাজ সে কাজের কথা জিগ্যেস করে ঝুনুকে, ঝুনুকে তার জবাবে যেটুকু না বললেই নয় সেটুকু বলেই পাশ কাটায়। সেপাই পুতুলের কথা জিগ্যেস করতে রুনুর কিন্তু ভারী লজ্জা হয় !

রুনু কিন্তু তক্কে তক্কে থাকে কোথায় কখন ঝুনু তার সেই সেপাই পুতুলটাকে নিয়ে খেলতে বসে—একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পেলে ঝুনু যেন কাকে বুঝিয়ে বলছে—'তুমি রাগ কর না দিদির ওপর, দিদি তোমায় খুব ভালবাসে—শুধু টুনুদির ওপর অভিমান করে ও তোমার সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছে—আর তাইতো আমিও তোমার হয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া করে দিয়েছি। দেখছ তো টুনুদির অবহেলায় তোমার চোখ নড়তো না, হাত নড়তো না—তোমার ভেতরের কলকব্জাগুলো সব মরচে পড়ে বন্ধ হয়ে গেচলো। এখন আমি কেমন তোমাকে সারিয়ে তুলেছি—তুমি চোখ চাইতে পার, চোখ বুজতে পারো—খাপ থেকে তরওয়াল বার করে আবার খাপে তরোয়াল রাখতে পারো। সাবান দিয়ে কেচে দিয়েছি তোমার ময়লা পোষাকগুলো—রেশমের চুলগুলো কেমন আঁচড়ে পরিষ্কার করে দিয়েছি। দিদি কিন্তু এসব কিছু জানে না, টুনিদিও এ সবের খবর রাখে না। ওরা যেদিন এ সব টের পাবে—তখন হয়তো দেখবে রুনুদিটাই তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইতো। টুনিদি ! সে'ও মধুপুর থেকে হয়তো লিখে পাঠাবে তোমাকে প্যাক করে তার কাছে ফেরৎ পাঠাবার জন্য। তখন তুমি নিশ্চয় ভুলে যাবে এই ছোট্ট ঝুনুর কথা।"

—রুনু লুকিয়ে দেখলে সত্যিইতো ! ঝুনুর যত্নে সেই সেপাই পুতুলটা আগের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর হয়ে উঠেছে। সে আর থাকতে পারলেনা চুপ্ করে।—হঠাৎ কি মনে হলো। ঝুনুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে "টুনুকে আজই লিখে দিচ্ছি যে তোমার হাতে পড়ে তার 'সেপাইপুতুল'টা কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাহলে দেখবি ঠিক সে ফেরৎ চেয়ে বসবে তার পুতুলটাকে। ঝুনু বললে—"বেশতো ! ফেরৎ চায় টুনুদি, নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে দোব—কিন্তু তোমাকে কিছুতেই আর নিতে দেব না সেপাই পুতুলটাকে।"

—রুনুর একসঙ্গে রাগ আর দুঃখ দুইই হলো—সে ঝুনুর ওপর রাগের ঝালটা ঝাড়বার জন্যে তখ্খুনি ওপরে গিয়ে টুনুকে একটা পোষ্টকার্ডে লিখলে—"ভাই টুনু, তোর সেপাই পুতুলটার কথা মনে আছে ? সেটা তুই ক্ষেন্তির মেয়ে বুঁচিকে দেবার জন্যে বলেছিলিতো—ঝুনু কিন্তু ভাই সেটা তাকে দেয়নি—সেটাকে ঝেড়ে পুঁছে তার ভেতয়ের কলকব্জাগুলোকে চালু করে তুলেছে। আমি কিন্তু সেপাই পুতুলটা নিয়ে একটুও খেলা করি না—কারণ পুতুলটাতো তোরই, আমারতো নয় ! আমরা সবাই ভাল আছি তোরা কেমন আছিস্ ! পুতুলটার জন্য তোর নিশ্চয় খুব মন কেমন করে ? আমি বড় হয়েছি কিনা তাই আমার পুতুল নিয়ে খেলতে আর একটুও ভাল লাগে না। ভাল লাগে বই পড়তে, ভাল লাগে দেশের কাজ করতে। ভালবাসা নিস—তোর 'রুনু'।"

বিকেলবেলা ভজহরিকে দিয়ে রুনু ডাকে দিয়ে দিলে চিঠিটা। ঝুনু এসব কিছু টের পেলেনা।

—ওদিকে দিদির শাসানীতে অভিমানী ঝুনুর অভিমানটা গেল আরও বেড়ে—বটে ! ইচ্ছেটা তার হলো দিদিকে না জানিয়ে সেদিনই সে সেপাই পুতুলটাকে পাঠিয়ে দেয় টুনুদির কাছে। কিন্তু ছেলেমানুষ ঝুনু কি করে পাঠাতে হয়, তাতো জানে না, তার মনে হলো পুতুলটাকে বুঝিয়ে বলবে, রাতে পরী হয়ে উড়ে যেতে। মার কাছে সে গল্প শুনেছিল তাতে রূপনগরের রাজকন্যের ক্ষীরের পুতুলটা নাকি রাতের বেলা জ্যান্ত রাজপুত্তুর হয়ে উঠেছিল। শোবার সময় চুপিচুপি সে বাইরে জানালার কার্ণিশে রেখে দেবে

সেপাই পুতুলটাকে—আর তাকে বুঝিয়ে বলবে, হাওয়ায় উড়ে উড়ে চলে যেতে টুনুদির কাছে। পুতুলটার ওপর তার ভারী মায়া পড়ে গেছে—তাই তার মনে ভারী কষ্ট হলো ওসব কথা ভেবে।

—যাক রাত্তির বেলা মা দিদি সবাই যখন অঘোর ঘুমে- অচৈতন্য—তখন চুপি চুপি বাক্স থেকে সেপাই পুতুলটাকে বার করে নিয়ে তার কানে ফিস্ ফিস্ করে বললে—'আমি যখন ঘুমিয়ে পড়বো—তখন তুমি সেই গল্পের পুতুলের মতই জ্যান্ত হয়ে টুনুদির কাছে চলে যেও মধুপুরে—মধুপুরের রাস্তা চেনত? এক কাজ করো সোজা হাওড়া ইষ্টিশনের লাইন ধরে উড়ে চলে যেও। টুনুদি তোমাকে পেয়ে কত খুশী হবে—পরেতে টুনুদিকে বলো আমরা তোমায় কষ্ট দিইনি কোনও।' এত কথা বললে ঝুনু অমন মিষ্টি করে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ বোবা সেপাইটার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না। বেরুবে কি করে বলো? 'পুতুল' পুতুলই! সবই তার আছে নেই শুধু কথা বলবার ক্ষমতা! তাই সে কিচ্ছু বললেনা। তাই জানালার বাইরে কার্ণিশে সে দাঁড়িয়ে রইল, ঠিক যেমনটি করে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে ঝুনু। শুধু একবার তার কলকব্জার শেষ দমটুকুর জোরে তার টিনের তরওয়ালটা একবার খাপ থেকে বার করে আবার রেখে দিলে। ঠুন্‌কো সেপাই পুতুলটা বোধ হয় ঝুনুকে শেষ সেলাম জানালে। ঝুনু তাতেই মহা খুশী হয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুমপাড়ানী মাসী পিসিরা তার চোখে দিয়ে গেল ঘুম্।

ভোর রাত্তিরে ঝুনু স্বপ্ন দেখলে—সেপাই পুতুলটা মানুষের মত হয়ে উঠে দূর থেকে বলছে—"ছোট্ট ঝুনু দিদি, তোমাদের আদর যত্নের কথা চিরদিনই মনে থাকবে কারণ তোমরা পুতুল নিয়ে শুধুই খেলা করতে না ভাই, সেপাই পুতুলটাকে সত্যিকারের সেপাইদের মতই জ্যান্ত করে তুলতে চেয়েছিলে—তা কিন্তু হয় না দিদি!"

—ঝুনু স্বপ্নের ঘোরে বললে—"বারে! কেন হবে না! এইতো মানুষ হয়েছ তুমি, কে বলবে তোমাকে পুতুল? মুখ ফুটে আমায় দিদি বলে ডাকলে এত কথা বললে যে!"

"—সব ভুলে যেতে হবে—আমি যে 'পুতুল', তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার অধিকার নেই, এবার যাই!"

—ঝুনু স্বপ্নের ঘোরে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো "সেপাই পুতুল, সেপাই পুতুল ভাই!"

—নিশুতি রাতের বাতাসের প্রতিধ্বনি বললে 'সব ভুল! নাই সেতো নাই।"

—রুনু পাশেই শুয়েছিল, সে ঝুনুর চীৎকারে জেগে উঠে জিগ্যেস করলে—"কিরে ঝুনু চেঁচাচ্ছিস কেন? স্বপ্ন দেখেছিস বুঝি!"

—ঝুনু দিদির কোনও কথার জবাব না দিয়ে শুধু চেয়ে দেখলে জানালার দিকে—দেখলে সেখানে সেপাই পুতুলটা নেই। চোখ থেকে দুফোঁটা জল তার ছোট বালিশটার ওপর গড়িয়ে পড়লো। পাছে দিদি কিছু টের পায়, সে চট করে উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুলো।

সকালে উঠে ঝুনু খুব গম্ভীর—কিন্তু সে আগের দিনের রাত্রের কোনও ঘটনার কথাই বললে না তার দিদিকে—পাছে দিদির মনে কষ্ট হয়।

—রুনুও ঝুনুর কাছে তার টুনুকে লেখা চিঠিটার কথা ভাঙলে না, পাছে রুনুর মনে ঘা লাগে।

কদিন ধরে এই ভাবেই মান অভিমান নিয়ে দুটি বোনের দিন কাটে। রুনুর ভারী ইচ্ছে লুকিয়ে



লুকিয়ে ঝুনুর 'পুতুল খেলা'টা আর একবার দেখে। শুনতে চায় বোবা পুতুলের সঙ্গে সেদিনের মত ছোট্ট ঝুনুর মিষ্টি কথাবার্ত্তা আর আলাপ। কিন্তু ঝুনু তারপর থেকে সব সময়ে দিদির সামনে সামনেই ঘুরে বেড়ায় অর্থাৎ সে দিদিকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে 'পুতুল খেলা'র সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো—অপরকে পুতুলটি নিয়ে খেলা করতে দেওয়া। তা যারা না জানে তারা 'পুতুলে'র কদর এতটুকুও বোঝে না!

—এতে রুনুর কিন্তু ঝুনুর ওপর রাগটা সত্যি সত্যিই ভয়ানক বেড়ে ওঠে—ইচ্ছে হয়—ঝুনুর চুলের মুঠিটা ধরে কষে চেপে ধ'রে তাকে ধমকে বলে—"কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস সেপাই পুতুলটাকে, শিগ্‌গিরী দেখা আমাকে।"—কিন্তু পারেনা পাছে তার দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে। ঝুনু ছেলেমানুষ কাজেই ঝুনু যদি পুতুলের সেবায় দিনরাত্তির লেগে থাকে তাকে কেউ দোষ দেবে না—কিন্তু সে যদি ঝুনুর মত সেপাই পুতুলটাকে নিয়ে খেলা করতে বসে—কিংবা ঠিক ঐ ঝুনুর মতই আবোল তাবোল বকতে সুরু করে পুতুলটার সঙ্গে—তাহলে সবাই বকবে—মা দাদা হয়তো বকবেন, বলবেন "রুনু বড় হয়েছিস এখন, দুদিনবাদে শ্বশুরবাড়ী যাবি, পুতুল নিয়ে পাগলামী তোর কি সাজে?"

—রুনু ভাবে সত্যিই তো! ভালো আপদ হয়েছে ঐ সেপাই পুতুলটা! টুনুওতো পুতুলটা ফেরৎ চেয়ে পাঠাচ্ছে না এখনও!

—ঝুনু ভাবে—টুনুদিটাতো আচ্ছা লোক! পুতুলটা যে গিয়ে পৌছল তার কাছে, সে খবরটাও একটা চিঠি লিখে জানালে না!

ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা দুটী বোনের বুকেই দারুণ অস্বস্তি! দুজনেই তাদের ঝগড়া মিটিয়ে নিতে পারে পুতুলের দায়ীত্ব থেকে মুক্তি পেলেই!

—যাক টুনুদির চিঠি আর এলোনা, দু'দিন পরেই টুনুদিরা সদলবলে মধুপুর থেকে ফিরে এলেন গরমের ঠেলায়। টুনু গাড়ী থেকে নেমেই ছুটলো ওপরে এক দৌড়ে 'রুনুর' কাছে—"রুনু, দেখি দেখি আমার সেপাই পুতুলটা—দেখি কেমন সুন্দর হয়েছে। কেমন চোখ নাড়ছে!"

—ঝুনু তখন ছাদের টবে ছোট্ট একটা হাসুহানার গাছে জল ঢালছিল একমনে—হঠাৎ টুনুর গলার শব্দ—আর তার ঐ সব কথা শুনে চমকে উঠলো সে, তবে কি সেপাই পুতুলটা টুনুদির কাছে ফিরে যায়নি!

—রুনু কাঁপা গলায় অনেক দিন পরে ডাকলে—'ঝুনু'—

—ডাক শেষ হবার আগেই ঝুনু ছুটে গেল টুনু রুনুর সামনে—

—রুনু বললে—"ঝুনু লক্ষীটি, টুনুদির পুতুলটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ওকে এনে দে, ওর জিনিষ যখন ফেরৎ চাইছে, ওকে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত তোর!"

—ঝুনুর মুখে কথাটি নেই! চোখে তার জল, টলমল। লজ্জায় মুখখানা তার লাল—সে শুধু রুনুর গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়ালো—চেপে ধরলে রুনুর হাতটা!

—টুনু অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠলো—"বুঝেছি, ঝুনু আমার পুতুলটা ফিরিয়ে দেবে না? আচ্ছা জামা কাপড় ছেড়ে আসি, তারপর দেখবো"—এই বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—তারপর! ঝুনু আস্তে আস্তে তার দিদি রুনুর কাছে সেদিন রাত্তিরে যা যা ঘটেছে সব কথা বললে। পুতুলটা জ্যান্ত হয়ে উঠে স্বপ্নে কি কি বলে গেছে, সব বলে ফেললে, যে বলে সেও কাঁদে, যে শোনে সেও চোখের জলে ভাসে। আর যেন রুনু ঝুনুতে এতটুকু ঝগড়া নেই!

—রুনু সব শুনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে! তাইতো! এখন উপায়!

—রুনুর বুঝতে বাকি রইলো না যে জানলা থেকে সেপাই পুতুল কোথায় পালিয়েছে। সে ঝুনুকে বললে "কোন জানালার, কোনখানটায় রেখেছিলি পুতুলটাকে দাঁড় করিয়ে?" ঝুনু ছুটে গিয়ে তাদের ঘরের সেই জানালাটা দেখিয়ে বললে—"এইখানে ঠিক এইখানটাতে।"

—রুনু বললে "বুঝেচি—চ' এখন নীচে বাগানে যাই!"

—ঝুনু বললে—"বাগানে কেন?"

—রুনু বললে—"সেপাই পুতুলের খোঁজে।" দুজনে দুর দুর করে সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নেমে গেল—গিয়ে দেখে সেপাই পুতুলটার কাঁচের হাতপাগুলো ভেঙে চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে, মাথাটা তার ধড় থেকে আলগা হয়ে একপাশে ঝুলছে।

ঝুনু আর রুনুর মুখে একটি কথা নেই! খালি চোখ ভরা জল।

এমন সময় টুনুও সেখানে এসে দেখলে সেপাই পুতুলটার অবস্থা! সে রাগে চীৎকার করে উঠলো—"হিংসুটে মেয়েরা পাছে ফিরিয়ে দিতে হয় পুতুলটা, তাই ওপর থেকে ফেলে ভেঙে তবে নিশ্চিন্ত হলি? যাচ্ছি আজ একটা হুলুস্থুল করে তবে ছাড়বো! মাকে বলে এবাড়ী থেকে বিদেয় করবো তোদের! বলেই সে ছুটে গেলো বাড়ীর ভেতর। অন্দর মহলে সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো টুনুর মা'র চীৎকার আর গালাগাল। এ গালাগালির একটি কথাও কিন্তু রুনু ঝুনুর কানে পৌঁছল না।

তখনও রুনু আর ঝুনু সেই ভাঙা হাতপাগুলোকে কুড়িয়ে আগের মতন গোটা করতে চাইছে সেপাই পুতুলটাকে। চোখ দিয়ে দুজনেরই গড়িয়ে পড়ছে মুক্তোর মত ফোঁটা ফোঁটা জল।

সেপাই পুতুলের অশ্রুহীন অপলক চোখ দুটো—তাদের এই পুতুল খেলা দেখতে পেলে কিনা তা সেই জানে।

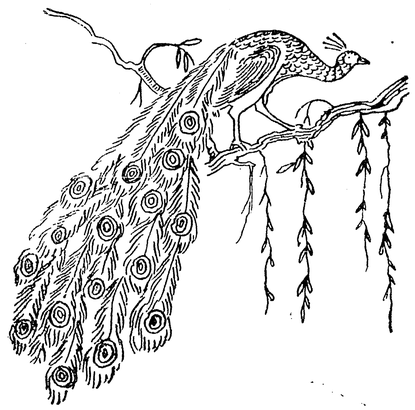

# যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

## তুলসীদাস

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

তুলসীদাসের রামায়ণ আর্য্যাবর্ত্তের ঘরে ঘরে ধর্ম্মগ্রন্থরূপে পঠিত হয়। আজ পর্য্যন্ত ভারতের কোন কবির রচনা জনসাধারণের মধ্যে এত বেশি সমাদর লাভ করে নাই। তুলসীদাসের জন্মস্থান কোথায় তাহা ঠিক বলা যায় না, কোন বৎসরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও বলা শক্ত। তবে অনেকের মতে ১৫৮৯ সংবতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তুলসীদাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম পরশুরাম মিশ্র। সরযূ নদীর উত্তরে মঘৌলি নামক স্থানের নিকটে ইহার নিবাস ছিল। তীর্থদর্শনের জন্য চিত্রকূটে গমন করিলে ইনি একটি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হ'ন। এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া ইনি তীখনপুরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তীখনপুরের রাজা ইহাকে রাজাপুরে ভূমিদান করেন। সেই হইতে পরশুরাম রাজাপুরের অধিবাসী হ'ন। এখানে থাকিবার সময়ে বৃদ্ধ বয়সে ইহার একটি পুত্র জন্মে। রাজাপুরের লোকদের আচার ব্যবহার ছিল বড়ই দূষিত—সেজন্য তিনি রাজাপুর ত্যাগ করিয়া শেষ জীবনে কাশীধামে বাস করেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

পরশুরামের পুত্রের নাম শঙ্কর। শঙ্করের পুত্র রুদ্রনাথ, রুদ্রনাথের পুত্র মুরারি। মুরারির পুত্র তুলারাম বা তুলসীদাস। তুলসীদাসের পিতা মালাবার প্রদেশে গিয়া বাস করেন। সেখানে তুলসীদাস রামানন্দ শাখার বৈষ্ণবাচার্য্য নরহরিদাসের নিকট রামায়ণ ও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

তুলসীদাস তিনটি বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর নাম রত্নাবলী, কনিষ্ঠার নাম বুদ্ধিমতী। তুলসীদাসের বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। তুলসীদাস তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নীকে খুবই ভালবাসিতেন—একদিনও তাঁহাকে কাছছাড়া করিতেন না। ফলে পত্নীর পিতৃগৃহ যাওয়াও ঘটিত না। একদিন গোস্বামী প্রভু গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন—সেই সময়ে তাহার শ্যালক আসিয়া তাহার ভগিনী বুদ্ধিমতীকে নিজগৃহে লইয়া গেল। গোস্বামী গৃহে ফিরিয়া পত্নীকে না দেখিয়া সন্ধানে জানিলেন—ঘণ্টা খানেক আগে তিনি ভ্রাতার সঙ্গে বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। তুলসীদাস তখন স্নানাহার না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্বশুরবাড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন। মধ্যপথে তিনি তাঁহার পত্নীর শিবিকা দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি শিবিকার পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন—পত্নী এতদূর আসিয়া আর ফিরিয়া যাইতে রাজী

হইলেন না। তুলসীদাস তবু ফিরিলেন না—শিবিকার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পত্নী তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমি সামান্য মানুষ, আমার প্রতি এত অনুরাগ তোমার, এতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। এই অনুরাগ-যদি তোমার ভগবান ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হত—তবে তুমি ভববন্ধন হতে মুক্তিলাভ ক'রতে।"

পত্নীর এই তিরস্কারেই তুলসীদাসের মন পরিষ্কার ছইয়া গেল—তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে গিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করিতে লাগিলেন। বারাণসী হইতে তিনি চিত্রকূটে গিয়াও কিছুকাল সাধন ভজন করেন। কাশীধামে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী বুদ্ধিমতী সেখানে গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তুলসীদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তারপর পত্নী বলিলেন—"যদি ফিরে না যাও তবে আমাকে তোমার সেবা কর্‌বার অধিকার দাও।" তুলসীদাস বলিলেন—"আমি শ্রীরামচন্দ্রের সেবক, আমি আবার অন্যের সেবা কি ক'রে নেব? তুমি বাড়ী যাও, তোমাদের অন্নবস্ত্রের দুঃখ নেই—সে ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি। আমার ভিক্ষান্নের ভাগ নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না।"

তুলসীদাসের একটি ঝুলি ছিল—তাহাতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিস সঞ্চিত থাকিত। গোস্বামী সেই ঝুলিটিকে কাছছাড়া করিতেন না। পত্নী বলিলেন—"গোঁসাই, তুমি যখন তোমার ঝুলির মায়া কাটাতে পারছ না—তখন আমাকে তোমার ছাড়া উচিত নয়।" গোঁসাই একথা শুনিয়া তখনি ঝুলি ত্যাগ করিলেন—তাহার মধ্যে যাহা কিছু ছিল সব বিতরণ করিয়া দিলেন।

কথিত আছে কতকগুলি তস্কর তুলসীদাসের আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

কাশীতে অবস্থানকালে গঙ্গারাম নামক এক জ্যোতিষীর সহিত তুলসীদাসের বন্ধুত্ব হয়। গহরবার সিংহ নামক এক রাজা কাশীধামে বাস করিতেন—তাঁহার নিকট গঙ্গারাম বৃত্তি লাভ করিতেন। রাজকুমার শিকার করিতে গিয়া আর ফিরিলেন না—রাজার উৎকণ্ঠার অবধি নাই। রাজা গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে বলিলেন—"আমার পুত্রের সংবাদ তোমাকে গণনা ক'রে বলে দিতে হবে। সত্য হলে লক্ষ টাকা পুরস্কার। মিথ্যা হলে কিন্তু শিরশ্ছেদ।" গঙ্গারাম ভ্যাবা গঙ্গারাম হইয়া গেলেন। তিনি তুলসীদাসকে বিপদের কথা জানাইলেন। তুলসীদাস ছয় ঘণ্টা গণনার পরে বলিলেন—"যাও রাজাকে গিয়ে বল'গে—পরশ্ব দিন এক প্রহরের মধ্যে কুমার ফিরে আস্‌বেন।" তুলসীর কথাই ঠিক হইল। রাজা গঙ্গারামকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেন। তুলসীদাস সেই অর্থের অর্দ্ধাংশের দ্বারা স্থানে স্থানে হনুমানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।



তুলসীদাস ১২৭ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন। তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে তুলসীদাসের ভক্ত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তুলসীদাস বাল্মীকির রামায়ণ ও অন্যান্য রামায়ণের সারাংশ লইয়া তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন। তুলসীদাসের রামচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম নারায়ণ, সীতাদেবী নারায়ণী। বাল্মীকির রামায়ণে যেখানে সেখানে রাম সীতার সম্বন্ধে অমর্য্যাদাকর কথা আছে—তিনি তাহার সবই বর্জ্জন করিয়াছেন। রাক্ষস সাক্ষাৎ নারায়ণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে ইহা অসহ্য। অথচ সীতাহরণ একেবারে বাদ দিলে রামায়ণই হয় না। তুলসীদাস লিখিলেন—সীতা অগ্নি-মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন—রাবণ ছায়া-সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। অগ্নিপরীক্ষার সময় ছায়া-সীতা পুড়িয়া মরিল। আসল সীতা অগ্নি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তারপর অযোধ্যার পুরবাসীরা সাক্ষাৎ নারায়ণীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিবে আর রামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া সাধ্বী সতীকে বনবাসে প্রেরণ করিবেন—ইহাও বড় অবমাননাকর—ভক্তি রসের বড়ই বিরুদ্ধ। তিনি তাই তাঁহার রামায়ণে এই সমস্ত বাদ দিয়াছেন। তুলসীদাসের সীতাকে লবকুশের জননী হইয়া সভামধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য দাঁড়াইতে হইবে—ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। বাল্মীকি জয়ন্তকাকের উপাখ্যানে লিখিয়াছেন—কাক সীতাদেবীর বুকে আঁচড় দিয়া পলাইল। ভক্ত কবি বুকের স্থলে চরণ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে আছে, বালী মরণ কালে রামচন্দ্রকে অনেক কটু কথা বলিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে বালীর পত্নী তারাও রামচন্দ্রকে বহু কটু কথা বলিতেছে। তুলসীদাস পরের মুখ দিয়াও আপন প্রভুকে কটু কথা বলাইতে পারেন নাই। বালী কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"প্রভু আমাকে কেন বধ করলে?" রাম বালীর অপরাধের কথা বুঝাইয়া দিলে, বালী শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিয়া হাস্য মুখে জীবন ত্যাগ করিল। পত্নী তারা বালীকেই দোষ দিল। তুলসীদাস কোথাও রাম-সীতার গৌরব হানি হইতে দেন নাই।

তুলসীদাসের রামায়ণ কাব্য হিসাবেও চমৎকার। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত ইহা সাধারণ পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত নয়। বহু প্রকারের সুমধুর ছন্দে এই রামায়ণ রচিত। প্রাকৃত পিঙ্গলে যে দোহা, চর্চ্চরী, ভরহাট্টা, বৃত্তনরেন্দ্র ইত্যাদি ছন্দের লক্ষণ দেওয়া আছে—সেই সকল ছন্দে এই রামায়ণ রচিত। বাংলায় ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব কবিতায় এই সকল ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলির ছন্দোহিল্লোল অপূর্ব্ব। সুর করিয়া পড়িলে মনে হয় কান জুড়াইয়া গেল। পণ্ডিতেরা তুলসীদাসের রামায়ণকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া আদর করেন এবং সাধারণ লোক ইহাকে ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করিয়া পরম ভক্তিভরে ইহার পাঠ শ্রবণ করে।

# যদুবংশ কেন ধ্বংস হোলো ?

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্যামবাজারের এক রেস্তরাঁয় বসে আছি এক বিকেলে, এমন সময় আমাদের হৃষীকেশ হেল্‌তে দুল্‌তে এসে হাজির ? সশরীরে একেবারে আমার সম্মুখের চেয়ারটাতেই !

"আরে, হৃষীকেস্ যে !" বল্লাম আমি ; তার দর্শনলাভে উল্লসিত হবার কোনো অভিনয় না করেই আমি বল্লাম। সত্যি কথা বল্‌তে, টোস্‌টের ওপরের ডিমের পোচ কিভাবে সুবিস্তৃত হচ্ছে তখন আমার একমাত্র দ্রষ্টব্য ছিল—ও ছাড়া আমার চোখের সামনে অন্য কিছু দেখবার লালসা তখন আমার ছিল না।

"এই যে !" বলে হৃষীকেশ খালি চেয়ারটার কোণায় কোণায় জমাট হয়ে বস্‌ল। "তারপর ? কাগজে পড়োনি নাকি ?"—এই বলে' পোচের ওপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে কানের কাছাকাছি এসে ফিস্‌ফিস্ করল হৃষীকেশ : "রাস্তাঘাটে এধারে ওধারে চারধারেই ফিফ্‌থ্ কলম্‌রা গিস্‌গিস্ করচে যে। জানো না নাকি ?"

"জানিনে, মানে ?" পোচের আওতা থেকে যতটা সম্ভব ওকে দূরে রেখে আমি জানালাম : "এখানে বসেই পাচ্ছি। এই রেস্তরাঁতেই। আমার পরে এসে আমার আগে সার্ভ্‌ড্ হয়ে চলে যাচ্ছে। স্বচক্ষেই তো দেখ্‌চি !"

"এইখেনে ? এই রেস্তরাঁতেও ?··· পঞ্চমবাহিনী ?" চোখ বড় বড় করে' হৃষীকেশ একটু নড়ে বস্‌ল।

"কেন, ঐ 'বয়'দেরই ছাখো না ! আধঘণ্টা ধরে তলব করে' টোস্‌ট পেলাম। তারপরে পনের মিনিট ধরে চেঁচামেচি করে এই পোচ্ পেয়েচি—তারপর কতক্ষণ থেকে চায়ের জন্যে ইসারা ইঙ্গিত কর্‌চি কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করচে কি ?"

"এরা—এরা পঞ্চমবাহিনী ?" ওর হাব ভাব দেখে মনে হয় নিজের চক্ষুকর্ণকে ও বিশ্বাস করতে পারছে না।

"তা না তো কি ? কোন্ বাহিনী তবে ?··· এদের—এদের পুলিসে ধরিয়ে দেয়া যায় ?"

"উহু। এরা নয়। আসল পঞ্চমবাহিনী।" হৃষীকেশ এবার নিজের মুখ পোচের ওপরে না এনে—একটা পোচকেই নিজের মুখের ওপর টেনে নিল।

"বর্ম্মার আম্‌দানী। একেবারে খাটি জিনিস। রেঙ্গুনের পতনের মূলে যারা—খবরের কাগজে পড়োনি ? সেই যারা আকাশে টর্চ্চ ফেলে জাপানী বোমারুদের ডেকে আন্‌ত হে !

"য়্যাঁ ? বলো কি ?" আমার হাঁ থেকে আধখানা পোচালো টোস্‌ট্ টেবিলের ওপরে পড়ে যায়—রোমন্থনের বিধি অমান্য করেই।



"হ্যাঁ, তবে আর বল্‌ছি কি ! সেই সব টর্চ্চার্—কিম্বা টর্চ্চারার্—যাই বলো !" চর্ব্বিত চর্ব্বণের সাথে সাথে হৃষীকেশ উদ্গীরণ করে : "আমাদের যাদবপুরের দিকটাতেই বেশী আরো।"

"যাদবপুর ! আরে, সেখানে আমার এক মামারা থাকেন যে !" টেবিলে না-পড়া পোচের বাকী অর্দ্ধেক আমার মাথায় উঠে যায়।—"কী সর্ব্বনাশ !"

"সর্ব্বনাশ বল্‌তে। তোমার তো মামারা থাকেন, আমার আবার মামার ভাগ্‌নে সেখানে আছে।" বল্‌তে না বল্‌তে আমার বিস্ফারিত চোখের ওপরেই হৃষীকেশ আমার প্লেট্‌টাকে ফাঁক করে আনে—টোস্‌টালো পোচের বাকী অংশকেও বেশীক্ষণ কারো মুখাপেক্ষা করতে হয় না।—"আমরাই থাকি কিনা সেখানে !"

হৃষীকেশের মামার ভাগ্‌নেদের—ওদের একজনের কার্য্যকলাপ দেখেই আমার চোখ কপালে ওঠে।

"তাহলে উপায় ? কী কর্ত্তব্য তাহলে ?" আমি জিজ্ঞেস করি। "পুলিসে খবর— ?"

"পুলিস ? পুলিসে কতোদিক সাম্‌লাবে ? এই যুদ্ধের হিড়িকে চার ধারে কতো তাল তাদের রাখতে হচ্চে, তার ওপরে যাদবপুরের স্থানীয় সমস্যা তাদের ঘাড়ে চাপানো কি উচিৎ হবে ? তার চেয়ে এসো, আমরা নিজেরাই সবাই মিলে এর বিহিত করি। একটা নগররক্ষী সমিতি গঠন করে' ফেলা যাক্।"

হৃষীকেশ ঐরকমই ! সমিতি বা সঙ্ঘ গড়বার এমন ভীষণ জোর ওর চাই যে কোনো কিছুর একটা ছুতো একবার পেলে হয় ! ফুটবল্-দর্শক-সমিতি, সর্ব্বদা-রাস্তার-বাঁদিক-দিয়ে-হণ্টনকারী-সঙ্ঘ, শঙ্খচক্র প্রতিযোগিতায়-যোগদানকারী-দল—এম্‌নি অনেক সঙ্ঘ-সমিতির ও জন্মদাতা। এমন কি, দৈনিক পত্রে ছাপবার জন্য নিয়মিত যারা চিঠি পাঠায় তাদের নিয়ে পত্র-প্রেরক সমিতি বলেও কী নাকি একটা ও খাড়া করেছিল—কিন্তু সংবাদপত্র-সম্পাদকের সহযোগিতার কার্পণ্যে সমিতিটা অবশেষে চিৎপাত হয়ে পড়ল। কোনো রকমে কিছু করেই দাঁড়ানো রাখা গেল না।

মাঝখানে সাবধানী-পথিকসঙ্ঘ নামে আরেকটা কী নাকি ও গড়তে গেছল—তার উদ্দেশ্য ছিল পিক্‌পকেটের কাঁচির থেকে ট্যাক্ বাঁচিয়ে চলা—অবস্থিত হস্তার্পণ থেকে আত্মরক্ষা করে' কি করে' সাবধানে পথে ঘাটে ঘোরাফেরা করা যায় তার জাজ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই ছিল সদস্যদের একমাত্র কাজ। এই কারণে তাদের জামার বক্ষস্থলে তিনরঙা ব্যাজ লাগানো থাক্‌ত—যাতে চলমান উদাহরণরা সহজে সবাইকার নজরে পড়ে। প্রথম প্রথম পিক্‌পকেটরা আপত্তি করে, হৃষীকেশকে ঘোরতর ভাবে শাসিয়ে দিয়েছিল পর্য্যন্ত। উড়োচিঠি ছেড়ে নোটিশ দিয়েছিল—এরকম করা ভালো হচ্ছে না ! এরকম করলে তারা হৃষীকেশের, কেবল পকেট নয়, জামার হাতা পর্য্যন্ত কেটে নেবে—এমন কি তার ভেতরে হাত থাকলেও দৃক্‌পাত করবে না। হৃষীকেশ তবু পেছয়নি, ভয় খাবার ছেলে নয় সে, কিন্তু শেষটায় সাবধানী পথিকরাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসে এলো পাথারি ঠ্যাঙাতে সুরু করে' দিল। না, কোনো পিক্‌পকেটকে নয়,—খোদ্ হৃষীকেশকেই।

কারণ ? পিক্‌পকেটদের অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে দল গড়া হলেও ওতেই ওদের খুব সুবিধা হয়ে গেল। জম্‌কালো মেঘের ভেতর থেকে চম্‌কানো রৌপ্য-রেখারা স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিতে লাগল। পকেট তো সবারই থাকে, কিন্তু সব পকেটে সব আর থাকে কি ? কজনের পকেট আর ট্যাক্‌শাল্ বলো ? অনেকেরই তো গড়ের মাঠ,—এই আমার যেমন ! সে সব পকেট থেকেও নেই, পকেটের ছলনামাত্র ! সেই সব নাম মাত্র পকেটে হস্তক্ষেপ করে' বদ্‌নাম কেনার দায় থেকে তারা বেঁচে গেল। আগে কারো পকেটে কিছু আছে কিনা চেষ্টা করে' জান্‌তে হোতো —এখন তো হৃষীকেশ তাদের সবাইকেই ব্যাজ্ লাগিয়ে মার্কামারা করে' ছেড়ে

দিয়েছে! এখন আর চেষ্টা করতে হয় না, কারা পকেট বাঁচাবার জন্যে তৎপর, চেষ্টা না করতেই জানা যায়। তারপর যতই সাবধানে থাকো না কেন—এক জনের পকেট আরেকজনের পকেটস্থ হতে আর কতক্ষণ?

দল তো ভেঙে গেলই, হৃষীকেশও সেই থেকে ভগ্নমনোরথ। তবে হৃষীকেশ চিরদিনই ভাগ্যবান, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, কন্‌সোলেসন্ প্রাইজ্ হিসেবে, একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস্ সে পেয়ে গেল—সেই সদল বলে ঠ্যাঙান্ খাওয়ার পর দিবসেই। কোনো এক অজ্ঞাত বন্ধুর উপহার নিশ্চয়ই,—কোনো অবজ্ঞাত বন্ধুদেরই, হয়ত বা! অবিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া বলে হৃষীকেশ কোনোদিন সেটা পরেনি—পরতে সাহস করেনি, দরজা জানলা সব ভালো করে এঁটে লুকিয়ে একদিন আমাকে দেখিয়েছিল। আর চুপি চুপি বলেছিল কেবল: "জেনারেলের বুক থেকে যারা এরকম একখানা হাতাতে পেরেছে তাদের সঙ্গে চালাকি করতে যাওয়া। ইয়ার্কি নাকি?"

হৃষীকেশ আমার সাম্‌নে বসে আবার নতুন দলে দলীয়ান্ নব বলে বলীয়ান হবার স্বপ্ন দ্যাখে আর আমি—আমি ওকে দেখি। এই হৃষীকেশ! বয়সে আমার দ্বিগুণ হলেও উৎসাহে আমার চতুর্গুণ! আমি সামান্য একটা কাট্‌লেট্‌কেই দলা পাকিয়ে মুখে তুল্‌তে কাহিল হচ্ছি—ছুরি দিয়ে কাট্‌তে পারি না আর ও কিনা, অম্লানবদনে, এতগুলো দুর্ঘটনার পরেও, আবার নতুন করে' দলাদলি পাকাবার মৎলব ভাঁজ্‌ছে!

হৃষীকেশ দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্ল: "নাঃ, এবার নামটা বেশ যুৎসই রাখ্‌তে হবে। অল্পের মধ্যে, অথচ নিখুৎ! আমার সর্ব্বদা-রাস্তার-বাঁদিক-দিয়ে-হন্টনকারী-সঙ্ঘ কেবল লম্বাচৌড়া নামের জন্যেই উঠে গেল। একদল বল্ল, উচ্চারণ করতে পারা যাচ্চে না, আরেকদল বল্ল, মনে রাখা ভারী শক্ত—আরেক দল বল্ল—আরেক দল কী বল্ল—?" হৃষীকেশ আমাকেই জিজ্ঞেস্ করে' বসে।

"বল্ল বোধ হয় যে এদলে নাম লেখালে তাদের বদ্‌নাম হবে?" আমি আন্দাজ করে' বলি।

"ঠিক তাই। তারা বল্ল যে হন্টনকারী সঙ্ঘের সভ্য বলে' জাহির হলে সবাই টের পেয়ে যাবে যে তাদের একদম্ মোটর নেই। আর কোনো কালে ছিলও না কখনো। সেটা ভয়ঙ্কর অপবাদ। আর এখন পেট্রোল কড়াকড়ির দিনে মোটর আছে কিন্তু চড়তে পারছিনে বলে' বেমালুম্ যখন নিজেকে চালানো যায়, তখন সে সুযোগের অপব্যবহার করাটা নেহাৎ বোকামি। এই বলে' সভ্যরা সব, বাকী চাঁদাটা না দিয়েই, ব্যাঙাচির ল্যাজের মত একে একে খসে গেল।"

"তাহলে উপায়?"

"তার আবার উপায় কি? সে দল তো মাঠে মারা গেছে, এখন এ ঘাটের কথা ভাবো? কী নাম দেখা যায় ভাবো দিকি? যাদবপুর রক্ষণাবেক্ষণ সমিতি—এই নামটা কি খুব সুবিধের হবে? আচ্ছা, যাদবপুর রক্ষোবৃন্দ—এটা কেমন? একটু রাক্ষস-রাক্ষস গন্ধ, তাই না? আচ্ছা, তাহলে একটু কাব্যি-কাব্যি নাম রাখ যাক্! যাদবপুর আর যদুপুর তো একই মানে, এক জিনিস তো, যদুপুরমধুমাছি—করলে খুব খারাপ হবে, অথবা, ধরো—"

অনেক ধরাধরির পর অবশেষে যদুবংশধর সমিতি এই নামই সাব্যস্ত হোলো। নিজেই ও সাব্যস্ত করল: যাদবপুর থেকে যদুপুর—এবং যদুপুর, আর যদুপুরী প্রায় অভিন্ন বস্তু—এবং যদুপুরীর বাসিন্দেরা যদুবংশ ছাড়া আর কি? অতএব, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্নর ধারায় হৃষীকেশ যাদবপুর থেকে যদুবংশে এসে পৌঁছল। তাছাড়া—তাছাড়া আসলে কথাটা হচ্ছে এই—হৃষীকেশ নিজেই বেফাঁস করে' ফেল্‌লে—



"আর ভায়া! কামান বন্দুক তো দেবে না আমাদের দেশরক্ষা করতে। লাঠিতেই কাজ সার্‌তে হবে। কাজেই বংশধর বলা কি 'বে-অস্ত্রায়' কিছু হয়েছে!"

"সে কথা ঠিক! তুমি একটা ভিক্টোরিয়া ক্রশ্ পেয়েছ—তা যে করেই পাও—কিন্তু তোমার তা ধারণ করবার যো নেই! পরাধীন দেশের কত অসুবিধে! ধারণ করতে গেলেই পুলিস ধরবে। ধারণ করা দূরে থাক্, ধারণা করতেই আমার বুক কাঁপচে।"

হৃষীকেশ আমাকে পরিত্যাগ করে' যাবার পর আমার মন খারাপ হয়ে গেল। যাদবপুরে আমার মামারা থাকে, মামার জন্যে যতটা না হোক্, যমুনার জন্যই আরো। যমুনা আমার মামাত বোন—তার জন্য ভারী মন কেমন করতে লাগল! বাল্যকালে কতবার যে আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে সে বাঁচিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মামার প্রচণ্ড তাড়নায়, ছাদের পাঁচিল টপ্‌কে সরু কার্ণিসের সংক্ষিপ্ত পরিসরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সভয়ে যে সময়ে আমি কাঁপতাম সেই সময়ের কথাই বল্‌ছি। সেই সময়েই সে বারম্বার আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছিল। হাতের নাগালে পেয়েও ঠেলে ফেলে দ্যায়নি সে কথা বল্‌ছিনে—নীচে একবার তখন পড়তে পারলে আর রক্ষা ছিল না, একদম্ ছত্রাকার!—সেই সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চকোলেট্ সাপ্লাই করে' আমার জীবন ধারণে ও সহায়তা করত। তারির আমি তারিফ করছি। আহা! যমুনার কথা ভাবলে এখনো আমার জিভে জল আসে—মামাত বোনের এমন নিস্বার্থপর নমুনা খুব কমই দেখা যায়।

সেই যমুনালয় এখন যমালয় হয়ে উঠেচে মনে করতেই মন দমে গেল। সেখানে এখন চারধারে পঞ্চম বাহিনীরা নেচে বেড়াচ্চে—ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই যমুনাকে এই সুযোগে তার মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচানো আমার শুধু কর্ত্তব্য নয়, দায়িত্বও বইকি! নিতান্ত মৃত্যুমুখ থেকে না পারি—অদ্দূর ওর সঙ্গে এগুবার আমার সাহস হবে কি না সন্দেহ, তবু পঞ্চমবাহিনীর সম্মুখ থেকে তো বাঁচাতে পারব?

বেশীক্ষণ স্থির থাক্‌তে পারলুম না। তক্ষুনি একখানা তিন নম্বরী বাসে চেপে শেয়ালদা পৌঁছে লোক্যাল্ ট্রেণের টিকিট কেটে বস্‌লুম।

কলকাতা থেকে এক পা বাড়ালেই যাদবপুর। আর ইষ্টিশনে পা নামাতেই জনার্দ্দন!—

দেখবামাত্রই জনার্দ্দন সটান্ কানের গোড়ায় এসে হাজির: "এধারে ভারী গোলমাল হে—ভয়ানক—একটু আগেই হৃষীকেশের সঙ্গে আমার দেখা—"

"পঞ্চমবাহিনীর সৈন্যসামন্তরা টর্চ্চ হাতে করে চারধারে ওৎপেতে বসে আছে—এই ত? আমাকেও বলছিল হৃষীকেশ।"

"তুমিও শুনেচ তাহলে? ওর যদুবংশ ধর-দলে যোগ দিচ্চ তো?"

"দেখি। বংশ ধারণ করতে পারব কি না, দেখি।"

সবার আগে আমার যমুনাকে দেখা দরকার—তারপরে অন্য কথা। গিয়ে দেখলাম, যমুনাও যদুবংশে যোগদান করে' বসে রয়েছে। বেথুন্ কলেজ থেকে ফেরার পথে এক ট্রেণেই ফিরছিল ও আর হৃষীকেশ। সুতরাং, আর বলবার কিছু ছিল না, সে-ই আরো আমায় শুনিয়ে দিল।—"মেয়েরা কি দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পারে না?"

"মামা? মামাও কি যদুবংশে—?" আমি ভয়ে ভয়ে জান্‌তে চাই।

"বাবার কাছ পর্য্যন্ত এগুনো যায় নি। তুমি বলো না বাবাকে?"

"আমি! বাবারে! এত বড় হয়ে ভারী হয়ে আর পারব না।"

"বড় হয়েও এত ভীতু কেন তুমি বলতো?" যমুনা আমার প্রতি অবজ্ঞাভরে তাকায়: "বাবার কাছে এগিয়ে যাবে, গিয়ে বল্‌বে। এতে না পারার কী আছে?"

"খুব ভারী হয়ে গিয়েছি কি না। ওজন বেড়ে গেছে এখন।" আম্‌তা আম্‌তা করে আমি সাফাই দিই: "এখন তো আর সেই চব্বিস সেরটি নেই—একমন চব্বিশ সের এখন। কতো ভারিক্কী একটা মানুষ আমি ভেবে ছাখো!"

"ভারী হয়ে তো হাতী হয়েছেন! মামার কাছে এগুতে পারেন না। ভারিক্কী না কচু?"

"এগুতো পারব না কেন, এক্ষুনি এগুতে পারি—কিন্তু পেছুতে হলেই তো হয়েছে! সেই ছোট্ট কার্নিশে আর আমার স্থান নেই। সে বোধ হয় আমাকে আর দাঁড়াতেই দেবে না। এই দেহ নিয়ে সেখানে দাঁড়াতে গেলে সবশুদ্ধ হুড়মুড় করে' নীচেই নামিয়ে দেয় কিনা কে জানে?"

"য়্যাতো তোমার প্রাণের ভয়! তবেই তোমার দ্বারা দেশোদ্ধার হবে!" যমুনা আমার দিকে তাচ্ছীল্যসূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করে।

"হৃষীকেশের যতো বাড়াবাড়ি। কোথায় কি তার ঠিক নেই—একেবারে যদুবংশ ধরে টানাটানি।" আমি বলি। বিরক্ত হয়েই বলি। যমুনার এই ভাবান্তরের জন্যে আমার ভীরুতার চেয়ে—ভীতু তো আমি চিরকাল!—তার বীরত্বই বেশী দায়ী বলে আমার মনে হতে থাকে। মনের ভেতরটা খচ্‌ খচ্‌ করে।

"পঞ্চমবাহিনী না ছাই! একটাও যদি পঞ্চম ফঞ্চমের টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় কোথাও তুমি দেখে নিয়ো।" কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমাকে মত পাল্‌টাতে হোলো। আমাদের সুনীল চন্দ্র—সুনীল আমার মামাত ভাই—হন্তদন্ত হয়ে এসে বল্ল:—"শোনো শোনো!—ঐ মোড়ে···ঐখেনে···তারিণীবাবুর বাড়ীর পাশে ···সেই মাঠটায়···ছেলেরা যেখানে ফুটবল পেটে···আশ্চর্য্য এক কাণ্ড হচ্চে···আমি শঙ্করের কাছ থেকে কাল্‌কের হোম্‌টাস্‌কে জেনে ফিরছি···দেখতে পেলাম।"

"কী—কী—কী—?" যমুনা আর আমি সমস্বরে বলি।

"একটা টর্চ্চ্‌। কে একজন টর্চ্চের আলো ফেলে সারা মাঠখানা যেন চষছে। ভূত মনে করে আমি পালিয়ে আস্‌ছিলাম, তারপর আমার মনে হোলো পঞ্চমবাহিনীও হতে পারে। তারপর আমি আজকেই—আজ বিকেলেই হৃষীকেশবাবুর যদুবংশে ভর্ত্তি হয়েছি—কি করে' পালাই? লোকটাকে দেখবার জন্যে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।—"

"বাঃ বাঃ! এই তো আমার ভাই! আমার ভাইয়ের মতই কাজ তো!···তুমি একটা কিস্‌সু না!" যমুনা একবাক্যে সাধুবাদ আর নিন্দাবাদ ব্যক্ত করে।

"তারপর কী হোলো? কী দেখলি কাছে গিয়ে? পঞ্চমবাহিনী না ভূত?" আমি সুনীলকে সভয়ে প্রশ্ন করি। ভূতদের আমি একদম্‌ পছন্দ করি না।—কী তোর মালুম্‌ হোলো?"

"দেখ্‌লাম একটা মানুষ। এ পাড়ার নয়—এ মুলুকের না—এই দেশেরই নয়। কোনো বার্ম্মীজ বা থাইল্যাণ্ডের লোক হতে পারে। দেখলে মনে হয় ছদ্মবেশে ঘুরচে—অন্ধকারে দেখে যতটা আন্দাজ করা যায়। ভারী সাবধানী কিন্তু লোকটা—কিছুতেই নিজের মুখের ওপর টর্চ্চ ফেল্‌ছিল না। আর ব্যাড় ব্যাড় করে' বিদেশী ভাষায় কী যে বল্ল তার কিচ্ছু আমি বুঝতে পারলাম না।"



"জাপানী বিমানদের ডাকবার অপেক্ষায় আছে।" যমুনা বল্ল: "হুম্‌। এক্ষুনি লোকটাকে গিয়ে পাক্‌ড়ে ফেলা দরকার।"

"পুলিসে খবর দিয়ে দাও। আমাদের গিয়ে কাজ কি?" আমি বলি।

"আগে তো পাক্‌ড়াই আমরা। তারপর পুলিস! মারো চাঁদা করে। একটু হাতের সুখ করব না?" সুনীল সুখের সন্ধানী—কিম্বা—কিম্বা হয়ত ইস্কুল-লব্ধ নিজের জীবনের দুঃখ বেদনা ভুল্‌তে চায়।

"যদুবংশের আর কে কে আছে আশে পাশে? তাদের খবর দিতে হয়।" যমুনা বলে।

"দুনম্বর সদস্য তুমি আছো ছোটদি আর চার নম্বরে আমি। তিন নম্বর জনার্দ্দন বাবুকে ডেকে আন্‌ব?"

"এক্ষুনি নিয়ায়। কিন্তু এক নম্বর গেলেন কোথায়?"

"এক নম্বর—হৃষীকেশবাবু—অন্যান্য নম্বরদের সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে কোথায় পাবো?"

বল্‌তে বল্‌তে সুনীল চলে যায় এবং দেখতে দেখতে জনার্দ্দনকে নিয়ে ফিরে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে এ ধারের প্ল্যান্‌ সাঁটা হয়ে গেল। সুনীল তারিণী বাবুর বাড়ীর দিক থেকে এগুবে আর জনার্দ্দন পূর্ব্বধার থেকে চড়াও হবে। যমুনার হোলো গিয়ে উত্তরায়ণ—আর আমি? আমি দক্ষিণ তরফ থেকে—(এদিকটা বেশ চওড়া আর অনেকখানি ফাঁকা)—আস্তে আস্তে ঘেরাও করে' আস্‌ব—অবশ্যি এক জনের পক্ষে গোটা একটা দিক যদ্দুর বেশী ঘেরাও করে আসা সম্ভব।

এই বিজাতীয় অভিযানে যোগ দেবার আমার একটুও উৎসাহ হচ্ছিল না। একেই আমার অ্যাড-ভেঞ্চারের স্পৃহা আদপেই নেই, তার ওপরে এই সব পঞ্চবাহিনীরা—শোনা গেছে—ভারী বিশ্রি জিনিস! আমার বদলে, একটীনি হিসেবে। আমি সুনীলের টম্‌কে পাঁচ নম্বরের সদস্য করে' দিতে প্রস্তুত ছিলাম—এবং সেও আমার বলবার আগেই তৈরী হয়েছিল, অনুরোধের অপেক্ষা রাখেনি। তখন থেকেই সুনীলের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে সে ল্যাজ নাড়ছিল।

কিন্তু টম্‌ গেলেও, আমার বকলসে যাবে কিনা, যেতে রাজি হবে কি না—সেই এক সমস্যা। যতটা বোঝা গেল, সুনীলের ধার ঘেষেই আগুয়ান হবার তার রাস্তা, মাঠের দক্ষিণ দিক থেকে একাকী বীরের মত—যদ্দুর ঘেরাও হয়ে—গোটা একটা দিক ঘোরতর ভাবে রক্ষা করে, যদুবংশের মুখরক্ষা করার মতলব তার নেই।

অগত্যা আমাকেও এগুতে হোলো! বীরদর্পেই এগুলাম, পা টিপে টিপে। সুনীল মিথ্যে বলেনি। মাঠের মাঝখানটায় আলেয়ার মতো টর্চ্চের আলো জ্বল্‌ছে আর নিভছে এখনও—এখনো। আমি যেধার দিয়ে বীরপদভরে এগুচ্ছিলাম—কিন্তু এগুবো যে তার যো কি। সে ধারটায় যে ধারেই পা বাড়াই কেবল গর্ত্ত। এদিকটা স্লিট্‌ ট্রেঞ্চে বোঝাই, বোঝা গেল। কোনোদিকে পা ফেলবার যো নেই—উল্‌টে পা ভাঙবার অব্যর্থ সুযোগ!

যাই হোক, উঠিপড়ি করে, তো টর্চ্চারের কাছে পর্য্যন্ত পৌঁছলাম। এধার-ওধার থেকে সুনীল আর টম্‌ জনার্দ্দন আর যমুনা—এরাও সব ঘেরাও হয়ে এসেছিল। তারপর হাতের সুখ যা একখানা হোলো তা কহতব্য নয়। জনার্দ্দন আর সুনীলের এলো পাথারির মাঝখানে আমিও কসে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তে নিজের গাল জ্বালা করতে লাগল দেখে নিরস্ত হয়ে গেলাম। গোলমালের মধ্যে মারামারি করতে যাওয়া ঠিক না, ওতে মারধোরের গোলমাল হয়ে যেতে পারে।

যমুনারও হাতের সুখের ব্যত্যয় হয়নি। সেও ফাঁক্‌তালে বেশ কয়েকটা চিম্‌টি কেটে নিতে পেরেচে। সংবাদটা সত্যি হওয়াই সম্ভব। কেননা সুনীল বল্‌তে লাগল, তার পিঠ কেন যে দপ্ দপ্ করছে, হঠাৎ সাপে কাম্‌ড়ালো কিনা কে জানে! (তবে পঞ্চমবাহিনীটাও কাম্‌ড়ে দিতে পারে, আশ্চর্য্য নয়!)

পড়ে যাওয়া টর্চ্চটা কুড়িয়ে নিয়ে কুরুক্ষেত্রের ওপরে আমি আলোক বিকিরণ করি। ওমা! এ কে? এ যে আমাদের—

"আরে, হৃষিকেশ যে। তুমি আবার এখানে কোত্থেকে?"

হৃষীকেশ ব্যাড় ব্যাড় করে যা বল্ল তার মর্ম্ম, অন্ধকারে মাঠ পেরিয়ে তারিণীবাবুর বাড়ীতে সে যাচ্ছিল—তাঁকে সদস্য বানানোর জন্য। হঠাৎ একটা স্লিট্ ট্রেঞ্চে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে তার বাঁধানো দাঁতের ওপরতলা খসে পড়ে গেছে। অন্ধকারে হাতরে না পেয়ে, বাড়ী থেকে টর্চ্চ নিয়ে ফিরে এসে তখন থেকে খোঁজাখুঁজি করছে—কিন্তু এখনও সেই উপরওয়ালা দাঁতদের পাত্তা পায়নি। তার মাঝখানে—

তার মাঝখানে তার অধস্তন দাঁতগুলোর অবধি কি দুর্দ্দশা হয়েচে, টর্চ্চের আলোতেই আমরা চাক্ষুস করলাম। একটিও তার আস্ত নেই!

ইতিমধ্যে আমাদের বাহিনীর পাঁচনম্বরী—পঞ্চম সদস্য শ্রীমান্ টম্ এক চক্কর্ ঘুরে এসেচে। তার মুখে কোনো সাড়া শব্দ নেই। এহেন তার স্বভাব-দুর্ল্লভ মৌনতা দেখে তার দিকে টর্চ্চের আলো ফেলে দেখি অঘটনের পরে আরো অঘটন!—

তার মুখে আমাদের যদুপতির হারানো দন্তপংক্তি!

## চমৎকার ছেলে!

—০—

রাখাল তালুকদার

মোটের ওপর চমৎকার ছেলেটির কথা—যার কথা আমার মতো কতো লোককেই না ভাবিয়েছে! ইতিহাসের গল্প রাজরাজরাদের সন্ধানে ব্যস্ত, ছবিসুদ্ধ তাঁদের দিগ্বিজয় কাহিনী ইতিহাসের পাতা জুড়ে, কিন্তু চমৎকার ছেলেটির কথা কেউ একবার ভেবে দেখে কী!—না, কেউ-ই তার বিশেষ কিছু খোঁজই রাখে না। সে গেছে মিলিয়ে কালের কালো জলের অতল বুকে একটি বুদ্বুদের মতো; তাই রঙিন লেখায় মিলিয়ে যাবার দাগও আঁকা পড়েনি। সমুদ্রের বুকে জাহাজের চলাফেরার চেরা-দাগ যেমন ক'রে মিলোয়, ঠিক তেমনি ক'রে চুপি সাড়ে সে মিলিয়ে গেছে।



তাই বলি, চমৎকার ছেলেটি কেমন সুন্দর হারিয়ে গেছে। বয়স তার কী-ই বা হয়েছিল, বড়ো জোর সতরো। কিন্তু এই সতরোটি বছরের ভিতর সে এমন কিছু ক'রে গিয়েছে, যার জন্য তার নাম বিশেষ ক'রে স্মরণ করবার যোগ্য। নামের এমনি একটা বিরাট আকর্ষণ—সেই চ্যাটারটন ছেলেটির নাম।

সতরো শ' বাহান্ন খৃষ্টাব্দে তার জন্ম হয় ইংলণ্ডের বৃস্‌টল সহরে সুপ্রসিদ্ধ সেণ্টমেরি গির্জ্জার কাছাকাছি নিভৃত একটি পল্লীতে। মধ্যযুগের চিত্রকলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তখনকার লোকের বিশেষ কোনো হুঁস্ ছিলো না, আর ছিলো না ব'লেই বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও হাতে লেখা পুঁথি বৃস্‌টল সহরের আদ্দিকেলে গির্জ্জায় লোকচক্ষুর অন্তরালে প'ড়ে ছিলো ধুলো বালির পোঁচে বিবর্ণ হয়ে দিনের পর দিন। কেননা তখনকার মানুষ এ'সবকে উদ্ধার করতে চাইতো না; বইয়ের রাজ্যে পাতিপাতি খোঁজ খবরের তারা কোনো ধার-ই ধারতো না।

ছেলেবেলা

চ্যাটারটনের বাবা বই বাঁধতেন, তাঁর কাছে রকমারি বইয়ের গাদা প'ড়ে থাকতো। তাঁর মৃত্যুর পর একদিন চ্যাটারটনের মা একটা ছবির বই নিয়ে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উনুনে আঁচ দিচ্ছিলেন, কারণ তিনি লেখাপড়া জানতেন না ব'লে বইয়ের তেমন একটা কদর দিতেন না। ছেলেমানুষ চ্যাটারটন ছবির বইখানা দেখে তড়াগ ক'রে মা'র হাত থেকে সেখানা কেড়ে নিল। সে তখন সাত বছরের মাত্র এবং এই সাত বছরের ভিতরই ওই বইখানার সাহায্যে তার অক্ষর পরিচয় ঘটলো। সামান্য একখানা ছবির বইয়ের সাহায্যে বর্ণমালা পরিচয় ঘটা নেহাৎ আজগুবি ব্যাপার। এমন কি তখন সে যে কারুর বাঁকাচোরা হাতের লেখা প'ড়ে দিতে পারতো। তুমি আমি বড়ো হ'লে তেমনি পারবো কী,—কখ্‌খনোই না।

অতি আশ্চর্য্য এই ছেলে বাপু। কেমন সুন্দর টানাটানা কালো চোখ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল; চেহারাটি পরিষ্কার ছিমছাম একহারা; পরণ পরিচ্ছদ যা পরতো তাই সুন্দর মানাতো।

একদিন একটি লোক তাকে একটা মেটে হাঁড়ি এনে দিল চিত্তির করতে। এ'তে কী আঁকা হবে—ফুল, না আর কিছু? ছোট্ট চ্যাটারটন ছেলেটির মুখ দিয়ে ফট্ ক'রে বেরিয়ে পড়লো, 'আমাকেই আঁকুন না স্বর্গের দেবদূত করে জগৎজোড়া আমার নাম ছড়িয়ে দিতে।' ছেলের পড়াশুনার চাড় দেখে তার মা তাকে কল্‌ষ্টন অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। কাজের মধ্যে কাজ ছিলো শুধু তার সারাদিন পই পই ক'রে গির্জ্জার আনাচ-কানাচ পাতি পাতি খোঁজা, কবি সে হবেই এটা ভাগ্যের মতো সুস্পষ্ট এবং আলোর মতোই সত্য। ঠিক দশ বছর বয়সের সময় প্রথম সে একটি কবিতা লিখলো, এবং তারপর থেকে সে লিখেই চলেছিলো। ছাপার হরপে নিজের কেমন লেখা কেমন দেখায়' এই ভাবটা নেশার মতো। প্রথম প্রথম পরের নামেই সে লিখে চললো নেশায় পেয়ে বসেছিলো ব'লে। সেই লেখাগুলো কিন্তু Rowley poems নামে বিখ্যাত। নিজের নামে না চালিয়ে পরের নামে চালানোর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, কাজেই চ্যাটারটন গোড়া থেকেই একটা মারাত্মক রকমের ভুল করেছিল।

Rowley ছিলেন প্রাচীন কবি, সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি চসারের (Chaucer) সম কালীন। তিনি ছিলেন একটা মাঠের অধিনায়ক, আর তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বৃস্‌টলের সুপরিচিত ব্যবসাদার উইলিয়ম ক্যানিজ। ক্যানিজ ছিলেন সত্যিকারের মানুষ; তাঁর কবর এখনও গির্জ্জার পার্শ্বস্থিত গোরস্থানে অবস্থিত। কবরটি ভারী ভালো লাগতো চ্যাটারটনের। সমস্ত গির্জ্জাটা এবং তার চারপাশ চ্যাটারটনের কাছে ঠেকতো স্বপ্নপুরীর মতো, সেখানে সে স্বপ্ন বিহ্বলের মতো ঘুরে বেড়াতো। নিজের নামটিই তো বড়ো পরিচয়—তার চাইতে আর কী বড়ো হ'তে পারে! কবিজীবনের প্রথম দিকটা ছদ্মনামের পশ্চাতে থাকে একটা সচেতন সূক্ষ্ম অনুভূতি—যার প্রাবল্যে কবিরা কবিতাই প্রকাশ করে, নাম প্রকাশের ধারে কাছেও যায় না। কিশোর কবি চ্যাটারটন ছেলে মানুষের মতো স্বপ্নরাজ্যের কথা কাউকেই জানাতে চায় না, তার ওপর লজ্জা এসে বাদ সাধে। চ্যাটারটনের মতো নির্জ্জনতাপ্রিয় ও গর্ব্বিতের পক্ষে তাই আরো সম্ভব হয়নি। মা-বোনদের ও আত্মীয়স্বজনের আবেষ্টনী থেকে শিশুমন গাছের মূলের মতো রসের ধারা টেনে নেয়, এবং ধীরে ধীরে জীবনের অন্তঃস্থলে সুগভীর ভিত্তিমূল স্থাপন করে। সুগোপনতা স্বভাবগত ব'লেই কার্য্যক্ষেত্রে সেটা রক্ষা করাই ছিলো তার একমাত্র ব্রত। ইতিমধ্যে Barrett ব'লে একজন লোকের সঙ্গে তার খায়-খাতির হোলো। তিনি ছিলেন বৃস্‌টলের ভাবী ঐতিহাসিক ও ধনীর ছেলে, এবং ধনীর ছেলের অতিরিক্ত ধন হিসাবে তার



একটা লাইব্রেরী ছিলো। চ্যাটারটন ছিলো বইয়ের কাঙাল, Barrett তাকে লাইব্রেরী থেকে বই পড়তে দিত, এবং তার বদলে চ্যাটারটনকে সংগ্রহ ক'রে দিতে হোত বৃস্‌টলের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তথ্যাবলি। এই রকম বিচিত্র আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে চ্যাটারটন মেতে উঠলো, —অধ্যবসায় দিয়ে আপন ক্ষমতা বলে সে আদর্শ গবেষকের মতো বৃস্‌টলের প্রাচীন কাহিনী একান্ত বিশ্বাসে বিবৃত করতে লাগলো Barrett-এর নিকট। প্রতিভার দান গর্ব্বান্ধ ধনিকের কাছে বিকোয়, এটা মানুষের অভিশাপ। এবং সে-যুগের পরতে-পরতে ছিলো এই অভিশাপ। এমনি একটা মমতাহীন যুগে তার ডাক পড়েছিল। তার কবিতা কেউ ভালো বললে না, নিজেদের নিভৃত অবসরের সঙ্গী ব'লে কেউ তার কবিতাকে ঠাঁই দেবে না,—এই রকম একটা ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল ব'লে, সে কবিতা Barrettকে পাঠিয়ে দিত। হয়ত সে ঠিকই করেছিলো, কারণ প্রতিভাবান্ কবিরা সে-সময়ে বড়ো একটা আমল পায়নি।

সে-সময়ে হোরেশ ওয়ালপোল্ নামে একজন পুরাতত্ত্ববিশারদ ছিলেন। চ্যাটারটন তাঁর নাম একদিন কারুর কাছে শুনে প্রাচীন কবিতাকারে কতকগুলো লেখা অদ্ভুত বানান দিয়ে—T. Rowliee বিরচিত, ( ১৪৬৯ ) Master Conynge-এর জন্য "The Ryse of Peyncleyne yn Englande" এই শিরোনামা দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল। ওয়াল-পোল্ সানন্দে সেগুলো গ্রহণ করলেন, এবং সুন্দর করে একখানা চিঠি লিখে দিলেন চ্যাটার-টনের নিকট: "মহাশয়, এগুলো পাঠিয়েছেন ব'লে আমি অনুগৃহীত···চিঠিখানার জন্য আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ···এই রত্নখনির সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে অবশ্য ক'রে জানাবেন ···আপনাকে সত্যিই জিগ্‌গেস করছি Rowley'র আর কোনো লেখা আপনার কাছে আছে কি-না। কবিতাগুলো প্রাণশক্তিতে উচ্ছ্বসিত; আশ্চর্য্য ছন্দ ও নৈপুণ্য তা'তে সুপরিস্ফুট"···ইত্যাদি।

চ্যাটারটনকে পায় কে তখন! ভারী মজা লাগলো তার। কবিত্ব তার আছে নিশ্চয়ই নইলে ওয়ালপোলের মতো লোক তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে দেদার কবিতা পাঠাতে লাগলো ওয়ালপোলের নিকট। এর মধ্যে ওয়ালপোল প্রকৃত কবিটির সন্ধান পেলেন; প্রথম থেকেই তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল কবিতাগুলো হাল ফ্যাশানি ব'লে। চ্যাটারটন অবসর প্রাপ্ত কোনো ভদ্দরলোকটোক নন্, সে হোলো একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের দুস্থ ছাত্র। এ'তে তিনি একটু বোকা ব'নে গেলেন। সেইজন্য আর তিনি চ্যাটারটনকে চিঠি লিখতে চাইলেন না। একদিন তবু তিনি চ্যাটারটনকে লিখে বসলেন: "যখন তুমি কিছু জমিয়েছ, তখন লেখাপড়ার ঝক্কি পোহাচ্ছ কেন? ছেড়ে দিয়ে মন যা চায় তাই করো।"

এতেই যথেষ্ট, চিঠিখানা প'ড়ে চ্যাটারটন মুষড়ে' পড়লো। তবু অদ্ভুত এই ছেলেটিকে

কেউ-ই দমাতে পারলো না ; আগুনের শিখার মতন সে ঊর্দ্ধমুখীন হয়ে রইলো। তারপর সে লণ্ডনে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তার বিশ্বাস, সেখানে গেলে হয়ত সে লেখক হিসাবেই কিছু করতে পারবে। সতরো বছর বয়সে সে জীবিকার জন্য লণ্ডনে ছুটে গেল। সাহিত্য-সৃষ্টির আশ্চর্য্য রকমের ব্যাপক প্রয়াস ছিলো তার ; এমন কোন বিভাগই ছিলো না যেখানে সে তার হাত ফলায়নি। সম্পাদকরা তার লেখা পছন্দ করতেন, কিন্তু তার দর্শনী ছিলো 'অতি ভয়ঙ্কর'। এক শিলিং নিয়ে সে একটি প্রবন্ধ ছাড়তো, এবং সাত পেনি নিয়ে, ছোট্ট একটি সে গান লিখে দিত। কালি-কলম ও কাগজ জোটাতে পারলেই, ব্যস্ ; তার আর কিছুর দরকার হোত না। এই রকমভাবে পূরো দুটি মাস সে কাটালো, তারপরই সুরু হোলো তার প্রকৃত দুঃখের দিন। সম্পাদকরা তার লেখা সাগ্রহে ছাপতে লাগলেন, কিন্তু দর্শনী দিতে তাঁরা একেবারেই ভুলে গেলেন। চ্যাটারটন তখন আরও সস্তার বাড়িতে উঠে গেল। এই সময়ে একটি ভালো কবিতা লিখে সে একটি পত্রিকায় পাঠিয়ে দিল, দু'দিন যেতে না যেতেই সেটি ফেরৎ এল। আরো একমাস কাটলো, কেউ তাকে কানাকড়ি দিয়েও পুঁছলো না। একটি শিলিং মাত্র তার সম্বল ছিলো। জীবনের শেষের তিন দিনের ভিতর তার মুখে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। গৃহস্বামিনী এ'টা লক্ষ্য ক'রে তাকে কিছু খেতে দিতে চাইলেন ; কিন্তু অভিমানী ছেলে বললে, 'না, আমি খেয়েচি'। যারা শোনে তারাই বলে "বোকার দেমাক !" ( অবশ্য যারা তাকে মোটেই দেখতে পারতো না। ) আত্মার দুঃখ ও অমর্য্যাদা তার কাছে শোকাবহ মনে হোত, এবং সেই কারণে আত্মা দেহের মুক্ত না হ'লেও নিঃশেষিত হয়ে পড়ছিল তিলে তিলে। মরীয়া হয়ে গিয়ে সে তার এক পূর্ব্বতন শুভানুধ্যায়ীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলো চাকুরীর জন্য, আফ্রিকা প্রবাসী একটি ডাক্তারের 'বয়' হিসাবে। কিন্তু তার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হোলো। নিরাশ হয়ে তখন সে দোকান থেকে তার সেই শিলিংটি দিয়ে বিষ কিনে আনলো, এবং খেয়ে সে আত্মহত্যা করলে। বয়স তখন তার ঠিক সতরো।

তার মৃত্যু যেন ট্রাজেডির চাইতেও সাংঘাতিক। "কেউ হয়ত ভুল করেছিল", ইতিহাস শুধু এই ব'লে সান্ত্বনা খোঁজে, শুধু কি তাই ; সে-মৃত্যুর জন্য দায়ী তখনকার সমাজ ও সমালোচক প্রভুগণ। ভাবতে চমক লাগে, সত্যি এই বয়সে এতোখানি প্রতিভাদীপ্তি পৃথিবীতে খুব কমই ঘটেচে। বড়ো হ'লে সে কতো বড়োই না হ'তে পারতো, কেউই বলতে পারে না, তবে তার পরবর্ত্তী কবিরা, যাঁরা তার কথা ভুলতেই পারেননি, এই রকম একজন কবি তাকে স্মরণ ক'রে বলেছেন ঃ

"আমি চ্যাটারটনের কথা ভাবি—
সেই চমৎকার ছেলেটির কথা,
ঘুমহারা প্রাণ অভিমানে ট'লে পড়ল,
মরণের বুকে…
সত্যি, সেই চমৎকার ছেলেটিকে আজও কতো লোকই না খুঁজে বেড়ায়।

# সহুরে

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

সহরেতে থাক' তুমি
যাও নাই থাক' নাই
কোনোদিন গ্রামে,
চাকরে বাজার করে
রাধুনীতে দেয় রেঁধে
আছ বটে আরামে।
কল টিপে বাতি জ্বালো
ঘর ভরা পেয়ে যাও
একরাশ উজ্জ্বল আলো !
দেখ' নাই কোনোদিন
নিভ' নিভ' টিম্‌টিপে
প্রদীপের আলো।
মোটরে বা ট্যাক্‌সীতে
চড়ে' যাও পিচ ঢালা
মস্থন রাস্তায়,
কিম্বা বাসে ও ট্রামে
উঠে বস' বাবু হ'য়ে
( যদি ) যেতে চাও সস্তায়।

হাঁট' যদি এতোটুকু
পা দু'খানা ব্যথা হয়
জ্বলে মর' পায়ের ফোস্কায়।
ডাক্তারে মলম লাগায়
দাসদাসী সব কাজ ফেলে
লেগে যায় পায়ের সেবায়।
ছাতে বসে' হাওয়া খাও
একলা বাজাও বাঁশী
ভাটিয়ালী সুরে—
রাখ' কি খবর তুমি
সেই মাঝিটির
নদীপথে দূরে—
নৌকার হাল ধরে'
প্রবল স্রোতের জলে
মাছ ধরে যারা ?
শুনেছ' কি কভু তুমি
ভাটিয়ালী সুরে যবে
গান গায় তারা ?

# কয়লা কত কাজের

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

কয়লা জিনিষটি কি জান তো? লক্ষ লক্ষ বৎসর আগেকার বনের গাছপালা মাটির নীচে চাপা প'ড়ে, তাপের আর প্রচণ্ড চাপের ফলে, এতকাল পরে আস্তে আস্তে আজ কয়লায় পরিণত হয়েছে। ভাগ্যে প্রকৃতির এই আবশ্যকীয় জিনিষ পৃথিবীর নানা দেশে মাটির নীচে লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল, না হ'লে আজ আমাদের কি মুস্কিল হ'তো একবার ভেবে দেখ তো!

কয়লা কি শুধু আগুন জ্বালাবার জন্যই ব্যবহার করা হয়? আর, তাই বা কম কি? উনুনের আগুন, রেল, জাহাজ প্রভৃতির ইঞ্জিনের আগুন, কারখানার বড় বড় ইঞ্জিনের আগুন, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ইঞ্জিনের আগুন,—এর প্রায় সবই তো কয়লার। পৃথিবীর নানা দেশের কোটি কোটি লোকের শুধু এই সব কাজের জন্যই কত লক্ষ লক্ষ মণ কয়লার দরকার লাগে একবার ভেবে দেখ তো!

কিন্তু, এ তো শুধু কয়লার একটি কাজ। কয়লা থেকে রাসায়নিক পণ্ডিত আজ কত দরকারী জিনিষ তৈয়ারী ক'রেছেন এবং ক'র্‌ছেন তা' জান কি? হাজার হাজার রকমের জিনিষ তৈয়ারী ক'রেও রাসায়নিক ক্ষান্ত নন্; এখনও প্রায় রোজই নূতন জিনিষ তৈয়ারী হচ্ছে।

খনির কয়লায় (কাঁচা কয়লায়) আগুন দিলে কি রকম ধোঁয়া হয় দেখেছ তো? এতে আলকাতরা, য়্যামোনিয়া, গন্ধক প্রভৃতি থাকে ব'লে এই ধোঁয়া শুধু দুর্গন্ধযুক্ত নয়, অনিষ্টকরও বটে। কয়েক শ' বছর আগে কয়লা শুধু জ্বালানি কাজেই ব্যবহার করা হ'ত। যে সব কাজে (যেমন, ঘরের উনুনে) কয়লার আগুনে বেশী ধোঁয়া হ'লে অসুবিধা হয়, তার জন্য কয়লা পুড়িয়ে তা' থেকে 'কোক' বা ধোঁয়াহীন জ্বালানি কয়লা তৈয়ারী করা হ'তো। কয়লা পোড়াবার সময় যে ধোঁয়া বের হ'তো তার দরুন চারিদিকের গাছপালা ম'রে যেত, লোকজনেরও স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হ'তো।

ক্রমে এই ধোঁয়াকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হ'লো। এ থেকে জ্বালানি গাস (Coal gas), জমির সার (এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট) প্রভৃতি তৈয়ারী হ'লো; বাকি রইল আলকাতরা। এ অতি দুর্গন্ধ জিনিষ; চটচটে, আঠালো। কিছুতে লাগ্‌লে আর উঠ্‌তেই চায় না। এ নিয়ে হ'লো এক বিপদ।



কিন্তু, বিজ্ঞানের যুগে আবর্জ্জনাকে কাজে লাগাতেও বেশী দেরি লাগে না। ক্রমে এ থেকে কার্ব্বলিক এসিড, ফিনাইল প্রভৃতি শোধক জিনিষ তৈয়ারী হ'লো;—তবুও এর অনেক অংশ বাকি রয়ে গেল। এই অংশ থেকে তৈয়ারী হ'লো বেঞ্জিন নামে এক রকম তেলের মত জিনিষ।

এই বেঞ্জিন থেকে ক্রমে এল 'এ্যানিলিন্' নামে এক আশ্চর্য্য জিনিষ, যা' থেকে ক্রমে শত শত শত রকমের রং তৈয়ারী হ'লো। রামধনুর সব রকম রং তো এ থেকে তৈয়ারী হ'লোই; তা' ছাড়া, যত রকমের মাঝামাঝি বা মিশ্র রংও সবই এ থেকে তৈয়ারী হ'লো। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ রং 'নীল' আর মূল্যবান রং মঞ্জিষ্ঠাও এ থেকে তৈয়ারী হ'লো। শত শত সুন্দর, সস্তা, পাকা রং আজ আলকাতরা থেকে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হচ্ছে।

আলকাতরা আজ অত্যন্ত মূল্যবান জিনিষ হ'য়ে পড়েছে। রং ছাড়া, এ থেকে নানারকম মূল্যবান ওষুধ, ফটোগ্রাফিক ডেভেলাপার ('হাইড্রোকিলোন' প্রভৃতি), বিস্ফোরক, গন্ধদ্রব্য, স্যাকারিন নামক অতি-মিষ্ট জিনিষ (যা' দিয়ে লেমোনেড প্রভৃতিকে মিষ্টি করা হয়) প্রভৃতি তৈয়ারী করা হচ্ছে; তা' ছাড়া, 'বেকলাইট' নামে এক রকম জিনিষ তৈয়ারী হচ্ছে, যা'কে গরম ক'রে ছাঁচে ঢেলে নানা রকম অভঙ্গুর বাসন, কৌটা, কলম, অলঙ্কার, আসবাব, ছুরির বাঁট, বৈদ্যুতিক 'সুইচ্' প্রভৃতি তৈয়ারী করা যায়। আজকাল বৈদ্যুতিক কাজের জন্য বেকলাইট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

তোমরা শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে, এই দুর্গন্ধ আলকাতরা থেকেই নকল মৃগনাভি, নকল আতর প্রভৃতি বহু রকমের সুগন্ধি তৈয়ারী হচ্ছে। আলকাতরা থেকে সম্প্রতি সাবানও তৈয়ারী করা হয়েছে।

আলকাতরার যে শেষ গাঢ় অংশ "পিচ্", তা'ও আজকাল ছাত মেরামত, রাস্তা তৈয়ারী প্রভৃতি কাজে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কয়লা থেকে আজকাল পেট্রোল তৈয়ারী করার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। লোহা তৈয়ারীর কাজে তো কয়লা না হ'লে চলেই না। সম্প্রতি আবিষ্কৃত নকল রবর তৈয়ারী করার জন্যও প্রচুর পরিমাণে কয়লার দরকার হয়। কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, যুদ্ধের ব্যাপারে কয়লা না পেলে যুদ্ধই অচল;—বোমা, বিস্ফোরকের জন্য কয়লা চাই; লোহা, তামা প্রভৃতি আবশ্যকীয় ধাতু তৈয়ারী এবং গলাবার জন্য কয়লা চাই; রবরের অভাব হ'লে নকল রবরের জন্য কয়লা চাই; পেট্রোল কম পড়্‌লেও কৃত্রিম পেট্রোলের জন্য চাই কয়লা। তা' ছাড়া, যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য চাই কয়লা থেকে তৈয়ারী নানারকম ওষুধ, শোধক প্রভৃতি; সৈন্যদের পোষাকের জন্য চাই খাকি রং।

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শালের বিচিত্র শামা মাথার টোপর
ভাঁজে ভাঁজে তার ছারপোকা আর উকুনের ঘর

—সেইটে মাথার উপর থাবড়ে বসিয়ে নিকষি বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে কালনেমি মামা ইন্দ্রজিতের মহলে ঢুকলেন।

মহামান্য কুমার ইন্দ্রজিত তখন নিশাচর বিদ্যুৎজিভকে নিয়ে মহাঙ্গান চর্চ্চা করছিলেন বিজ্ঞানের নানা যন্তর পাঁতি নিয়ে। ঘর ধুমার ধুমাকার—মেঘনাদকে দেখাই যায় না, টাক এক একবার চিক্ চিক্ চমকাচ্ছে।

"মেঘনাদ যেন লুকায়ে মেঘেতে
হড়মড় শব্দ দেয় যন্তর যেন ভাদর রেতেতে।"

কালনেমি বল্লেন—"কুমার বাহাদুর কাছে আছ নাকি?"

—"এই যে এইখানে!"

নিকষি নড়ি হাতে গুড়ি গুড়ি এগিয়ে বল্লেন—"কি কাজে আছো ইন্দিরজিৎ?"

—"মহাঙ্গানের গবেষণা করছি দাদুমা। আর একটু কল টেপো হে বিদ্যুৎজিভ।" দুম্‌দাম্ দুম্ পটাস্ শব্দ দিয়ে খানিক বিজলী চমকিয়ে কল বন্ধ, ধূমা আর ওঠেনা, ঘর পরিষ্কার। কালনেমি মামা দ্বারের দিকে চারহাত পিছিয়ে পড়ে বল্লেন—"এ কি বিদ্যুৎ না বাজ! চক্ চোঁও লাগিয়ে দিলে যে বাপ মেঘনাদ!"

—"এরে বলে কুহর বান, বিদ্যুৎ খরশান।"

—"বাবা এ তো ভয়ানক বান দেখছি। এ বানের কাজটা কি শুনি?"

তখন কুমার ইন্দ্রজিৎ হেসে বলছেন—"দেখবে এর গুণ পরে, আগে প্রস্তুত হোক।"

বিদ্যুৎজিভ অমনি বলছেন—

"এ বানের কুহকে রাত্রি কি দিন না হয় জ্ঞান
দশদিক অন্ধকার এতে জুড়লে মহাঙ্গান।"

—"আরে রাখ তোর মহাঙ্গান। ওদিকে নাত্‌বৌ যে হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে আছে তার খবর রাখিস্ কি?"

—"কি দাদুমা কি হাঙ্গামা বাধিয়েছে প্রমীলা?"

—"বৌ হয়ে লড়াই করতে গেল আধা রাতে ঘোড়া চেপে। রামের সীতাকে চুল চিরে দোফাঁক করে কাটলে রামের নাকের সামনে। হাঙ্গাম বাধাতে এসে পড়লো বলে হনুমান লঙ্কায়।"



কালনেমি মামা শামা তুলে মাথা চুলকে বল্লেন—"তোমার বাবা বুঝি এবারে যায়। নাত্‌বৌ গেছে, এখন তোমার লড়ায়ে না গেলে তো ভাল দেখায় না।" কালনেমি বলছেন—

"বাবা, তোমার বাপের অবস্থা দেখে হলেম অস্থির
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীড়।
রাবণ আমার হাত ধরে বল্লেন,
'চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার
আজি মামা তুমি কিছু কর উপকার।"

—তাই এলেম ছুটে বাবা তোমার কাছে। তোমার বৌ এক কিত্তি করে বসেছেন, আমরা মারা যাই তার ফলে। এবার কেবল মধুবন ভেঙে লঙ্কা পুড়িয়ে ছাড়ান দেবেনা হনুমান।"

—"বৌ এমন কাজ করলে, এতো বড় অন্যায় কথা।"

—"অন্যায় বলে অন্যায়। তোমার যেমন প্রেমিলী আমার ছেলের তেমনি মৈথিলী। ভালবাসা কারে বলে তুমি তো বোঝো, কথাবার্ত্তা নেই সীতাকে কাটা; কেঁদে লুটোপুটি দশ মাথা; মন্দোদরী বলছে—দেখবো কেমন বৌ—করবোনা হাতা পেটা!"

ইন্দ্রজিত ভয় খেয়ে বল্লেন—"ও বিদ্যুৎজিভ, এ কি ব্যাপার, এর তো আমি কিছু বুঝছিনে। সীতাকে পেলে কোথা প্রমীলা, অ্যাঁ?

সীতারে রেখেছে পিতা অশোক কাননে
সাধ্য কি যে কোন জীব যায় সেখানে
সীতারে পিতার লেগেছে নয়নে
প্রমীলা আমার সিটা তো বেশ জানে।"

কালনেমি আকাশে চক্ষু তুলে বলছেন—"কি জানি বাবা, তুমি জান আর তোমার বৌ জানে। লোকে বলছে বাপটা মলে তুমি সিংহাসন পাবে, বৌ হবে লঙ্কেশ্বরী।"

নিকষি বুড়ি বল্লে—"সে পরে যা হয় তাই হবে। আপাতো যে হনুমানের হাতে মরি।"

—"থামো, আমি একবার প্রেমিলাকে তার করি।"

—"তার করবে কি? তার ছাল ছাড়িয়ে চামড়ার জুতো বানিয়ে দাও, তবে যদি আমি অন্ন আহার করি।"

—"থামো মা, শুনতে দাও বৌ কি বলছে!—হাঁ হাঁ বুঝেছি, তোমার কথায় অপ্রত্যয় করছিনে। দাদুমা আছেন এখানে, বল খুলে ব্যাপারটা। বেশ কথা; বিদ্যুৎজিভ রয়েছে এখানে। ভগ্নিদূতীটি কে? ওঃ, ভগ্নদূতের ভগ্নী,—হঃ হঃ, তার মতো নেকা তো দেখিনি, —একেবারে ধাঁদায় পড়ে এই কাণ্ড করে বসেছে। বল কি বলছিলে—আজ নাটক দেখতে হবে? হাঁ হাঁ বুঝেছি। আমি মহাঙ্গানের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছি; অবশ্য অবশ্য আমি পরে যাবো। বিদ্যুৎজিভ রঙ্গমঞ্চের প্রদীপ ঠিক করে আসবে আগেই। বাবাকে মাকে দেখিয়ে দিও খুসী হবেন। দাদুমা আর উকিল-মামা আছে, বলে দিচ্ছি এঁদেরও।"

নিকষি লাঠি ঠুকে বল্লেন—"দ্যালের গর্ত্তে মুখ রেখে কি বড় বড় করছিস ?"

—"প্রেমিলের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নিলেম।"

—"তুই হেথায়, সে সেথায় - এতদূর থেকে কথা চালাচালি হয়ে গেল ?"

কালনেমি বল্লেন—"এও কি তোমার মহাঙ্গানের ছিষ্টি বাক্যবান ?"

—"একবার দেখবো কথা কয়ে নাত্‌বোয়ের সঙ্গে ?"

—"দেখ।" বলে ইন্দ্রজিত কল টিপলেন। কথা কওয়া, কথা শোনা চল্লো।

—"বলি হ্যাঁ লা, ও দস্যি, ও নাত্‌ বৌ।"

—"কেন দাদুমা ?"

—"তুই নাকি বীর-নারী হয়েছিস্ ? বাক্যবান ধরতে শিখেছিস ? এখন কি করছিস ?"

—"মায়া-সীতা নাটকের গান মুখস্ত করাচ্ছি কলের পুতুলকে।"

—"অ্যাঁ, তাহলে মায়া-সীতা-কর্ত্তন নাটক করছিস ?"

—"হাঁ দাদুমা, তুমি এসো দেখবে যদি।"

—"বাঁচালি। যাবো লো যাবো। কই, মায়া সীতের কল টেপ্‌না গানখানা শুনে নিই।"

—"আচ্ছা শোনো—"

'আহা কাননে চলিয়া যেতে
ফিরে ফিরে চেয়ে দেখিতে
সীতেকে তোমার
পাছে পলকে হারাই
আতসে মিলাই
ননীর পুতুলী জানকী মিথিলার।'

—"ওমা এ যে ঠিক মানুষের গলা ও নাত্‌বৌ। এ সীতে-কল তোরে গড়ে দিলে কে ? দেখ, আর কথা কয় না।"

ইন্দ্রজিত বল্লেন—"দাদু শুনলে তো, মহাঙ্গানের জোরে এসব হচ্ছে।"

কালনেমি বল্লেন—"বাবা তোমার মহাঙ্গানের যদি এতই শক্তি তো বানরগুলো ঢুকতে না পারে লঙ্কায় তার একটা উপায় কর না।"

—"হবে, হচ্ছে, হয়ে এসেছে। আজ রাত্রের মধ্যে সেই মহাঙ্গান ইন্দ্রজাল প্রস্তুত হয়ে যাবে। যা ভেদ করে লঙ্কায় ঢোকবার সাধ্য কারু হবে না।"

—"বাবা, অতটা আশা করিনে—ঐ ঘর পোড়া তার তার সঙ্গে তোমার খুড়া বিভীষণ ; আর ঐ যে দুটো, কি তাদের নাম অযোধ্যার, এই কটাকে ঠেকালেই এ দফা রক্ষে পাই।"

ইন্দ্রজিত বল্লেন—"ভয় নাই যাও। এখন ক্রমশঃ প্রকাশ্য।"

চাঁইবুড়ো কথা রেখে ঘরমুখো হলেন সেদিন থিয়েটারে 'বলিদান' দেখার তাড়ায়।

# এ কাহিনী রাতে পোড়ো না

শ্রীশামুক

এই যুদ্ধের প্রথম বছরে হঠাৎ খেয়াল হ'ল—নাম লিখিয়ে দিলাম। এ্যাম্বুলেন্স চালাবো। নিয়ে গেল ফ্রান্সে।

ছোট গ্রাম লাভাঁতু, পাঁহাড়ের সারির তলায়। গাছপালার আড়ালে লুকানো হাসপাতাল ও আমাদের আড্ডা। আসল যেখানে লম্বা লাইন ধরে যুদ্ধ হচ্ছিল তার খানিকটা পিছনে। পাহাড়ের চড়াই উতরাই পার হলেই একেবারে গোলাগুলির সামনে।

দশটি এ্যাম্বুলেন্স, আমরা দশজন ড্রাইভার। আমাদের কাজ নানা জায়গা থেকে আহত লোকদের কুড়িয়ে নিয়ে আসা, আর মাঝে মাঝে খুব দরকারী জিনিষপত্র বা খাবার লাইনে পৌঁছে দেওয়া।

বিপদ প্রচুর ছিল বৈকী! মেসিন্‌গানের 'গুলি'র ঝাঁকের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। এ ছাড়া ট্যাঙ্কের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ও আকাশ থেকে বোমাবৃষ্টি ত' আছেই। যমরাজের সঙ্গে সোজাসুজি যুঝতে হয়েছে অনেকবার। আমাদের দশজনের ভিতর হঠাৎ দেখতাম একটি চেনা মুখ বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার জায়গায় এক নতুন লোক। জিজ্ঞাসা কিছু করতে হ'ত না, বুঝে নিতাম ব্যাপার কি! খাওয়া ঘুম নির্ভর করতো কাজের চাপের উপর। স্নান ? না বলবো না সে কথা। মানুষের সব সয়, আমারও সয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে।

যুদ্ধ জিনিষটা বই এ পড়া ভাল, সিনেমাতেও বেশ দেখা যায়। কিন্তু চোখের সামনে—উঃ সে বড়ো ভয়ানক!

দেখতাম জোয়ান ছেলের দল চলেছে বন্দুক ঘাড়ে। তাদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত ঘোষণা করছে—আমি জীবন্ত, আমি বেঁচে আছি।

দেখতাম তাদের মধ্যে কতজন মাটিতে পড়ে জড়ের মত। টাট্‌কা রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। মাটিতে কালো কালো রক্তের চাপ।

দেখতাম যাদের তুলে নিয়ে এসেছি হাসপাতালে, তাদের শরীরে কত জায়গায় আঘাত লেগেছে, শরীরের কত অংশ নেই।

এ ছাড়া দিনরাত হাসপাতালের নানা জায়গা থেকে যে সমস্ত শব্দ হাওয়ায় ভেসে বেড়াতো, সে যে মানুষের যন্ত্রণার চীৎকার—মানুষের গোঙানি, নিজের চোখে না দেখলে, নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা অসম্ভব।

সেখানে যতদিন ছিলাম, অনেক অদ্ভুত জিনিষ দেখলাম, অনেক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হ'লো। শুধু একটা রাতের কথা বলি। জীবনে কোনদিন সে কথা ভুলতে পারবো না।

জানুয়ারী মাস। কনকনে শীত। তিন দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো জোরে কখনো আস্তে, একেবারে না থেমে। রাত আটটায় ডিউটি শেষ হ'ল। হাত পা অসাড় দেহে প্রাণ আছে এমন মনে হয় না। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

সম্ভব ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছি, ডেকে তুলে দিল এখুনি লাইনে যেতে হবে, অনেক জখম হয়েছে। হাসপাতালে কাজ কম থাকলে রাত্রে বেরুবার সময় একজন সঙ্গী পাওয়া যেত, যদি রাস্তার মাঝে গাড়ি খারাপ হয় বা অন্য কিছু দরকার হয়। কিন্তু এ'কদিন এমন ব্যাপার চলেছিল যে কারুর ফুরসৎ নেই।

নির্জ্জীব দেহটাকে টানতে টানতে গ্যারেজে পৌছালাম। দেখি শুধু তিন নম্বর গাড়ি দাঁড়িয়ে বাকী সব বেরিয়ে গেছে। এই এ্যাম্বুলেন্সখানা কেউই সুনজরে দেখতো না। যার ভাগে যেদিন পড়েছে তারই কিছু না কিছু গোলমাল হয়েছে। সকলে বলে অপয়া গাড়ি যমরাজের বাহন। কিন্তু উপায় কি? ষ্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

লাইনের যে অংশে আমার যাবার হুকুম হ'ল, সে দিকটা প্রায় এক প্রান্তে। একটা খাড়া পাহাড়ের উপর চড়ে তাকে বেষ্টন করে নেমে যেতে হয়। মাত্র একবার এদিকে এসেছিলাম আগে' তা'ও দিনের আলোয়।

কম আওয়াজ করে যতটা সম্ভব জোরে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলি। মাথার উপর এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলেই দাঁড়িয়ে যেতে হয়, এঞ্জিন বন্ধ করে। ওভারকোট, কম্ফাটার, ও টুপি কিছুতে আটকাতে পারে না সে কনকনে শীতের সূচ ফোটানোকে।

ঘণ্টা দুই দৌড়ে পৌছে গেলাম লাইনে। বারো জন বড় ও মাঝারী কর্ত্তা জখম হয়েছে ভীষণ ভাবে। যত শীঘ্র সম্ভব এদের নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে। বাঁচাবার চেষ্টার ত্রুটি হলে চলবে না। বারো জনকে শোওয়াবার জায়গা ছিল না। কয়েকজনকে শুইয়ে বাকীদের ঠেসান দিয়ে বসানো হ'ল। সে যে কি বিভৎস দৃশ্য কি বলবো। হাত পা' নেই অনেকের, মুখের অর্দ্ধেকটা উড়ে গেছে, জামা কাপড় ব্যাণ্ডেজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে চাপ চাপ রক্ত! এত রকমের যন্ত্রণার চীৎকার এত রকমের কষ্টের আওয়াজ যে কানে শোনা যায় না—মনে হয় এ সত্যি নয়, সত্যি হতে পারে না—এ সমস্ত শব্দ আমার মাথার ভিতর থেকে আসছে!



এদের নিয়ে রওনা হ'লাম। রাত বারোটা নাগাদ। বৃষ্টি তখন একটু ধরেছে, কালো জমাট মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ফালি সবুজ চাঁদ করুণ ভাবে তাকাচ্ছে।

চড়াই দিয়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে যখন উঠছি আবার বৃষ্টি সুরু ঝম্ ঝম্—নিবিড় অন্ধকার হয়ে গেছে। বৃষ্টির ফোঁটা পাথরের টুকরোর মত চোখে মুখে এসে বিঁধে দিতে লাগলো।

পিছনে পায়ের উপর দিয়ে সাপের মত বুক বেয়ে উঠছি। ভুরু কুঁচকে কালো পাহাড় ঝুঁকে দেখছে। তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস হাওয়া হয়ে সারা দেহে চাবুক মারছে। পাতা বিহীন গাছগুলো আঙ্গুলে দেখিয়ে ধমকে বলছে, খবরদার চুপ!

হঠাৎ গাড়ির ভিতরের সেই বুক ভাঙা গোঙানি কমে কমে যেতে লাগলো। একেবারে থেমে গেল। কেবল একজন চাপা গলায় বারবার বলছে—ওমা মাগো।

বুঝলাম অনেকের জীবন লীলা হয়তো শেষ হয়ে গেছে বা যাবার উপক্রম হয়েছে। হয়তো যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বা। ক্লাচ্ টিপে একটু জোরে চালাই, শীঘ্র পৌছোলে ওদের দু'চারজন বাঁচতে পারে।

একটা বিপদজনক মোড় ফিরেছি—এখানটায় রাস্তা ভীষণ সরু, পাশ দিয়ে একেবারে খাড়াই নেমে গেছে। একটু বেহিসাবী হলে ধূলো হয়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। কানের কাছে একটা শব্দ শুনতে পেলাম, সি-সিসি—যেন শিস দিচ্ছে, যেন বারণ করছে কিছু। আমার নাকটা কে যেন টিপেই ছেড়ে দিল। নাক অসাড় হয়ে গেল! আমার শিরদাঁড়ায় কি একটা বুলিয়ে দিল উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত, বরফের লাঠির মত!

গাড়ি চালাচ্ছি আর ভাবছি এসব হচ্ছে কি? চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যায় পিছন ফিরে তাকাবার সাহস হয় না!

আমার কম্ফাটারের দুটো ঝোলা দিক ধরে কে বা কারা টানতে সুরু করে। আমি জোরে চালাই জোরে টানে, একটু আস্তে করি অমনি একটু আলগা টান দেয়। মনে হঠাৎ এল সম্ভব মোটার থামাতে বলছে। গলার ফাঁস টানাটানির সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে সুখ নেই, নিরাপদত্ত নয়। গাড়ি থামিয়ে দিলাম। আবার টান। নেমে এস। নিজের সিট থেকে নামবার সময় টর্চ্চ জেলে দেখি ভিতরের মানুষগুলি যেমন ভাবে শোয়ানো বা বসানো হয়েছিল ঠিক তেমনি আছে কেবল কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু একজন তখনো বলে চলেছে, —ওমা-মাগো।

বোধ হয় বাকী এগারো জনের নিঃশ্বাস চলাফেরা একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

আবার টান। খাড়াই দিয়ে নেমে চল। মজা মন্দ নয়! কিন্তু না বলি কাকে? না বললে ছেড়ে দেবে? তবুও একবার জোর করে গাড়ির দিকে চলি। আবার নাক টিপে দিল। নাকের রইলো না কিছু। চল। জাহান্নমেই যাবো তোমাদের সঙ্গে।

পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলি। অন্ধকারে দেখার কোন উপায় নেই। কতবার হোঁচট খেলাম, কতবার পড়ে যাবার মত কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আমার কম্ফাটার ঘোড়ার লাগামের মত টান দিয়ে পড়তে দিল না, ঠিক টেনে নিয়ে চললো।

বেশ খানিকটা নেমে এসে দেখি একটা প্রকাণ্ড কালো জন্তু উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চোখ বুজে ভোলবার চেষ্টা করি, ভোলা যায় না। টর্চ্চ দিয়ে দেখি জন্তু নয়, একটা ভাঙ্গা এরোপ্লেন মুখ থুবড়ে পড়ে। ওকি ? একজন পাইলট ! হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে— মরে !

কাণের কাছে হাওয়া কথা বলে,—ওকে নিয়ে চল। ও আমাদের বন্ধু !

বন্ধুকে কাঁধে তুলে নিলাম। চোখ বুজে পথ চলি। কারা যেন আমাকে টেনে ঠেলে নিয়ে যায়। ভাবলাম আপত্তি করবো না কিছু. করে কোন লাভ নেই যখন।

তোমরা কোনদিন এমন বিপদে পড়েছ ? পড়নি নিশ্চয়। তাহলে খানিকটা বুঝতে পারতে সেই বৃষ্টিতে সেই অন্ধকার রাত্রে একটা মরা মানুষকে কাঁধে করে পাহাড়ে উঠা কি ভীষণ ব্যাপার। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর এই এরা ! যারা আমার পাশে পাশে চলেছে ! চোখে দেখলাম না কিছু, কিন্তু সারা দেহ মন দিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলাম এরা আছে ও নাগপাশের মতই আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে !

উপরে উঠে এলাম। এ্যাম্বুলেন্সের ভিতর বন্ধুকে রাখলাম। তবু ছুটি নেই, গাড়ির ভিতর নিয়ে যায়। এবারে ভাল করে দেখি, সত্যি সকলে মরে অসাড় হয়ে গেছে। শুধু সেই একজন তখনো বাকী। সে তখন গলা ঘড় ঘড় করে খুব আস্তে বলছে—ওমা মাগো।

আমায় টেনে তার সামনে নিয়ে গেল। দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ, মুখ নীল, বুকের উপর অনেকটা জায়গা রক্তে লাল।

আবার হাওয়া কথা বলে,—একে গুলি করে মেরে ফেল। ও মরবেই, শুধু কষ্ট পাচ্ছে। আমাদের এই বন্ধুকে না পেলে আমরা যেতে পারছি না, শান্তি পাচ্ছি না !

মেরে ফেলবো আমি ? মানুষকে মারবো। কখনোই না ? তাতে যা হয় হোক।

একটা দমকা বাতাস আমাকে পিছন থেকে ঠেলে তার বুকের উপর ফেলে দিল সটান। গরু ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছ তাদের গা কি রকম শিরশির করে কেঁপে ওঠে !

ঐ লোকটির সারা দেহে ঠিক সেই রকম একটা শিহরণ বয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। আমার শরীরে সেটা একটা ইলেক্ট্রিকের শকের মতন এসে লাগলো। ছড়ানো দু'হাত দু'পাশ থেকে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ! একটা আওয়াজ করে তার নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। বেশ অনেক্ক্ষণ ! যখন জ্ঞান হ'ল, দেখি আকাশ ফ্যাকাশে হয়েছে, বৃষ্টি তখনো পড়ছে। পাগলের মত জোর দিয়ে নিজেকে ছিনিয়ে উঠে দাঁড়াই। মাতালের মত টলতে টলতে নিজের সিটে গিয়ে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলাম। দৌড়ে চললাম তেরটি মরা মানুষকে নিয়ে হাসপাতালে।

# শরৎ এলো

অপর্ণা সেন

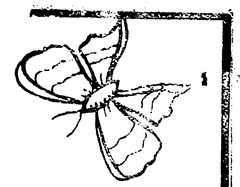

কাজল সজল মেঘের ফাঁকে শরৎ বুঝি হাসে
হাসির আভা ছড়িয়ে গেছে সবুজ ঘাসে ঘাসে।
শ্যামল বনের আঁচল ভরে ফুটছে শেফালিকা,
নদীর তীরে কাশের বনে কিসের লিখন লিখা ?
শরৎ এলো, চললো উড়ে সাদা বকের সারি
চলনারে দিই ওদের সাথে অচিন দেশে পাড়ি,
রাজার মেয়ে সোনার খাটে শিথিল তনু ঢালা
ঘুমিয়ে আছে বিভোর হয়ে রূপের প্রদীপ জ্বালা।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেবো জাগবে নয়ন তুলে
আমায় দেখে হাসবে বালা স্বপন যাবে ভুলে
শরৎরাণী হবে বা সেই রূপকথার এক মেয়ে
সাতটি সাগর পেরিয়ে আসে সোনার তরী বেয়ে !

শরৎ এলো, ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব,
আনন্দময়ীর আগমনে জাগলো কলরব।
অকারণে ব্যস্ত সবাই অকাজেরই কাজে
কাহার খুসীর চরণ ধ্বনি মনের মাঝে বাজে !
ঝম ঝমাঝম বাদ্যি বাজে, বাজে পায়ের মল,
খুসীর মেলায় যোগ দিল কি নদীরও কল্লোল ?
স্নিগ্ধ হাওয়া শ্রান্তি হরে শান্তি নিয়ে আসে
মায়ের মতন সান্তনা দেয় তেমনি ভালোবাসে।
শরৎ ঋতু সবার প্রিয় সবার আনন্দের
হাসি খুসীর মিলন ঋতু তুলনা নাই এর !

# অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ফুটবল দল

কে ভট্টাচার্য্য

সিড্‌নীর পথে লেখক

১৯৩৮ সালে ভারতীয় দলের অষ্ট্রেলিয়া খেলতে যাওয়ার কথা এর আগে অনেক কাগজেই লেখা হয়েছে। কিন্তু দেশের বাইরে খেলায় যে শিক্ষা পাওয়া যায় সেটা যত বেশী অন্য সকলকে জানান যায়, বিশেষ করে যে সব খেলোয়াড়দের সে সুযোগ হয়নি, ততই তার সার্থকতা বাড়ে। তাই আজ আবার সেই কথাই লিখতে বসেছি। এ ছাড়া, দেশের বাইরে যাওয়ার বিষয়টা অর্থাৎ বিষয়ের আলোচনাটার গল্প হিসেবেও একটু দাম আছে, বিশেষ করে যখন সেটা কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শোনা যায়। এই দলের অধিনায়ক হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের দেশে ফুটবল খেলার প্রচলন অনেকদিন হ'ল হয়েছে। এই খেলা এখন জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে যথেষ্ট! লোকের মুখে কাগজে এর আলোচনাও হয় অনেক। মাঠে খেলা দেখে আমরা বলি—অমুক খেলোয়াড় খুব ভাল খেলে, ওর মত কেউ খেলতে পারে না, ইত্যাদি। কিন্তু সে যে কতখানি ভাল খেলে তার ঠিক ধারণা আমাদের ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ না অন্য দেশের খেলোয়াড়দের খেলার সঙ্গে তার খেলার তুলনা করার সুযোগ পাই। এখানে অবশ্য মিলিটারী দলে এবং ইউরোপীয় দলে মাঝে মাঝে ভাল খেলোয়াড় দু'একজন আসে। কিন্তু দু'একজনের খেলা দেখে সঠিক ভাবে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এবং তার থেকে ঠিক মত শিক্ষা লাভ করাও যায় না। খেলার উন্নতি করতে হলে বিদেশে গিয়ে অন্য ভাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলা খুবই দরকার। নিজেদের চেয়ে ভাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে না খেললে, নিজেদের খেলার দোষটা ঠিক বোঝা যায় না। তাই আমি আমাদের দলের বিদেশে পাঠানোর খুবই পক্ষপাতি।

ফুটবল জগতে অষ্ট্রেলিয়ার নাম অবশ্য বিশেষ কিছু শোনা যায় না, যতটা শোনা যায় ক্রিকেট, টেনিস ইত্যাদি খেলায়। আমাদের আগে এখানকার কোনও ফুটবল দলই ওখানে যায় নি। ওদের ফুটবল খেলা সম্বন্ধে যা অল্প কিছু শুনেছিলাম, সেটা আমাদের এই দলের ম্যানেজার মিঃ পঙ্কজ গুপ্তর মুখে, তিনি এর কিছুদিন



আগেই একটি হকি দল নিয়ে ওখান থেকে ঘুরে এসেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে এবং অন্য দু'এক জায়গা থেকে শুনে এইটুকু ধারণা আমাদের হয়েছিল যে অষ্ট্রেলিয়ানরা খুব গায়ের জোরে এই খেলা খেলে থাকে। এই সব শুনে আর সে বছর এখানকার আই এফ্ এ শীল্ড এর খেলা শেষ না হওয়ার দরুণ, কতকগুলি ভাল খেলোয়াড়কে দলে না পেয়ে, যাওয়ার সময় বেশ একটু নিরুৎসাহ হয়েই জাহাজে উঠেছিলাম। মনে হচ্ছিল যে আমাদের ওপর ভারতবর্ষের ফুটবল খেলার সুনাম বা দুর্নাম নির্ভর করছে। এই সময়ে অন্ততঃ আমাদের সব চেয়ে ভাল দল নিয়ে যেতে পারলেও খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। এর উপর অজানা দেশের আরও অনেক অনিশ্চয়তার কথা, যেমন সেখানকার খেলার আবহাওয়া, আমাদের প্রতি লোকেদের ব্যবহার ইত্যাদির ভাবনা এসে মনটাকে সত্যই একটু দমিয়ে দিয়েছিল। কলম্বো থেকে জাহাজে উঠবার পর জাহাজের জীবনের বৈচিত্রের ভেতর কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই এ সব কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে এর ভেতরেও আমাদের সুদক্ষ ম্যানেজারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ইত্যাদি করতাম। ঐটুকু সময় ছাড়া, ফুটবল খেলার কথা মনে হওয়ার সময় বোধহয় কারও হয়নি। কিন্তু যেদিন আমরা প্রথম অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা দিলাম, সেদিন থেকে এ মনের ভাব আর কারও ছিল বলে মনে হয় না। সকলেরই ভাবনা যে কি করে নিজেদের সম্মান বজায় রেখে দেশে ফিরতে পারব। কেন না ওখানে গিয়ে প্রথমেই কয়েকটা প্রতিকূল অবস্থা চোখে পড়ল। সেগুলো হচ্ছে (১) শক্ত খেলার মাঠ, (২) শীত ও (৩) ৫০ মিনিটের বদলে ৯০ মিনিট খেলা। ওখানকার দুএকটা মাঠ ছাড়া আর সবগুলোতেই ঘাসের অভাব আর মাটি একেবার পাথরের মত শক্ত। ঐ সব মাঠে খালি পায়ে খেলা যে কি ব্যাপার, তা যে না খেলেছে সে বুঝতে পারবে না। তারপর মেলবোর্ন, সিড্‌নী প্রভৃতি জায়গায় শীতও যথেষ্ট। তবে শীতের জন্য খালি পায়ে একটু লাগা সত্ত্বেও এইটুকু সুবিধা হয়েছিল যে ৯০ মিনিট ধরে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করেও, দমের অভাব বিশেষ কারও হয়নি। খালি পায়ে খেলা ছাড়া উপায়ও ছিল না, কেননা আমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই ছিল ওদের খালি পায়ের খেলা দেখানোর। এ বিষয়ে ওখানকার লোকদের এমনি উৎসাহ যে প্রথম পার্থ সহরে পৌঁছোনোর দিন থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্রেলিয়া ছাড়ার দিন পর্য্যন্ত ওখানকার খবরের কাগজে আমাদের খালি পায়ের ছবি কত যে ছাপা হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই। ওখানকার খবরের কাগজওয়ালাদের প্রথম প্রশ্নই হল—"তোমরা কি খালি পায়ে খেলবে?" আমরা 'হ্যাঁ' বলাতে ওরা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না এই রকম একটা মনের ভাব নিয়ে চলে যেত! সত্যি কথা বলতে কি, যতক্ষণ না এডিলেডের মাঠে আমাদের প্রথম খালি পায়ে বল মারতে দেখল, ততক্ষণ তারা বিশ্বাসই করেনি যে আমরা খেলতে পারব। সেদিন মাঠে আমাদের খালি পায়ে বল মারা দেখতে সে কী ভীড়। আমরা এক একটা বল মারি আর সমস্ত লোক হৈ হৈ করে উঠছে। - তারপর খেলার শেষে ওরা এসে আমাদের পা টিপে দেখছে যে ওদের মতই আমাদের পা কিনা! কালো চামড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু তফাৎ নেই দেখে, ওরা ভেবেই উঠতে পারে না যে এ রকম একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড কি করে আমরা করে উঠতে পারি। তারপরের দিন যথারীতি খালি পায়ের ছবি দিয়ে কাগজে আমাদের পরিচয় পত্র বেরোনোর পর, ওখানকার লোকেরা বোধ হয় ভাবল যে আমাদের খালি পায়ে ফুটবল খেলাটা একটা ম্যাজিক বিশেষ। যাই হোক, এই এডিলেডেই আমাদের প্রথম ম্যাচ আমরা যখন ৬-১ গোলে জিতলাম এবং নূতনত্বটা কেটে যাওয়ার পর, ওরা বেশ বুঝতে পারল যে তাদের বুটের সঙ্গে খেলতে আমাদের একটুও অসুবিধা হয় না, বরঞ্চ খেলার মাঠে তাদের বোকা বানিয়ে আমরা ভালভাবেই জিততে পারি। আমাদের খেলা সম্বন্ধে একটা

ধারণা তারা যেমন করে নিল, তেমনি ওদেরও খেলা সম্বন্ধে আমাদেরও একটু একটু ধারণা ক্রমশঃ হল। আমরাও খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে আমাদের আগে আরও অনেক বিদেশী দল ওখানে খেলে গিয়েছে। তারমধ্যে একমাত্র ইংলণ্ডের একটি পেশাদারী দল ছাড়া, সকলকেই এরা টেষ্ট ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছে। এই সব দল ইংলণ্ড, কানাডা, চীন ও চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ওখানে খেলে অষ্ট্রেলিয়ানদের খেলা সম্বন্ধে বেশ ভাল ধারণা নিয়েই ঘুরে গিয়েছে। তারপর যেদিন এরা ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের বাছাই করা একটি দলকে টেষ্টএ হারিয়ে দিল, সেদিন থেকে এদের ফুটবল খেলায় খুব উৎসাহ বেড়ে গেল। আমরাও যা দেখে এলাম, তা থেকে মনে হ'ল যে খুব শীঘ্রই ফুটবল খেলায় এদের স্থলাভিষিক্ত ক্রীকেটের মতই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন মিঃ কে ভট্টাচার্য্য এবং অষ্ট্রেলিয়ান দলের ক্যাপ্টেন মিঃ জ্যাক্ ইভান্স্ ব্রিসবেনএ ২য় টেষ্ট ম্যাচ খেলার পূর্ব্বে হ্যাণ্ড সেক্ করছেন।

যাই হোক, এডিলেডে প্রথম খেলা জেতার পর আমরা অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান ফুটবলের জায়গা সিড্নীতে গিয়ে পৌঁছোলাম। এখানকার মাঠ বেশ ভাল। অনেকটা কলকাতার মাঠের মত ঘাস। এবং সেইজন্যই আমার মনে হয় যে যদিও এখানকার খেলাগুলো আমরা সবই হেরেছিলাম, তবুও এইগুলোই, অবশ্য দু'একটা খেলা বাদ দিয়ে, সব থেকে ভাল খেলা হয়েছিল।

এখানে তিনটি খেলা হয়েছিল, তারমধ্যে প্রথম ও চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ও নিউ সাউথ ওয়েলস দলের সঙ্গে একটা। নিউ সাউথ ওয়েলস্ দলের সঙ্গে ৬-৪ গোলে হারি। এখানে বলে রাখি, এই নিউ সাউথ ওয়েলস্ দলই অষ্ট্রেলিয়ার সব চেয়ে ভাল ফুটবল দল। প্রায় প্রত্যেক টেষ্ট ম্যাচেই এই দল থেকে অন্ততঃ ন'জন খেলোয়াড় খেলেছে। প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ওরা সত্যই অনেক ভাল খেলে আমাদের ৫-৩ গোলে হারিয়ে দেয়। কিন্তু চতুর্থ টেষ্টে রেফারী একটি মারাত্মক ভুল না করলে, খেলাটি ৪-৪ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হত। সিড্নীতেই আমাদের খেলায় সব চেয়ে বেশী দর্শক হত। এইখানেই দর্শকদের ভেতর সব থেকে বেশী উৎসাহও দেখা গিয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত বড় বড় সহরে—যথা পার্স, এডিলেড, মেলবোর্ণ, সিড্নী ও ব্রিসবেনএ খেলার মাঠে ষ্টেডিয়ম আছে। সিড্নীতে এক সঙ্গে ৪০,০০০ হাজার দর্শকও আমাদের খেলা দেখেছে।



যাই হোক, এর পর আমাদের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা হয় ব্রিস্বেনে। এই খেলাটিও খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত দু'দল ৪-৪ গোল দেওয়ার পর, খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা আমাদের জিত বললেও হয়। ঠিক পরে চতুর্থ টেষ্টে, যে ভুলের জন্য আমরা এক গোলে হারি, রেফারীর সেই ভুলের জন্যই প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে অষ্ট্রেলিয়ানরা একেবারে বে আইনী ভাবে একটা গোল দিয়ে আমাদের জিত থেকে বঞ্চিত করে। এই দু'টা ভুল না হলে টেষ্ট খেলার ফল যে অন্য রকম হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া ব্রুইন্সল্যাণ্ডে আর সমস্ত খেলাই আমরা জিতি। ব্রিসবেনে একটা বেশ মজার খেলা হয়েছিল রাত্রে। খেলার মাঠের চারিদিকে খুব জোর আলোর বন্দোবস্ত ছিল। বলটিকেও সাদা রং মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অসুবিধার মধ্যে হ'ল রাত্রে খেলা হওয়ায় একটু শীত ভোগ করতে হয়েছিল, তা না হ'লে এই নূতন

সিড্নীতে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলার আগে লাইন্-আপ্
(বাঁ দিক হইতে)—কে ভট্টাচার্য্য (কাপ্টেন), আর লাম্স্ডেন, নুর মহম্মদ, প্রেমলাল, রহিম, বি সেন, এ নন্দী, কে প্রসাদ, সি রেবেলো, জুম্মা খান্, কে দত্ত

রকমের খেলাটা বেশ আমোদজনক হয়েছিল। খেলার ফলাফল হয়েছিল আমাদের ৭-৬ গোলে জিত। খেলার প্রায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোনও না কোনও পক্ষে এক একটী করে গোল হয়েছিল। ওখানকার প্রায় খেলাতেই অনেকগুলি করে গোল হ'ত। সেটার কারণ হচ্ছে ৯০ মিনিট করে খেলা। সময় অনেক বেশী পাওয়াতে গোল দেবার সুযোগও অনেক বেশী পাওয়া যেত। ব্রুইন্সল্যাণ্ডে শীত একটু কম থাকরে দরুণ ওখানে খালি পায়ে খেলতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ওখানকার আর সব খেলাগুলি জেতার পর আমরা নিউক্যাসল্

সহরে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ৪-১ গোলে জিতলাম। সেদিনকার খেলায় আমরা সত্যাই অষ্ট্রেলিয়ানদের থেকে অনেক ভাল খেলি এবং সেই খেলা দেখে তারাও বুঝতে পেরেছিল যে তাদের হারানো আমাদের ক্ষমতার বাইরে নয়।

সিড্নী, নিউক্যাস্ল্ ও ব্রিস্বেন্ ছাড়া, আমরা আর যে সব মাঠে খেলে এসেছি, সে সব মাঠে খেলা ত দূরের কথা—খালি পায়ে হাঁটাই প্রায় এক রকম অসম্ভব। বিখ্যাত মেল্বোর্ণ ক্রিকেট গ্রাউণ্ড, যেখানে অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলার কথা আমরা কাগজে কত পড়েছি, সেখানে আমাদের পঞ্চম এবং শেষ টেষ্ট খেলা হয়েছিল। মেলবোর্ণে পৌঁছে ওখানকার মাঠ দেখতে গেলাম, কেননা আগেই শুনেছিলাম ওই মাঠটা বড় শক্ত। কতখানি যে শক্ত তা বুঝতে পারলাম যখন সত্যাই পায়ের জুতা খুলে একটু হেঁটে পরীক্ষা করতে গেলাম। টেষ্টে সমান সমান সম্মান লাভ করার ওই শেষ সুযোগ। এর আগের চারটি টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে দু'টি জিত। আমাদের পক্ষে একটা জিত ও একটা খেলা সমান সমান ভাবে শেষ হয়েছিল। কিন্তু মাঠের অবস্থা দেখে খেলার ফলাফল সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ রইল না। মনটা সেদিন সত্যাই দমে গেল। মাঠ এতই শক্ত যে লাঙ্গল দিয়ে মাঠ খুঁড়ে দিতে বলা হোলো। তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না। একটু খেলতে না খেলতেই পা কেটে রক্তারক্তি। ঐ রকম অবস্থায়ও আমাদের খেলোয়াড়রা সেদিন যে রকম প্রাণপণে খেলেছিল, তা সত্যাই প্রশংসনীয়। এত চেষ্টা সত্ত্বেও ওই মাঠে আমাদের পক্ষে জেতা সম্ভব হল না এবং খেলাটি আমরা ১-৩ গোলে হারলাম। সর্ব্বসমেত খেলা হয়েছিলো ১৭টা। তার মধ্যে ৭টি খেলা আমরা জিতি ২টি খেলার ফল সমান সমান হয় এবং ৮টি খেলায় ওদের জিত হয়। সব খেলাগুলিতে গোলের সংখ্যা হয়েছিল ১২৩টা। আমরা দিয়েছিলাম ৬৩ গোল এবং খেয়েছিলাম ৬০ গোল।

টেষ্টে হেরে যাওয়ায় মনটা সত্যাই খারাপ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের খেলার শেষে যখন ওরা একবাক্যে বলেছিল যে ফুটবল খেলায় এতটা কৌশল তারা আর কোনও দলের খেলাতেই দেখেনি, তখন সত্যাই গর্ব্ব ও আনন্দে মনটা ভরে উঠেছিল। তারা যে আমাদের খেলা দেখে খুসী হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওখানকার সমস্ত কাগজেই লিখত যে ফুটবল খেলা যে এত দ্রুত খেলা যায় তা তারা ধারণাই করতে পারেনি। আমাদের খালি পায়ের বলের উপর আয়ত্ত দেখেও ওরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিল। রেডিওতে এক রাত্রে কিছু বলার সময় প্রশ্ন করা হয়েছিল—"তোমরা বুট পায়ে দিয়ে খেলনা কেন?" তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, "ফুটবল মানে পায়ে যে বল খেলা হয়—বুটবল নয়!" এ উত্তরে তারা খুব খুশী হয়েছিল। কিন্তু এ কথাটা ঠাট্টা করেই বলেছিলাম।

সত্যাই যখন ঐ সব খেলার কথা ভাবি, তখন মনে হয় শীতের দেশে শক্ত মাঠে এবং আমাদের থেকে বেশী শক্তিশালী, আকারে বড় ও সবুট প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে খেলতে হলে বুটের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করে রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়দের পক্ষে। কেননা রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের কাজ হল, বিপক্ষের খেলোয়াড়দের পা থেকে বলটা কেড়ে নিয়ে নিজেদের খেলোয়াড়দের পায়ে দিয়ে দেওয়া। এ কাজ করতে হলে বিপক্ষের বুটের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং শীতের জন্য পায়ে লেগে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। আক্রমণ ভাগের খেলা হ'ল, বিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে বলটা গোলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এতে আমাদের খালি পায়ের এই সুবিধা হয় যে খালি পায়ে বুটের চেয়ে অনেক দ্রুত বলটা নিয়ে দৌড়ানো যায়। তা ছাড়া খালি পায়ে বলের উপর যতটা আয়ত্ত থাকে, ততটা বুট পায়ে দিয়ে থাকে না। এর উপরেও বড় কথা—আমাদের ফুটবল খেলার বিশেষত্বই হল খালি পায়ের খেলা। সেটাকে নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক উচিৎ নয়। অথচ খেলার কার্য্যকারিতাও যাতে বজায়



থাকে তার দিকেও নজর রাখতে হবে। তাই আমার মনে হয় যে আমাদের আদর্শ ফুটবল দল হবে বুটপায়ের রক্ষণভাগ এবং খালিপায়ের আক্রমণভাগ। কিন্তু এইটুকু মনে রাখতে হবে যে দরকার হলেই এই খালিপায়ের আক্রমণ ভাগকে বুট পরে খেলতে হবে এবং বুট পায়ের রক্ষণভাগকে খালি পায়ে খেলতে হবে। আমাদের খেলোয়াড়দের এইভাবে তৈরী না করতে পারলে, আন্তর্জ্জাতিক খেলায় আমরা কিছু সুবিধা করতে পারব বলে মনে হয়না।

হ্যাঁ, এখন তাদের খেলার কথা কিছু বলে এই আলোচনা শেষ করব। গায়ের জোরে খেলার কথা আমরা যা শুনে গিয়েছিলাম, তার ভেতর কিছু সত্য আছে বলে মনে হল না। অষ্ট্রেলিয়ানরা বেশ ভালই খেলে। বিশেষ করে তাদের আক্রমণ ভাগের খেলায় আমাদের শিক্ষা করবার অনেক কিছুই আছে। কি করে এবং কখন বল্‌টিকে নিজেদের খেলোয়াড়দের পাশ করে দিতে হয় এবং কি করে ও কখন গোলে মারতে হয়, সেটা তারা আমাদের বেশ ভাল করে শিখিয়ে দিয়েছে। আক্রমণ ভাগের পাঁচজন খেলোয়াড়ের ভেতর, দেওয়া ও নেওয়া করে, কি করে বল নিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঠিক সময়মত গোলে মারতে হয়, তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় আমাদের আদর যত্নের ত্রুটি মোটেই হয়নি। সব বড় সহরেই নাগরিক অভ্যর্থনায় সম্মানিত হয়ে এসেছি এবং আমাদের সমস্ত সুখ সুবিধার দিকে নিখুঁৎ নজর রেখে প্রতিটি দিন সম্পূর্ণভাবে উপভোগ্য করবার চেষ্টা করেছে। খেলার মাঠে অষ্ট্রেলিয়ানদের মত 'স্পোর্টিং' জনতা আর কোথাও সহজে চোখে পড়ে না।

## বুদ্ধির ব্যাপারী

শ্রীসতীকান্ত গুহ

চৌদ্দটা গ্রাম নিয়ে একটা গ্রাম। গ্রামের নাম চৌদ্দডাঙা। গ্রাম নয় যেন পৃথিবী। কোনো গ্রামে পণ্ডিতেরা তর্ক করেন, পুরুতেরা পুঁথি পড়েন; কোনো গ্রামে টোল মন্দিরের বালাই নেই, কামার আর কুমোরের আড্ডা—কাঁসা পেতলের খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ আওয়াজ, খড় ও মাটি ছেনার খর খর সপ্ সপ্ শব্দ। কোনো গাঁয়ে আবার শুধু হাতির হুঙ্কার আর মল্লদের দাপাদাপি। মোটামুটি পৃথিবীতে যা আছে, তা আছে এই চৌদ্দডাঙা গ্রামে, আর পৃথিবীতে যা নেই, তা'ও হয়তো নেই এই চৌদ্দডাঙা গ্রামে। এর চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে!

চৌদ্দডাঙা গ্রামের চৌদ্দটি জমিদার চৌদ্দডাঙার বিশাল বৈঠকখানায় বসে সকালে প্রজাশাসন করেন, দুপুরে নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমোর আর সন্ধ্যা হতে না হতে গোঁফে সুর্ম্মা দিয়ে আলবোলা গড়্গড়া নিয়ে এক একটী ক্ষুদে দেবতার মত জমিদাররা ইন্দ্রসভার মত নাটমন্দির জমিয়ে বসেন—ষোলো ঝাড়ের আলোয় কবিগান শুনে, ছোকরা-নাচ দেখে বাহবা

দিতে দিতে তাদের শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, চোখের পাতা জড়িয়ে আসে, তখন জমিদাররা দলবেধে তাদের বিশাল শয়ন ঘরে ঘুমোতে যান।

সেদিন চৌদ্দটি জমিদার সকালবেলা বসে মহা আরামে প্রজাপীড়ন করছেন, বাঁশডলা আর নাকডলা কোনটি প্রয়োগ করলে প্রজার খাজনা না দেওয়ার ব্যাধি আরোগ্য হবে এই নিয়ে নিজেদের ভিতর তুমুল তর্ক করছেন, এমন সময় সিংদুয়ারে একটা হৈ হৈ শোনা গেল। মনে হল, কে যেন জোর করে জমিদারদের বৈঠকখানায় ঢুকতে যাচ্ছে, সিংদুয়ারের পাইক পথ আটকেছে, কিন্তু মানা না শুনে যে-করেই হোক সে ঢুকে পড়তে চায়।

চৌদ্দডাঙার জমিদার সভায় এসে এত আস্পর্দ্দা!

ক্রোধে বিস্ময়ে চৌদ্দটি জমিদারের গোঁফ ফুলে ওঠে আর চৌদ্দ জোড়া চোখ আগুনের ভাটার মত জ্বলতে থাকে।

একসঙ্গে চৌদ্দজন ধমকে ওঠেন—"কোন্ হ্যায়!"

"আরে মশাই আমি আমি!"

জমিদাররা নিজেদের চোখ বিশ্বাস করতে পারেন না। অসুরের মত চৌদ্দটা পাইককে ফাঁকি দিয়ে কোন্ এক ফাঁকে সট্‌কান দিয়ে লোকটা একেবারে বৈঠকখানা ঘরে এসে হাজির! লোকটা—হ্যাঁ লোক তো বলতেই হবে, মানুষের মত নাক কান চোখ মুখ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এক অদ্ভুত জীব, যেন অন্য কোনো এক অদ্ভুত পৃথিবীর প্রাণী।

লোকটি মেরে কেটে মাথায় আড়াই হাত হবে কিনা সন্দেহ, রোগা লিক্‌লিকে হাত পা, রক্তহীন ফ্যাকাসে রঙ, শনের নুড়ির মত কটা চুল, ধূর্ত্ত নীল একজোড়া কুৎকুতে চোখ।

জগন্নাথের মন্দিরে ইঁদুরের মত বিশাল জমিদার সভায় এই রুগ্ন বামনাবতার যেন ঠাহর-ই হয় না। জমিদাররা যে যার পকেট থেকে চশমা বার করে এনে চোখে এটে তাঁদের উঁচু চৌকি থেকে ঝুঁকে পড়ে এই বামনাবতারকে সবিস্ময়ে দেখতে থাকেন। খানিক বাদে জমিদাররা সোজা হয়ে বসেন, তারপর তাদের তর্ক সুরু হয় এই জীবটি সত্যিকারের মানুষ না উদ্ভট আর কোনো জীব।

লোকটি বিড়বিড় করে বলে—"বোকার সন্দেহ দেখছি বড় ভয়ঙ্কর।"

জমিদাররা রে রে করে' বলে' উঠলেন, "অ্যাঁ অ্যাঁ, কি বলে, কি বলে!"

লোকটা হতাশার স্বরে বলে, "নাঃ, বলার কিছুই নেই। দুঃখ এই মশাইরা যে এলুম, অথচ চিনতে পারলেন না। আপনাদের রকম সকম দেখে আমার বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে, আমার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে, আমি মানুষ না উইচিংড়ি।"

এত বড় মজার কথা জমিদাররা আর জীবনে শোনেন্ নি। হোঁঃ হোঁ করে বিশাল বৈঠক খানা কাঁপিয়ে চোদ্দটি অসুর জমিদার হেসে ওঠেন।

লোকটি একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কিন্তু ধূর্ত্ত দুটি চক্ষে তার অপরিসীম চতুরতা ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটুকরো কাঁচ বার করে এনে সে এক জমিদারের হাতে দিয়ে বলে, "এই নিন জ্ঞানচক্ষু, চোখে লাগিয়ে একবার দেখুন।"

১নম্বর জমিদার সেই কাঁচ চোখে লাগাতে মহাবিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট ধ্বনি বার হয়, তার হাত থেকে কাঁচের টুকরো খসে পড়ে। জমিদার সেই কাঁচের ভিতর দিয়ে



দেখলেন, কোথায় রুগ্ন বামনাবতার! নাক কান চোখ হুবহু এক বটে, কিন্তু আড়াই হাত বামনের স্থানে দাঁড়িয়ে আছে যেন বিশহাত এক দৈত্য!

জমিদারের হাত থেকে কাঁচটি খসে পড়তেই বামনাবতার শশব্যস্তে কাঁচটি কুড়িয়ে নিয়ে তার ঝোলায় রাখে। তার দুটি চোখ চালাকিতে চক্‌চক্ করতে থাকে।

১নম্বর জমিদারকে লক্ষ্য করে অন্য জমিদাররা বলে উঠলেন "কি ব্যাপার?"

১ নম্বর জমিদার বিস্ময় বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, "ব্যাপার বড় ভয়ঙ্কর! এই আড়াই হাত প্রাণীটি যে-সে ব্যক্তি নন। ইনি আসলে এক অতিকায় মানুষ! জ্ঞানচক্ষুতে দেখলুম পর্ব্বত প্রমাণ এর শরীর।"

১ নম্বর হতে সুরু করে চৌদ্দ নম্বর, চৌদ্দডাঙার চৌদ্দ বোকা হাঁ হয়ে পৃথিবীর বিস্ময় বামনাবতারের দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকেন। তাদের মহাবিস্ময় লক্ষ্য করে বামনাবতারের মুখ ধূর্ত্ত হাসিতে ভরে যায়।

খানিকটা ইতস্ততঃ করে অবশেষে ১ নম্বর জমিদার শুধোন—"মহাশয়ের পরিচয়? চৌদ্দডাঙায় কী অভিপ্রায়ে আগমন? আর এত বড় বিশালকায় হয়েও আড়াই-হাতের ছদ্মবেশ ধরে বেড়ানোর অর্থ?"

খুক করে কেশে নিয়ে বামনাবতার জবাব দেয়—"আড়াই হাত হয়ে বেড়ানোয় অনেক সুবিধে—যেখানে সেখানে এক ফাঁকে ঢুকে পড়তে পারি, কবাট বন্ধ করে দিলে জানালা দিয়ে গলিয়ে ঘরে ঢুকে পড়তে পারি। আগে আগে আমি অবশ্য বিশ হাত দেহ নিয়েই ঘুরে বেড়াতুম—কিন্তু হিন্দুস্থানের কয়েক মহারাজের সভায় বড় নাকাল হতে হয়েছিল!"

জমিদাররা সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করেন—"সে কি রকম! সে কি রকম?"

বামনাবতার মাথা নেড়ে বলে—"সে বড় লজ্জার কথা মশাই! প্রথমতঃ আমি সভায় ঢুকতেই রাজারা অজ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মাথার ধাক্কায় রাজসভার খিলান ফুটে চৌচির আর খিলানের সেই ফাঁক দিয়ে রাণীরা ঝুপ্ করে নীচেয় পড়ে—"

জমিদাররা হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন "অজ্ঞান!"

হাসি চেপে নিয়ে বামনাবতার বলে, "হ্যাঁ অজ্ঞান! তখন থেকে আমার জ্ঞান হল, এ মানুষ বেচারাদের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, কাজেই আড়াই হাত বামন হয়ে ঘুরে বেড়াই, দরকার মত জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে নিজের বিশ-হাত পরিচয় দিই। এই হল আপনাদের প্রথম প্রশ্নের জবাব। এখানে আমি কেন এসেছি জিজ্ঞেস করছেন, আমি এসেছি বুদ্ধির মারপ্যাচ শেখাতে। আমি এত ফন্দি ফিকির জানি যে আমার পাল্লায় পড়লে স্বয়ং ভগবান বাপ্ বাপ্ ডাক ছেড়ে পালানোর পথ খুঁজে পাননা। যদি ভূতের মুখে রামনাম শুনতে চান বুদ্ধির কায়দায় তাও শোনাতে পারি।" লোকটি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে থাকে।

দিন-দুপুরে জমিদারদের গা ছম্ ছম্ করতে থাকে, লোকটা বলে কি!

লোকটি চোখ পিট্ পিট্ করে' বলে, "আগুন যেমন ছাই চাপা থাকে না, তেমনি নিজেকেও আমি আর লুকিয়ে রাখতে পারলুম না। চারিদিকে আমার নাম রাষ্ট্র। এই চৌদ্দডাঙার দিকটাই যা মাড়াইনি, না হলে মানুষ তো মানুষ, জন্তু-জানোয়াররা পর্য্যন্ত আমার

নামে তটস্থ। আফ্রিকার সিংহেরা তো আমার নাম শুনলে দাড়ি কামিয়ে সুর্ সুর্ করে' গর্ত্তে ঢোকে!"

বোকাসোকা একটি জমিদার ঢোক গিলে বলেন, "আপনার নামটা জানা থাকলে তো বেশ আফ্রিকায় গিয়ে খালি হাতে সিংহ ধরে আনা যায়!"

লোকটি এবার ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে হাসতে বলে, "তা আনা যায় বই কি! আনা যায় বই কি! কিন্তু মজা দেখুন জমিদার মশাইরা, এই নামটাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত বলা হয়নি।"

জমিদাররা যতটা সম্ভব পরস্পরের কাছাকাছি গা ঘেঁষে বসে নামটা শোনার জন্য প্রস্তুত হন। অর্থাৎ নাম শুনে পালাতে হলে যাতে একসঙ্গে পালাতে পারেন।

হল্‌দে এক জোড়া উইয়ে খাওয়া গোঁফে তা দিতে দিতে, এক চোখ বুজে, বিচিত্র মুখভঙ্গি করে বামনাবতার তার মহাশ্চর্য্য নামটা বলেন—"শ্রীল শ্রীযুক্ত মহাতঞ্চক।

জমিদাররা সমস্বরে বলে উঠেন, "মহাতঞ্চক!"

মাথা নুইয়ে বামনাবতার বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দরকার হলে শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদ দিয়ে শুধু তঞ্চকও বলতে পারেন।

## দুই

এই সময় চৌদ্দডাঙার সভাপণ্ডিত তাঁর নিত্য হাজিরা দিতে আসেন। তার বগলে পুঁথির বোঝা, এক হাতে লাঠি, আর এক হাতে নস্যের ডিবি। সভায় ঢুকে বামনাবতারকে দেখে সভাপণ্ডিত বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে থাকেন।

তঞ্চক খন্‌খনে গলায় বলেন "আসুন, আসুন পণ্ডিতমশাই, প্রাতঃপ্রণাম হই।"

পণ্ডিত ছোটখাটো একটা উল্টা নমস্কার জানিয়ে এবার জমিদারদের পানে তাকান। জমিদাররা যেন পণ্ডিতের মনোগত ভাব বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বলেন, "দেখছেন কি পণ্ডিতমশাই, তঞ্চক নাম শুনেছেন? আপনার চোখের সামনে যে আড়াই-হাতকে দেখছেন, তিনি হচ্ছেন পৃথিবীর জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ পুরুষ তঞ্চক।"

তঞ্চক ঈষৎ হেসে জমিদারদের এ উক্তির সমর্থন করেন।

পণ্ডিত বেচারা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হন, বলতে থাকেন, "কিন্তু মাত্র আড়াই হাত!" ১ নম্বর জমিদার বলে ওঠেন, "আড়াই-হাত হচ্ছে এঁর ছদ্মবেশ, আসলে ইনি হচ্ছেন এক দৈত্য বিশেষ পূরো বিশ হাত!"

"বিশ হাত?" পণ্ডিত যেন বিশ্বেস করতে পারেন না।

তঞ্চক তখন বলেন, "জ্ঞানচক্ষু থাকলে আপনার মনে এই আড়াই হাত নিয়ে কোনো খট্‌কা থাকতো না পণ্ডিতমশাই—দুঃখের বিষয় আপনার জ্ঞানচক্ষু নেই। জমিদারদের দিকে চতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তঞ্চক বলেন, "কি পরিতাপের বিষয়! এত বড় চৌদ্দডাঙার সভাপণ্ডিতের কিনা জ্ঞানচক্ষু নেই!"

জমিদাররা অধোবদন হয়ে পড়েন। বিশেষ করে ১ নম্বর জমিদার, যিনি কাঁচের ভিতর দিয়ে আড়াই-হাতের বিশাল বিশহাত স্বরূপ দেখেছিলেন, তিনি যেন একটু বেশী অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। ফিস্ ফাস্ ক'রে তিনি বলতে থাকেন, "চেপে যান পণ্ডিতমশাই, চেপে যান।"

অগত্যা পণ্ডিত চেপে যান। কিন্তু তর্ক করা যার আজন্ম অভ্যাস তিনি এই অদ্ভুত



আড়াই-হাতের সঙ্গে তর্ক না করে' পারেন না। তা ছাড়া, কে যেন তার কানে কানে বলতে থাকে, এই আড়াই-হাত যদি জমিদার সভায় শিকড় গেড়ে বসে, তবে তোমার ভাত উঠল পণ্ডিত। সুতরাং, পণ্ডিত মশাইয়ের ভিতর যুদ্ধং দেহি ভাবটা প্রবলতর হতে থাকে।

একটিপ নস্যি নাকে পুরে পণ্ডিত বলেন "তা বেশ, কিন্তু মশাই এর কি অভিপ্রায়ে আগমন?"

তঞ্চক জবাব দেন—"জবাবটা জমিদার মশাইদের একবার দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তবু আপনাকে বলতে বাধা নেই—এখানে একটু বুদ্ধির মার প্যাচ শেখাতে এসেছি।"

পণ্ডিত শ্লেষ ভরে বলেন, "পৃথিবীতে আর কোনো জায়গা পেলেন না, চৌদ্দ ডাঙায় এসে উৎপাত করার অর্থটা বুঝতে পারি!"

তঞ্চক বিনয়ে গলে পড়ে বলেন, "আজ্ঞে, পৃথিবীর আর কোনো দেশ বাকী নেই, বাকী ছিল এই চৌদ্দডাঙা!"

পণ্ডিত একটু গরম হয়ে ওঠেন, চোখ পাকিয়ে বলেন "বটে! বটে!" মনে মনে তোলপাড় করতে থাকেন কি করে এই চালিয়াতকে জব্দ করা যায়।

তঞ্চক তখন জমিদারদের সম্বোধন করে' বলেন—"চৌদ্দডাঙায় কি উদ্দেশ্যে আমি এসেছি তা খুলে বলেছি। এই বোকার আড্ডায় এসে বুদ্ধির ব্যবসা না খুলি তো বিবেকের কাছে আমার দায়ী হতে হবে। আমার সংকল্পে বাধা দেয়, ত্রিভুবনে এহেন শর্ম্মা নেই—কোন্ ফন্দিতে কার্য্যোদ্ধার করতে হয় আমার বেশ ভালো করে জানা আছে। তবু জমিদার মশাইরা যদি ইচ্ছে করেন আমি সভাপণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে বুদ্ধির পরিচয় দিতে রাজী আছি। যদি সভাপণ্ডিত আমায় হঠাতে পারেন, বেশ, আমি বিনা দ্বিরুক্তিতে এ তল্লাট ছেড়ে প্রস্থান করব।"

জমিদাররা বললেন, "তা বেশ! তা বেশ!"

সভাপণ্ডিত বললেন—"তর্কযুদ্ধের নিয়মটা হচ্ছে এই যে গোড়াতেই যদি প্রমাণ হয় যে একজন আর একজনের চেয়ে এত ছোট যে তর্ক যুদ্ধ চলতেই পারে না, তা হলে যুদ্ধটা আর হয় না। যে ছোট, সে বড়র পায়ের ধুলো নিয়ে সরে পড়ে।"

তঞ্চক হেসে বলেন, "তাহলে আপনি সেই প্রমাণ দিন পণ্ডিত মশাই, আমিও সরে' পড়ি।"

পণ্ডিত নাকের বাঁশী ফুলিয়ে বলেন, "তাহলে সভাস্থ সকলে শুনুন, আমি চৌদ্দ-ডাঙার সভাপণ্ডিত—উরুক্রমপুর, বিক্রমপুর জয় করে আমি দিগ্বিজয়ী, আমার বাপ ঠাকুর্দ্দা চৌদ্দ পুরুষ দিগ্বিজয়ী, আমার সঙ্গে আড়াই হাত বামনের তর্ক করা শোভা পায় না।"

তঞ্চক বলেন "সভাস্থ সকলেরা পণ্ডিতের কথা শুনলেন। হ্যাঁ স্বীকার করি, পণ্ডিতমশাইএর পুঁথিপড়া অভ্যেস আছে, আর বোকার হাটে বুদ্ধিমান সাজবার ক্ষমতাও আছে। কিন্তু যদি প্রমাণ করে' দিতে পারি যে পৃথিবীতে যার তুল্য কেউ নেই, যার পায়ের ধুলো পেয়ে পণ্ডিতমশাই ধন্য হবেন, তাঁকে আমি তর্কে পরাস্ত করেছি তা হলে পণ্ডিত মশাই হার মেনে নেবেন তো?"

পণ্ডিতের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে' ওঠে। সভাস্থ সকলে সমস্বরে বলে ওঠেন—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

তঞ্চক তখন তার খন্ খনে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলতে থাকে—"কিছুক্ষণ আগে কথাচ্ছলে বলেছিলুম, আমার পাল্লায় পড়ে ভগবান বাপ্ বাপ্ ডাক ছেড়ে পালাতে পথ পান না, এ শুধু কথার কথা নয়। আমি একবার সত্যি সত্যি ভগবানকে তর্কে পরাস্ত করেছিলুম।"

জমিদার সভায় তখন কুটোটি পড়ার শব্দ শোনা যায়!

তঞ্চকের তর্ককাহিনী পুনরায় সুরু হয়—"একদিন হিমালয়ের চূড়োয় ভগবানের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের হাতে কাজ ছিল না, বসে বসে খাব্‌লা খাব্‌লা বরফ খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে ভগবান চটেমটে বললেন—'তুমি কে হে বাপু! দেখছ আমি এখানে বসে বরফ খাচ্ছি। এখানে এসে তোমার ঘুর ঘুর করার অর্থটা কী? আমি বললুম—'আজ্ঞে আমি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই এসেছিলুম।'

ভগবান বললেন, "আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে এসেছিলে! তোমার আস্পর্দ্দা তো কম নয়!"

আমি বললুম—"সে যেতে দিন, মশাই! আপনাকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে এসেছিলুম।"

ভগবান তখন তাড়াতাড়ি আর এক খাব্‌লা বরফ খেয়ে বলেন—"বেশ! বলো কি কথা! কিন্তু বাজে কথা বল্‌লে তোমাকে আস্ত রাখবনা বলে রাখছি।"

আমি বললুম—"দেখুন ভগবান মশাই! যদি কিছু মনে না করেন তো বলি আমার কিছুকাল যাবত সন্দেহ হচ্ছে যে খুব সম্ভব আপনি নেই।"

ভগবান হা হা করে বলে ওঠেন—"কি সর্ব্বনেশে কথা! আমি নেই—সে কি রকম!"

"আজ্ঞে, আপনার রকম সকম এত গোলমেলে যে আমার ক্রমাগতই সন্দেহ হচ্ছে আপনি মস্ত বড় একটা বুজরুকি—আসলে আপনি নেই!"

ভগবান এবার মহাখাপ্পা হয়ে বলে ওঠেন, "আমি তোমায় আস্ত রাখব না বামন। বাজে কথা বলে আমার বরফ খাওয়া নষ্ট করতে এসেছ!"

আমি বলি—"আজ্ঞে হিমালয়ের বরফ একশ বছর ধরে' বসে খেলেও ফুরোতে পারবেন না। কিন্তু আপনি নেই, অথচ আছেন এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বেশ মনের ফুর্ত্তিতে খাব্‌লা খাব্‌লা বরফ খাচ্ছেন, এ কেমন একটু দৃষ্টিকটু নয় ভগবান মশাই!"

ভগবান হাতের বরফ ঝেড়ে ফেলে বলেন, "ভনিতা না করে, তোমার চালাকি খুলে বলো তো ধড়িবাজ চন্দ্র!"

আমি বললুম—"আমার বিশ্বাস আপনি নেই। তবে, আপনি আবার চটে উঠবেন, সেই জন্যেই গোড়ায় ধরে' নিচ্ছি আপনি আছেন।"

ভগবান একগাল হেসে বলেন—"হাঁা, হ্যাঁ, তা আছিই তো।"

"আপনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র সকল সময় আছেন—অর্থাৎ যখনই যা দেখি যা শুনি তা আপনি।"



"বেশ, বেশ কথা।" ভগবান খুসি হয়ে বলেন।

"তা হলে আপনি আমাতেও আছেন।"

ভগবান ঘাড় নেড়ে বলেন - "হ্যাঁ—"

"ঐ যে কাশীর ঘাটে মরা পুড়ছে ওই মরাটার ভিতরও আপনি আছেন।"

ভগবান হাত নেড়ে বলেন—"ঐ মরাটা তো আমিই।"

"কিন্তু মরাটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল—অর্থাৎ আপনিও ছাই হয়ে গেলেন।"

ভগবানের চোখে যেন সন্দেহ ঘনিয়ে আসে। কিন্তু আমি তাঁকে কথা বলার সুযোগ দিই না। আমি বলি—'ছাই হয়ে গেলে কিছুই থাকে না, আপনিও তাহলে নেই।"

ভগবান দুচোখ কপালে তুলে বলেন "কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! আমি আছি অথচ নেই।" ভগবান নিজের নধর শরীরটির দিকে তাকিয়ে বলেন, "এটা তা হলে কি?"

আমি বলি—"এই কথাই তো বলছিলুম ভগবান মশাই—যা নেই, তা আছে, এ বড় গোলমেলে ব্যাপার নয় কি? আপনার থাকা ব্যাপারটা নিয়ে যদি এত বড় গোলমালের সৃষ্টি হয়, তা হলে কে আপনাকে মানবে মশাই, আপনার সৃষ্টিকে কে বিশ্বাস করবে?"

ভগবান এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন, "ধড়িবাজ তঞ্চক! এ কথা কাউকে বোলো না বাপু! এসো, বরফ খাও?"

জমিদার সভায় হাততালি আর বাহবা পড়ে যায়। সভাপণ্ডিত এই তর্কের গলদ দেখাতে চেষ্টা করেন, তর্কটা যে আগাগোড়া জুয়াচুরি বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সভায় তখন বামনকে কাঁধে নিয়ে জমিদাররা নাচতে সুরু করেছেন। তখন রেগে মেগে পুঁথি গুটিয়ে সভাপণ্ডিত প্রস্থান করেন।

মহাতঞ্চক চৌদ্দভাঙায় বুদ্ধির ব্যবসা পত্তনের সনদ পেয়ে যান।

———

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ও ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কনট্রাকটার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

## রংমশাল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রংমশাল ! রংমশাল !
অরুণ উষার
সিঁদুর ভূষার
বরণ বিভায়
তোমার কি ভাই
রংটি লাল ?
রংমশাল ?

নীল গগণের
নীল মাণিক
নীল সাগরের
ঢেউ খানিক
এল কি গো ভুলে
নীল নদী কুলে
আলোর মুকুলে
প্রজাপতি বুলে
সাঁঝ সকাল,
রংমশাল !

সবুজ আভাটি
শ্যামেলা বনে
কচি ও কাঁচার
রংটি মনে
সর্ষে ফুলের
হলুদ মায়া
চিকণ বরণ
করলে কায়া

বেগুণ ক্ষেতের
রং বেগুণা
পাঠিয়েছে কি
তোমায় গুণী,
রংয়ের তাল ?
রংমশাল !

কমলা লেবুর
কমলা আর
গোলাপ ফুলের
রং গোলাপী,
ময়ূরকণ্ঠী
বর্ণ তার
যোগায় তোমায়
কোন্ কলাপী ?

জর্দ্দাপরী কি
পর্দ্দা তুলে
চুম্ দিয়ে যায়
তোমায় ভুলে ?

রামধনুকের
রং নিয়ে কে
বুন্‌লে রঙের
ইন্দ্র জাল ?
রংমশাল !

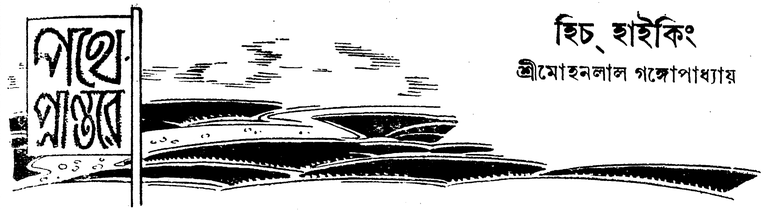




## হিচ্ হাইকিং

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের দেশে দিশী কারখানায় মোটার গাড়ি তৈরী করবার প্রস্তাব নিয়ে কিছুদিন আগে খুব একটা হৈ চৈ পড়েছিল। নানা কারণে সেই প্রস্তাবকে আপাততঃ মুলতুবি রাখা হয়েছে। বড়ই দুঃখের কথা। মোটার গাড়ির দাম সস্তা হলে, দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়লে, দেশের টাকা হলে, আমাদের অনেকেই মোটার কিনতে পারতুম ; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—আমরা সকলেই ইচ্ছা করলেই 'হিচ্ হাইকিং' ( Hitch Hiking ) করতে পারতুম।

আমি প্রায়ই বসে বসে ভাবি আমাদের দেশে হিচ্ হাইকিংটা সম্ভব হলে বেশ মজা হত। এত বড় দেশ, আর এত কিছু এখানে জানবার দেখবার আছে, হিচ্ হাইক করে তা যেমন সম্ভব তেমন আর কিছুতে নয়। আমি ঐ করেই ইয়োরোপের কয়েকটা দেশ দেখেছি। একটা দেশকে দেখবার বহু উপায় আছে জানি—রেলে করে, বাস্‌এ করে, নিজের মোটারে করে, সাইকেলে করে—কিন্তু এটা নিশ্চয় বলতে পারি, সবচেয়ে সেরা উপায় হচ্ছে হিচ্ হাইকিং—যদি সে দেশে তা সম্ভব হয়।

হিচ্ হাইকিং করবার আগে, জিনিসটা সম্বন্ধে আমার নিজেরই খুব অস্পষ্ট রকমের ধারণা ছিল। শুনেছিলুম একটা হাত বাক্সয় জিনিসপত্র ভরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়, যেমন করে বাস্‌এর জন্যে লোকে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মোটার গাড়ি বা লরি দেখলেই হাত তুলতে হয়। হাত তোলা দেখে গাড়ি যদি না থামলো তো চুকেই গেল ; আর যদি থামলো তো ছুটে গিয়ে বলা যে আমি অমুক দিকে যাচ্ছি, আমায় একটু পৌঁছে দেবেন ? গাড়িওয়ালার যদি সেই দিকেই গন্তব্য হয় এবং মর্জ্জি হয় তাহলে খানিকটা পথ হয়তো পৌঁছে দিলে, আর নৈলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল। এইভাবে যতটুকু যেতে পারা যায়। তারপর আবার একটা মোটার বা লরির জন্যে অপেক্ষা করা এবং হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করা। একেই জানতুম হিচ্ হাইকিং বলে।

শুনে মনে হয়েছিল, এ অতি কঠিন ব্যাপার। অচেনা গাড়িকে থামকা হাত দেখিয়ে থামাবো কি করে ? যদি না থামে তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। আর থামেও বা যদি, অজানা মানুষকে মুখ ফুটে বলি কি করে যে আমায় গাড়িতে তুলে নিন ? সবচেয়ে ভয়, গাড়ি থামিয়েও যদি মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে চলে যায়, তাহলে আর একটাও গাড়ি থামাবার সাহস থাকবে না। এই সব ভয়ে হিচ্ হাইকের চেষ্টা কোনোদিন করিনি।

১৯৩৮এর গ্রীষ্মের ছুটিতে সুইডেন ও নরওয়ে বেড়াবার মৎলব করেছিলুম। ইচ্ছে ছিল পাহাড়

অঞ্চলে কিছুদিন হেঁটে বেড়াবো, চরণিক হয়ে আর পারি তো হিচ্ হাইকিংটা একটু চেষ্টা করে দেখবো কেমন লাগে। মনে মনে তৈরী হয়েই ছিলুম যে একটু অপমানের গন্ধ পেলেই আর ওদিকে পা মাড়াবো না।

সুইডেনের পথে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেনে কয়েকটা দিন ছিলুম। একদিন ভারি সুন্দর রোদ উঠেছে—যেন আমাদের দেশের শরৎকালের মতো। ছুটির দিনে এ রোদ দেখলে স্থির হয়ে থাকা যায় না। আমি আর আমার একটি বন্ধু পিঠে দুটো রুক্‌স্যাক * নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম কোপেনহাগেন থেকে। যাবো সমুদ্রের তীরে হর্ণবেক্ পর্য্যন্ত। বাস্‌এ করে যাওয়া যায়, কিন্তু আজকের দিনে কি বাস্‌এ চড়তে মন লাগে? চল্লুম হেঁটে মুক্ত হাওয়ায়, আলোয় ছায়ায় ভরা খোলা রাস্তা ধরে। ইচ্ছা, যতটা পারি হাঁটবো, বেশ খানিকটা পরিশ্রম হবে, তারপর বাকিটা পথ বাস্‌এ করে গিয়ে হর্ণবেক্‌এ পৌঁছে সমুদ্র স্নান! বেশ চলেছি হাঁটতে হাঁটতে, হিচ্ হাইকিংএর কোনো মৎলবই নেই। সুইডেনে পৌঁছবার আগে ও-সব করবই না এই ইচ্ছে। মনেও নেই ঐ জিনিষটার কথা। হঠাৎ একটা হলদে রংএর মোটার গাড়ি ব্রেক্ কষে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রৌঢ়া এক ডেনিশ্ মহিলা গাড়ি হাঁকাচ্ছিলেন, তিনি জানতে চাইলেন, কতদূর যাচ্ছি আমরা।

—"হর্ণ্‌বেক্!"

—"হর্ণ্‌বেক্? তাহলে তা অর্দ্ধেক পথ আমিই পৌঁছে দিতে পারব।" বলে মহিলা গাড়ির দরজা খুলে দিলেন।

আমরা প্রায় মন্ত্রচালিতের মতো গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গদিতে বসে আমি আমার বন্ধুটিকে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লুম—"আমাদের না আজ হাঁটবার কথা ছিল? এটা কি হল ভাই?"

বন্ধু বল্লেন—"হিচ্ হাইকিং হল!"

মহিলা গল্প করা সুরু করলেন, বল্লেন—"আমরা ডেন্‌মার্কে হাইকারদের, বিশেষতঃ ছাত্রদের গাড়ি করে পৌঁছে দিতে খুব ভালবাসি। আপনারা তো বিদেশী দেখছি, আপনারা ছাত্র তো?"

আমরা বল্লুম—"হাঁ। ছুটিতে দেশ দেখতে বেরিয়েছি।"

মহিলা বল্লেন—"তবেই তো আসল শিক্ষার কাজে বেরিয়েছেন। এখানে আমরা আজকাল ছাত্রদের দেশ বেড়াবার জন্যে খুব উৎসাহ দিই। আমাদের যাদের গাড়ি আছে, কত সময়ই তো খালি গাড়ি নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাই, তার মাঝে যদি একজন হাইকারকে একটু জায়গা দিতে পারি, নিজেদের কৃতার্থ মনে করি।"

শুনে সত্যিই আমাদের নিজেদের মস্ত লোক বলে মনে হল। মনে হল, আমরাই গাড়ির মালিক—উনি আমাদের ড্রাইভার।

কয়েক মাইল চলে একটা রাস্তার মোড়ে এসে আমাদের নামিয়ে দিয়ে মহিলাটি অন্য পথে চলে গেলেন। আমরা আবার রুক্‌স্যাক্ নিয়ে হাঁটা সুরু করলুম। এই আমার প্রথম হিচ্ হাইকিং! খুব ভাগ্য বলতে হবে। কারণ হাত তুলে গাড়ি থামাতে হল না, অপমান সইতে হল না, উল্টে খাতির। উৎসাহ পেয়ে গেলুম।

* ফ্রেমে আঁটা বোঁচকা-বিশেষ। জিনিষপত্র ভরে পিঠে করে বেশ সহজে নিয়ে যাওয়া যায়—চরণিকদের আদর্শ জিনিস।



অনেকখানি হেঁটে হর্ণবেক্‌এর প্রায় কাছে এসে পড়েছি, মাইল পোষ্ট্‌এ দেখছি, আর মাত্র দু-মাইল পথ। এতক্ষণ ধরে হাঁটছি, বহু মোটার গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেই উৎসাহী ডেনিশ্ মহিলার মতো কেউই আর গাড়ি থামালো না। বিকেল হয়ে আসছে, সহরে পৌঁছবার আগে আর একটা 'লিফ্‌ট্' পাবো না? এই ভাবছি, এমন সময় সাঁ করে একটা মোটার এসে পড়ল। আমি আমার হাতখানা তুলে ফেল্লুম। আধখানা তুলেছিলুম, কারণ হাত তুলতে গিয়ে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেলুম। আশা করলুম, হয়তো ড্রাইভার দেখতে পায়নি—না দেখতে পেলেই বাঁচা যায়! কিন্তু অবাক কাণ্ড, গাড়িখানা একটু এগিয়েই থেমে গেল!

বন্ধু চেঁচিয়ে উঠলেন—"থেমেছে! থেমেছে!" আমরা দু-জনেই ছুটলুম। হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লুম—"আপনি হর্ণ্‌বেক্‌এর দিকে যাচ্ছেন?"

ভদ্রলোক ইংরিজি জানতেন না; তবে "হর্ণ্‌বেক্" শব্দটা বুঝলেন এবং আমাদের গাড়িতে তুলে নিলেন। হিচ্ হাইক করে আমরা হর্ণ্‌বেক্‌এ ঢুকলুম। হিচ্ হাইকিংএর ভয়টা এক রকম আমার কেটে গেল।

এরপর সেবারের ছুটিতে সুইডেন আর নরওয়েতে প্রায় দেড় হাজার মাইল পথ আমি হিচ্ হাইক করেছি। অবশ্য সব সময়েই যে এত সহজে এবং এত বন্ধুভাবে গাড়িগুলো এসে এসে থেমেছে তা নয়—অনেক সময় অনেক রকম সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে পড়েছি—তার সব কথা বলতে গেলে একটা বই হয়ে যায়।

একটা জিনিস খুব আশ্চর্য্য লেগেছিল—এত গাড়িতে তো উঠেছি, কখনো দেখিনি একগাড়ির মালিকের সঙ্গে অন্য কোনো গাড়ির মালিকের কোনো মিল আছে। সবাই আলাদা। প্রত্যেকের স্বভাব, ধরণ, আচরণ, আলাপ করবার, কথা বলবার রীতি, সব কিছুই পৃথক। মানুষ যে এত রকমের হতে পারে এই এক আশ্চর্য্য। হিচ্ হাইকিংএর মস্ত গুণই হচ্ছে এই সব বিভিন্ন মানুষদের সঙ্গে কত চট্ করে, কত সহজে আলাপ করে ফেলা যায়। বিদেশে গিয়ে এমন খোলা মন নিয়ে চট্ করে এত মানুষের সঙ্গে মেশা, তাদের জানা, আর কোনো উপায়েই সম্ভব নয়। তাই বলছিলুম, দেশ দেখবার এই হচ্ছে সেরা রাস্তা।

নরওয়েতে হাত তুলে গাড়ি থামানো ডেনমার্কের মতো অত সহজ না হলেও বিশেষ শক্ত ছিল না। দুটো গাড়ি না থামলে তৃতীয় গাড়িটা প্রায়ই থেমেছে। একবার এমন কি, ভুলে একটা ট্যাক্সিকেও থামিয়ে ফেলেছিলুম। থামিয়ে দেখি একটা 'মিটার'। আমি বল্লুম—"ভুল হয়ে গেছে ট্যাক্সি চাইনে।"

ট্যাক্সিওয়ালা দরজা খুলে বল্লে—"উঠে আসুন। কোথায় যাবেন?"

আমি বল্লুম—"লিলিহামের।"

মোটার গাড়ির দরজা খুলে ধরলে কেমন একটা হয়, না-উঠে থাকা যায় না। ভিতরে গেলুম, কিন্তু সন্দেহ গেলনা—ট্যাক্সি-ভাড়া দিতে হবে কি হবে না। বিশ মাইল পথ—সবটা ভাড়া দিতে হলেই তো গেছি! একটু বাদে উস্‌খুস্ করে বলে উঠলুম—"এই মোড়ে আমি নামব।"

ট্যাক্সিওয়ালা বল্লে—"আপনি লিলিহামের যাবেন বলেছিলেন না?"

—"কত ভাড়া লাগবে?"

—"দু তরফের ভাড়াই আমি পেয়ে গেছি। ভাবছেন কেন, আপনার কিছু লাগবে না।"

আর একবার কিন্তু ভারি জব্দ হয়েছিলুম। নরওয়ের এক নির্জ্জন পার্ব্বত্য অঞ্চলে পিঠে

রুক্‌স্যাক্ নিয়ে এক রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে বাস্‌এর অপেক্ষায়। প্রায় পনের মাইল দূরে এক আস্তানায় যাবো। একজন পথিককে, বাস্ কখন আসবে শুধোতে সে বল্লে—"এ অঞ্চলে বাস্ এর কোনো স্থিরতা নেই—কখনো দিনে দুবারও যায়, কখনো একবারও যায় না।"

স্থির করলুম একটা মোটার গাড়িই থামাতে হবে। সাপের মতো আঁকা বাঁকা পাহাড়ে রাস্তায় দূর থেকে দেখতে পেলুম একটা মোটার আসছে। কাছে আসতে গাড়িটাকে দাঁড় করালুম। খালি গাড়ি। কোথায় যেতে চাই বুঝিয়ে দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। কিন্তু উঠেই বুঝলুম এটা ট্যাক্সি। ভেবেছিলুম এবারেও আগের মতো হবে, কিন্তু হল ঠিক উল্‌টো। আস্তানায় পৌঁছে আগুনের ধারে গিয়ে বসেছি, এমন সময় ট্যাক্সি-ওয়ালা বিল্ নিয়ে এসে উপস্থিত। অগত্যা ভাড়া চুকিয়ে দিতে হল।

গাড়িতে আমায় যাঁরা স্থান দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলতেন, দীর্ঘ রাস্তা একা একা মোটার চালানো বড় একঘেঁয়ে লাগে। দু-একটা হিচ্ হাইকার পেলে তবু গল্প করে সময়টা কাটে। কতজনই তো আমায় পথের মাঝে সুন্দর কাফেতে বা রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে কফি এবং কেক খাইয়ে এবং কত গল্প গুজব করে আপ্যায়িত করেছেন। তবে শুনেছি অনেকে হিচ্ হাইকারদের ভয়ও করেন। দুষ্টু লোক হিচ্ হাইকার সেজে গাড়িতে উঠে লুটপাট করেছে এমন ঘটনাও অজানা নয়। তাই কেউ কেউ পথের মাঝে গাড়ি থামাতে চান না।

যে দেশে যথেষ্ট মোটার গাড়ি এবং রাস্তা আছে সেই দেশেই সত্যিকারের হিচ্‌হাইকিং সম্ভব। কাজে কর্ম্মে বহু মোটর গাড়ি এবং লরিকেই এখানে ওখানে যেতে হয়—লম্বা লম্বা পাড়িও দিতে হয়। তাই যে সব সময় ভর্ত্তি হয়ে যায় তা নয়—প্রায়ই খালি যায়। এই খালি জায়গার উপর যদি হিচ্ হাইকাররা তাদের দাবী জানায় তা পূরণ করতে কার কি ক্ষতি? এই জন্যেই হিচ্ হাইকিংএ সঙ্কোচ বা মর্য্যাদা-হানির কোনো কথা ওঠে না। আমাকে গাড়িতে স্থান দিয়ে যে আমার প্রতি মস্ত দাক্ষিণ্য করা হচ্ছে এ ভাবটা কখনো কারুর মধ্যে দেখিনি, কেবল একবার ছাড়া; ঘটনাটা ঘটেছিল সুইডেনে।

সুইডেনের হিচ্ হাইকিংটা নরওয়ে বা ডেনমার্কের মতো অত সহজ হয়নি। কখনো চার খানা, পাঁচ খানা এমন কি কপাল খারাপ হলে, পর পর দশখানা গাড়িও আমার হাত-তোলা দেখে না-থেমে বেরিয়ে গেছে।

একবার একটা বড় সহরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি গাড়ির অপেক্ষায়। যতগুলো গাড়িই দেখি সব লোকে ভরা। তাদের তো আর থামানো যায় না—হাঁটতে সুরু করলুম। দু-চারটে খালি গাড়িও চলে গেল। হাত তুললুম, কিন্তু কেউ থামালো না। বড় সহরের মুখে সাধারণতঃ এই রকম হয়—কেউ গাড়ি থামাতে চায়না—তাই আরো চল্লুম হেঁটে। সেদিন বোধ হয় দশ-বারোবার আমার চেষ্টা বার হয়েছে। একটা ছোট উপবনের কাছে এসে পড়েছি। দূর থেকে দেখি একখানা লরি আসছে। দেখে খুব আনন্দ হল, কারণ, হিচ্ হাইকারদের ইঙ্গিতে মোটার গাড়ির চেয়ে লরি অনেক বেশী থামে—এ অভিজ্ঞতা আমার ততদিনে হয়ে গেছে। লরিটা খালিই ছিল, কাজেই হাত তুললুম—থামল। আমার গন্তব্য জানিয়ে লাফিয়ে গিয়ে উঠলুম।

লরিওয়ালা ইংরিজি জার্ম্মান দুই ভাষাতেই অজ্ঞ—সুইডিশ্ ছাড়া কিচ্ছু জানেনা। সব ভাষা থেকে ধার করা কিছু কিছু শব্দ আর ইঙ্গিত দিয়ে কথা চল্লো। লোকটার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল আমি একজন 'জিপ্‌সি'—যাযাবর—আমার ঘর দোর কিছু নেই। লোকটা কি একটা প্রশ্ন করলে। আমার মনে হল, জানতে



চাইছে, আমার দেশ কোথায় এবং আমি কি করি। কারণ আলাপের আরম্ভে এই রকম প্রশ্নই তো মানুষ করে থাকে। আমি বল্লুম, আমি ভারতীয়, এবং ছাত্র। লোকটা কি বুঝলে জানিনা, তাড়াতাড়ি তার ঝুড়ি থেকে দুটো আপেল, একটা প্রকাণ্ড রুটি আর দু-টিন সার্ডিন-মাছ টেনে বার করে আমার হাতে দিলে।

আমি বল্লুম—"এ সব কি?"

লোকটা আমার রুক্‌স্যাক্ দেখিয়ে বল্লে, এগুলো ভরে নাও। ইঙ্গিতে বল্লে, খেও!

বাজার করে সে ফিরছে আমি তার জিনিস নেবো কেন? তা ছাড়া আমি কি ভিখিরী? মাথায় একটা বুদ্ধি এল। রুক্‌স্যাক্ থেকে টেনে একটা বাংলা পত্রিকা বার করলুম। বই-টই দেখিয়ে অনেক কষ্টে তাকে বোঝাই যে আমি য়ুনিভার্সিটির ছাত্র, দেশ বেড়াচ্ছি, আমি জিপ্‌সি নই।

ইংরিজিতে যাকে বলে Tramp তার সঙ্গে হিচ্ হাইকারের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। নিঃসম্বল, ভবঘুরে, চাল-চুলো নেই, কোনোরকমে চেয়ে চিন্তে এ গাড়িতে ও গাড়িতে ওঠে, পারলে রেল কোম্পানীকেও ফাঁকি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—এরাই ট্র্যাম্প্। হিচ্ হাইকাররা ঘোরে সখ করে. দেশ দেখার, মানুষ দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে, শিক্ষার জন্যে। হিচ্ হাইকারদের লোকে যেমন খুসী হয়ে গাড়িতে জায়গা দেয়, ট্র্যাম্পদের তেমনি কেউ নিতে চায় না। এইজন্যেই হিচ্‌হাইক করবার সময় আমি পরিষ্কার জামা পরতুম, এবং বিশেষ করে জুতো জোড়াটা চক্‌চকে করে রাখতুম—যাতে কেউ ভুল না করতে পারে। তবে ঐ লরি ড্রাইভার কেন যে ভুল করেছিল তা আজও আমি জানিনা।

শেষে একটা কথা না বল্লে হিচ্ হাইকারদের প্রতি অবিচার করা হবে। এ কথা মনে হতে পারে—বড় বড় মোটারে করে সৌখীন যারা দেশ ভ্রমণে বেরয়, হিচ্ হাইকাররাও তাদেরই একজন। তফাৎ শুধু এই যে নিজের গাড়ির বদলে পরের গাড়িতে চড়ে বেড়ানো। কিন্তু মোটেই তা নয়। হিচ্ হাইকাররা আসলে হচ্ছে চরণিক। তাদের যথেষ্ট হাঁটতে হয়, এবং হাঁটতে তারা ভালবাসে। যতক্ষণ না গাড়ি পায় তারা কেউ চুপ করে বসে থাকে না—হেঁটে চলে। হিচ্ হাইকার রাস্তার ধারে গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছে, এ দৃশ্য যেমন বিরল তেমনি লজ্জাকর। আমি তো আজ অবধি কখনো দেখিনি।

# কেরাণীর মেয়ে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বাপকে ডেকে ছোট্ট মেয়ে বলে,—
"রাগে আমার গা' শুধু যায় জ্বলে' ;
পূজোর বাজার পোঁট্‌লা খুলে দেখি
বাবা, তোমার কাণ্ডখানা একি ?
সবার জন্য আন্‌লে তুমি, নিজের জন্য কিছু আন্‌লে না'ক ?
আমায় তুমি যা দেবে তা' মায়ের বাক্সে বন্ধ করে' রাখ।
তোমার জন্য কাপড় জামা, নিদেন পক্ষে স্যাণ্ডেলও এক জোড়া ?
কিন্‌তে গেলে লাগ্‌ত না'ক, মোহর কিম্বা টাকার তোড়া ;
জরী পেড়ে শান্তিপুরী ধুতিও অন্ততঃ
তোমার জন্য কিন্‌লে পরে হোত ?—
তা নয় তুমি খোকার জন্য নিয়ে এলে দুটো দুটো জামা ?"
বাবা বলে,—"ওরে মিনু গিন্নিপনা একটুখানি থামা,
জিনিষগুলো মিলিয়ে আগে নিই,
যাকে যাকে দিবার দিয়ে দিই,
তারপরে তোর বক্‌বকানি ঠাণ্ডা হয়ে শোনার সময় পাবো—
লক্ষ্মীপূজার পরেত' সেই যাবো ?"

"মাপগুলো ঠিক হ'ল কি না, মানাল কি যাকে যেমন মানায় ?"
মিনুর মাকে ডেকে বাবা এই কথাটি বারে বারে শুধায়।
"দেখত এই শাড়ীখানা, ঢালা-পাড়ে মুগার ধাক্কা দেওয়া,
দাম বেশী নয় ভেবো নাক', আড়ং থেকে নেওয়া।
খোকার জামা ঠিক হয়েছে ? ছোট খুকীর ফ্রকটা দেখ খুলে
তাড়াতাড়ি বাজার করা হয়ত কিছু কিন্‌তে গেছি ভুলে ;
মায়ের সাদা থানখানা আর রাঙা দিদির নরুণ পেড়ে ধুতি ;
কাল সকালেই দিয়ে দিও ; মালোপাড়ার ভূতি
অনেক করে' বলেছিল,— বাপহারা সেই পাঁচ বছরের মেয়ে
আহ্লাদে সে নাচবে' খুনি নীলাম্বরী কাপড় হাতে পেয়ে ;



একি মিনু, এক পাশে তুই দাঁড়িয়ে একা ?
কেমন জামা কাপড় পেলি,—মাকে দেখা ?"
মিনুর চোখে জল দেখে তার হাতটি ধরে'
চুমু খেয়ে আদর করে'
বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বললে বাবা—
"মেয়ে আমার এমনি হাবা
আমার পূজার কাপড় আমি আনিনি তাই বলে
দুঃখ দিবি চোখের জলে ?
বাবা যে তোর বুড়ো হ'ল, চুল পাকিয়ে ঠেক্‌ল পাঁচের কোঠায়
সে যদি আজ সেজে গুজে কোঁচা লোটায়—
শান্তিপুরী ধুতির জরী পাড়ে—
বলবে লোকে,—এত বড় সংসার যার ঘাড়ে
তার কি সাজে বাবুগিরি করা ?
অবুঝ মেয়ে, আজকে আমার খুসীতে মন ভরা
তোরা আমার সেজে গুজে দাঁড়াবি আজ পূজার আঙিনায়
সে যে আমার কী আনন্দ—শুধানা তোর মায় ?
তুই যখন মা হবিরে, পাবিরে তার স্বাদ ;
দুষ্টু মেয়ে কাঁদতে আছে ? শুভদিনে ঘট্‌বে পরমাদ !"

আট বছরের মেয়ে মিনু মুখ লুকায় বাপের বুকে
সে জানে না, কী সে গভীর দুখে
সেই বুকে আজ উঠ্‌ছে কিসের ঢেউ,
মিনুর মা তা বুঝতে পারে, আর, আর বোঝে না কেউ !
ষাট্ টাকার কেরাণী বাপের মনের আশা মনেই থেকে যায়।
বিশটি বছর এমনি ব্যর্থতায়
পূজার সময় এসেছে সে বাড়ী,
এবার মনে ছিল আশা স্ত্রীকে দেবে বিষ্ণুপুরী শাড়ী,
খোকার জন্য আনবে কিনে জরীর টুপি ;—
এনেছে তাই চুপি চুপি—
সস্তা দরের কাঠের ঘোড়া, কিছু সাবান, এসেন্স একশিশি,
তাও দিতে তার হাত সরেনা, বিকেল থেকে করছে গড়িমিশি।
মিনু যেমন বাপের জন্য দুঃখ পেলে, ফেল্‌লে চোখের জল,
অন্তরালে আর একজনের নয়ন বেয়ে তেমনি নয়ন ঢল,
বেদনা তার গুম্‌রে মরে আজ শরতের মেঘ ভাঙা আকাশে,
কাসের বনে হাওয়া কি তাই সেই বেদনায় বইছে হতাশ্বাসে।

———

# অমর কাহিনী

শ্রীরমাপ্রসাদ দাসগুপ্ত

ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে পাহাড়ের গায়ে আছাড়ে পড়ছে প্রচণ্ড আক্রোশে, পাহাড় কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে অটল অটুট। কি সাধ্য ক্ষুদ্র ঢেউয়ের পাহাড়কে টলাবার! ভেঙ্গে পড়া দূরে থাক, তার গায়ে একটা আঁচড়ের দাগও বসছে না, শুধু ঢেউগুলিই আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে নতমস্তকে। ক্ষুদ্রের এই নিষ্ফল আস্ফালন দেখে দাম্ভিক পাহাড় অবজ্ঞার হাসি হেসে যেন বলছে, "কি এখনও সাধ মেটেনি শক্তি পরীক্ষার! বেশ তবে এস আবার।"

কিন্তু পাহাড় ত নয়—এ যে বিরাট অষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী ক্ষুদ্র সুইটজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ কর্ব্বার জন্য সমবেত হ'য়েছে জেম্পাকের প্রান্তরে মুষ্টিমেয় সুইসদের পিষে মারবে বলে। তাদের বর্ম্মের উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হ'য়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রসারিত বর্ষাফলকের সারি দেখে অভেদ্য লৌহপ্রাকার বলে ভ্রম হচ্ছে। কার সাধ্য এই লোহার প্রাচীর ভেদ করে অগ্রসর হয়।

কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'র্ত্তে হ'লে আর অন্য উপায় নেই। তাই সুইস বীরেরা বার বার এই বিরাট সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে হটে যাচ্ছে—তবু তাদের আক্রমণ শেষ হ'চ্ছে না। তারা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রাণ দিয়েও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর্ব্বে। যেমন করেই হউক, ঐ লৌহ প্রাচীর ভেঙ্গে তাদের পথ করে নিতে হবে। অসম্ভব! অষ্ট্রীয় ব্যূহ বর্শা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অটল অটুট আর ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু ভাঙ্গতে হবে এই বর্শাপ্রাকার—পথ চাই—স্বাধীনতার জন্য পথ চাই!

আর্ণল্ড্ ফন্ ভিঙ্কেলরিড্ এগিয়ে এসে ব'ল্লেন, "বন্ধুগণ, পথ আমি করে দেব। তোমরা শুধু আমার স্ত্রী পুত্রকে দেখ। এবার সবাই আমার পেছন পেছন এস।"—এই ব'লে তিনি অষ্ট্রীয় বাহিনীর দিকে ছুটে চ'ললেন। সুইসবীরেরাও তাঁর পেছনে কীলক আকারে অগ্রসর হ'ল। আর্ণল্ড্ যখন অষ্ট্রীয় সৈন্যের সামনে এসে পড়েছেন, তখন একসঙ্গে শতাধিক বর্শাফলক তার বুক লক্ষ্য করে ঝলসে উঠ্‌ল। কিন্তু বীরের হৃদয় একটুও টল্‌ল না। তিনি দুই হাতে সমস্ত বর্শাফলক ধরে ফেলে নিজের বুকে বিঁধিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "সৈন্যগণ, অগ্রসর হও, স্বাধীনতার পথ তৈরী!" তখন সেই ক্ষুদ্র পথে অগ্রসর হ'য়ে সুইসবীরেরা অদম্য বিক্রমে যুদ্ধ করে বিশাল অষ্ট্রীয়বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

—আর দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়ে, আর্ণল্ড্ ফন্ ভিঙ্কেলরিড্ ইতিহাসের পাতায় অমর হ'য়ে রইলেন!

—

## ভবানী আসে ভুবনে

শ্রীসত্যব্রত বসু

সোনার রথে আলোর পথে ভবানী আসে ভূবনে,
দীপ্তি তাঁহার চতুর্দিকে ছড়ান ;
শারদ প্রাতের শ্রান্তি-হরা হিমেল মৃদু পবনে
গন্ধরাজের স্নিগ্ধ সুবাস জড়ান।
থলকমলের কুঁড়ি মেলে আঁখি কাহার পরশে,
কাহার ছোঁয়ায় রঙীন বনবীথিকা ?
কাকলি তুলি বনের বুকে পাখীরা আজি হরষে
গাহিছে কাহার আগমনী গীতিকা ?
শিউলি বিছায় তুষার ধবল, আসন কাহার লাগিরে,
শিশির-ভেজা সবুজ বন-পথেতে ?
কোথায় ওঠে দিঘীর বুকে কমল ধীরে জাগিরে ?
মা যে আসেন চড়ি' সোনার রথেতে।
অর্ঘ্য রচে বিশ্ববাসী, বিশ্বমাতায় স্মরিয়া,
ব্যস্ত আজি সবাই মহাপুলকে,
কাঁসর, শাঁখের ঝঙ্কারে আজ বাতাস ওঠে ভরিয়া,
ছন্দ জাগে ভূলোক এবং দ্যুলোকে।
সোনার-আলোর জোয়ার ছোটে পূবগগনে প্রভাতে
সোনার রথে ধরায় আসে ভবানী,
দিগন্ত আজ উদ্ভাসিয়া স্নিগ্ধ রঙীন শোভাতে
এল কি ঐ এল মায়ের রথখানি॥

—০—

# চলন্তিকা

আজকের এই মহাযুদ্ধের নানা ক্ষেত্রে হতাহতের সংখ্যার কোন সীমা নেই। তার ঠিক হিসেবও হয় না। তবুও দেশে দেশে এই অঙ্ক কষার বিরাম নেই। এক একটা যুদ্ধ শেষ আর তার করুণ ফলাফল প্রকাশ করবার চেষ্টা হয়। ভারতীয় সৈন্যেরা তাদের দেশের বাইরে পৃথিবীর নানা জায়গায় যুদ্ধ করছে। সম্প্রতি এই ভারতীয় সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যার একটা হিসেব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। হিসেবটি এইরূপ :—

২০৯৬ হত ; ৮৫২১ আহত ; ৮৪,৮৩৩ বন্দী।

সমস্ত হতাহত, বন্দী ও নিরুদ্দিষ্টের সংখ্যার মোট ৯৮,৩৮৮। মিশর, সুদান ও ইরিট্রিয়াতেই হতাহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। মোট হত ১২১১, মোট আহত ৬২১৮ ; নিরুদ্দেশের সংখ্যা মিশরেই মোট ১২,১৫৮। বার্ম্মার যুদ্ধে মোট ৪১৭ হত, ১,১৭৩ আহত এবং নিরুদ্দেশ ৩৩২৭। আজ যদি পৃথিবীর সর্ব্বক্ষেত্রের শত্রু মিত্র উভয়ের হতাহতের সংখ্যার হিসেব নেওয়া হয়, তাহ'লে পৃথিবী যে শেষ হতে বসেছে সে কথা বুঝতে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। আর কবে এই মানুষ মারা যুদ্ধ শেষ হবে ! কবে সৈন্যরা নিজ নিজ দেশে বাপ মা ভাইবোনের কাছে ফিরতে পারবে !

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারে দক্ষিণ ইংলণ্ডের একটি গ্রামের এক স্কুলের ওপর জার্ম্মান এরোপ্লেন বোমাবর্ষণ করে। ফলে, ২৮জন ছাত্র ও ৩টি ছাত্রী মারা গিয়েছে এবং ৩৩জন আহত হয়েছে। স্কুলের হেড্‌মাষ্টার এবং সহকারী শিক্ষয়িত্রীও মারা গিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন নিতান্তই শিশু ছিল। সমস্ত দিনরাত ধরে বোমা বিধ্বস্ত স্কুল বাড়ীর স্তূপ থেকে হতাহত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের উদ্ধার করা হয়েছে। স্কুলের ওপর জার্ম্মানদের বোমাবর্ষণের এই নৃসংসতার তুলনা নেই। নিষ্পাপ শিশুদের প্রতি যারা এমন অত্যাচার করতে পারে তারা পশুর চেয়েও নীচ।

জাপান শীতের প্রারম্ভে রুশিয়া না ভারতবর্ষ কোন্‌টে আক্রমণ করবে, সেটা এখনও মস্ত গবেষণার বিষয় হয়ে আছে। কারুর কারুর মতে ষ্ট্যালিনগ্রাদ ও ককেসীয় যুদ্ধ জার্ম্মানদের অনুকূলে গেলেই, জাপান রুশিয়া আক্রমণ করবে। অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষই এবার জাপানের লক্ষ্য। কারণ, এখন থেকেই বিমানবহর পাঠিয়ে ব্রহ্মে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে। তাছাড়া ভারতবর্ষকেও নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে দেওয়া মানে, জাপানের পক্ষে ক্ষতি হওয়া। জেনারেল ওয়াভেল বলেন, জাপান এখন কোন বড় অভিযানে হাত দেবে না, কারণ নাকি, জাপানীরা এখন আসাম-সীমান্ত থেকে ২০ মাইলের মধ্যে থাকলেও অত্যন্ত অল্প



সৈন্যই তাদের এখন ব্রহ্মে মজুত আছে। তবে ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একবার বোমাবর্ষণ ( ভগবান না করুন ) হতে যে পারেনা, তা নয় !

গত ১৫ই আশ্বিন শুক্রবার পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ মানবের জন্মদিন ছিল। কিন্তু হায়, পৃথিবীর নির্য্যাতিত মানুষের একমাত্র মুখপাত্র করে ভগবান যে দূত মর্ত্তে পাঠিয়েছিলেন, আজ তিনি মানুষের বিচারে কারারুদ্ধ। একদিন যিশু খৃষ্টও মানুষের এমনি অবিচার হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। আজকের এই অন্ধকার পৃথিবীতে ভগবানের দূতরূপী এই মানুষটিকে স্মরণ করে এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক একবার বলেছিলেন, তাঁদের সৌভাগ্য আজকের এই পৃথিবীতে একটি আলো আজও তাঁদের পাশে জ্বলছে, যে আলো সুদূর ভবিষ্যতের মানুষকেও ডাক-দিয়েছে। এক বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা বলেছেন, আজ তাঁর নাম শুধু একটি মানুষের নাম মাত্র নয়, আজকের অশান্তির পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার একটি মাত্র পথ। এই আলোটি, এই নামটি, এই নামটির সঙ্গে আর যা কিছু সবই ইংরাজদের দরবারে আজ শৃঙ্খলিত। এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র রাজবন্দীটির নাম মহাত্মা গান্ধী।

ছুটির দিনগুলি কাটাবার নানা সুন্দর উপায় আছে। নিছক্ ঘরে বসে লাভ কি ! ( এবার অবশ্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ভ্রমণ বিলাসীদের নিতান্ত দমিয়ে দিয়েছেন ) সহুরেদের পক্ষেও একটু খোলা গ্রামের দিকেও অন্ততঃ দু' পা না বাড়ালে, বা দু'একজন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিয় না করলে কেমন যেন লাগে। সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ের কোলে হ'লে তো কথাই নেই। এমনি ছুটির দিন কেমন সুন্দর করে উপভোগ করা যায়, তার একটা দৃষ্টান্ত সম্প্রতি দু'জন ইউরোপীয় যুবক হাতে পায়ে দেখিয়েছেন। এঁরা ছুটি উপভোগ করার মতলব করে সিকিম রাজ্যে গমন করেন। সিকিম হ'ল পাহাড়ী রাজ্য, পূর্ব্ব হিমালয়ের গায়ের একটি অংশ বিশেষ। সিকিম হিমালয়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা, দিনিয়োল, কাঞ্চনঝাউ প্রভৃতি সুউচ্চ শৃঙ্গগুলি অবস্থিত। এ ছাড়াও, ছোট বড় কয়েকটি শৃঙ্গও আছে, যেমন—লামা এনডেন্, (১৯,০০০ ফিট) তাদের মধ্যে একটি। তাঁদের ছুটির দিনের মধ্যেই ঐ দু'টি যুবক—মিঃ এ স্মাইথ এবং মিঃ পি ফোর্ড এই লামা এনডেন্ শৃঙ্গটি চড়াও হয়ে এসেছেন। এর আগে কেউ নাকি এই শৃঙ্গটি চড়াও হবার চেষ্টা করেন নি। কেশাঙ্‌লা নামে এক জায়গায় এঁরা তাঁবু ফেলেছিলেন।

অনেকের আজও মনে আছে, পাঞ্জাবে জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্যার' উপাধি বর্জ্জন করে বলেছিলেন, "যখন অপমানের বোঝা প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন তার পাশে সম্মানের চিহ্ন কেবল আমাদের লজ্জাকেই প্রকাশ করে।" সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মান্যনীয় আল্লা বক্স রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর খান্ বাহাদুর' এবং 'ও, বি, ই' উপাধি বর্জ্জন করে ইংরাজ সরকারের ভারতীয় নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

রংমশালধারী ভাই বোনেরা আমার !

সর্ব্বদুঃখহরা মায়ের মহান আবির্ভাবের মহালগ্ন এসেছে। মা আসছেন, তারই আভাষ পাচ্ছি শরৎকালের উদার আকাশে সবুজ শোভায়। সমস্ত জগৎ আজ উদ্‌ভ্রান্ত, মৃত্যু মুখর আর্ত্তনাদ চারিদিকে, আমাদের দেশের মাঝে আছে অন্ধকার এমনি অন্ধকারের পথ বেয়ে মা আসছেন। সন্তানের বুকে আশা মুখে ভাষা জাগে হয়তো মায়ের পুত চরণ স্পর্শে এ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।

আজকের দিনে তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা—দেশকে ভালোবাসো, দেশের শিল্প বাণিজ্য দেশের পণ্য সামগ্রীকে শ্রেয় ও প্রেয় করে নাও। আমাদের চার পাশে যারা রয়েছে তাদের ভালবাসতে হবে—হোক সে অন্তজ হোক সে অতি নিকৃষ্ট তাদের ভালবেসে তাদের পারিপার্শিক অস্বাস্থ্যকর ও অসুন্দর আবহাওয়ার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিয়ে, দেশ জননীর ক্লিষ্ট মুখে হাসির ফুল ফোটাতে হবে।

মাত্র ক'টি দিনের জন্য সর্ব্বদুঃখহরা মাকে আনুষ্ঠানিক ফুল বিল্বপত্র আর বলি দিয়ে নিয়ম রক্ষা হয়—পূজা হয় না, শ্রদ্ধা নিবেদন হয় না।

আচার অনুষ্ঠান নয়—আন্তরিকতা তোমাদের পূজার্ঘ্য হোক।

তোমাদের কাছে থেকে এবারে আমি বহু চিঠি পেয়েছি—সেগুলি যত্ন করে তুলে রাখলাম—কোনমতেই সম্ভব হলো না তার উত্তর দেবার। গত বারে যেগুলি পেয়েছিলাম—তার থেকে মাত্র কয়েকখানির উত্তর লিখলাম এবং বাকী নাম দিলাম—যদি কিছু উত্তর দেবার থাকে পরে দেবো।

যে সব প্রশ্ন আগে ছিল তা সব তোমরা প্রশ্নোত্তর বিভাগে আগামী বারে দেখতে পাবে। নতুন প্রশ্নের ও ক্রমশঃ উত্তর পাবে।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছ—বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্র ছাত্রীরা কি করবে? গত সংখ্যায় তোমরা অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের প্রবন্ধটী ভাল করে পড়ো, তাহলেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে।

**মীরা রায়:** ( মোরদাবাদ ) তুমি যা পাঠাবে লিখেছে—খুব তাড়াতাড়ি করে পাঠিও—কেননা ওরা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে। ইন্দিরাদি বলেছেন—যদিও গতবারে ভাবীগৃহিণীর বৈঠক গেল—তবুও সেলাই গেল না, এজন্য দুঃখিত হয়ো না, তোমাদের যাতে অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।



**হীরেন রায়** ( রাচি ) ১২৩৪ রংমশালদলের প্রোগ্রাম তোমাদের ভাল লেগেছে একথা অনেকেই জানিয়েছে। ছবি আঁকার প্রশ্ন কেন? কি দরকার বলো তো? বিভিন্ন পত্রিকায় এখন যে সব 'দল' গঠিত হয়েছে বা মেলা'র সমাবেশ হয়েছে—এতো বহু আগে তোমাদের রংমশালে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। পুরাণো রংমশাল খুলে দেখো। নতুনেরা নতুন ভাবে নিতে চাইলেও—এর প্রথম পরিকল্পনা করেন রংমশাল। তোমরা যা করতে চাও অনায়াসে করতে পারো। আর এ ছাড়া রংমশালের গ্রাহক বা দলের দলী হলে অন্য কোথাও সে যোগ দিতে পারবে না, এ বিধি নিষেধ আমাদের নেই। তবে সকলের একটা আদর্শ থাকা দরকার—সেটা তো তার নিজের মনের জিনিস।

**গিরিন্দ্রনাথ রায়** ( নৈহাটি ) ১৭৯০ তোমার লেখনীবন্ধু যদি পত্রোত্তর না দেয় সে দোষ কি আমাদের? প্রশ্নের উত্তর পাবে।

**কল্যাণী বিশ্বাস** ( বহরমপুর ) ১৮৪৭ লেখনী বন্ধু যাচ্ছে। না, লেখেন না—বর্ত্তমানে অসুবিধা আছে।

**অরুণা দাশ গুপ্তা** ( গৈলা ) ১৩২৩ পৃথক পত্র লেখা হয় না। তিন পয়সার ডাক টিকেট পাঠালেই বন্ধু পাবে।

**নারায়ণকুমার দত্ত** ( ১৭২৬ ) কবিতাটা বড্ড ছোট্ট—কিন্তু এখন কবিতা না লিখে অন্য কিছু লেখো। ষ্টাম্প পাঠিয়েছ কেন?

**রেখা ও রেবা দাশ গুপ্তা** ( কলিকাতা ) ১০৩৬

তোমাদের পুরাণো বন্ধু সুজাতা রক্ষিত, পিণ্টু মিণ্টু বসু ও রেখা এদের খবর আমিও জানি না। "বিভিন্ন দেশের মেয়েদের কথা" ইন্দিরাদিকে বলতে বলে দিয়েছি—তিনি বল্লেন ভোট নিয়ে দেখেছেন তোমরা যা শুনতে চাও এই দিকেরই জয় হয়েছে।

**ইন্দুবাসিনী দেবী** ( সিলেট ) যে সমস্ত লেখক লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় চেয়েছ তা রংমশালে দেওয়া সম্ভব কিনা ভেবে দেখা দরকার—কারণ ওগুলি ব্যক্তিগত। প্রশ্নগুলির উত্তর পাবে।

**সাধন চন্দ্র বসু** ( কলিকাতা ) ১৪২৫। চিঠি পেলেই প্রাপ্তি স্বীকার করে থাকি। লালমোহনের চিঠি তুমি পাওনি কারণ কলকাতায় চলে এসেছ বলে—একথা জানালুম তাকে। 'যুদ্ধ না শান্তি' এ সম্বন্ধে আর আলোচনা হবে না। তুমি এবং অরুণ বন্দোপাধ্যায় দু'জনকেই বলছি।

প্রতিমা সেন, রথীন্দ্রনাথ মজুমদার, আশীষ দত্ত, অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, অজয় দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ নাগ, নছিফা খাতুন, এলা ও রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, জোতির্ম্ময় দাশ, দেবকুমার রায় চৌধুরী তোমাদের চিঠি পেয়েছি। তোমাদের জন্য প্রীতি রইল।

শুভার্থিনী—

দিদিভাই

## এ বছরের পূজায়

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষাল

এই বছরের পূজায়
জ্বল্‌বে নাক রঙীন্ আলো,
থাকবে সহর নিকষ কালো,
ভায়ে ভায়ে বাধছে বিবাদ,
দারায় এবং সুজায়।
এই বছরের পূজায়।

এই বছরের পূজায়
নতুন কাপড় রঙীন্ শাড়ী,
বিলেত পথে দিচ্ছে পাড়ি
আমরা কেঁদে দেখ্‌ছি চেয়ে
কে কাহারে বুঝায়।
এ বছরের পূজায়।

এ বছরের পূজায়
প্রতিমাতে থাকবে না প্রাণ,
শুধুই ভাবো রুশ আর জাপান,
কামান বোঝাই জাহাজ শ্রেণী,
সাগর পথে উজায়।
এ বছরের পূজায়।

এ বছরের পূজায়
সবাই খোঁজে চুরির পন্থা
সবার কাঁধেই জীর্ণ কন্থা
সবই এবার শিখণ্ডীকে
সামনে রেখে যুঝায়
এ বছরের পূজায়।

এ বছরের পূজায়
আসবে কি মা সিংহে চড়ি,
অন্নভাণ্ড হস্তে করি?
মিট্‌বে কি না মিট্‌বে বিবাদ
রাজায় এবং প্রজায়?
এই বছরের পূজায়।

এই বছরএর পূজায়
শান্তি সে কি লুপ্ত হবে
অন্নপূর্ণা সুপ্ত হবে
বাঙ্‌লা এবার কোন পথেতে?
বাঁকায় কিম্বা সোজায়।
এই বছরের পূজায়॥

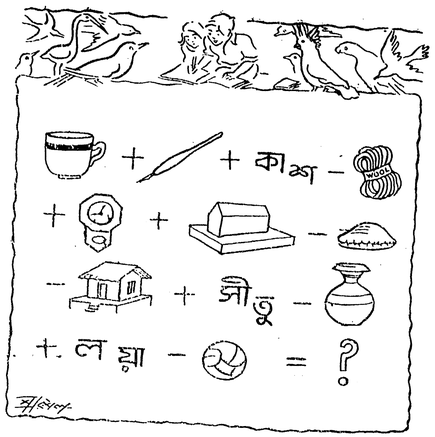

—:*:—




### একটী পাখীর নাম

উপরের লেখা ও ছবির মধ্যে একটী পাখীর নাম লুকিয়ে আছে। আচ্ছা যে জিনিষের ছবি আছে তার চলতি ভাষার নাম-গুলি বসিয়ে যাও, তারপর পাটীগণিতের লঘূকরণের মত যোগ বিয়োগ করলেই পাখীর নামটী উত্তর হইবে।




### নূতন পুরস্কার প্রতিযোগিতা

ক্যামেরাতে তোমাদের নিজের হাতে তোলা 'ফটোগ্রাফ্' (প্রাকৃতিক বা কৌতুকপ্রদ ছবি বা কোন অদ্ভুত ছবি, বা যারা আঁকতে জানো তাদের নিজের হাতে আঁকা (এক-রঙা) ছবি (প্রাকৃতিক ছবি বা কার্টুন ছবি বা কোন অদ্ভুত ছবি) এবার প্রতিযোগিতার নূতন বিষয় হ'ল। গ্রাহিকারা ইচ্ছে করলে এই প্রতিযোগিতাতে রঙ্গীন বা একরঙা বিচিত্র 'ডিজাইন' (শাড়ীর পাড়ের বা আঁচলের, ব্লাউসের হাতের বা টেবিল-ক্লথের বা রুমালের কোনে বা ঐ রকম কিছুর) এঁকে পাঠাতে পারো। ছবির পেছনে নাম ধাম বয়স গ্রাহক নং বা এজেন্টের নাম এবং পিতামাতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর পাঠাতে হবে। ছবি কিন্তু ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হবে না। পাঠাবার শেষ তারিখ—২৫শে কার্ত্তিক। তিনটি পুরস্কার থাকবে।

—*—

### গতমাসের ধাঁধার উত্তর

বউ-কথা-কও; বিছা; গাই; হয়; পায়রা; ময়না; পাতিহাস; কেউটে; বক; শ(শ্রী) গাল; বরাহ; কাকাতুয়া; হায়না; জেব্রা; তিমি।

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম আগামী অগ্রহায়ণের রংমশালে ছাপা হবে।

ভিড় ক'রেছে রঙমশালীর দলে।
কেউবা জলে কেউবা তা'রা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে'
দুঃসাহসে এগিয়ে তা'রা চলে॥

—রবীন্দ্রনাথ

## দরকারী খবর—পড়ে দেখো

বিপদের দিনে—অশান্তির দিনেও—ভাল বই পড়তে হবে।

সবেমাত্র বেরিয়েছে! তোমাদের প্রিয়-লেখক

বিমল ঘোষের লেখা

**যে গল্পের শেষ নাই!**

দাম—বারো আনা

**মনীষীদের ছোটবেলা**

দাম—বারো আনা

**শিশুরবি**

দাম—ছ আনা

শিগ্‌গিরী বেরুবে—তোমাদের সকলের বন্ধু মৌমাছি সম্পাদিত

**নাচ—গান—হল্লা**

—আরও বেরুচ্ছে—

দরদীবন্ধু ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের

**ভবঘুরের গল্পের ঝুলি**

মৌমাছির লেখা

**জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড**

১ম ভাগ ছাপা নেই—দ্বিতীয় ভাগও ফুরিয়ে এসেছে—এইবেলা কিনে নাও, পরে কবে পাবে—কে জানে?

**মিত্র এণ্ড ঘোষ**

শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা

---

**নির্ভরযোগ্য**

**হারমোনিয়ম**

কিনিতে হইলে

**ডোয়ার্কিনের কিনিবেন**

হারমোনিনা মডেল ডবল প্যারিস রীড ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ ২ বৎসরের গ্যারান্টি দ্বারা সুরক্ষিত বাক্সসহ ৪০৲ টাকা।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

**DWARKIN & SON LTD.**

**11, Esplanade, Calcutta.**

---

পূজায় উপহার দেবার মত বই

# দুই খুণী

জীবজন্তুর ঘর-সংসার সুখ-দুঃখের কথা।

—দাম মাত্র বারো আনা—

**রংমশাল কার্য্যালয়**

৯১।১১-এ, টালিগঞ্জ রোড, ককিকাতা।

বড় বড় পুস্তকের দোকানে পাইবেন।


---

রংমশাল

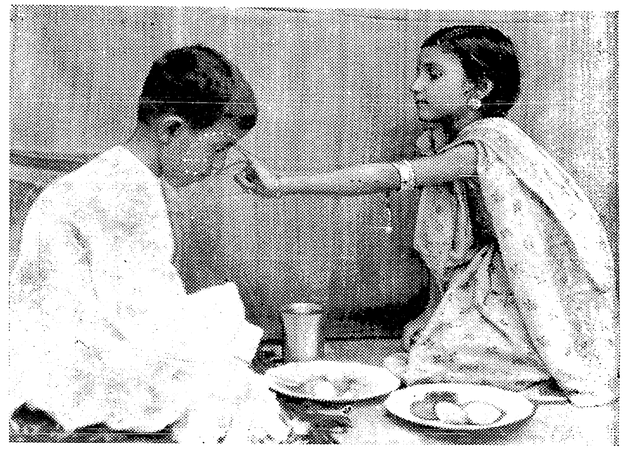

'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা'

আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীবীরেন সিংহ
আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে

রংমশাল

সপ্তম বর্ষ
৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ
১৩৩৯

# মায়ের মুখের গান

—*—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া বাঙ্গালা-দেশের নানা জেলার ও গ্রামের এবং ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মায়ের মুখের গান বা মেয়েলি ছড়া কিংবা খুকুমণিদের ছড়া সংগ্রহ করিয়া বিভিন্নভাবে সাজাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সে সকলের অর্থ ও ঐতিহাসিকতা, ভৌগলিক তথ্য, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নানাদিক দিয়া আলোচনা করিয়াছি। তৃতীয় বর্ষের 'কৈশোরক' পত্রেও সামান্য ভাবে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। যদি কখনও আমার সংগৃহীত ও সম্পাদিত ছড়াসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তোমরা যে ঐ সব সচিত্র ছড়া পড়িয়া আনন্দ পাইবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

আমাদের দেশে শুধু নয়, পৃথিবীর সকল দেশের মায়েরাই তাহাদের খোকা ও খুকুর মন ভুলাইবার জন্য এই সকল ছড়া রচনা করিয়া আসিয়াছেন। এ সব ছড়া বা গান লিখিত নয়। মায়ের মুখে মুখে রচনা করিয়া গান করিয়াছেন, তাই আমি প্রবন্ধের নাম দিয়াছি মায়ের মুখের গান। এ গানগুলির বয়স বড় কম নয়—যদি বলি লক্ষ লক্ষ বছর তাহা হইলেও তোমরা আমার ভুল ধরিতে পারিবে না। যে দিন মায়ের বুকে সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে শিশু আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল, সেদিন হইতে মায়ের মুখে ফুটিয়া উঠিল শিশু-দেবতার মনোরঞ্জন করিবার জন্য নানা গান ও ছড়া। মা শিশুকে কখনও আদর করিয়া চুমো খাইতেছেন, তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন, ভয় দেখাইতেছেন, এ সবই মায়েদের মুখের ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐ সব ছড়ার ভাষা অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল। ঘরোয়া কথায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা যাহা মনে ভাবেন, উপলব্ধি করেন, প্রত্যক্ষ করেন, যেটুকু তিনি জানেন যতটুকু কল্পনা তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহাই তাঁহার ভাষায় গানের রূপে ফুটিয়া উঠিয়া গীত হইয়া আসিতেছে।

এই ভাবে আমরা যে সকল ছড়া শুনিতে পাই তাহার সবগুলিই মায়েদের মুখের গান বা মেয়েদের রচনা। শ্রীমতী ঈসাবেল কেমেরোন (Isabel Cameron) তাঁহার লিখিত "Mother craft and folk Rhymes নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "of great and intriguing interest is it for women to note how large a part the work of our own sex has had in the coining and circulating of our ancient folk Rhymes" প্রাচীনকাল হইতে যে ছেলে ভুলানো ছড়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই মায়েরাই রচনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে মুখেই দেশ বিদেশে ইহার প্রচার হইয়াছে। চরকা কাটিতে কাটিতে, কাঁথা সেলাই করিতে করিতে, শিশুকে দোলনায় দোল দিতে দিতে যে ছড়া ও গান তাহাদের মুখ হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে যে মৃদু চপল ছন্দ ও গীতি মাধুর্য্য বিকশিত হইয়াছে, তাহার তুলনা কোথায়?

আমাদের দেশের এই সব ছড়া সংগ্রহের ইতিহাসের মূলে ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি এই সব মেয়েলি ছড়া সংগ্রহের জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে থাকে কিন্তু কি কারণে জানি না কাজটা অধিকদূর অগ্রসর না হইয়াই থামিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি ছড়া' নামে একটি অতি সুন্দর ও সরস প্রবন্ধও সে সময়ে পাঠ করেন। তাঁহার সেই মনোজ্ঞ রচনাটি 'লোকসাহিত্য' নামক গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ১৩০৬ সালে 'খুকুমণির ছড়া' নাম দিয়া বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঐ গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার সর্ব্বপ্রথম পথ প্রদর্শক যোগীন্দ্রনাথ। আমরা জানি এই ছড়াগুলি যখন চিত্র সহকারে প্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সেকালের অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার খোকাখুকুরা যেমন আনন্দ পাইয়াছিল, তেমনি পাইয়াছিলেন সেকালের তরুণী জননীরা ও প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারা তাঁহাদের গান ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইয়া।

রামেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকায় কয়েকটি অতি সুন্দর কথা লিখিয়াছিলেন: "প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের প্রতি আমাদের কোন অনুরাগ নাই; এবং আমার বিশ্বাস, এই বিষাদের মূল আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাব। ইতিহাস মনুষ্য জীবনের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে; বিজ্ঞান সমগ্র জগতের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে; সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞানেরই একটা শাখা। ইতিহাসে বিরাগের নাম বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগের নামান্তর সত্যের প্রতি বিরাগ। আমরা সত্যসাধনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য প্রাণের জন্য যতটা লোলুপ ও সত্যের আধ্যাত্মিক ফলভোগের জন্য যতটা আগ্রহবান্, সত্যের প্রতি আমাদের ততটা আশক্তি নাই। সত্যকে আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই না; আমাদের বিশ্বাস, আমাদের বিনা প্রযত্নে বিনা উদ্যমে, প্রকৃতিদেবী সত্য সমষ্টি দ্বারা আপনার যে দেব-দেহ নির্ম্মিত করিয়াছেন, সেই দেহের জ্যোতিঃ আমাদের চোখের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়া দেখাইবেন, এবং সেই খরা জ্যোতিঃর আনন্দ উপভোগে আমাদিগকে সমর্থ করিবেন।"

"কোন ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার এই অবজ্ঞাত ছড়া সাহিত্য হইতে সম্ভবপর না হইলেও, অনাবিষ্কৃত সত্যের পরিচয় এই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিৎ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্য জীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের



মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশব জীবনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।" *

আমরাও এই মতই পোষণ করি। সাহিত্যের আলোচনাও বৈজ্ঞানিক ভাবেই হওয়া উচিত।

একটা বিষয়ে সকলেই লক্ষ্য করিবেন যে ঘুমপাড়ানী গান পৃথিবীর সর্বত্র রহিয়াছে।

এখানে বিখ্যাত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক বার্ণার্ড শ'র একটী কথা মনে পড়িতেছে। বার্ণার্ড শকে একটি শিক্ষিতা মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আপনি শিশুদের কোন্ বয়সে বিদ্যালয়ে পাঠানো উপযুক্ত মনে করেন?' বার্ণার্ড শ হাসিয়া বলিলেন,—'কোন বয়সেই না'।

মহিলা গম্ভীর ভাবে কহিলেন—'এ কি রকম কথা হইল?'

বার্ণার্ড শও গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—'আমি স্কুলে গিয়া কিছুই শিখি নাই, সেজন্য একথা বলিলাম। আর আপনারা মেয়েরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে চান কেন জানেন?"

—"কেন বলুন ত?"

'দুপুরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাবার জন্য, কিংবা নভেল পড়িবার জন্য, অথবা পাড়া বেড়াইবার বা বাজে গল্প করিয়া সময় কাটাইবার জন্য। যা কিছু বিপদ শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষকদের ঘাড়ে গিয়া পড়ুক।'

মহিলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

—এই যে ঘুমপাড়ানিয়া গান, তাহাও মা জননীদের নিজেদের শান্তির জন্যই সৃষ্টি। এ বিষয়ে কোন জননী বোধ হয় আমার কথায় প্রতিবাদ করিবেন না। শিশু না ঘুমাইলে জননীর শান্তি কোথায়? আবার "খুকুমণির নিদ্রায় একান্ত বিরাগ। যেন যতক্ষণ ঘুমাইয়া থাকে ততক্ষণ তাহার পক্ষে বৃথাই যায়।" তাহার চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া না আসিলে সে ঘুমাইতে চাহে না। যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে মাতার নিস্তার নেই। হয় ছড়া বলিতে হইবে না হয় খেলা করিতে হইবে। এখন অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া খোকামণির সহিত ক্রীড়া করা বা রূপোপকথন করা সকল সময় সব জননীর সুবিধা হইয়া উঠে নাই। তাই তন্দ্রালু অবস্থায়, নিমীলিত নেত্রে জননীর গাইতে হয়

'ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যেও।'

অমনি খুকুমণি মন্ত্র মুগ্ধবৎ নিস্তেজ, নীরব, নিস্পন্দ। আমার মনে আছে আমার শৈশবে এই গানটির সংযোগে অতীব করুণ লাগিত এবং গায়িকার প্রতি এত গভীর অনুকম্পায় উদ্রেক হইত যে, আমি শুদ্ধ কৃপাপরবশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। * এই ঘুমপাড়ানী গানের—'ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুমের বাড়ী যেয়ো' ছড়াটি নানা জেলায় নানারূপ ভাবে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। আজ আমি তোমাদের কাছে সেই সব জটিল প্রশ্ন নিয়া আলোচনা করিব না। এই ছড়াগুলির মধ্য হইতে যে আমরা নানারূপ ঐতিহাসিক তথ্য, ভৌগোলিক পরিচয়, জীবজন্তুর বিবরণ, সামাজিক রীতি-নীতি, অপ্রাকৃতে জীবজন্তু, মাতৃস্নেহ ও আদর, অসম্ভব বা অবাস্তব কল্পনা, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির পরিচয় পাই। সে কথা বুঝাইবার জন্য আজ শুধু অল্প কয়েকটি ছড়া লইয়া আলোচনা করিব।

আর একটা কথা মনে রাখিও। বাঙ্গালী জননীর স্নেহ ও আদর এই ছড়াগুলির মধ্যে ফুলের সৌরভের

* যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত খুকুমণির ছড়ার ভূমিকা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত ৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ন্যায় জড়াইয়া আছে। বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক জেলার ছড়ার মধ্যে সেই সেই স্থানের প্রভাবও বিদ্যমান, একটু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। আমাকে পরম শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয় তাঁহার দৌহিত্রীদের দ্বারা নদীয়া জেলার বহু ছড়া সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই সব ছড়ার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম যে উহার অনেক ছড়াই নদীয়া জেলার ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বিবরণকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। যেমন একটি ছড়ায় আছে,

ও-পারের জন্তি গাছটি জান্ত বড় ফলে,
গো-জন্তির মাথা খেয়ে, প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই ঢাই, গলা **করে কাঠ**।
কতক্ষণে যাবরে ভাই **হড় গড়ায়ের** মাঠ॥
**হড় গড়ায়ের** মাঠেতে ভাই পাকা পাকা পান,
পান কিনবো চুণ কিনবো, নন্দে ভাজে খাব,
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দিব।
দাদা দাদা ডাক **পাড়ি**, দাদা নাইকো বাড়ি,
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি।
আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে,
সুবলকে নিয়ে গেল **দিগনগর** দিয়ে।
দিগনগরের মেয়ে **দুটি** নাইতে লেগেছে।
চিকণ চিকণ ছুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে
হাতে তার দেব শাঁখা মেঘ লেগেছে।
গলায় তার্ **কণ্ঠমালা** রক্ত ছুটেছে।
ওপারে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে।
কে দেখেছে? কে দেখেছে? দাদা দেখেছে॥
দাদার হাতের **রাজবন্দুক** ছুড়ে মেরেছে।
দুই দিকে কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে॥
একটি নিলেন গুরু-ঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে,
টিয়ের বাপের বিয়ে, লাল গামছা দিয়ে।
গৌরীবেটি কিনে, নকা বেটা বর।
ঢ্যাম কুড়ু কুড়ু বাদ্দি বাজে চড়ক ডাঙ্গার ঘর।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়ার' ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠায় এই ছড়াটি সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু একটু রূপান্তরিত ভাবে। আমি যে ছড়াটি পাইয়াছি তাহার সহিত কোথায় কোথায় প্রভেদ তাহা দেখাইয়া দিতেছি।

* প্রদীপ দ্বিতীয় ভাগ। অগ্রহায়ণ, ১৩০৬, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত 'খুকুমণির ছড়ার' সমালোচনা। ৩৮৬ পৃষ্ঠা।



আমার সংগৃহীত ছড়ায় আছে—'গলা করে কাঠ'। যোগীন্দ্রবাবু সেস্থানে লিখিয়াছেন 'গলা হল কাঠ'। তারপর হরগৌরীর মাঠ—স্থলে আমি পাইয়াছি হড় গড়ায়ের মাঠ। যোগীন্দ্রবাবুর বইয়ে আছে—'ডাক ছাড়ি'। আর আমি পাইতেছি ডাক পাড়ি। যোগীন্দ্রবাবুর বইয়ে রহিয়াছে 'দিঙনগর', আর আমি পাইতেছি দিগনগর। তারপর আমরা পাইতেছি 'দিগনগরের মেয়ে দু'টি নাইতে লেগেছে। তারপরেই আছে 'হাতে তার দেব শাঁখা মেঘ লেগেছে।' কিন্তু খুকুমণির ছড়ায় রহিয়াছে :

দিঙ নগরের মেয়ে গুলি নাইতে নেমেছে,
চিকণ চিকণ চুল গুলি ঝাড়্‌তে লেগেছে।

এই পংক্তিটি আমার সংগৃহীত ছড়ায় নাই। আর 'মেয়েগুলির' স্থানে মেয়ে দু'টি লক্ষ্য করিবেন। এইরূপ ভাবে—'ভক্তি মালার' জায়গায় 'কণ্ঠমালা'। 'দাদার হাতের রাজ বন্দুক' অশথের পাতা ধনে, গৌরী বেচে কনে' ইত্যাদিও আমার প্রাপ্ত ছড়ায় নাই। এই একটি ছড়ার মধ্যেই অনেক শব্দের রূপান্তর, পংক্তির অনৈক্য দেখা যায়। এ সব দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। শব্দ তত্ত্বের দিক্ দিয়াও আমরা নানারূপ নূতন নূতন পল্লী শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ এই সব ছড়ার মধ্যে লক্ষ্য করিতেছি। এবার ছড়াটীর মধ্যে যে স্থানের যে নাম আছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

যোগেন্দ্রবাবুর সংগ্রহে আছে দিঙনগর। আমি পাইতেছি দিগনগর। কিন্তু আমরা ছড়ায় পাই, "সুবলকে নিয়ে যাব দিগনগর দিয়ে। এই দিগনগর আমার মনে হয় হইবে দীঘনগর। দীঘনগরই ঠিক্ বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন,—"সুবলকে নিয়ে যাব দিঙনগর দিয়ে, এটি "দীঘনগর হইবে। দীঘনগর কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মাঝামাঝি একটি গ্রাম। ইহাতে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটি দীঘিকা থাকায় ইহার নাম দীঘনগর হইয়াছে। (ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত দেখুন) দিঙনগর নামে কোন স্থানের অস্তিত্ব বিষয়ে আমরা অবগত নহি।" বর্ত্তমান সময়ে দীঘ নগরে একটি রেলষ্টেসনও স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বোধ হয় ঐ পথের যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এবং দীঘনগর কথাটিই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়—দিঙনগর ত নহেই। দীর্ঘিকা হইতে দীঘ বা দীগ এইরূপ রূপান্তরিত হইতে পারে কিন্তু দিঙনগর হইতে পারে কি?

এ সম্বন্ধে আর একটি ছড়ার আলোচনা করা যাক্। এ-ছড়াটি সর্ব্বজন পরিচিত। ছড়াটি হইতেছে—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

'বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্, নদী এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান!
এক কন্যে গোসা ক'রে বাপের বাড়ী যান!
বাপেদের তেল সিঁদুর, মালীদের ফুল!
এমন খোপা বেঁধে দেবো, হাজার টাকা মূল।'

যোগীন্দ্রবাবুর ছড়ায় 'নদী এল বাণ' এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় 'নদেয় এল বাণ' এইরূপ হইবে। 'নদেয়'র অর্থ নবদ্বীপে। এ প্রসঙ্গে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও 'নদেয়'র মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মতে "এই ছড়াগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে বোধ হয় ইহা সর্ব্ববাদি

সম্মত যে ইহাদের রচয়িত্রী রমণী জাতি। নবদ্বীপ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকগুলি ছড়ার যে উৎপত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। 'নদেয়' 'দীঘনগর,' 'হরগৌরীর মাঠ' ইত্যাদির উল্লেখ তাহার এক প্রমাণ॥ দ্বিতীয় প্রমাণ সেই ছড়াগুলির পরিভাষা।"

এ-প্রসঙ্গে অর্থাৎ জন্তি গাছের ছড়া উপলক্ষ্য করিয়া মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যও আমাদের মতাবলম্বী। তিনি বলেন, "এই ছড়াটিতে নদীয়া জেলাবাসিনী কোনও রমণীর রচনা, তাহা স্থির করিবার আর একটি কারণ আছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটি কক্ষে দুইটি শুভ্র বর্ণের শৃগাল এখনও রহিয়াছে; ঐ কক্ষের দ্বারে ইংরাজী অক্ষরে লিখিত আছে, "White fox, caught near Ranaghat, Nadiya District.' পরে তত্রত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম, "Found no where else" ছড়া বর্ণিত চন্দনমাখা শৃগাল (শুভ্র শৃগাল) নদীয়া জেলার বিশেষত্ব।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আরও বলেন: 'দিগ্‌নগরের মেয়েগুলির চুল চিকন, হাতে দেব শাঁখা এবং গলায় কণ্ঠমালা। গ্রাম্য ছড়াতে আছে,—

"উলার মেয়ের কল্‌কলানি, গুপ্তি পাড়ার চোপা।
শান্তিপুরের হাত নাড়ানি, নবদ্বীপের খোঁপা॥'

ইহাতে প্রাচীন দিগ্‌নগর যে এক্ষণে নবদ্বীপ হইয়াছে তাহা পাওয়া গেল। বর্ত্তমান সময়েও নবদ্বীপের রমণীগণ সুকেশি ও সুন্দরী এবং নবদ্বীপের শঙ্খাভরণ দেশ বিখ্যাত। গ্রাম্য ছড়ায় আরও আছে—

"পাগলি লো ছাগলি, তোর ছাগল কোথা চরে?
দিগ্‌ নগরে।
কোন্ খন্দ খায়!

আঁশের পাতা, বাঁশের পাতা তিন খন্দ খায়। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে, দিগ্‌নগরে বড় বড় বাঁশ ঝাড় এবং আঁশ শ্যাওড়া বন আছে।" [গৃহস্থ, ১৩২০ মাঘ।] আমরা একটি ছড়া অতি শৈশবে শুনিয়াছি. ছড়াটি এই—

হড়ুম্ বিবির খড়ম পায়
লাল বিবির জুতা পায়।
দুই বিবি ঢাকা যায়,
ঢাকা গিয়া ফল খায়,
সে ফলের বোঁটা নাই।
ঢাকীরা ঢাক বাজায়
**বিয়াইনার** ফলে,
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম
ডাকাইতের মেলে,
আগে যদি জানতাম,
ডুলি থইরা কান্‌তাম
পাট কাপড় খান দিয়া



বেইড়া নিলা
দেখতে পাইলাম না।

খুকুমণির ছড়ায় উহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কি কি রূপান্তর হইয়াছে তাহা লিখিলাম।

'দুই বিবি ঢাকা যায়' স্থলে লেখা হইয়াছে 'চল বিবি ঢাকা যাই।' আবার ছেলেবেলা শুনিয়াছি, ঢাকীরা ঢাক বাজায়। কিন্তু খুকুমণির ছড়ায় হইয়াছে ঢাকায়েরা। ঢাক ঢাকীরা কোথায় বাজাইয়াছিল।—খালে আর বিলে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, বিয়াইনার খালে। বিক্রমপুর অঞ্চলে একটি খাল আজও বিয়াইনার খাল নামে পরিচিত। এক সময়ে ঐ স্থানে ডাকাতি ও রাহাজানি হইত। এ ছড়াটি যে পূর্ব্ববঙ্গীয় কোন স্থানে রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষা বিক্রমপুর অঞ্চলের ন্যায়। যোগীন্দ্রবাবুর সংগৃহীত ছড়ার শেষ পংক্তি আছে শুধু—ডুলি ধ'রে কাঁদিতাম; কিন্তু আমরা শুনিয়াছি:

আগে যদি জান্‌তাম
ডুলি থইরা কাঁন্‌তাম্।
পাট কাপড় খানা দিয়া বেইড়া নিল দেখতে দিল না।

এইরূপ অদল বদল প্রত্যেক ছড়াতেই আছে।

অনেক সময় সামাজিক ইতিহাসের সন্ধানও ছড়ার মধ্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। যথা:

'উলু কটু চুলু কটু নলের বাঁশী,
নল গড়েছে একাদশী।
একানল পঞ্চদল, কে কে যাবি কামার শাল॥
কামার মাগি খড় খড়ানি, খড়ের উপর তোলেখানি।
অপ্‌পন, দপ্‌পন, কুরি, কে'স্ত, বেয়াম্ভন।'

অপ্‌পন বলিতে আলাপনকারী, চিত্রকর, দপ্‌পন=নাপিত, যাহারা দর্পণে দেখায়, কুরি নদীয়া জেলার একটি জাতি, কে'স্ত—কায়স্থ আর বেরাম্ভন—ব্রাহ্মণ। একটি গ্রামের অধিবাসিগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

তারপর সামাজিক দ্বেষ-বিদ্বেষ এবং মূর্খ ব্যক্তির প্রতি পরিহাসও অনেক ছড়ায় দেখিতে পাই, যেমন:

'কি কথা? ব্যঙ্গের মাথা
কি ব্যঙ্গ? সরু ব্যঙ্গ
কি সরু? বামুন গরু
কি বামুন? ভাট বামুন!

ভাট বামুনদের প্রতি অবহেলা এবং মূর্খ ব্রাহ্মণের প্রতি কি অবহেলার ভাব ইহা দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে না।

এই ছোট প্রবন্ধে ছড়াগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে যে আমরা কত নূতন তত্ত্ব, কত নূতন পরিভাষা, কত অদ্ভুত জীবজন্তু—এক নড়ে, হিটিংটিং আর কত যে—আগাডুম বাগডুম ঘোড়াডুম। কত যে কমলা পুলির বিয়ে ও ডাম মিরগেল পাপরের শব্দ পাই তাহা কি বস্তুতঃই বিস্ময়জনক নহে?

তোমরা এই ছড়াগুলি বেশ মনোযোগ দিয়া পড়িও এবং সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিও।

যেমন ঘুম পাড়ানিয়া গান দিয়াই আমাদের মায়ের মুখের গান আরম্ভ করিয়াছিলাম। তেমনি আজ অসভ্য লোটা নাগাদের একটি ঘুমপাড়ানী গান তোমাদিগকে উপহার দিয়াই আমার কথাটি শেষ করিলাম।

ছোট ছেলেটি কাঁদিতেছে। নাগার ছেলে। শিশুটির বাপ বাঁচিয়া নাই তাই বিধবা জননী দুর্দান্ত শিশুটিকে ঘুম পাড়াইতে না পারিয়া বড় করুণ সুরে গাহিতেছেন। প্রথমটা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে :

ও লি ই—ই—লিহি
ও ঈ ঈ হি,

ও কাকাও নিতিতম কোনা চিতাতা কোন্ কি যোতে ইত্যাদি। অর্থ হইতেছে,

ওগো, খোকনমণি কেন তুমি কাঁদ ?
ও আমার বুকের ধন কিসের জন্য এত কান্না ?
বুঝেছি তুমি বনের মিষ্টি মধু খেতে চাইছ ?
মধু ! সে যত খুশি তুমি খেতে চাও তোমায় দেব !
আমি যে মস্ত বড় ভাণ্ড ভরে তোমার জন্যেই মধু সঞ্চয়
করে রেখেছি।
এ কি ! তবু তোমার কান্না থামলো না !
হাঁরে বোকা ছেলে, তোমার বাবা মরে যে বীরদের
সঙ্গে বাস করছেন, তোমার শত কান্না শুনেও ত তিনি
ছুটে এসে তোমাকে তাঁর বুকে তুলে নিয়ে আদর
করবেন না !
বাছা আর কেঁদনা !
ও আমার সোনার খোকা ;—আর কেঁদনা।

আজ নাগা বলিয়া যাহাদের তোমরা অবহেলা কর, তাহাদের জননীরাও কেমন করিয়া সন্তানকে ভালবাসে, কেমন করিয়া মিষ্ট গানের সুরে সুরে ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে চাহে আর মৃত স্বামীর বীরত্বে কতই সে গৌরববোধ করে, এবং পুত্রকে স্বামীর বীরত্ব কথা শুনাইয়া কত যে আনন্দ বোধ করে, তাহাই এই ছড়ার মধ্য দিয়া সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

## স্বীকৃতি

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

কাকামণি আর দাদামণি বলি' যে কটি কিশোরী মেয়ে
না ডাকিতে মোর মন্দিরে আসে নিতি নব গান গেয়ে
হাসে ভারি মিঠে হাসি
ফুল দেয়, প্রাণে গান দেয়, গানে প্রাণ দেয় ভালোবাসি।
পশমে বুনিয়া মণিব্যাগ দেয়, মোজা দেয় উপহার
ফিরে পেতে পুনঃ আশা-না-করেই টাকা কড়ি দেয় ধার ;
রুমাল আমার নোঙ্‌রা থাকে-ই, তাই বলে : যাও পাজি
কফোণো ওতে ফুল তুলে' দিতে হবো নাক' কেউ রাজী,
আজি তাহাদের নামে
বন্দনা-গান কোমল-ছন্দে কলমে আমার নামে।
আমার বাগানে তারা যেন আহা গোলাপ-মালতী-বেলি
সুখে নাচে প্রাণ নয়নে তাদের যতো রে নয়ন মেলি।
স্নেহ-সৌরভে গৌরবিত এ-চিত্ত রে অবিরাম,—
ক্ষমা করো, যদি ক্ষণতরে গাহি তাহাদেরি শতনাম
যদি তাহাদেরি তরে
আঁখি মুদি আজি পৃথিবীর জ্বালা ভুলি'
উদি ভাবাবেগে চকিতে গোপনে
স্বপনের অম্বরে ॥

কাকা বলি' আর মামা বলি আর দাদা বলি ফিরে' ফিরে'
কমলের মতো যে-কটি কিশোর আসে মোর মন্দিরে
আসে, করে দুষ্টুমি—
( মানে নাক' মানা কিছুতে, যতোই মারোধরো, বকো তুমি ! )
'ডিবে' থেকে মোর নিয়মিত করে নস্য ও পান চুরি,
'চুরি করা দোষ, বড়ো দোষ' বলি করে' হেসে বাহাদুরী ;—
বুকে ওঠে, আর পিঠে ওঠে আর কোলে চড়ে জোর করে'
কবিতা লেখার সময় সহসা পেন নিয়ে যায় সরে'—
আজি তাহাদের নামে
বন্দনা-গান কোমল-ছন্দে কলমে আমার নামে।
আমার আকাশে তারা হাসে যেন চন্দ্র-সূর্য-তারা,
তাদের বিহনে চোখে নামে কালো, হয়ে যাই দিশে হারা ;
তারা আছে তাই এ-হৃদি সদাই প্রদীপ্ত অবিরাম
ক্ষমা করো, যদি ক্ষণতরে গাহি তাহাদেরি শতনাম
যদি তাহাদেরি তরে
হেলাভরে দলি' জীবনের ব্যর্থতা
খেলাভরে চলি সাফল্য পানে
আনন্দ-অন্তরে ॥

দিদির মতন প্রীতি দানি' আর মায়ের মতন স্নেহ
যে-সব মেয়েরা ভরি' তোলে নিতি এ-মোর হৃদয়-গেহ,
শুধুই প্রাণের টানে
যাদের নিকটে না-গিয়ে পারি না এতটুকু আহ্বানে ;—
মোরে পেয়ে ভাই যাদের খুসির পাওয়া-ই যায় না সীমা
মিষ্টিকথায় ছড়ায় যাহারা মনোরম মধুরিমা,
সমাদরে যারা জল খেতে দেয় মিষ্টি ও ফল দিয়ে
পেটুক কবির পেট ভরি' ভাই প্রাণটিরে নেয় নিয়ে,
আজি তাহাদের নামে
বন্দনা-গান কোমল-ছন্দে কলমে আমার নামে।
আমার দেউলে তারা হাসে যেন স্বর্গীয়া ভগবতী
আঁখির আলোয় ঢালে আশিষের অকূল স্রোতস্বতি,
মরু-ক্ষিতি তাই প্রীতিরসে ভাই উর্বরা অবিরাম ;
ক্ষমা করো, যদি ক্ষণতরে গাহি তাহাদেরি শতনাম,
যদি তাহাদেরি তরে
মায়ার আবেগে পৃথিবীরে বরি' বুকে
অবহেলি সুখে ধর্ম গুরুর
আনন্দী ব্রহ্মরে ॥

ভায়ের মতন ভালোবাসা আর দাদার মতন প্রেম
এ-জীবনে ভাই যাদের নিকটে অবিরত লভিলেম ;
যারা করে কর দিয়া
অমারাতি হতে প্রভাতে আমারে স্নেহভরে চলে নিয়া,
এই পৃথিবীর ঘনীভূত স্নেহ মূর্ত যাদের মুখে,
প্রাণে প্রাণে মোর দানে যারা নিতি চেতনার কৌতুকে,
কাব্যে যাদের উপমা মেলে না, অপরূপ অনুপম
প্রিয় করি' মোরে, হোলো যারা মোর আত্মার প্রিয়তম,
আজি তাহাদের নামে
বন্দনা-গান কোমল-ছন্দে কলমে আমার নামে।
তারাই আমার সাধনাপথের বন্ধু, গুরু ও গীতা
তাদেরি কারণে কামনা আমার চেতনা দীপান্বিতা ;
উদার প্রেমের বেণু বাজে তাই অন্তরে অবিরাম
ক্ষমা করো, যদি ক্ষণতরে গাহি তাহাদেরি শতনাম,
যদি তাহাদেরি তরে
নিরাশ ভুলোকে আশাবাদী মন মম
স্বপন-সায়রে আলোকে পুলকে
শান্তিতে সন্তরে ॥

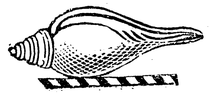

## ঝগরু

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

ঝগরুকে আমি ছোটোবেলা থেকে চিনি। আমাদের বাড়ীর পাশে যে বস্তী, সেই বস্তীর ছেলে সে। আমি স্কুল থেকে আসতুম, প্রায় দেখতুম ঝগরু নেংটি পরে মুখে আঙ্গুল দিয়ে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতো। রোগা হাড়-বের-করা চেহারা—বেচারা খালি ভুগছে। বস্তীতে সব শুদ্ধু ছিল ছোট ছোট পাঁচটি কুঁড়েঘর। তার ভেতর থাক্‌তো বোধকরি জন পঁচিশেক লোক, অবশ্যি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সব মিলে। বর্ষার দিনে তাদের যে কি দুর্ভোগ, তা' না দেখলে বুঝ্‌বে না! কুঁড়ে ঘরগুলিতে জল পড়ে—রাত্রে যে একটু ঘুমোবে তারও উপায় নেই! কেঁচোতে উঠোন ভরে যায়—আরসোলা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়! জল পড়ে' পড়ে' পিছল হ'য়ে গেছে জায়গাটা। একটু রোদ উঠলে বস্তীর বাঁশের ভাঙ্গা বেড়াতে ও সাম্‌নে ছেঁড়া কাঁথা তোষকের প্রদর্শনী খোলে। সাততালি নয়, হাজার তালি কাঁথা কাপড় তালির কম্‌পিটিসন্। একটু রোদে শুকিয়ে নেবার জন্যই ওগুলো বাইরে বের করা, তা' না হলে ছারপোকা ও পিশু পোকাতে কি আর ওগুলো ব্যবহার করা যায়? ঝগরুর পিসীরা ও মা শুকোতে দেবার জন্য বার কর্‌তো ওগুলো। তাই নিয়ে আবার ঝগড়া লাগ্‌তো—পিসীরা সব দজ্জাল মেয়ে, সব ভালো জায়গাগুলোতে তাদের কাঁথা শুকোতে দেয়—ঝগরুর মা বেচারী পিসীদের সঙ্গে ঝগড়ায় পার্‌তো না—কোনো রকমে একটুখানি জায়গাতে ছেঁড়া-ঝুলি কাঁথাগুলো বাইরে ফেলে রাখ্‌তো—রোদ না পায়, হাওয়া ত' পাবে; ঝগরুর বাপ অনেকদিন মারা গেছে—ঝগরুর একটু একটু মনে পড়ে।

ঝগরুদের একটা মাত্র মোষ ছিল। সেইটাকে ঝগরু প্রায় চরাতে নিয়ে যেতো। নেংটি পরা ঝগরু দেখ্‌তুম. মোষটার পিঠে ব'সে দিব্যি চলেছে! বর্ষায় যেখানে একটু জল জম্‌ছে, মোষটা সেখানে গড়াগড়ি খেতো—ঝগরু তাকে কিছুতেই আর কোথাও নিতে পার্‌তো না। ঘরের পড়্‌বার টেবিলের সাম্‌নে জান্‌লা দিয়ে বারান্দা থেকে ওকে দেখ্‌তুম। ক্রমে ক্রমে একটু একটু ক'রে ওর সঙ্গে ভাব করলুম! বেশী কথা বলে না। ছোটোলোকের ছেলে সে; লোকে তাকে দেখলে নাকি বল্‌তো, রাস্তার ছোঁড়া। তাই তার রাগ ও দুঃখ। কিন্তু কি কর্‌বে সে—ভালো জামা কাপড় পাবে কোথা।

জিজ্ঞেস্ করেছিলুম একদিন তাকে, "তোর মোষ চরাতে ভালো লাগে?"

সে বলেছিল, "বেশ লাগে! মোষটাকে নিয়ে সারাদিন খুসী মনে দিন কেটে যায়!"

আশ্চর্য্য মনে হ'ত! ঝগরু মোষটার পিঠে ব'সে নির্ব্বিবাদে ঘুরে বেড়াতো! মাঝে মাঝে দু'একটা কথাও বল্‌তো এমন ভাবে যেন মোষটা সব বুঝতে পারে।

মোষটার একটা বাচ্চা হ'ল। ঝগরুর কি স্ফূর্ত্তি! বাচ্চাটা হ'ল তার খেলার সাথী! ওদের অবস্থাটাও একটু ফির্‌লো। মোষের দুধ বিক্রী ক'রে দু'পয়সা রোজগার আরম্ভ কর্‌লো। ঝগরুর কিন্তু বড় দুঃখ হ'ত! বাচ্চাটা কি ছট্‌ফট্ কর্‌তো দুধ খাবার জন্য—তাকে জোর ক'রে সরিয়ে দুধ দু'য়ে নেওয়া হ'ত। সে এখান থেকে ওখান থেকে ঘাস, খড়ের কুটো যা' পেতো বাচ্চাটার জন্য আন্‌তো--আর ব'সে বসে খাওয়াতো। তাই দেখে ওর বড় পিসী একদিন হাস্‌লে। বল্‌লে, "ঝগরুর সবেতে বাড়াবাড়ি! ওটাকে অত যত্ন ক'রে কি হবেরে—ও তো বড় হ'য়ে দুধ দেবে না—বড় জোর ময়লা গাড়ী টান্‌বে!"

ঝগরুর মন খারাপ হ'ল। দুধ দেবে না তাই বলে' বাচ্চাকে যত্ন কর্‌বে না,—সে কি কথা! তা'—বড় হ'য়ে ও গাড়ী টান্‌বে! ঝগরু নিজে চালাবে সেই গাড়ী!—বেশ হবে। বেশী ভারী জিনিষ নেবে না, ওরা কথা বল্‌তে পারে না বলে কি ওদের কষ্ট দেওয়া যায়!

ঝগরুর স্কুল যেতে হয় না। স্কুল থেকে বাড়ী এসে "হোম টাস্ক্" কর্‌তে হয় না,—ওর বেশ মজা। ঘুরে বেড়ায় মোষের পিঠে। কাপড় চোপড়ের বালাই নেই। সকালে আমাকে যখন মাষ্টার মশাই এসে পড়ান্, বই মুখস্ত কর্‌তে হয়—তারই ফাঁকে ফাঁকে জান্‌লা দিয়ে দেখি ঝগরু মোষের পিঠে চলেছে।—তখন একটুখানি ঝগরুকে হিংসে হ'ত!

সেদিন স্কুলে যাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি—দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ঝগরু পিছনে দৌড়ে আস্‌ছে দেখে থাম্‌লুম। আমার 'ফাউণ্টেন পেন'টা নাকি পকেট থেকে পড়ে' গিয়েছিল। ও দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে আমায় দিতে এসেছে! ঝগরুর ওপর আমার শ্রদ্ধা হ'ল! স্কুলের কোনো ছেলে হ'লে হয়তো আর পাওয়া যেতো না—

খেতে পায় না একবেলা ভালো ক'রে—নুন দিয়ে ভাত গেলে কোনো রকমে। ঝগরু স্কুলে পড়্‌বে কি ক'রে! ঝগরুর বয়স হ'য়ে গেলো—পড়াশুনা তার হ'ল না। ঝগরুর দুঃখ নাই তাতে। অবস্থা বুঝেই ত ব্যবস্থা হবে। মিছে দুঃখ করলে ত' আর স্কুলে পড়া হবে না।

ক্রমে স্কুলের পড়া আমার শেষ হ'ল! আমি চলে গেলুম কলকাতার কলেজে পড়্‌তে। তারপর ঝগরুর কথা মনে ছিল না। এক ছুটিতে বাড়ী এসেছি—ঝগরু নমস্কার করে দাঁড়ালো আমার কাছে। আমার মনের কোনে যে ওর একটু স্থান আছে, সে ও টের পেয়েছিল।

আগে কতদিন ওকে মুখ ভার ক'রে থাক্‌তে দেখেছি।--অভাবের মধ্যে মানুষ! অন্য অনেক রাস্তার ছেলেমেয়েরা কতদিন আমার কাছে পয়সা চেয়েছে—তাড়া খেয়েছে—মারে মাঝে পেয়েছেও। ঝগরুকে কোনোদিন কারু কাছে হাত পাত্‌তে দেখিনি। আমার কাছে এসে দাঁড়াতেই বল্‌লুম—"কি রে ঝগরু—কেমন আছিস?"

সে বল্‌লে, "আমি ভালোই আছি কিন্তু মা'র অসুখ বড়! মোষটা ম'রে গেছে—



পাড়ারই লাখুলাল শত্রুতা ক'রে বিষ খাইয়ে মেরেছে। বাচ্চাটা বড় হ'য়েছে।"—এতোদূর বলে' ঝগরু কি বল্‌তে গিয়ে থাম্‌লে।

তারপর যা' কোনোদিন ঝগরু বলেনি তাই বলে' বস্‌লে—সে দশ টাকা চায়! সে তো রোজগার কর্‌তে চায়! তা না হলে আর চলে না। তার মাকে বাঁচতে হবে—পিসীদের গঞ্জন সহ্য ক'রে আর কতদিন থাক্‌বে! কিছু টাকা মহাজনদের কাছে সে নিয়েছে সে একটা ঠেলা গাড়ী তৈরী কর্‌তে চায়, মোষটাকে কাজে লাগাবে তাতেই রোজগার হবে।

রাজী হলুম। হাতে দশ টাকা ছিল না। বল্‌লুম—"আচ্ছা পাবি, তুই যা' গাড়ী তৈরী সুরু ক'রে দে"—ঝগরুর মুখটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো!

ব'লে ত' দিলুম দেব। হাতে চারটি টাকা ছিল। কলকাতার হষ্টেলের জলখাবার না খেয়ে বাঁচানো চারটি টাকা! বাড়ীতে চাইতে সাহস হ'ল না! আমাদের অবস্থাও খুব সচ্ছল নয়! কষ্টেই চলে সংসার। পুরানো বই ছিল কতগুলি, তাই এক দোকানে বিক্রী ক'রে কিছু টাকা পেলুম। আর মা'র কাছ থেকে বাকীটা জোগাড় করলুম।

গাড়ী তৈরী হ'ল। ঝগরু মোষটাকে গাড়ী টানার কাজে লাগালো। ছোটোবেলা ঐ রকমই ত' তার ইচ্ছে ছিল। ঝগরু বলেছে সে টাকাগুলো নাকি রোজগার ক'রেই ফেরত দেবে। বাজারের কাছে সে রোজ থাকে কিন্তু মোষের গাড়ীতে নিয়ে যাবার মতো অত বেশী বাজার কি কেউ করে? কেউ তার গাড়ী ব্যবহার কর্‌লো না! শেষে সে ভাবলে—সহরের আবর্জ্জনা সহরের বাইরে সে নিয়ে যাবে। মিউনিসিপ্যালিটির বাবুকে ধ'রে সে এই কাজ জোটালে! ঝগরু হ'ল এখন ঝগরু মেথর! তাতে দুঃখ নেই। পরম উৎসাহে সে কাজ সুরু কর্‌লে—মাসে ছয় টাকা তার মাইনে হ'ল।

দিন এমনি কাট্‌তে লাগ্‌লো! আমারও ছুটি ফুরোলো। চলে যাবার দিন ঝগরু দেখি ষ্টেশনে এসেছে—মুখখানা চুণ! বল্‌লুম, "ঝগরু তোর গাড়ী কেমন চল্‌ছে?" ঝগরু অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌লে—"দশ টাকা এবার দিতে পার্‌লুম না, কিছু হাতে থাক্‌চে না এবারে ফির্‌চেন যখন তখন বোধকটি দিতে পারবো।"

আমি টাকার কথা ভেবে বলি নি ওর গাড়ীর কথা। বল্‌লুম, "তাতে কি, সুবিধে মতো দিস্-- নাই বা দিলি!"

ঝগরু জিভ কেটে বল্‌লে--"না, দাদাবাবু, তাই কি হয়!"

পূজোর ছুটিতে সেবারে যখন ফির্‌লুম হঠাৎ একদিন দেখি, ঝগরু গাড়ীটা নিজেই টান্‌ছে। আমায় দেখেই থাম্‌লে। তার সমস্ত শরীরে ঘাম ঝর্‌ছে। রোগা হয়ে গেছে সে। বল্‌লুম, "কি রে ঝগরু, কেমন চল্‌ছে কাজ? মোষটা কোথায়—তুই গাড়ী টান্‌ছিস যে?"

ঝগরু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো, কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। তারপর অপ্রস্তুত মতো হ'য়ে বল্‌লে—"মোষ মরে' গেছে—পয়সার দরকার, চাকরীটা রাখ্‌তে হবে—তাই গাড়ী আমিই টান্‌ছি—এই একমাস প্রায় হ'ল!" তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "মোষটার কি দোষ! খেতে দিতে পারতুম না ভালো ক'রে, খাটাতুম!" তার চোখ ছল ছল ক'রে এলো। খানিক থেমে আবার বল্‌লে—"মহাজনকে টাকা শোধ দিতে হ'ল—বড় বেশী সুধ নিতো! আপনার দশ টাকাও তো দিতে হবে, সেইজন্যে একটু কষ্টে টেনে চল্‌ছিলুম—"

ঝগরু হাত দিয়ে চোখটা পুঁছলে—ঘাম মোছার ভাণ ক'রে, তার অনেক দুঃখ—সে দুঃখ সে কারুকে দেখাতে চায় না। তাই চোখের জল ফেলে না সে! সে মেথরের কাজ করে—সুচিবাই ব্রাহ্মণের দল তার সাড়া পেয়ে নাকে হাত দিয়ে দূর—দিয়ে চলে যায়। কেউ তার সঙ্গে ফিরেও কথা বলে না কাজ ছাড়া। চোখের জল অত সহজে ফেল্‌চে কেন সে? আজ কেবল মোষটার কথা মনে পড়ে তার চোখে জল এলো। মোষটাকে সে ভালোবাস্‌তো, ভালো ক'রে খেতে দিতে পারে নি, সেই দুঃখে তার চোখে জল এলো—।

বিকেলে ঝগরু এলো। অতি সাবধানে একটি থলে থেকে দশটী টাকা বের করে' সে মাটিতে রাখ্‌লো। হাতে দিতে ভর্‌সা পেলে না! সে যে মেথরের কাজ করে, তার ছোঁয়া লাগ্‌লে নাকি নাইতে হয়!

কথা বল্‌তে পার্‌লুম না। বহু কষ্টে এক আনা দু'আনা ক'রে জমিয়ে জমিয়ে দশটি টাকা তার জমেছে! আজ সেই দশ টাকা আমার পায়ের কাছে মাটিতে রেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে!—সে এখন আর কারু কাছে ধারে না।

একবার ভাব্‌লুম বলি, "টাকা আমার চাইনে ঝগরু"—বল্‌তে পার্‌লুম না। কেননা ঝগরুকে আমি চিনি, ও ফিরে নিতো না ঐ টাকা!

তারপর দিন সকালে দেখি—রোজকার মতো ঝগরু গাড়ীখানা নিয়ে চলেছে নিজের কাজে।

---

## রেণুকা

শ্রীকল্যাণী মিত্র মজুমদার

### এক

রেণুকার চোক দুটি আলোমাখা ঝলমল্‌
তুলি দিয়ে ভুরু দুটি আঁকা যেন অবিকল!
হাসি হাসি মুখে রেণু চুপ করে চেয়ে রয়,
কী মিঠে কথার সুর, ধীরে ধীরে কথা কয়।

ছোট্ট পাখীর মত চোক দুটি যেন তার
কখন্‌ কি নেয় দেখে জান্‌বেনা কেউ আর!
কোথাও একটুও নড়চড় কিছু হয়,
এসে রেণু গুছিয়ে তা রাখবেই নিশ্চয়!

ভোরে উঠে মার সাথে টুকি টাকি যত কাজ
সেরে নিয়ে, একটুকু সেখে রেণু এস্রাজ,
তারপরে পড়াশুনা তারপরে ইস্কুল,
খেলাতেও ভুল তার নেই ভাই একচুল!

ফিরে এসে খুসিমাখা হাসির সে ফুল বন,
মায়েরি ছায়ার মত সেই কাজে সেই মন!
কাজ আর পড়া তার উজল মণির টিপ্‌,
সে যেন ভোরের রোদ, সে যেন সাঁজের দীপ!

### দুই

এস্রাজে সুর শুনি সাঁজ ভোর দুইবার,
অসুখ বিসুখ কক্ষনো নেই তার,
শুধুই ছুটির দিনে ছোঁয় না সে বই টই
পাই নে রেণুর সাড়া, তাই তো অবাক হই!

ঘরের একটু পাশে এতটুকু চালাঘর,
হাওয়া যায় খেলে সেথা ঝির্‌ ঝির্‌ সুর্‌ সর্‌
সেইখানে বসে রেণু কিযে করে সারাদিন,
নিয়ে যত ছেঁড়া ন্যাতা, শিশি, কড়ি, আলপিন্‌!

ছোটি ছোট ভাঁড় আর তুলো আর তুলি রং
যত সব হিজিবিজি নিয়েই জবরজং!
দেখে তো শিউরে উঠি আর শুধু হাসি পায়,
পাগল কি হল রেণু ছুটির এ দিনটায়?

তাই তো! পাগল ন হলে নকি করা যায়
অত কিছু, বসে বসে ভোর থেকে সন্ধ্যায় ?
রাতের কাজটি সেরে মা-ও এসে দেন হাত,
চালা ঘরে হাসে আলো ছুটির দুপুর রাত!

মায়ের কাছেতে রেণু সব কিছু শিখে নিয়ে
কি সব তৈরী করে সে সব জিনিষ দিয়ে!
খেলনা পুতুল, জেলি, চাটনী, আচার আর
ছবির ফ্রেম ও ছবি—অমন চমৎকার!

### তিন

রেণুর মামা তা এসে কলকাতা নিয়ে যান,
আছে সেথা মেয়েদের খুব বড় কি দোকান,
রেণুর জিনিষ নাকি পায় সেথা কী আদর!
পায়না পড়তে মোটে, সব চেয়ে তারি দর!

ছোট আর বড়দের শুনি সেথা হয় ভিড়,
দেশের তৈরী বলে' আনন্দ সুনিবিড়।
রেণুর জিনিষগুলো খুসির সু-লহরে
ছোট বড় ঘর ভরে অত বড় সহরে!

মায়ের দুখের দিন তাই আজ কেটে যায়,
আগে কেউ ভাবে নি তো হতে পারে এ উপায়,
ছোট খাট জিনিষের অমন অসীম জয়ে
রেণুর ছুটির দিন উঠে যেন সোণা হয়ে!

### চার

সেবারের বড়দিনে পড়েছিল বড় শীত!
'একজিবিশনে' হল রেণুকারই বড় জিৎ!
তারি তো তৈরী জেলি, খেলনা পুতুল দল
সবার প্রথম হল, পড়ে গেল কোলাহল!

বিদেশের দামী দামী পুতুলেরা হেরে যায়,
জেলি ও চাটনী কেনা কাড়াকাড়ি বেড়ে যায়,
বড় এক খানি ছবি আর ছোট 'ফ্রেম' খানি
কিনেছেন এক রাজকুমারী ও মহারাণী।

হঠাৎ এসেছে চিঠি, কত বড় লেপাফাই!
'স্বদেশী-উৎসব' হবে, রেণুকাকে সেথা চাই।
বাজল রেলের বাঁশী, গাছেরা মেলল ছাতা,
মা'র সাথে রেণু আজ চলে গেল কলকাতা।

## "ছাত্রদের কল্পনা"

[ নাটক ]

শ্রীসুহাসচন্দ্র মল্লিক

[ একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী। বিদ্যালয় বসিবার সময় হয় নাই, তাই চারিদিকে হট্টগোল আর হৈ চৈ। বেঞ্চগুলি সারি সারি সাজান। শেষ বেঞ্চে কয়েকটি ছাত্র কি এক আলোচনায় মত্ত। ]

বোঙ্কো— ভাব কি হ'ত, হ'তাম যদি হেডমাষ্টার মহাশয় ;
কুড়ি মার্কের জন্যে আমার ইংরিজীতে থাকতো ভয় ?
ভাবনা তোদের থাকতো কি আর ?—সবাই করে যেতিস্ পাশ ;
নম্বর ?— তো দিতাম তোদের, মার্ক যে যত—যতই চাস্।

ভুলো— আশাটা তোর নেহাৎ বেশী, আমি অত চাইনা, ভাই,
খুসী আমি হবোই, যদি সব প্রাইজই একলা পাই ;
আর ফাঁকি দিয়ে প্রথম যদি হতে পারি বারংবার, —
বল্‌না ভোঁদা,—ভাবনা আমার থাকবে কি এ' পরীক্ষার ?

ভোঁদা— তার চেয়ে ভাই পেতাম যদি সেক্রেটারির কাজ,
ইংরিজী আর অঙ্কোটাকে উঠিয়ে দিতাম আজ।
ফেল কর্ল্লে ও পাশের নিয়ম কর্ত্তাম ঠিক বা'র
তোদের তা'লে এক কেলাসে থাকতে হ'ত আর ?

হাঁদা— পণ্ডিত যদি ছাত্র হতেন, হতাম কি তুই বল—
মাথার দফা শেষ করানোর পেতেন প্রতিফল।
পেতেন যদি একশো, দিতাম শূন্য প্রতিবারে,
বুঝতেন তাই ফেল করানোর ফলটা হাড়ে হাড়ে।

খাঁদা— সব পেপারই জড়িয়ে কুড়ি ইংরিজিতে, তবু—
অঙ্কে যে "এক" পাবার কপাল হয়নি আমার কভু,
সংস্কৃতে পাঁচ তো তবু—শূন্যি তাত নয় ;
অঙ্কটাকে একেবারে বাদ দিলে ঠিক হয়।

বোঁচা—উঠিয়ে দেবার দরকার নেই, সব জিনিষই থাক ;

যদি মুখ্যু হয়েও পণ্ডিত হই ছড়ায় সুনাম ডাক।

সকলে—( সমস্বরে )—আঃ

—সব্‌চে' এটা জবর উপায়, পড়াশুনোও নাই

পরে ইস্কুলেতেও পার্ব্ব হতে যার যা' খুসী তাই।

[ বিদ্যালয় বসিবার ঘণ্টাধ্বনি ও বিভূতিবাবুর প্রবেশ ]

ভূলো—(করজোড়ে)—মাষ্টোমশাই নমস্কার।

হাঁদা—(করজোড়ে)—নমস্কার।

বোঙ্কো—(করজোড়ে)—নমস্কার।

খাঁদা—(মিনতি সুরে)—মারবেন না আজকে শুধু।

বোঁচা—(মিনতি সুরে)—করবেন কম তিরস্কার।

ভোঁদা—আপনার তো অসুখ ছিল, এলেন কেন ইস্কুলে ?

বোঙ্কো—(স্বগত)—আঃ! অসুখ বলে অঙ্কগুলো দেখতে যদি যান ভুলে!

বিভূতিবাবু— বসো দেখি এক এক করে, আজকে আমায় বকাও কম,

(হাত দেখাইয়া) সর্দ্দিতে আজ বুকটা ভরা, কথাও বলার নেইকো দম।

[ সকলে বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল ]

বিভূতিবাবু— তিরিশটি তো ছেলে, তবু ঠেকেছে যে কম কম যেন

(ছাত্রদিগের প্রতি চাহিয়া) (গুণিয়া) উপস্থিত আজ মাত্র বারো, আজকে ছেলে কম কেন ?

[দারোয়ানের "নোটিশ" লইয়া প্রবেশ]

বিভূতিবাবু—(নোটিশ দেখিয়া)—আজকে তোদের এই আওয়ারেই রথের ছুটি হবে ;

[ দারুণ কোলাহল ]

বেশ, অঙ্কগুলো দেখিয়ে আমায় বাড়ী পালাও সবে।

[ প্রায় স্তব্ধ ও দরোয়ানের প্রস্থান ]

অঙ্কগুলো হয়নি যাদের, বদ ছেলে সব যত

চেয়ার হয়ে বেঞ্চি পরে দাঁড়াক আপাতত।

[ সম্পূর্ণ স্তব্ধ

[ ভূলো, ভোঁদা, বোঁচা, খাঁদা, হাঁদা ও বঙ্কোর বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান—

বাকী ছ'জন ছাত্রের টাস্ক দেখাইয়া প্রস্থান ]

বিভূতিবাবু—(ছ'জন ছাত্রের প্রতি চাহিয়া)—

টাস্ক হয়নি ?—হয়নি এমন সহজ অঙ্কগুলো ?

কারণ কি—ভোঁদা, বোঁচা, খাঁদা, বোঙ্কে, হাঁদা, ভূলো ?



বিভূতিবাবু—ভোঁদা!

ভোঁদা—আপনার যা অসুখ তা তো শুনেছিলাম অল্প না,

একদিনেতেই সারবে এমন, করিনি তা কল্পনা।

অঙ্কগুলো আনবো এবার বলছি নাক' মিথ্যে তা',—

দিন্‌না ছেড়ে—বাড়ী যাবার বড়ই বেশী ইচ্ছেটা।

বিভূতিবাবু—বোঙ্কো!

বোঙ্কো—কালকে ছিল পেটটা খারাপ—ভাবলাম আজ ফাঁকি ;

এক ওষুধেই সারলো হটাৎ,—জানতাম কাল তা কি ?

বাবার হুকুম, "ইস্কুলে যাও", লোক তিনি ন'ন যে সে,

উপুস করেও, ইস্কুলেতে আসতে হল শেষে।

বিভূতিবাবু—হাঁদা!

হাঁদা— কালকে মামার বাড়ী যাবার হল যে ঠিক্‌ঠাক্—

(হটাৎ) দিদির হল অসুখ, বাবা বল্লেন, "আজ থাক"।

অঙ্কগুলো হল না আর—বেজায় যে আপশোষ ;

বলুন তো স্যার—টাস্ক না আনার নয় কি দিদির দোষ ?

বিভূতিবাবু—বোঁচা!

বোঁচা (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)—টাস্ক কর্ত্তে একেবারে ভুল হয়েছে, স্যার।

বিভূতিবাবু—(ক্রুদ্ধ হইয়া) বদমাইসি ?—পরশু থেকে বলছি কতবার ;

ভাত খেতে কি যাস ভুলে ? তুই আসিস্ কেন স্কুল ?

বোঁচা—(অমায়িকভাবে) পড়ার বেলায়ই হয় যে আমার সবচে' বেশী ভুল।

বিভূতিবাবু—টাস্ক না আনার বোঙ্কো দিল কারণ চমৎকার,

(ঈষৎ হাসিয়া) বেশ ভুলো, তুই কারণটা বল, মৌণ কেন আর ?

ভূলো—মাষ্টোমশাই আসেন কি কাল, কল্লাম তাও চেষ্টা ;

অনেক খেটেও অঙ্কগুলো ভুল হ'ল, স্যার, শেষটা।

চেষ্টা করেও ভুল যদি হয়, মেজাজ কারো থাকে ?

সব পাতা তাই ছিঁড়ে দিলাম আজকে ভীষণ রাগে।

বিভূতিবাবু—(খাঁদার প্রতি)—সত্যি করে বলতো খাঁদা, ছাড় বাজে ওজর,

ঠিক করে বল, ছাড়ান পাবি, হয়নি কেন তোর ?

খাঁদা—কাবুলটা কাল বল্লে আমায়, আপনি গেছেন মারা
তাই পড়া সব করে এলাম, অঙ্ক গুলোছাড়া।

[ বিভূতিবাবু কাবুলের অন্বেষণে বেতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই ]

খাঁদা—দুঃখে সে তো স্কুল পালাল, বেঁচে আছেন, তাই ;
সব কথা স্যার সত্যি, এবার দিন না ছুটি, যাই।

[ প্রধান শিক্ষকের প্রবেশ ]

প্রধান শিক্ষক—( ছাত্রদের প্রতি চাহিয়া )—
তোমরা সবাই দাড়িয়ে কেন ?—হয়নি পড়া তাই ?
সত্যি বল-কর্ব্বে পড়া, নয় তো ছুটি নাই।

সকলে—এবার থেকে কর্ব্বো পড়া, আজকে ছুটি দিন—

[ প্রধান শিক্ষকের গমনাদেশ, সকলে প্রস্থান করিতে উদ্যত ]

হাঁদা—কর্ত্তাম তাই রথের ছুটি থাকলে প্রতিদিন।

[ জিভ্ কাটিয়া হাঁদার ছুটিয়া প্রস্থান, পরে সকলের পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে করিতে প্রস্থান ]

## যবনিকা

## স্পেক্ট্রোস্কোপের সুপরিস্ফুট কাহিনী

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

স্পেক্ট্রোস্কোপকে বিজ্ঞান জগতের অভিনবতম যন্ত্র বল্লে বোধহয় অত্যুক্তি হ'বে না। কারণ এই যন্ত্রটির গঠন এত সহজ আর সেই তুলনায় কার্য্য এত ব্যাপক যে অল্পদিনেই জ্যোতির্ব্বিদ মহলে এই যন্ত্রটি বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। টেলিস্কোপ অর্থাৎ দূরবীক্ষণ-যন্ত্র জ্যোতির্ব্বিদ্যায় কতটা কার্য্যকরী তার পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে হ'বে না। মানুষের চোখ অজানা লোকের যে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে ব্যর্থ প্রয়াস হয়, মানুষেরই তৈরী দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তারা নিজে এসে ধরা দেয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় যে স্পেক্ট্রোস্কোপ অর্থাৎ বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রের কার্য্যকারিতা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে বহুগুণে অধিক আশ্চর্য্যজনক।



স্পেক্ট্রোস্কোপ শব্দটি ল্যাটিন Spectrum কথাটি থেকে এসেছে। বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে সূর্য্যরশ্মিকে একটা ত্রিশিরা কাঁচের মধ্য দিয়ে চালনা করলে সেটা সাতরঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে সূর্য্যরশ্মি বা সাদা আলো সাতটা বর্ণে গঠিত। এই সাতটী রং হ'চ্ছে ক্রমান্বয়ে বেগুনী, ঘন নীল, নীল, সবুজ, হল্‌দে, নারঙ্গ ও লোহিত। তোমরা বাড়ীতে এই সাতটা রং মিশিয়ে দেখতে পারো। দেখবে ঠিক কাগজের মত সাদা রং হবে মিশ্রিত রংটির। এই যে সূর্য্যরশ্মির সপ্তবর্ণের সমাবেশ তার বৈজ্ঞানিক নাম হ'চ্ছে spectrum বা বর্ণালী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে একটি খুব অদ্ভুত তথ্য ধরা প'ড়ছে। পৃথিবীতে যত জিনিষ আছে তাদের প্রত্যেকের আলো অন্য প্রত্যেকের আলো হ'তে ভিন্ন। ত্রিশিরা কাঁচে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক আলোর বর্ণালীতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্য আলোর বর্ণালী হ'তে তার ভিন্নতা সূচনা করে। অতএব কোন একটা বর্ণালী দেখলেই তার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে আমরা অনায়াসেই বলতে পারব এটা কোন আলোর আর আলোটা কোন পদার্থের।

এই যন্ত্রটি বহুকাল ধরে রাসায়নিকদেরই ব্যবহারে ছিল। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে স্যার উইলিয়ম হাগিন্‌স্ এই যন্ত্রটি প্রথম জ্যোতির্ব্বিদ্যায় প্রয়োগ করেন। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। একটা আগুনের শিখায় খানিকটা লবণ ফেলে দাও। তাতে দেখ্‌বে যে শিখাটির আলো হল্‌দে রঙের হয়ে গেছে। এখন যদি এই আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করা যায় তবে দেখতে পাবে দুটো উজ্জ্বল হল্‌দে রেখা তা'তে আছে। লবণের উপাদান দুইটি সোডিয়ম ও ক্লোরিণ। সেইজন্য লবণের বৈজ্ঞানিক নাম সোডিয়ম ক্লোরাইড। সোডিয়ম বাষ্পীভূত হলে ঐ রকম দু'টো হল্‌দে রেখা তার বর্ণালীতে পাওয়া যায়। এখন কোন একটি নক্ষত্রকে পরীক্ষা করতে গিয়ে যদি দেখতে পাওয়া যায় যে তার বর্ণালীতেও অনুরূপ দুটো রেখা পাওয়া যাচ্ছে, তবে এ মনে করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হ'বে না যে ঐ নক্ষত্রটিতে বাষ্পীভূত সোডিয়ম বর্ত্তমান।

খুব সরল ও সাধারণ স্পেক্ট্রোস্কোপে থাকে একটী দুমুখখোলা নল ; তার একমুখে একটি ত্রিশিরা কাঁচ ও অপর মুখে একটী লেন্স বা কাঁচ। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় যে সমস্ত যন্ত্র থাকে সেগুলির গঠন প্রণালী ভীষণ জটিল। ত্রিশিরা কাঁচ তাতে মাত্র একটা থাকে না, থাকে থাকে সাজান অসংখ্য থাকে আর সঙ্গে প্রায়ই ফটো তুলবার যন্ত্রপাতিও থাকে। স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে খালি বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রাদি কি দ্বারা গঠিত তার বিবরণ পাওয়া যায় বল্লে কিন্তু কিছুই বলা হ'ল না। আজকাল এই যন্ত্রটীর এতই উন্নতি হয়েছে যে এর সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্র তরল না কঠিন অবস্থায় বর্ত্তমান আর যদি গ্যাস পদার্থ হয় তবে সেটা ভীষণ চাপের অধীন কিনা সবই স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে জানা যায়। আজ পৃথিবীর প্রত্যেক মানমন্দিরে

সব সময় স্পেক্ট্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা চলছে, তার নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হ'চ্ছে এর সাহায্যে।

সাধারণ গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে যাই জানা যাক্ আর নাই যাক্, স্পেক্ট্রোস্কোপ দিয়ে সব চেয়ে বেশী জানা গেছে আমাদের সৌরমণ্ডলের পিতা সূর্য্য সম্বন্ধে। সূর্য্যকে ঘিরে তিনটি মণ্ডল বর্ত্তমান। এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তোমাদের দিচ্ছি। দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখলে সূর্য্যের চারিধারে একটি বলয় চোখে পড়ে। এটীকে বলা হয় আলোকমণ্ডল, ইহার বহির্ভাগে সুবৃহৎ অপর একটী বলয় দেখা যায়—ইহা সূর্য্যের চির জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সমবর্ণমণ্ডল। আর তারও বহির্ভাগে ছটামণ্ডল। এই শেষেরটীই সবচেয়ে বড়। প্রথমটী ছাড়া এদের কোনটীই সূর্য্যগ্রহণ ছাড়া দেখা যায় না কারণ—সূর্য্যের মধ্যভাগের প্রচণ্ড তেজে সবই ঢাকা পড়ে যায়।

১৮৪২ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ ইউরোপে সূর্য্যগ্রহণের সময় সৌরমণ্ডল প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ভারতে সূর্য্য গ্রহণের সময় অনেক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ আসেন। এই সময়েই সূর্য্যকে প্রথম স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে লক্ষ্য করা হয়। বৈজ্ঞানিক জ্যানসেন (Jansen) প্রথম দেখান যে স্পেক্ট্রোস্কোপ সাহায্যে যে কোন সময় সূর্য্যকে পরীক্ষা করা চলতে পারে। এতে বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর এল। আজকাল আর বৈজ্ঞানিকদের সূর্য্যকে লক্ষ্য করার জন্যে সূর্য্যগ্রহণের অপেক্ষায় থাকতে হয় না। যে কোনদিন ইচ্ছা করলেই অনায়াসে তা করা যেতে পারে।

স্পেক্ট্রোস্কোপে আর একটী যে মহা উন্নতি সাধিত হয়েছে তার উল্লেখ না করলে কিন্তু সমস্ত রচনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। একটী জিনিষ তোমরা লক্ষ্য করেছ কী? রেলগাড়ী যখন দূর থেকে বাঁশী বাজাতে বাজাতে ক্রমশঃ যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই সেই বাঁশীর স্বর পরিবর্ত্তিত হয় এবং পরিশেষে যখন দূরে চলে যেতে থাকে ততই ক্ষীণ হ'তে হ'তে অবশেষে মিলিয়ে যায়। মোটরগাড়ীর হর্ণ সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। আমরা কেন শুনতে পাই তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। কোন শব্দ বাতাসে ঢেউ তুলে আমাদের কানে আঘাত করলেই আমরা শুনতে পাই। প্রাগ্ নগরীর ক্রিশিয়ান ডপ্লার সাহেব প্রমাণ করেন যে রেলগাড়ীর বাঁশীর স্বরের পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী বাতাসের ঢেউএর ক্রমবর্দ্ধমান অথবা ক্রমক্ষীয়মান সংখ্যা। অর্থাৎ যখন খুব দূরে থাকে বাতাসে শব্দের ঢেউ বেশী এবং যখন খুব কাছে তখন শব্দের ঢেউ খুব কম হওয়াই এর কারণ। এই তথ্যটীকে 'ডপ্লারের সত্য' বলা হয়। জ্যোর্ব্বিদ্যায় ব্যবহৃত স্পেক্ট্রোস্কোপের আবিষ্কারক স্যার উইলিয়াম হাগিন্স্ এই সত্যটীকে স্পেক্ট্রোস্কোপে প্রয়োগ করেন। তাঁর নূতন পদ্ধতিতে যে নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী আমরা পরীক্ষা করছি, সেই নক্ষত্রটীর গতি আমাদের পৃথিবীর দিকে, না পৃথিবী হ'তে দূরে আমরা জানিতে পারি। এমন কী বর্ণালীর রেখাগুলি কতটা



সরে গেছে পরীক্ষা করে আমরা জানতে পারি নক্ষত্রটী কত বেগে ধাবিত হ'চ্ছে। কিন্তু তা বলে মনে কর না যে নক্ষত্রের গতিবেগ নির্ণয় করা খুব সহজ। যতগুলি তারার খবর এ পর্য্যন্ত জানা গেছে, তাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী হ'চ্ছে 'পিকটর" রাশির একটী ক্ষুদ্র তারা। কিন্তু তা হ'লে কী হ'বে, ২০০ বছরেও এই নক্ষত্রটী পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রের একধার থেকে আর এক ধারের বেশী যেতে পারে না (আমাদের চোখে অবশ্য)।

আর একটী তথ্য এই স্পেক্ট্রোস্কোপে প্রয়োগ করা হয়েছে। আমরা রাত্রিবেলা পথে যতই এগোতে থাকি, ততই আমাদের পিছনের দুপাশের আলোগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট মনে হয়, আর সামনে মনে হয় আলোগুলি আরও বেশী পৃথক হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে সূর্য্যকে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে সূর্য্য তার সমস্ত সৌর মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই এক অজানা পথের পথিক। সে ক্রমেই "পিসেস" নামে একটী রাশির দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে—তার কারণ পরীক্ষা করে দেখা যায় ক্রমেই উক্ত রাশি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'চ্ছে। তবে সূর্য্য অন্য কোন বৃহত্তর সূর্য্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে না নিজের মতিতেই ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে তা জানা যায়নি কারণ তার গতিপথটী একটী বৃত্তাংশ বা বক্র না সরল তা ঠিক বলতে পারা যায় না। *

* এইটি প্রবন্ধটির লেখক বালক অরুণকুমার নিজ হাতে তাহার এই সুলিখিত রচনাটি রংমশাল কার্য্যালয়ে দিয়া যায়। ইহার কিছুদিন পরেই সে কঠিন টায়ফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হয় এবং গত ৫ই অক্টোবর রাত্রি ১২-৩৬ মিনিটে তাহার জীবন প্রদীপ চির নির্ব্বাপিত হয়। অরুণকুমারের ক্ষণজন্ম জীবনের একটি আলেখ্য আমরা রংমশালে অন্যত্র প্রকাশিত করিলাম।—সম্পাদক।

## চাঁদ ও শিশু

ছোট ছেলে মা'র কোলে বসে বলে, "চাঁদ,
তোর সাথে খেলিবারে আছে মোর সাধ,
তাই বলি নেমে আয় কুঠির প্রাঙ্গনে,
কত সুখে কত খেলা হ'বে দুইজনে।"
মৃদু হাসি চাঁদ্ বলে, "নেমে যদি আসি,
আয়, আয় বলি আর ডাকিবে না হাসি!"

—আশীষ দত্ত (গ্রাঃ নং ১০৬৯)

( পূর্বানুবৃত্তি )

এই সব কথা শুনতে শুনতে আমরা এসে পড়লাম আর এক জায়গায়। শুনলাম এইখানে ওদের এককটি বড় পাঠশালা আছে। কিন্তু কোথায় পাঠশালা চারদিকে তাকিয়েও কিছু বুঝতে পারা গেল না। সামনে গুদামের মতো একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তাকে পাঠশালা ব'লে মনে করা সম্ভব হ'ল না। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা কলরব শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু সেই কলরবকে মানুষের কলরব না ব'লে মৌমাছির গুঞ্জন বললে ঠিক হয়, কেননা অনেক দূর থেকে এসেও আওয়াজটি ছিল তীক্ষ্ণ এবং মধুর।

সর্দার সেই গুদাম ঘরেই আমাদের নিয়ে গেল। ভিতরে গিয়ে বুঝতে পারলাম সেইটেই পাঠশালা – আর আমরা যে কলরব শুনেছিলাম তা এখানকার ছাত্রদের কণ্ঠ থেকেই আসছিল। কিন্তু গুদাম ঘরে জানালা নামক কোনো বস্তু না থাকাতে মনে হচ্ছিল আওয়াজটি বহু দূর থেকে আসছে।

আমরা এগিয়ে পাঠশালার ভিতরে গেলাম। সর্দার আমাদের সঙ্গে ছিল, সে জন্য কেউ কিছু বলল না। আমরা দেখলাম গুরুমশাই একটি ছেলেকে প্রশ্ন করছেন—"বৃষ্টি হয় কি থেকে?

আমরা বাইরে থেকে এসেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমাদের সম্বন্ধে কোন ছাত্রেরই কৌতূহল দেখলাম না, কতকগুলো বাইরের লোক তাদের মধ্যে এসেছে, এটা যেন তারা দেখতেই পায়নি এমনি ভাবখানা।

আমরা অবাক হ'য়ে পড়ানোর ভঙ্গী দেখতে লাগলাম। গুরুমশাই প্রশ্ন করলেন, "বৃষ্টি হয় কি থেকে?"

যাকে প্রশ্ন করা হ'ল, সে নতুন ছাত্র, তখনও তার বই কেনা হয় নি, কিন্তু তবু সে এই প্রশ্নের উত্তরে বলল, "বৃষ্টি হয় মেঘ থেকে।"

গুরুমশাইয়ের চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠল। রেগে বললেন, "কি ক'রে জান্‌লে?"

ছেলেটি বলল, "আমি মেঘ থেকে বৃষ্টি হ'তে দেখেছি।"



এ কথায় গুরুমশাই গর্জন ক'রে লাফিয়ে উঠে ছেলেটিকে নিষ্ঠুর ভাবে বেত মারতে লাগলেন। ছেলেটি চীৎকার ক'রে কেঁদে বলতে লাগল, "মিছে কথা বলছিনা গুরুমশাই, নিজে দেখেই বলছি," কিন্তু এ কথায় কোনো ফল তো হ'লই না, উল্টে সে আরও বেশি ক'রে বেত খেতে লাগল।

ছেলেটির অবস্থা দেখে আমি তাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সর্দার আমাকে টেনে এ'নে চুপে চুপে বলল, "চুপ ক'রে দেখে যাও, নইলে বিপদে পড়বে, এখানকার যে সব নিয়ম তা তোমাদের দেশের নিয়মের সঙ্গে মিলছে না বলেই অধীর হ'য়ো না, তা হ'লেই তোমাদের দেখা সার্থক হবে।" সর্দারের কথায় থেমে গেলাম। ছেলেটি মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল হ'য়ে পড়ল, তখন গুরুমশাই আসনে গিয়ে বসলেন। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে, কপালের ঘাম মুছে এক ঘটি জল খেয়ে অন্য ছাত্রদের কাছে ডাকলেন। সবাই এল তাঁর কাছে। তিনি তখন তাদের বলতে লাগলেন, "এই নতুন ছেলেটির কাণ্ড! প্রশ্ন করলাম, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় কি ক'রে জানলে? তার উত্তরে ও বলে কি না, নিজে চোখে দেখেছে!"

শুনে ছেলেরা তো হেসেই অস্থির। তাদের হাসি আর থামে না। ওদের মধ্যে একটি ছেলে একটু গম্ভীর ছিল, সে নতুন ছেলেটিকে হাত ধ'রে মাটি থেকে তুলে বলল, "ও রকম উত্তর দিলে তোমার এখানে পড়া চলবে না—বুঝলে? কেমন ক'রে গুরুমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাও জান না? তোমার বলা উচিত ছিল, 'বৃষ্টি হয় তা কি ক'রে জানব?' তুমি তো আর পাঠশালায় পড়নি! পাঠশালায় যখন পড়বে তখন বই থেকে সব সব জানতে পারবে। চোখে দেখে কিছু শেখা যায় না, শিখলেও তা ভুল শেখা হয়, যা বলবে বই থেকে মুখস্থ ক'রে বলবে।"

মার-খাওয়া ছেলেটি এই কথা শুনে খুব নরম সুরে বলল, "আমি তা হ'লে খুব অন্যায় ক'রে ফেলেছি, আর কখনো এ রকম বলব না।"

নতুন ছাত্রের এই দুর্দশা দেখে নিতাই-র চোখে জল এল। সে চোখ মুছে আমাকে চুপে চুপে বলল "চল, আর নয়—এদেশ থেকে এখুনি চলে যাই।"

মণ্টু শুনে বলল, "না নিতাই, তা হয় না, এই অদ্ভুত দেশটি ভাল ক'রে না দেখে কিছুতেই যাওয়া যায় না।"

আমরা সবাই পাঠশালা থেকে বেরিয়ে বাইরে এলাম। সর্দার তখন বলল, "চোখে দেখা যতটা বন্ধ করা যায়—সেই জন্যই পাঠশালা গুদামে বসে।—এখানে জানলা নেই, তাতে অন্তত পড়ার সময় ছেলেরা বাইরে তাকিয়ে কিছু দেখতে পারে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের দেশে পড়ানোর যদি এই নিয়ম তা হ'লে

গুরুমশাইয়ের দরকার কি? ব'সে ব'সে বই মুখস্থ করা ছাড়া ছেলেদের তো আর কাজ নেই।"

সর্দার বলল, "গুরু মশাই না থাকলে ছেলেরা পড়া মুখস্থ করছে কি না তা দেখবে কে? তা ছাড়া ছেলেদের পাহারা দিতে হয়, ওরা যদি বই থেকে চোখ ফেরায় তা হ'লে যে পাঠশালার নিন্দা হবে।"

মণ্টু বলল, "তা হ'লে গুরুমশাই মানে চৌকিদার?"

সর্দার বলল, "ঠিক তাই। যাকে আমরা দেখলাম সে লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানে না। খুব সকালে সে একপাল গোরু নিয়ে মাঠে বেরিয়েছিল। মাঠে গোরু চরিয়ে পাঠশালায় এসে বসেছে। একটা মজার গল্প শোন। একখানা বইতে 'গোরুর চার পা' এই কথাটা ছাপার ভুলে 'গোরুর তিন পা' হয়ে গিয়েছিল। গুরুমশাই পড়াতে লাগল গোরুর তিন পা। একটি ছেলে তার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, কিন্তু তখুনি গুরুমশাইয়ের বেত তাকে নীরব ক'রে দেয়। কারণ বইতে যা ছাপা আছে তাই সত্য, চোখে যা দেখা যায় তা সত্য নয়। সেই থেকে আর কেউ ছাপা বইয়ের কথার প্রতিবাদ করে না।"

আমি বল্‌লাম, "তোমাদের এই গুরুমশাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। সর্দার গুরুমশাইকে সে কথা জানাতে তিনি আনন্দের সঙ্গে রাজি হ'লেন। আমাদের অনেক বিষয় আলাপ হ'ল। গুরুমশাইয়ের জ্ঞানের বহর দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। একটা প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনারা ইতিহাস কিছু পড়ান তো?" গুরুমশাই বলেছিলেন, "ইতিহাঁস মানে কি? ( ইতিহাঁসের চন্দ্রবিন্দুটা তিনিই যোগ করেছিলেন )।—অ্যাঁ ইতিহাঁস মানে কি? —আমি এক রকম হাঁসের নাম জানি সেটা পাতিহাঁস—ইতিহাঁস তো কখনো শুনিনি?"

আমি আর কি বলি! কিন্তু আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে গুরুমশাই বললেন, "বল না হে ইতিহাঁস দেখতে কেমন?" আমি বললাম, "পাতিহাঁসের মতোই দেখতে, তবে তার মাথাটা অনেকটা আপনার মতো, ছুটো শিংও আছে কিন্তু দেখা যায় না। গুরুমশাই খুব খানিকটা হেসে বললেন, "ভারি মজার তো।"

আমি বললাম, "মজা ব'লে মজা! তাকে দেখলেই হাসি পায়।"

গুরুমশাই হাসতে হাসতেই বললেন, "কিন্তু এ রকম হাঁস তোমরা পড় কি ক'রে? হাঁস কি কেউ পড়ে?"

"সে কথা আর শুনবেন না গুরুমশাই, আমাদের দেশে সবাই অদ্ভুত!"—কিন্তু আর বলা হল না, এই সময় হঠাৎ একটা ভীষণ গোলমাল আমাদের কানে এল। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দেখি পথে লাখ লাখ লোক দাঙ্গা বাধিয়েছে। আমাদের পাশ দিয়ে বহু লোক ছুটে যাচ্ছে সেই দিকে। ব্যাপার কি?



সর্দার ভীতভাবে বলল, "নিশ্চয় সেই লোকটির অসুখ করেছে।"

"এ কথার মানে কি? সেই লোকটি কে?" আর তার অসুখ করলেই বা এত দাঙ্গা বাধায় কেন?"

সর্দার গম্ভীর সুরে বলল, "আমাদের দেশে এই বিপদ। এই শহরে পাঁচ হাজার বয়স্ক পুরুষ লোক আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ৪৯৯০ জনই ডাক্তার। বাকী দশজনের মধ্যে আমি একজন। শহরের বারো হাজার লোকের মধ্যে এত ডাক্তার থাকলে কারোই রোগী পাবার উপায় নেই—কেননা সব বাড়িতেই ছুএকজন ক'রে ডাক্তার আছে। এই শহরে বাইরে থেকে আসা একটিমাত্র লোক আছে যে ডাক্তার নয়। সুব ডাক্তার সব সময় লক্ষ্য রাখে এই লোকটির অসুখ হয় কি না। একমাস আগে একদিন তার জ্বর হয়েছিল, তা শুনে ৪৯৯০ জন ডাক্তারই একসঙ্গে ছুটে গিয়েছিল তাকে চিকিৎসা করতে। কিন্তু এত ডাক্তার গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? তাই পথে তাদের মধ্যে লাগল মারামারি। সে এক মজার দৃশ্য! ডাক্তারি যন্ত্র দিয়ে এ ওকে মারছে, ও তাকে মারছে। কেউ ষ্টেথোস্কোপ দিয়ে একজনের গলায় ফাঁস লাগিয়েছে, কেউ ইনজেকশনের সুঁচ একজনের গায়ে ফুটিয়ে দিচ্ছে, কেউ মুঠো ভরা কুইনিন একজনের মুখে গুঁজে দিচ্ছে, কেউ ফোড়া কাটা অস্ত্র দিয়ে একজনের গলা কাটছে—সে এক মারাত্মক কাণ্ড!

"এই সব ডাক্তারদের বীভৎস চীৎকার আর আর্তনাদ শুনে রোগীর জ্বর গেল ছেড়ে! সে বিছানা থেকে উঠে দেখে হাজার হাজার ডাক্তার তার জন্য প্রাণ দিচ্ছে। দেখে তার দয়া হ'ল কিন্তু কাছে গিয়ে তার কিছু বলতে সাহস হ'ল না—ক্ষীণ কণ্ঠে হাজার উত্তেজিত ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তার পক্ষে ছিল সত্যই অসম্ভব। তাই সে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা গাছে উঠে সবাইকে ডেকে বলল—"এই দেখ—তোমরা যে রোগীর জন্য মারামারি করছ, আমি সেই রোগী - তোমাদের চীৎকারে আমার রোগ সেরে গেছে। কিন্তু যদি তোমরা এখন না থাম এবং আরও চীৎকার কর, তা হ'লে আমি গাছ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ম'রে যাব। দেব লাফ?

"এ কথা শুনে ৪৯৯০ জন ডাক্তার ভয়ে কাঁপতে লাগল। তাই তো, যদি সত্যিই লোকটি প'ড়ে মরে যায় তা হ'লে ভবিষ্যতে তারা আর একটিও রোগী পাবে না! এইটে বুঝতে পেরে সবাই মিলে তাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল, অনেকে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল। সেই কান্না আর তাদের অসহায় ভাব দেখে রোগীর মন ভিজল। তার কাছে একটি টাকা ছিল, সেইটে সে নীচে ফেলে দিল ডাক্তারদের মধ্যে। ডাক্তাররা আনন্দে চীৎকার করতে করতে টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে বখরা করতে বসল, ঠিক হ'ল সবাই সমান ভাগ পাবে।

কিন্তু একটি টাকাকে ৪৯৯০ ভাগ করা গেল না। তারা তখন সবাই মিলে গেল পাঠশালার গুরুমশাইয়ের কাছে। কিন্তু গিয়ে দেখে গুরুমশাই সেখানে নেই।

"তখন ডাক্তারদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলল, "গুরুমশাইকে পাঠশালায় পাবে কেন? তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন—অর্থাৎ আমিই তিনি। আমিও যে ডাক্তার সেটা তোমরা ভুলে গিয়েছ তাই এতক্ষণ মজাটা দেখছিলাম।"

"সবাই তখন গুরুমশাইকে বলল, টাকাটাকে ৪৯৯০ ভাগে ভাগ ক'রে দিতে। গুরুমশাই পাঠশালায় ঢুকে অঙ্কের বই খুলে অনেকক্ষণ ধ'রে উল্টে পাল্টে বললেন, সে হবে না, বইতে নেই।

"ডাক্তারদের মধ্যে এক চাল-বিক্রেতা ছিল, সে বলল এক টাকার চাল কেনো, আমার দোকানে চল, আমি এক টাকায় ৪৯৯০টি চাল দেব, এই চাল প্রত্যেকে একটি ক'রে নিলেই হবে। শেষে তাই ঠিক হ'ল। ডাক্তাররা সবাই একটি ক'রে চাল নিয়ে ঘরে গেল।"—

সর্দার এই কাহিনীটা শুনিয়ে বলল, "আজ বোধ হয় আবার সেই লোকটির অসুখ করেছে এবং আবার ডাক্তাররা তার চিকিৎসার জন্য মারামারি করছে।"

মন্টু জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা এরা ডাক্তারি শিখেছে কোথাও?"

সর্দার বলল, "ডাক্তারি আবার কোথাও শিখতে হয় নাকি? কৈ আমি তো জানি না। তোমাদের দেশে হয় তো হয়, কিন্তু আমাদের দেশে জ্ঞান হবার পর থেকেই প্রায় সবাই ডাক্তার। তুমি আমাদের দেশে কারো কাছে যদি একবার বল তোমার মাথা ধরেছে বা জ্বর হ'য়েছে, তা হ'লেই বুঝতে পারবে ডাক্তার কাকে বলে। তোমরা কেউ এই রকম মারাত্মক ভুল কখন ক'রো না যেন, করলে আমি কিন্তু তোমাদের তখন রক্ষা করতে পারব না।" শুনে আমরা সবাই ভয়ে কেঁপে উঠলাম। (ক্রমশঃ)

## প্রথম ভাগ

প্রথম ভাগেরে ডাকি ক'হে বিজ্ঞানে,
"চিরকাল তুই হায় কাটালি অজ্ঞানে।
এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য যে কত,
কিছুই জান না তুমি অবোধের মত
কিন্তু দেখ সুধী, সাধু, বিজ্ঞ ও ধীমান
কতই উচ্চেতে মোরে দিয়াছে যে স্থান।"
বলিল প্রথম ভাগ, "যেথা আছ তুমি,
প্রথম-সোপান তার রচেছি যে আমি।"

—আশীষ দত্ত

# সলিলার সৎমা

শ্রীজ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

সলিলা ঘোষ মোটাসোটা, বেঁটে, ফর্সা, ছোট ছোট চোখ আর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলওলা একটি মেয়ে। চুল তার বেশী লম্বা না হলেও ফাঁপিয়ে সে বড় করেই খোঁপা বাঁধতো। আর নিজেকে ঠিক নুরজাহান মনে না করলেও আনার কলির কাছাকাছি একটী সুন্দরী বলে মনে করতো। আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলতে ওস্তাদ ছিল।

স্কুলে প্রথম ভর্ত্তি হয়েই সে মেয়েদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল তাদের বাড়ীর সম্বন্ধে লম্বা লম্বা গল্প বলে। তার বাবা হচ্ছেন কোথাকার হাকিম—সেখানকার লোকে তাঁর নামে ভয়ে থরহরি কাঁপে। একবার একটা লোক নাকি তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখায় নি—তারপর স্বয়ং লাট সাহেব নাকি তাদের বাড়ী এসে অতিথি হয়ে সেই লোকটাকে ডেকে এমন বকে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে বাছাধন আর যায় কোথা।—তার বাবার একটা পোষা বাঘ আছে—সেটা কুকুরের মত তার বাবার সঙ্গে ঘোরে, তার ভয়ে তাদের বাড়ী চোর ডাকাত আসা দূরে থাকুক একটা শেয়াল পর্য্যন্ত ঢুকতে সাহস পায় না। কাশ্মীরের মহারাজা নাকি নিজে প্যাক করে তাদের বাড়ী জাফরান পাঠান, যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেট এর উপর সরকারী হুকুম আছে তাদের বাড়ী মাখন পাঠাবার, ফল আসে মালাবার থেকে এমনি কত কি! তার মায়ের গলার মুক্তোগুলো এক একটা টিকটিকির ডিমের মত বড় আর বাবার হাতের হীরার আংটিটার হীরাটা পায়রার ডিমের সাইজ।

"আমরা ভাই বাড়ীতে সিল্কের সেমিজ সায়া পরি—সাটিনেরও পরি। কিন্তু মা বল্লেন যে ইস্কুলে ওসব পরতে দেবে না তাই কি জানি কি কাপড় বলে—সুতোর কাপড়ের নামও জানি না ছাই—তারই সেমিজ সায়া ইত্যাদি কিনে আনা হ'ল। আমার ঠাকুমা যদি জানতে পান আমি এই রকম সাধারণ বিছানায় শুচ্ছি তো বুড়ো মানুষের ঘুম নাওয়া খাওয়া সব মাথায় উঠ্‌বে।"

পিকো বল্লে, "কেন? তুমি বুঝি কিংখাবের বিছানায় শুতে—না মখমল?"

সলিলা বল্লে "না, ভাই, ব্রোকেডের সাটিন ব্রোকেড আর সিল্ক লেস।"

টপসী বল্লে "তবে তো ভাই, তোমার সেই রাজকন্যের মত এই বিছানায় ঘুমই হবে না।"

বিল্লু বল্লে "মটর রেখে দিলে তিনটা গদীর নীচেও কোথায় আছে সেটা বল্‌তে পার নিশ্চয়। তুমি ভাই এইটথ্ ওয়াণ্ডার।"

"তোমাকে দেখিয়ে পয়সা করা যেতে পারে।" স্নলু বল্ল।

সলিলা বল্ল, "ঠাট্টা করছ কেন? আমরা ভাই, সব ভাল জিনিস ব্যবহার করি—খাওয়ার জিনিস যা 'বেস্ট' পরার জিনিসও তাই। খারাপ জিনিস ব্যবহার করা আমাদের বাড়ীর কুষ্টিতে লেখে নি।"

এ হেন সলিলা কিন্তু ক্লাসে লেখাপড়ায় 'বেস্ট' হতে পারে নি; বেশ নীচেই ওর স্থান হ'ত। ওর জ্যাঠতুতো দিদি নাকি তাদের স্কুলে বরাবর ফার্ষ্ট হয়ে, মেডেল পেয়ে এসেছে। ইউনিভার্শিটিতে

সে রেকর্ড ব্রেক করবে। গান বাজনায় ওর মাসতুতো বোনের কথা আর কি বলবে ও। গ্রামোফোন কোম্পানীগুলো এমন মারামারি লাগিয়েছিল ওর গান নেবার জন্য সে শেষে আইন-সভা থেকে লাট সাহেবকে একটা অর্ডিন্যান্স পাশ করাতে হ'ল—না ?" পিকো বল্‌ল।

সলিলা বল্‌ল "ঠাট্টা কর কেন ? অর্ডিন্যান্স করতে হয় নি—কিন্তু পুলিশ কমিশনারকে আসতে হয়েছিল। মেশোমশায় রেগে বল্লেন তিনি কোনও কোম্পানীকে গান দেবেন্ না।"

টপ্‌সী বল্ল, "বাঁচা গেল !"

সলিলাকে ক্লাশের মেয়েরা কেউ পছন্দ করত না, সে বেশীর ভাগ সময়ে একা একাই ঘুরে বেড়াত। তার টিচারদের মধ্যে সতীদিকে সব চেয়ে ভাল লাগতো—কিন্তু সতীদি তার দিকে চেয়েও দেখ্‌তেন না। সতীদি সুন্দরী, সতীদি বড় লোকের মেয়ে, ছুটীর দিনে তাঁর জন্য বাড়ী থেকে আসে মস্ত বড় গাড়ী, তাঁর কত রকমের শাড়ী আর কি সুন্দর সুন্দর ম্যাচ করা গহনা। ইন্দ্রাণীর মত তাঁর রূপ। সলিলা বল্‌ত "ওঁর নাম সতী না হয়ে শচী হ'লে মানাতো বেশী।" মেয়েদের সঙ্গে যখন সলিলা থাকে, তখন সতীদির সামনে পড়লে তার মুখ চোখ কান লাল হয়ে ওঠে, সে লজ্জায় মাটীতে মিশিয়ে যেতে চায়। বলে "ছি ! ছি ! কি লজ্জা !" ক্লাসে সতীদির সামনে তার গলার স্বর ফোটে না—তাঁর সাবজেক্টের খাতায় পাতার উপরে লেখা হয়ে যায়—জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

সতীদির মুখে কিন্তু হাসি ফোটে না, সরম অরুণ রাগ রক্ত কপোল আর সলাজ চাহনি তাঁর দেখা যায় না। অন্য মেয়েরা বলে, সতীদি খুব বেশী বিরক্ত হলে নাকি ঐ রকম ভাব লেশহীন মুখ তাঁর হয়—কিন্তু সলিলা বিশ্বাস করে না।

সতীদিকে একলা কোথাও দেখতে পেলেই সলিলা তাঁর পিছনে ছোটে—কিন্তু সে নাগাল তাঁর পায় না। তিনি ওকে যে কেমন করে এড়িয়ে যান—ও বুঝতে পারে না, ওর বুক ধুকপুক করতে থাকে।

একদিন সলিলার নামে এক টেলিগ্রাম এলো, ওর বাবা করেছেন "ঠাকুমার বড় অসুখ। শীঘ্র চলে এসো।"

সতীদি টেলিগ্রামটা নিয়ে সলিলাদের ঘরে ঢুকে ওর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লেন, "ভয় কি ? তৈরী হয়ে নাও। গিয়ে ভালই দেখ্‌বে।" সলিলা এত কাঁপছিল আর কাঁদছিল যে সকলেই তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সতীদি বল্লেন "তুমি চুপ করে একটু শোও। আমরা তোমার সব গুছিয়ে দিচ্ছি। আমি নিজে তোমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবো।"

সলিলা এত উদ্বেগের মধ্যেও যেন হাতে স্বর্গ পেলো। সতীদি সলিলাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গার্ড সাহেব এবং সহযাত্রিনীদের জিম্মায় দিয়ে স্কুলে ফিরে এসে বল্লেন, "বেচারী ! বড্ড ভয় পেয়ে গেছে।"

সলিলার ঠাকুমা মারা গেলেন। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর সলিলা ফিরে এল। ক্লাসের শেষে সতীদি ওকে ডেকে নিয়ে অনেকক্ষণ ওকে বাড়ীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মেয়েরা সকলেই ওকে নানা রকম ভাবে সহানুভূতি দেখাতে লাগ্‌ল।

কয়দিন সলিলা বোর্ডিংএর সকলেরই বিশেষ হেফাজতের সম্পত্তি হয়ে রইল। কিন্তু তার পরেই তার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে এল। কারণ বোর্ডিংএর মেয়েদের মধ্যেই কতজনের বাড়ীতে কত ব্যাপার ঘটে গেল—টুস্‌কীর



একটি ছোট্ট ভাই হয়েছে, গীতার দিদির বিয়ে ঠিক, জুঁইএর এরোপ্লেন চালক নিরুদ্দেশ দাদাটী ফিরেছেন কত দেশ বিদেশ পর্য্যটন করে এসে—এই সব মহা ইনটারেষ্টিং ব্যাপারের মধ্যে সলিলার বুড়ো ঠাকুমার স্বর্গারোহণটা বিস্মৃতির তলে ডুবে গেল। সলিলার আর এ ভাল লাগে না। তার যেন স্বর্গচ্যুতি ঘটেছে। সতীদিও আর তাকে ডেকে ঠাকুমার কথা জিজ্ঞাসা করেন না।

একদিন মেয়েরা দেখ্‌ল যে সলিলা একখানা চিঠি নিয়ে খুব বিমর্ষভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা বল্‌ল "সলিলা, তোমার কি হল—কিসের চিঠি ?" সলিলা কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌ল "ভাই, আমার মার বড় অসুখ করেছে—মাসীমা লিখেছেন।" "বেচারী ! এই সেদিন ঠাকুমার এ রকম হ'ল !" "হাঁ, ভাই, আমারও তাই মনটা খারাপ হয়ে আছে—কেমন যেন ভয় করছে, মার যে আমার বিশ্রী রকমের টাইফয়েড হয়েছে তাই বাড়ীর ওরা আমায় নেবে না এখন।"

সতীদি ঠিক সেই সময়ে সেখান দিয়ে উপরে যাবার জন্য যাচ্ছিলেন। পিকো তাকে ডেকে সলিলার দুঃসংবাদটা দিল। সতীদি সলিলাকে ডেকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনিই ওর জন্য চেষ্টা করে প্রতিদিন চিঠি লেখার পারমিশন এনে দিলেন। ও রোজই একটা পোঃ কার্ড মাসীমাকে লিখ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু রোজ ওর উত্তর আসল না। চার পাঁচ দিন পরে একটা পোঃ কার্ড এলো ওর মাসীমার কাছ থেকে তাতে শুধু এই লেখা ছিল "মা সলিলা—তুমি বিজুর খবরের জন্য রোজ রোজ পয়সা খরচ করে কার্ড লিখ্‌ছ কেন তা তো বুঝতে পারছি না। এত ব্যস্ত হবার কি দরকার ? মন দিয়ে পড়াশুনা কর। বাজে ব্যাপারে অত ব্যস্ত হওয়া ভাল না—মাসীমা।"

সতীদি চিঠিটা হাতে করে এনে বল্লেন "তোমার মার নাম কি ? তোমার মাসীমা তাঁর অসুখটা বাজে ব্যাপার বলে লিখেছেন কেন ?" সলিলা কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল "আমার মার নাম বিজনবাসিনী। মাসীমা ঐ রকম ভারী হিংসুটে। মাকে একটুও ভালবাসেন না। সতীদি মা হয়তো আমার বেঁচে নাই।"

এর দিন চার পরে সলিলার নামে দুটো পোষ্ট কার্ড এলো—একটা লিখেছেন ওর মা আর একটা ওর মাসতুতো বোন লীলা। সতীদি চিঠি দুটো এনে সবায়ের সামনে ওর হাতে দিয়ে কঠিন গম্ভীরমুখে বল্লেন, "তোমার টাইফয়েডাক্রান্ত মা তোমায় শনিবার দেখতে আসছেন—শয্যাশায়িনী মাকে তোমার বাবা শহরে তামাসা দেখাতে আনছেন।" সলিলা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কার্ড দুটো মাটীতে পড়ে গেল। শতন চেঁচিয়ে পড়ল।—

"সলিলাদি—বিজুর খবরের জন্যে তুমি নাকি অত্যধিক ব্যস্ত ছিলে। শুনে খুসী হবে কাল তার তিনটে ছানা হয়েছে—একটা মিশ কালো আর দুটো সাদায় কালোয়। একটা বাচ্চা নেবে ? —লীলা"

"কল্যাণীয়াসু—শনিবার তোমার বাবার সঙ্গে কলকাতা যাচ্ছি বেশীদিন থাকা হবে না, তাই সেই দিনই কার্শিভালে যাব। স্কুল থেকে তোমায় নিয়ে আসব। রবিবার আবার ফিরে যাবে। দেখার অপেক্ষায় রইলাম। আশীর্ব্বাদ জেনো—মা"

মেয়েরা একে একে সরে পড়ার চেষ্টায় ছিল। সলিলা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে বল্‌ল, "ও আমার মা নয় আমার সৎমা। বাড়ী নিয়ে গিয়ে খালি কষ্ট দেবে—সতীদি !"

সতীদি কিন্তু সেখানে দাঁড়ান নি। ললিতা ডাকতে গিয়েছিল, তাকে বলে দিলেন, "আমি একটা কথাও আর ওর বিশ্বাস করছি না। সৎমা না আরও কিছু—যেমন ওর মার নাম বিজনবাসিনী।"

সুরালাদি সেই ঘরে ছিলেন, তিনি বল্লেন, "কি বক্‌বক্ করছ সতী, কার মার নাম বিজনবাসিনী ?"

"কার আবার—ঐ সলিলার।"

"বেশ মজা তো। সলিলার মার আবার কবে বিজনবাসিনী নাম হ'ল—এই স্কুলেই তো সে আমাদের সময় পড়্তো—নাম তো তার দময়ন্তী। ওরা দুই বোন ছিল জয়ন্তী আর দময়ন্তী।"

"হাঁ, আপনাদের ঐ জয়ন্তী দেবীর বেড়ালের নাম বিজু বোর্ধ হয়।"

"তা হবে, জয়ন্তীর ঐ রকম বাতিক ছিল কুকুর বেড়ালের গাল ভরা নাম দেওয়া—স্কুলে থাকতে ওর কুকুরের নাম ছিল অসিতকুমার আর বেড়ালের কৃষ্ণকামিনী। সলিলার আবার সৎমা কোত্থেকে এল—এই তো দময়ন্তীর চিঠি পেয়েছি ও পুরোণো স্কুল দেখতে আস্ছে।

সুলেখাদি বল্লেন, "আশ্চর্য্য মেয়ে যা হোক। আর সতীর যেমন নরম মন—সলিলার মার শরীর খারাপ বলে ওকে ভোলাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। আমি তো ভাবছিলাম এবার বুঝি ও 'অর্দ্ধমৃতা' হল।

সতীদি ললিতার দিকে ফিরে বেশ কঠিন সুরেই বল্লেন, "ওর সৎমার প্রতিই আমাদের দরদ খুব বেশী। ওকে বোলো তাঁকে আমরা খুব সাদরেই আমাদের মধ্যে স্বাগত কর্ব। ও ওর বিজনবাসিনী মা এর তিনটে ছানা নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতে পারে।"—

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### সাম্রাজ্য ও দুর্ভাগ্য

সৈনিক তৈমুর আজ আমীর তৈমুর!

এতকাল তিনি অস্ত্র ধারণ করেছেন সবল হস্তে। এবার কতখানি যোগ্যতার সঙ্গে তিনি রাজদণ্ড ধারণ করেন, তা দেখবার জন্যে সকলেই কৌতূহলী হ'ল।

যারা ভেবেছিল রাজ্য চালনায় অনভ্যস্ত এটি নতুন রাজার অনভিজ্ঞতার সুযোগে ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার দুই হাতে লুণ্ঠন করবে, দুদিন পরেই ভেঙে গেল তাদের সুখস্বপ্ন!

তৈমুরের হাত দরাজ বটে, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেরে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব!



এবং যারা ভেবেছিল বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার খাতিরে তৈমুর এর-ওর-তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন, তাদেরও হতাশ হ'তে হ'ল।

তৈমুরের কাছে যে কোন সময়ে যে কোন বন্ধুর অবারিত-দ্বার ছিল বটে, কিন্তু রাজ্য-চালনার বল্গা রইল একমাত্র তাঁর নিজের হাতেই। কোন বিশেষ প্রিয়পাত্রকেও তিনি রাজদণ্ড স্পর্শ করতে দিলেন না।

এবং যারা ভেবেছিল রাজদণ্ড লাভ ক'রে তৈমুর তাঁর তরবারিকে আর কোষমুক্ত করবেন না, তাদেরও বড় আশায় পড়ল ছাই!

সিংহাসনের উপরে ব'সে তৈমুর দেখলেন, রাজ্যের উত্তরদিকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে জাট মোগলেরা এখনো যখন-তখন হানা দিতে ছাড়ছে না—গ্রামের পর গ্রাম সমর্পিত হচ্ছে সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির লেলিহান শিখায়—হাজার হাজার রক্তাক্ত তরবারির উত্থান-পতনে দিকে দিকে উঠছে গগণভেদী হাহাকার!

তৈমুর বুঝলেন, আত্মরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে আক্রমণ করা। জাট-মোগলেরা আক্রমণ করতে যেমন অভ্যস্ত, আত্মরক্ষা করতে তেমন নয়।

তৈমুর জাট-মোগলদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা জাট-মোগলদের দেশে গিয়ে চতুর্দ্দিকে করলে বিষম অশান্তির সৃষ্টি। তারা গ্রামের পর গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিলে, সর্ব্বত্রই চলতে লাগল লুণ্ঠন, হত্যা ও অত্যাচারের অবিরাম লীলা, জাট সৈনিকরা বাধা দিতে এসে বারবার হ'ল পরাজিত। জাট মোগলরা পরের উপরে যে ঔষধ প্রয়োগ করত, এবারে নিজেরা সেই ঔষধ খেতেই বাধ্য হ'ল। তখন দায়ে প'ড়ে তারা হার মানলে এবং তৈমুরকে স্বীকার করলে।

তারপর তৈমুরের দৃষ্টি ফিরল প্রতিবেশী রাজা-রাজ্ড়াদের দিকে। খিভা, উর্গঞ্জ ও আরাল সমুদ্রের অধিপতির নাম ছিল খারেজ্মের সুফী।

সুফীর সুন্দরী মেয়ের নাম খান্ জেদ্। দূত-মুখে তৈমুর জানালেন, নিজের ছেলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তিনি রাজকন্যা খান্ জেদের বিয়ে দিতে চান।

এ প্রস্তাবে সুফীর বংশ মর্য্যাদায় আঘাত লাগল। ভরঘুরে তৈমুর ভুঁইফোঁড় রাজা হয়েছেন বটে, কিন্তু আজও তিনি আভিজাত্যের গর্ব্ব করতে পারেন না। অতএব সুফী ব'লে পাঠালেন, "তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে অসম্ভব।"

অসম্ভব? আজ তৈমুরের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর শত যুদ্ধজয়ী তরবারি সব অসম্ভবকেই সম্ভবপর করতে পারে।

সিংহাসন থেকে নেমে তৈমুর আবার পরলেন বর্ম্ম এবং হাতে নিলেন চর্ম্ম, তরবারি ও ধনুর্ব্বাণ। সামন্ত-রাজারা সদলবলে ছুটে এসে দাঁড়ালেন তাঁর পতাকার তলায়। তৈমুর করলেন যুদ্ধযাত্রা।

প্রথমেই হ'ল খিভার পতন। তারপর তৈমুর উর্গঞ্জ অবরোধ করলেন।

সুফী ব'লে পাঠালেন, "তৈমুর, ঝগড়া কেবল তোমাতে-আমাতে। আমাদের ব্যক্তিগত ঝগড়ার জন্যে হাজার হাজার লোক প্রাণ দেবে কেন? তার জন্যে এস আমরা দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি।"

তৈমুর বললেন, "উত্তম! আমি রাজি। তোমার নগরের প্রধান সিংহদ্বারের সামনেই আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে।"

সিংহাসনে। তুমি দেবে হুকুম, আমরা করব হুকুম পালন। আমরা থাকতে তুমি তরবারি ধরবে কেন?"

তৈমুর বললেন, "তা হয় না। সুফীর কোন সেনাপতি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলে আমি তোমাদেরই কারুকে পাঠাতে পারতুম। কিন্তু আমাকে আহ্বান করেছেন একজন রাজা, সুতরাং আমাকে নিজেই যেতে হবে।"

তৈমুর ঘোড়া ছোটালেন। সৈফুদ্দীন নামে এক প্রাচীন সেনানী দৌড়ে গিয়ে তাঁর ঘোড়ার রাশ চেপে ধ'রে বললেন, "না প্রভু, একজন সাধারণ সৈনিকের মতন এমন ক'রে আপনি যুদ্ধে যেতে পারবেন না!"

তাঁর এই অতি-ভক্ত অনুচরটিকে মুখে কোন জবাব না দিয়ে তৈমুর নিজের তরবারির উল্টো পিঠের দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে গেলেন।

সৈফুদ্দীন আঘাত এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার রাশ ছেড়ে স'রে এলেন।

শত্রু-নগরের প্রাচীরের উপরিভাগ তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে,—আমীর তৈমুর স্বয়ং একাকী এসেছেন প্রধান সিংহদ্বারের সামনে! সকলেই অবাক ও হতভম্ব!

তৈমুর হাঁক দিলেন, "ওহে, তোমাদের কর্ত্তা য়ুসুফ সুফীকে খবর দাও। বল, আমীর তৈমুর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন!"

অদ্ভুত সাহস ও বীরত্ব! শত শত বল্লম ও ধনুক উদ্যত হয়ে আছে তাঁর মাথার উপরে, কিন্তু তৈমুরের ভ্রূক্ষেপও নেই! আমীর তৈমুর আজও যুবকের মতনই ডানপিটে!

তৈমুর তাঁর ঘোড়া "বাদামি ছোক্‌রা"র পিঠে চ'ড়ে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক করলেন, কিন্তু সুফীর দাড়ীর প্রান্তটুকুও দেখা গেল না!

তৈমুর ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "যে নিজের বাক্যরক্ষা করতে পারে না, সে নিজের প্রাণও রক্ষা করতে পারবে না!" তারপর তিনি ফিরে গেলেন নিজের দলে। আমীরকে অক্ষত দেহে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে সৈন্যরা সমস্বরে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল—আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বাজতে লাগল কাড়া-নাকাড়া এবং তূরী-ভেরী!

কিন্তু আর বেশীদিন তৈমুরকে নগর অবরোধ ক'রে থাকতে হ'ল না। তাঁর কথা ফ'লে গেল দৈব বাণীর মত। য়ুসুফ সুফী হঠাৎ রোগশয্যায় শুয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। নগরবাসীরাও করলে আত্মসমর্পণ। সুফীর মস্ত রাজ্য হ'ল তৈমুরের হস্তগত। এবং রাজকন্যা খান্ জেদের পাণিপীড়ন করলে তৈমুর-পুত্র জাহাঙ্গীর।

সে-সময়ে ও-অঞ্চলে ভারত-সীমান্তের হিরাট-সহরের নাম-ডাক ছিল অসাধারণ। মস্ত-বড় সহর, তার মধ্যে বাস করে আড়াই লক্ষ মানুষ। তখনকার দিনে এত-বেশী জনসংখ্যার জন্যে গর্ব্ব করতে পারে পৃথিবীতে এমন সহর দুই-তিনটির বেশী ছিল না—লণ্ডন ও প্যারিসেরই লোকসংখ্যা ছিল ষাট হাজারের মধ্যে। হিরাটের মধ্যে বিদ্যালয় ছিল কয়েক শত, স্নানাগার ছিল তিন হাজার এবং দোকান ছিল প্রায় দশ হাজার।

হিরাটের অধিপতির উপাধি "মালিক"। তৈমুর দূত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, মালিক তাঁর সামন্ত রাজা হ'তে রাজি আছেন কিনা?

না, মালিক রাজি নন। উল্টে তৈমুরের দূতকে তিনি করলেন বন্দী।

নগ্ন অসি হস্তে তৈমুর আবার সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন। হিরাটের পতন হ'তে দেরি লাগল না।



এই হিরাটের যুদ্ধে তৈমুরের দেহের দুই জায়গায় বিদ্ধ হয়েছিল দুইটি তীর। অধিকাংশ সেনাপতির মতন তৈমুর কখনো নিজে নিরাপদ যায়গায় দাঁড়িয়ে সৈন্য চালনা করতেন না। যুদ্ধ যেখানে ভয়াবহ, তৈমুরকে দেখা যেত সেইখানেই।

হিরাট জয়ের পরে তৈমুরের রাজ্য হ'ল চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 'সবুজ সহর' সুন্দর নগর বটে, কিন্তু এত-বড় রাজ্যের রাজধানী হবার উপযোগী নয়। তৈমুর তখন সমরখন্দকে নিজের রাজধানী ব'লে ঘোষণা করলেন।

অতি প্রাচীন নগর এই সময়খন্দ। তৈমুরের আগে আরো দুইজন বিশ্ব বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন—আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ও জেঙ্গীজ্ খাঁ।

সমরখন্দের খ্যাতি অসামান্য হ'লেও তার নানা দিক তখন পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে। তৈমুর নিজের হাতে সমরখন্দকে আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত হলেন।

নতুন নতুন পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত রাজপথ, মনোরম তরু-বীথি, রঙিন উদ্যান ও অপূর্ব্ব সব প্রাসাদের সৌন্দর্য্যে দেখতে দেখতে সমরখন্দ হয়ে উঠল বিচিত্র এবং মোহনীয়।

এমন কি নগরের রং পর্য্যন্ত গেল বদ্‌লে। তাতারীদের প্রিয় হচ্ছে নীল রং—যা থাকে অসীম আকাশে, অনন্ত সাগরে ও মেঘচুম্বী গিরিশিখরে। তৈমুর নতুন সমরখন্দেরও গায়ে মাখিয়ে দিলেন সেই রং। তার নতুন নাম হ'ল "নীল নগর।"

তৈমুরের প্রথম পুত্র জাহাঙ্গীরের একটি ছেলে হ'ল।

তৈমুর নিজেও দ্বিতীয় বিবাহ করলেন শ্যালক হুসেনের পরমা সুন্দরী বিধবাকে! তার নাম সেরাই খানুম। এটা ছিল প্রাচীন মোগলদের চিরাচরিত নিয়ম। পরাজিত ও নিহত রাজাদের সহধর্ম্মিনীদের বিবাহ করতেন বিজয়ী রাজারা।

বংশ গৌরবে সেরাই খানুমের তুলনা ছিল না। তাঁর ধমনীতে ছিল জেঙ্গীজ খাঁয়ের রক্ত। তিনি তৈমুরের উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী—অশ্বপৃষ্ঠে প্রায়ই যেতেন গভীর অরণ্যে শিকার করতে।

কিন্তু তৈমুরের অশান্ত মন সিংহাসনের নরম গদীর উপরে কোনদিনই তুষ্ট থাকতে পারত না। রাজধানীর মধ্যে তাঁর দেখা পাওয়া যেত খুবই কম। তাঁর খবর আসত দূর দেশ থেকে। তিনি প্রকাণ্ড সেনাদল নিয়ে ফিরতেন আজ এদেশে, কাল সে-দেশে। কখনো পূর্ব্বে, কখনো পশ্চিমে। কখনো খোরাসানের পথে, কখনো কাস্পিয়ানের তটে।

অবশেষে তিনি একদিন ছুটিলেন উত্তর দিকে—গোবি মরুভূমির দিকে। সেখানে শেষ মোগল আমারুদ্দীন তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। মোগলদের সব আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল এবং তৈমুরের রাজ্য পরিণত হ'ল সাম্রাজ্যে।

বিজেতা তৈমুর যশোগৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে দেশে ফিরে এলেন। সমরখন্দের নিকটবর্ত্তী এক পথের কাছে এসে দেখলেন, তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এক বিপুল জনতা।

জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে তৈমুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন সব-চেয়ে প্রাচীন ওমরাও সৈফুদ্দীন। তাঁর মাথা হেঁট, মুখ নীরব।

তৈমুর বললেন, "দুঃসংবাদ আছে? বলতে ভয় হচ্ছে?"

সৈফুদ্দীন বললেন, "যুবরাজ জাহাঙ্গীর আর ইহলোকে নেই।"

জাহাঙ্গীরকে তৈমুর প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর প্রৌঢ় মুখের একটি মাংসপেশীও কম্পিত হ'ল না। কেবল বললেন, "সৈফুদ্দীন, তোমার ঘোড়ায় চড়ো। সৈন্যগণ, রাজধানীর দিকে যাত্রা কর।"

* * * *

তৈমুর এতদিনে অসংখ্য যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর থেকে তিনি যে-সব যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন, সেই-সব যুদ্ধই আজ পৃথিবীতে তাঁকে অমর ক'রে রেখেছে। আসছে পরিচ্ছেদে আরম্ভ হবে তাঁর রুসিয়া-অভিযানের কাহিনী।

ক্রমশঃ

## কবিতা

### "প্রকৃতির পাঠশালা"

শ্রীশশাঙ্কজীবন চক্রবর্ত্তী

ধরণীর পাঠশালে মোরা শিশু ছাত্র,
কত কী যে শিখ্‌বার দেখি অহোরাত্র,
সুমুখে পিছনে দূরে
শুনি শুধু নানা সুরে
কে যেন ডাকিছে, তোরা আয় ছুটে আয়রে,
শিখ্‌বার শুভ'খণ, যায় চলে যায় রে ॥

কুসুম ঝরিয়া পড়ে বিলাইয়া গন্ধ,
অকাতরে লীণ হতে পায় সে আনন্দ,
ছল্ ছল্ নদী জল,
বলে শুধু—চল্, চল্,
জীবনের মাঝে আন্ জাগরণ ছন্দ,
চেতনায় ভরে তোল হৃদয়ের রন্ধ্র।

তৃণের কাছেতে পাই বিনয়ের শিক্ষা,
পাহাড় অটল হতে দেয় সবে দীক্ষা,
উদার অসীম নভ,
প্রসারতা অভিনব
ছড়াইয়া দেয় মর মানবের চিত্তে,
তনুমন ভরে তোলে বিকাশের বিত্তে।

আপনার তেজে জ্বলে দিবসের সূর্য্য,
নিশীথে শিখায় চাঁদ স্নিগ্ধ মাধুর্য্য,
বর্ষার ঝর্ ঝর্,
বলে,—ওরে ঝরে পড়্,
নিজেরে বিলায়ে কর্ মানবের তুষ্টি,
ত্যাগের মাঝারে আন্ বিশ্বের পুষ্টি ॥

গুণ, গুণ, গুণ্ গুণ্ গেয়ে কয় ভোম্‌রা,
কোন্ গুণ! কোন্ গুণে, গুণী বল তোম্‌রা?
ওরে ও মানুষ ভাই,
সময় যে আর নাই,
ভরে নাও তব জীবনের মধু পাত্র,
সময় অবাধগতি—ছোটে দিবারাত্র ॥

দেবতার বেদীমূলে যে তুলসী ঝরলো,
হোমের অনলে যেই ঘৃতাহুতি পড়্‌লো,
তারা ডেকে কয় মোরে
বুঝিসনা বোকা—ওরে!
মৃত্যুর মাঝে মোরা মৃত্যুঞ্জয় যে,
সৎকাজে প্রাণ দিলে নাই তার ক্ষয় যে ॥

বিশ্বের পাঠশালা—ছোট সে ত নয়গো,
নানা কথা নানা জনে ডাক দিয়ে কয়গো,
চিরদিন কত সুরে
মানুষের মন জুড়ে,
অবিরাম চলে এই প্রকৃতির দীক্ষা!
কেবা তার কতটুকু নিতে পারে শিক্ষা ॥

—:*:—

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুদ্ধের অবসরে রাম বিভীষণকে শুধান—

"প্রচণ্ড ধনুক বাণ খরতর জেঠা
গজাসনে অজা হেন রণে এলো কেটা!"

বিভীষণ বলছেন—

"বীরবাহু নাম ধরে রাবণের বেটা।
চিত্রাঙ্গদা মাতা ওর দশানন বাপ
অজবদন বীরবাহু দুর্জ্জয় প্রতাপ
যে গজে এসেছে ওটা করি আরোহণ
ঐ গজের জীবনাবধি উহার জীবন।"

লক্ষ্মণ বল্লেন—

"দাদা, এবারে গজ চেলেছে রাবণ
কর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।
রণে বানরগণ দেখিছে বিপাক
হনুমান জাম্বুবান খাচ্ছে ঘুরপাক।"

রাম বল্লেন—

"রও, চিন্তা করা যাক
হনুমান জাম্বুবানকে দাও ডাক।"

ডাকতে আর হল না, জাম্বুবান হনুমান গন্ধর্ববান খেয়ে ঘুরুণী লেগে রামের পায়ের কাছে পড়ে বলছেন—

"দুষ্ট বীরবাহু ঘটালো অনিষ্ট
আমরা মরি ক্ষতি নাই, ভাবো নিজ ইষ্ট।"

তখন রাম বিভীষণের দিকে কাতরভাবে চেয়ে বলছেন—

"করিয়া ছিলাম মৈত্র ভরসা তোমার
তোমার দেশে এসে হলাম সকলে সংহার।"

এই বলে রাম কপালে করাঘাত করে বলছেন লক্ষ্মণকে—

"যাউক জানকী মম, যুদ্ধ যাক বয়ে
পুণ্যবলে ফিরে যাই সেতুবন্ধ হয়ে
বিভীষণ করুণ গমন রাবণ সভায়।"

বিভীষণের আর কথা নেই, মুখ শুকিয়ে আমসী। আমতা আমতা করেন আর বিড়বিড় বকেন—

"এ ভব সংসার দেখি অকুল পাথার
হবেনা কার্য্য সিদ্ধি করে মিষ্ট ব্যবহার।"

এই ভেবে তখন বিভীষণ মুখে ভয়ানক রাগ প্রকাশ করে বলছেন—

"এ কেমন কথা কও—
যুদ্ধে নেমে পলাতে চাও!
লঙ্কার রাজা করে ভাওাবে আমারে,
সীতারে ফেলে যাবে এসে লঙ্কাপারে!
বধ করে রাবণ মোরে দাও সিংহাসন,
তবে যেতে দেবো সেতুবন্ধ পারে!
জাননা আমি রাবণের ভাই বিভীষণ
ভুয়ো লঙ্কাপুরী দিয়ে ভাওাবে আমারে,
কলা পেলে ভোলে বানরা
তেমনি বুঝি ভেবেছো এই রাক্ষসটারে?"

বলে বিভীষণ চোখ পাকাতেই রাম বলে উঠেছেন—"মার, মার, মার দুরাচারে।" বানরগণও সব লাফিয়ে উঠেছে।

ক্রোধেতে হইল রাম জলন্ত আগুনী
বিভীষণ বলেন, "এখন যুদ্ধে যাও তুমি।
তোমাতে রাগাতে দেখালাম রোষ।
ক্ষম অপরাধ রাম, না লইও দোষ।
যুদ্ধ এড়াইতে চাও ক্ষত্রিয় সন্তান,
এতে যে চিরকাল রবে বদনাম।"

বিভীষণের ভাব বুঝে জাম্বুবান বল্লেন, "ধন্য বিভীষণ।"

"মিত্র নাই তোমার সমান।" বলে হনুমানও গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালেন।

এই লেগে গেল দুই দলে সমর ভীষণ
ক্রোধেতে হইল রাম কালান্তক যম—
বীরবাহু আর থাকেন কতক্ষণ!
বীরবাহু ধনুকে বান জুড়তে জুড়তে
এক বান ছাড়লেন রাম গজটার তুণ্ডে

এক বানে ভাঙা দাঁত ছিরকুটে শুঁড় কাটা গজ চারপাইয়ের মতো উল্টে পড়েছে—বীরবাহু ছাতিশুদ্ধ হাতী চাপা! বান হাতীর তুণ্ডু ফাঁসিয়ে বীরবাহুর মুণ্ডু ফাটিয়ে সাগর জলে নেয়ে রামের তূণে এসে ঢুকলো।

—"কি বান, বাপ্!" বলে জাম্বুবান অবাক। সুগ্রীব বল্লেন—"সখে রাম, এ বানটির নাম কি বোষ্টম বান?" হনুমান বল্লেন—



"কত বানই জানো রাম, তোমায় বলিহারি
এমন সব বান থাকতে কান্‌ছে তোমার নারী!"

রাম বল্লেন—"হনু ব্যস্ত হোয়োনা। বান কারে বলে দেখবে ক্রমশঃ।" এই কথা হচ্ছে, এমন সময় এক বোষ্টম দেখা দিলেন রণক্ষেত্রে—চক্ষে চর্ম্মঠুলি, কান্ধে গামছা, কক্ষে ঝুলি।

—"অন্ধ বাবা জন্মান্ধ বোষ্টম,
রামচন্দ্র কোথা বাবা, দাও একবার দর্শন
জীবনটা সার্থক করি
কি জানি কবে মরি।" বলেই গান—
করহ উপায় চিন্তা, মরিতে হবে নিশ্চয়,
অতএব রাম শরণ নিলাম দূর কর ভব ভয়
দৃশ্য হয়ে ভস্ম কর পাপচয়!

—"অন্ধ বাবা জন্মান্ধ, রামচন্দ্র কোথা বাবা?"

হনুমান বল্লেন—"জাম্বুবান, রামচন্দ্রকে দেখিয়ে আনো ভাই।"

জাম্বুবান বল্লেন—"ওহে তুমি জন্মান্ধ, রামচন্দ্রকে দেখবে কেমন করে?"

—"আরে ভাই, এ বোঝোনা,—
রামের গায়ের বাতাস পেলে
মরাও চায় চক্ষু মেলে।
জন্মান্ধ তো তুচ্ছ রোগ
দেখবে তখন, আগে তো দেখা হোক।"

তখন, এ বাগে হনুমান, সে বাগে জাম্বুবান, মাঝে বোষ্টম, ধীরে ধীরে আগান—মুখে রাম নাম।

শ্রীরাম চরণ সরোজ রজ ভূখা শুখা রুখা রহু
রাম রাম কহ, দরশন দীজে পহু।

রাম নাম শুনে হনুমানের দুই চক্ষে ধারা বইছে, জাম্বুবানের দাড়ি ভিজে সপ্ সপ্। ওদিকে দূর থেকে বিভীষণ, হনুমান আর জাম্বুবানকে ইসারা করছেন—ধর চেপে হাত, বাঁধো পিছমোড়া করে। হনুমান রাম-নামে মশ্‌গুল্, জাম্বুবান বিগলিত-প্রায়—কে কার ইসারা দেখে। তখন বিভীষণ মনে ভাবছেন—'প্রমাদ হইল বড়।' এক দৌড়ে পিছন থেকে এক হাতে হনুমানের, এক হাতে জাম্বুবানের ল্যাজ টেনে উল্টে ফেলে কোমর বন্ধ দিয়ে বোষ্টমের দুই হাত পিছ-মোড়া করে বেঁধে ফেলেছেন।

বোষ্টম বলে উঠেছেন অমনি—"বাঁধলে কেন বাপ্ হনুমান?"

হনুমান বলছেন—"আমি তো বাঁধিনি।"

"তবে?" বলে বোষ্টম চক্ষের ঠুলি খুলতে যায়, পারে না। দুই হাত বাঁধা।

বিভীষণ ঠুলির উপরে আরো সাত পুরু তুলির কাপড় জড়িয়ে বল্লেন—"চল এখন রাম দর্শন করাই।"

বোষ্টম বলছে—"ওঃ তাই বল, ছোট কর্ত্তা তুমি রাবণের ভাই। চল তোমারি সাথে যাই।"

বিভীষণ বল্লেন—"এইখানে দাঁড়াও রামকে আনছি।"

বোষ্টম বলছে—"মৎলব বুছেছি ছোট কর্ত্তা।"

জাম্বুবান বলছেন—"কি মৎলব ?"

বিভীষণ বল্লেন—"ক্রমশঃ প্রকাশ্য।"

—"ক্রমশঃ প্রকাশ্য ?" বলে হেঁয়া রবে বোষ্টম হাস্য করে উঠতেই হনুমান বলে উঠেছেন—"তু বেটা কেরে ?"

বিভীষণ বলছেন—"শোন বলি, ইনি কে—

ইনি হচ্ছেন অশ্ববদন ভস্মলোচন রাক্ষস ভয়ঙ্কর,
করেছিল কঠোর তপ হাজার বচ্ছর,
দৃষ্টি মাত্রে ভস্ম চরাচর, ব্রহ্মার পেলো বর,
হেন রাক্ষস রামে পোড়াতে হয়েছে অগ্রসর।"

—"সরবনাশ!" বলে জাম্বুবান হল এক পাশ।

—"ঠকালি বেটা!" বলে হনুমান চাপড় কসান ঠাস।

চড় খেয়ে ভস্মাক্ষের দাঁত নড় বড়।
বলে, "ছোট কর্ত্তা, এ কি গড় বড়!"

বিভীষণ তখন বল্লেন—"চল আমার বাসায়, খাবা অন্নজল।"

—"না ছোট কর্ত্তা, অন্নজলে কাজ নাই। চোখ খুলে দাও, চাঁদ দেখে ঘরে যাই।"

বিভীষণ নিশাচরদের ইসারা করলেন, তারা চাঁদের মত বড় তিনখানা চাঁদির রেকাবি মেজে ঘসে আসির মত করে ভস্মাক্ষের তিন দিকে ধরলো। তখন বিভীষণ বল্লেন—"তবে চোখের ঠুলি খুলি ?"

—"হাঁ ছোট কর্ত্তা, খোলো।"

বিভীষণ ধীরে তার চোখের সাত পুরু কাপড়, হাতের বাঁধন কড়াকড় খুলে দিয়ে বল্লেন—"ঠুলি খুলে দেখ, সামনেই আছেন রাম!" যেমন তাড়াতাড়ি ঠুলি খুলে সামনে চাওয়া, অমনি—

রূপার দর্পণে দেখি আপনার আস্য,
আপন মুখ দেখে আপনিই ভস্ম!
ভস্ম হয়ে পড়ে বেটা মাটির উপরে,
হাস্য করেন বিভীষণ, হনুমান কাঁপেন ডরে।
ভস্মাক্ষ পড়িল যদি, জাম্বুবানের রঙ্গ,
রণ স্থলে নৃত্য করে হেলাইয়া অঙ্গ।
হাসি চাহে হনুমান বিভীষণ পানে,
বলে, এর মত আর কটা আছে লঙ্কাধামে ?
বিভীষণ বলে—একে ভস্ম আর ছাই
এমন আর দুটি নাই চল জানাইব রামে!

এই বলে চাঁই বুড়ো সেদিন কথা বন্ধ করে রথের ঘটা দেখতে গেলেন।

---

# অরুণান্ত

শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়

৺অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ইংরাজী ১৯২৮ সালে ৩রা জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পিতা শ্রীযুক্ত অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় সৈয়দপুর (রংপুর) ও বরিশাল জেলার শোলক গ্রাম নিবাসী বিশিষ্ট কুলীন বংশসম্ভূত এবং বর্ত্তমানে বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। অরুণের মাতামহ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকায় প্রসিদ্ধ আইন-জীবী। এই মাতামহ-গৃহেই অরুণকুমার ভূমিষ্ঠ হয়। অরুণ-কুমার তাহার পিতার প্রথম সন্তান সকলেরই আদরের ধন। তাই আদর করিয়া সকলেই তাহাকে "মাণিক" বলিয়া ডাকিত। বাস্তবিক সে মাণিকই ছিল এবং পরিবারবর্গ তাহাকে মাণিকসদৃশ আদর-যত্নেই লালন পালন করিতেছিলেন।

৺অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

শৈশবকাল হইতেই অরুণ-কুমার তাহার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছে। শিশু অরুণকুমার শান্ত অচঞ্চল ও সদাহাস্যমুখ ছিল। সাধারণ শিশুর মত ক্রন্দনকোলাহলে সে কখনও পরিজনবর্গের বিরক্তির সৃষ্টি করিত না। বাল্যেও সে কদাপি সমবয়স্কগণের সহিত ঝগড়া মারামারি করে নাই। অরুণকুমার সৌম্য, প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, মেধাবী, অনুসন্ধিৎসু ও সদাকর্ম্মব্যস্ত ছিল। বাল্যাবধিই পাঠে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। পাঠ ও বালকসুলভ খেলাধুলার মধ্যেও সে তাহার মাতার ছোটখাটো গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত এবং করিত। শৈশব হইতেই নিজহস্তে রেলওয়ে এঞ্জিন, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী, বাড়ী ঘর ইত্যাদি নির্ম্মাণ-কার্য্য বিশেষ দক্ষতার ও অসাধারণ নৈপুণ্যের নিদর্শন দেখাইয়াছে।

অরুণের স্বাস্থ্য বাল্যাবধিই ভাল ছিল। কৈশোরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিশেষ স্বাস্থ্যোন্নতি হয় এবং বিদ্যানুরাগ, জীবে দয়া, পরদুঃখকাতরা, গুরুজনে ভক্তি ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় দেয়। অষ্টম বৎসর বয়সে বালক অরুণকুমার বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। সেখানেও সে প্রথম হইতেই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। অরুণ প্রত্যেক শ্রেণীতে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বদা প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহার প্রশ্নোত্তর পাঠে শিক্ষকগণ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন এবং বালকের চিন্তাশক্তি, ভাব ও ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। চতুর্থ শ্রেণী হইতেই ছাত্র অরুণকুমারের প্রবন্ধ সাদরে বিশিষ্ট মাসিকপত্রে স্থানলাভ করিয়াছে। মৃত্যুকালে সে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউসনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তাহার লেখার মধ্যে চিন্তাশক্তি মধুর ভাব ও ভাষার পরিচয় পাওয়া যাইত এবং শুধু প্রবন্ধে নহে, কাব্যেও তাহার বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাহার জ্ঞানপিপাসা ও অনুসন্ধিৎসা শুধু সাহিত্যচর্চ্চায় নিবদ্ধ ছিল না, গণিত, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, শিল্পকর্ম্মেও তাহার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ লাভ করিয়াছিল। শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধেও অরুণ সচেতন ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট, মুগুরভাজা, লাঠি ছোরাখেলা, সাঁতার, দৌড় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় তাহার করায়ত্ত ছিল। ১৯৩৯ সালে অরুণকুমার তৃতীয় কলিকাতার "বয় স্কাউট" সঙ্ঘে যোগদান করে এবং অসীম অধ্যবসায় গুণে গত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১৪ বৎসর বয়সে "কিং স্কাউট" ব্যাজ্ লাভ করে।

অরুণকুমার নিরহঙ্কার, আত্মভোলা ও বসনভূষণ বাহুল্য বর্জ্জিত ছিল। সরল জীবন-যাপন এবং উচ্চ আদর্শ ছিল তাহার জীবনের বীজমন্ত্র। অরুণকুমারের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া অতি অল্প বালকই জন্মলাভ করে এবং কদাপি দীর্ঘদিন মরলোকে অবস্থান করে। ভগবান যেন ইহাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের তরে মরজগতে প্রেরণ করেন। এবং ক্ষণিকের পরেই নিজক্রোড়ে টানিয়া লন। অরুণের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। ১৪ বৎসর ৩ মাস মরজগতে অবস্থান করিয়াই অরুণকুমার পার্থিব মাতাপিতা, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরমপিতার কোলে ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘ ২৫ দিন যাবৎ ভীষণ টাইফয়েড্ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ১৫ই অক্টোবর রাত্রি ১২-৩৬ মিনিটে অরুণকুমার ইহজগৎ ত্যাগ করিল। অরুণের মৃত্যুতে তাহার পিতা মাতা ও আত্মীয়স্বজন যে তাহাদের 'মাণিক' হারাইয়াছেন তাহা নহে, বঙ্গ জননীও তাঁহার একটী বিশিষ্ট রত্ন হারাইল। অরুণকুমার প্রাপ্তবয়সে যে সমাজ ও জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। অরুণকুমারের অভাব তাহার পিতামাতা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও জাতি সকলেই সমভাবে অনুভব করিতেছে ও করিবে। অরুণকুমারের আত্মা পরমপিতার চরণে চিরশান্তি লাভ করুক আজ তাহাই সকলের প্রার্থনা। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি॥

# চলতি কথা

কালীপূজার দিন কলিকাতায় পরেশনাথ মন্দিরের নিকট হালসীবাগান রোডে যে মর্ম্মন্তুদ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হল, তা বোধ হয় সকলেই কাগজে পড়ে থাকবে। কলিকাতা সহরের ইতিহাসে এমন করুণ ঘটনা বোধ হয় আগে কখনও ঘটেনি। এই কাণ্ডটী হয়েছে, 'আনন্দাশ্রম'এর কালীপূজা প্রাঙ্গনে। বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর বড়রাও অনেকে হোগলার চাল ছাওয়া মণ্ডপে বসে ব্যায়ামবীর বিষ্ণু ঘোষ ও তাঁর দলের ব্যায়াম দেখছিল। এমন সময় নাকি গ্রীনরুমে হঠাৎ আগুন লাগে ও কেমন ভাবে তা খুব তাড়াতাড়ি হোগলার চালের ওপর ছড়িয়ে পড়ে! আগুন দেখামাত্র পুরুষেরা মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু মেয়েদের ও ছোট ছেলেমেয়েদের বেরুবার রাস্তায় বহু বাধা থাকায় তারা তাড়াতাড়ি বেরুতে পারে নি। ইতিমধ্যে যে বাড়ীর সঙ্গে হোগলার চালটি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, সেই বাড়ী থেকে ঐ দড়িগুলি কেটে দেওয়া হয় ও জ্বলন্ত হোগলার চাল নীচে যে সব ছেলেমেয়েরা তখনও বেরুতে পারে নি, তাদের ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। ফলে, এই প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ১১৯ জন জীবন্ত দগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। পরে আরো কয়েকজন হাসপাতালে মারা যায়। আজ পর্য্যন্ত মৃতের মোট সংখ্যা ১৪৫। আগুন লাগল কি করে জানা যায় নি। তদন্ত চলছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হয় নি। অগ্নিময় হোগলা চাপা পড়া এত গুলি ছোট ছেলেমেয়েদের রক্ষা করা কেমন করে অসম্ভব হল তা আমরা জানি না। আশা করা যায়, সমস্ত ব্যাপারটা তদন্তের ফলে পরিষ্কার হবে। যারা এতে নিহত হয়েছে, তাদের আত্মীয় স্বজনকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

এবার দুর্গাসপ্তমীর দিন সারা বাঙলার বুকে যে নিদারুণ ঘূর্নিঝড় বয়ে গেল, তা নিদারুণ ক্ষতি করেছে, মেদিনীপুর, তমলুক, কাঁথি এই অঞ্চলগুলিতে। এই সব দেশে সমুদ্রের জল প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ঘূর্নিহাওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোকের বাসস্থান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। কত যে লোক মারা পড়েছে তার আর লেখাজোকা নেই। প্রকাশ, দশ হাজারেরও বেশী লোকে প্রাণ হারিয়েছে। গরু বাছুর প্রায় সবই গিয়েছে। যারা কোন রকমে বেঁচে গিয়েছে, তারা তাদের সর্ব্বস্ব হারিয়ে, এক মুঠো অন্ন, একটা ছেঁড়া কাপড়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। এদের সাহায্য করবার জন্যে রামকৃষ্ণ মিশন, মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি, হিন্দু মহাসভা, সংবাদ পত্র-সম্মেলন ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠান প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। যারা মারা

গিয়েছে তাদের আর ফেরান যাবে না কিন্তু সকলেরই কর্ত্তব্য যে নিরন্ন বুভুক্ষু মৃতপ্রায় লোকেরা এখনও ধুঁকছে তাদের মুখে অন্ন, গায়ে বস্ত্র দেবার জন্যে যথোচিত সাহায্য করা। আশা করি, এ বিষয়ে সবাই মনোযোগ দেবে।

তোমাদের কাছে একটা খুব দুঃখের খবর দেবার আছে। গত মহাষষ্টির দিন রাত প্রায় ১টার সময়ে রংমশালের গ্রাহক ও আমাদের কিশোর বন্ধু শ্রীমান্ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় টাইফয়েড রোগে মারা গেছে। সে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশনের দ্বিতীয় শ্রেণীর (ক্লাস নাইন) ছাত্র ছিল। তার মত বিনয়ী, বিদ্বান্ ও খেলোয়াড় ছাত্র খুব কমই দেখা যায়। স্কুলের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সে ছিল শ্রেষ্ঠ ছাত্র। মৃত্যুর কিছু আগে সে রংমশালে একটি লেখা পাঠিয়েছিল, সেটি রংমশালে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। তার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশ করা হল। তার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

যুদ্ধের হিড়িকে কাগজের যা দাম হয়েছে, তা 'অগ্নিমূল্য' যাকে বলে, তাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। এবার অগ্নিমূল্য দিয়েও কাগজ মিলছে না। এক টুকরা কাগজও বাজে খরচ করবার উপায় নেই। আধুনিক জীবন যাত্রার জন্যে কাগজ একটি অপরিহার্য্য বস্তু। সুতরাং এই রকম একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের এ রকম দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি, তা বলাই বাহুল্য। নিকট ভবিষ্যতে পাঠ্য পুস্তক ও মাসিক পত্রিকাগুলো কাগজের অভাবে ছাপান স্থগিত রাখতে বাধ্য হতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ যে কত বড় ক্ষতি, তা বলা বাহুল্য।

আর একটি জিনিষের অভাব সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছে, তা' হল তামার পয়সা। সুসময়ে এই তুচ্ছ জিনিষের প্রতি যে রকম অবজ্ঞা করে এসেছি (অবশ্য কেবল গরীবরা ছাড়া), এখন তাকে ডবল সম্মান দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। এখন পয়সার জন্যে সকলেই হাহুতাশ করে। ট্রামে, বাসে, হোটেলে দোকানে যেখানে যাও, ওই এক কথা, "ভাঙানী দেবার পয়সা নেই।" এখন ধনী দরিদ্র সকলেই পয়সার অভাব বুঝতে পারছে।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ ও এম্-এস্-সি পরীক্ষায় অনেকগুলি বিষয়ে মেয়েরা যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন তা লক্ষ্য করবার বিষয়। ইংরাজিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শ্রীমতী চিত্রা মজুমদার, সাইকলজিতে প্রথম হয়েছেন শ্রীমতী উমা বসু, সংস্কৃততে চতুর্থ ও পঞ্চম হয়েছেন শ্রীমতী অনিমা চক্রবর্ত্তী ও উমারাণী রায়, প্রাচীন ইতিহাসে সোমকুমারী জোসি এবং বটানিতে শান্তি খোসলা ফাষ্ট ক্লাস পেয়েছেন। এই কয়েকজন কৃতি মহিলাকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমার ভাই বোনেরা!

তোমরা আমায় লেখো চিঠি—কত সুন্দর সুন্দর চিঠি। চিঠি পড়ি আর এই ভেবে গর্ব্বিত হয়ে উঠি যার এত সুন্দর ভাই বোন, যে দেশের ছেলেমেয়েরা দেহ মনে এত সুন্দর, সে দেশের দুঃখ কি? আমার সোনার ভাই বোনেরা ভাবতে শিখেছে, কথা বলতে শিখেছে, দেশও জাতিকে ভালবাসতে শিখেছে। তাহলে আর ভয় কি? আমরা হয়ে গেছি পঙ্গু, অথর্ব, প্রতিবাদের ভাষা নেই আমাদের। আমাদের যা নেই তা তোমরা পেয়েছ। আমরা যা হারিয়েছি, তা পাবার উত্তরাধিকারী হয়েছ তোমরা। তোমাদের কথা ভাবতে ভাবতে একথাই মনে হয়, জীবনের মেয়াদ কেটে যাবার আগে দেখতে পাবো কি তোমাদের হাসিভরা মুখ, বলিষ্ঠতা তোমাদের দেহ মনে? ঘটবে কি নবসূর্যোদয়-অভিনন্দন দোবো কি তোমাদের স্বাধীন দেশের তরুণ তরুণী হিসেবে?

তোমরা সে সম্মানের সেই শ্রদ্ধার যোগ্য হও আজকের দিনে—তোমাদের বিজয়ার প্রণামের পরিবর্ত্তে আমাদের এই প্রার্থনাই রইল। আমার আগামী যুগের অনামী ভাই বোনদের দিয়ে যাই আমার প্রণাম দেশের কল্যাণকামী বন্ধু হিসেবে।

### —বিতর্ক আলোচনা—

তোমাদের একটি ভাই—শ্রীঅমরনাথ একটি প্রশ্ন করে পাঠিয়েছে, টাকা না থাকলে কি দেশের সেবা করা যায় না? এ প্রশ্ন আমি তোমাদের প্রত্যেককে করে পাঠালুম। তোমাদের প্রত্যেকের মতামত আমায় পাঠিও। এটাই এবারকার বিতর্কের বিষয় রইল।

**অমিয় মোহন বসু** (শ্যামসিদ্ধি) তোমার চিঠি ও পত্রচিত্র পেয়েছি। ঐটি সম্পাদক মশাই মনোনীত করেন নি। তোমার পাঠান টাকা পেলেই বৈশাখ থেকে রংমশাল পাঠান হবে। রংমশাল অফিসের ঠিকানাতেই তো চিঠি আসে—গোলমাল হওয়ার কারণ বুঝলাম না। ষ্ট্যাম্প পেয়েছি, যা পাঠাতে বলেছ চেষ্টা করবো। **বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য** (মোগলসরাই) ১৩০৯ আমি অত্যন্ত লজ্জিত—যত শীঘ্র সম্ভবতুমি যা চেয়েছ পাঠিয়ে দেবো।

**গণেশ মুখোপাধ্যায়** (পাটাভোগ) ১৭২২ না, দিদিভাইকে অন্য নামে ডাকা যায় না—যে সব লিখেছ তা ঠিক নয় মধুর সমাবেশ এখানে নেই। গ্রাহক করা সম্বন্ধে যা লিখেছ পরিচালক মশায়কে লিখলে সঠিক উত্তর পাবে। **সনৎকুমার রুদ্র** (কলিকাতা) ১৮৭৭ তোমাদের লেখা মনোনীত হলেই প্রকাশিত করা হয় আর হবেও। শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলে জেনে খুব ভাল লাগল। নয়টী ষ্ট্যাম্প পাঠাইলেই যা চেয়েছ পাঠান হবে।

**ছবি দেব** (সিলেট) ১৭৬৪ এবারে পূজায় স্ফুর্ত্তি করোনি—খুব ভাল করেছ। মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তমীর ঝড়ে কি ব্যাপারটা ঘটলো তা নিশ্চয় কাগজে পড়ছো? আনন্দের দিন এখনও আমাদের আসেনি—যাতে আসতে পারে সেই মত কাজ করো। তুমি কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও জানিও।

**সবু** (জামসেদপুর) ১৩৭৭ পুরাতন গ্রাহক হয়েও নিয়ম জানো না? কি রকম কথা হলো এটা? পুরোণো রংমশাল উল্টে দেখো—কারণ বারে বারে এক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

যায় না। **লালমোহন ভট্টাচার্য্য** (কালীঘাট) ১৫৮৬ যার কথা লিখেছ সে যদি তোমার বোন বা একবাড়ীর আত্মীয় হয় তাহলে তোমার গ্রাহক নম্বরটা দুজনের নামে করে নিও কারণ একবাড়ীতে দু'খানা বই নেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে একথা খাটবে না, নতুন সভ্য হতে হবে। **রথীন মজুমদার** গ্রাঃ ১৫২৫ দেরীতে শুভেচ্ছার জন্য কিছুই মনে করিনি—যেটা আন্তরিক সেটা দেরীতে এলেও চির নূতন। এই সম্বন্ধে যা লিখেছ তা আমি পরিচালক মশাইএর সঙ্গে কথা বলে জানাবো। তোমার প্রস্তাবটি ভাল। **মীরা সান্যাল** ( রাজসাহী ) ১২৮৩ তোমার দু'টী চিঠি পেয়েছি। সপ্তমীতে যে দুঃর্ঘটনা আমাদের দেশের উপর দিয়ে হয়ে গেল তা কি বুঝতে পারছো না? গ্রাহকের কথা পরিচালক মশাই জানেন।

**মীরা রায়** ( মোরাদাবাদ ) তোমার রচনা 'অগ্রদূত' সম্পাদকরা মনোনীত করেছেন—কিন্তু দেরীতে আসার জন্য পূজা সংখ্যায় যায়নি---সরস্বতী পূজার বিশেষ সংখ্যায় যাবে বলে শুনেছি। তোমার ডিজাইন কেয়া বুনুদের কাছে পাঠান হয়েছে।

**গুরুপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ বসু চৌধুরী** ( বাঁকুড়া ) ১৬২৫ যেগুলি পাওনি সম্ভবত দাম দিয়ে অফিস থেকে নিতে হবে। অফিসে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করে নিও।

**সাধনচন্দ্র বসু** ( কালীঘাট ) ১৫২৩ আশাকরি সুস্থ হয়ে উঠেছ? কাগজের যা অবস্থা হয়েছে তা কি বুঝতে পারছো না? যাহোক তোমার প্রত্যেকের প্রতি আমার অনুরোধ, দরকারী কথা বা প্রয়োজন ভিন্ন এই সময়ে পয়সা খরচ করে চিঠি লিখোনা।

আমার দুটী বোনের দু'খানি চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছি। পাবনা থেকে বাণী মৈত্র লিখেছে তার বাবা অকস্মাৎ ব্লাডপ্রেশারে মারা গেছেন আর কটক থেকে গীতা দে তার মা হারানর সংবাদ দিয়ে প্রতি লাইনে লাইনে লাইনে তার দুঃখ উজাড় করে দিয়েছে।

**গীতা ও বাণী**! তোমাদের দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই বোন। কিন্তু মা, বাবা তো কারুর চিরকাল থাকেন না। তাঁদের তোমরা ভাল বাসতে—সুতরাং তাঁরা যা ভালবাসতেন—যা পছন্দ করতেন সেই কাজগুলি তোমরা আন্তরিক ভাবে করে যাবে, এতে মনে শক্তি ও সান্ত্বনা দুই'ই ফিরে পাবে ভাই।

কল্যাণ সেনগুপ্ত, অক্ষয় কুমার, দিলীপকুমার কানুনগো, রবীন্দ্রনাথ হাজরা, মিনতি চাটার্জ্জি, মৃণালকান্তি সেন গুপ্ত, বিনীতা ঘোষ, বাসন্তী, শরৎশ্রী, দেবু, বাণী কণা মুখোপাধ্যায়, সুশীল মণ্ডল, কল্যাণী বিশ্বাস, আশীষ দত্ত, আভা রায়, তোমাদের চিঠি পেয়েছি।

একটী অনুরোধ আমার আছে আমার প্রত্যেক ভাই বোনেদের কাছে। মেদিনীপুর কাঁথি ইত্যাদি অঞ্চলে প্রবল ঝড় ও বন্যায় কত সংসার কত জীবন যে নষ্ট হয়েছে—তার ঠিক নেই। যারা আছে তারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বান্ধবহীন হয়ে—তাদের সাহায্যের জন্য তোমাদের ক্ষুদ্র কোমল মুঠিতে যেটুকু সাহায্য আসে তা কি তোমরা করবে না? আমার একান্ত অনুরোধ তোমরা যা পারো এদের সাহায্যে পাঠিয়ে দাও। যার দান যতটুকুই হোক—সেখানে তার মূল্য অনেক এটী ভুলোনা। তোমরা পৃথক ভাবে কিছু ব্যবস্থা করতে না পারো আনন্দবাজার পত্রিকা আফিসে যে ফাণ্ড খোলা হয়েছে—সেখানে নাম ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দাও। এখন যদি দু' আনাও দাও, তার মুল্য অনেক কিন্তু পরে দুশো টাকা দিলেও তার কোনও দাম থাকবে না। শুভেচ্ছা রইল। ইতি, তোমাদের

দিদিভাই

# আমাদের লাইব্রেরী

**"নাচ-গান-হল্লা"**—প্রকাশক মধুচক্র। মৌমাছি সম্পাদিত। মূল্য দেড়টাকা, প্রাপ্তিস্থান মিত্র এণ্ড ঘোষ॥ এই বইখানি সঙ্কলন করে মৌমাছি এবার তোমাদের ভাইফোঁটার উপহার দিয়েছেন। বইটির নাম থেকেই বিষয় বস্তুটি কি বোঝা যাবে। বইটিতে নাচ গান ও অভিনয় এবং আবৃত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধ, অখিল নিয়োগী প্রভৃতি লেখকের রচিত কয়েকটি গান ও তার স্বরলিপি এবং শিশুদের অভিনয়োপযোগী তিনটী নাটক আছে। প্রবন্ধগুলি নামকরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লিখেছেন। যেমন, সাজগোজের কৌশল লিখেছেন বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। তবে প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছে শান্তি নিকেতনের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের 'নৃত্যে ধরা জাগিয়ে তোল।' যাদের নাচ সম্বন্ধে আগ্রহ আছে কিন্তু শেখার সে রকম সুবিধা পায় না তারা এটি---পড়ে দেখো। নাটিকা তিনটির মধ্যে একটি লিখেছেন তোমাদের প্রিয় লেখক সুনির্ম্মল বসু আর দুটি লিখেছেন শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ। বিমল ঘোষের 'পুতুলের দেশ' নাটিকাটি তোমরা কেউ কেউ হয়তো 'আনন্দবাজারে' পড়ে থাকবে। গানের স্বর-লিপিগুলিও বইতে পাবে। মোট কথা, তোমরা যারা সরস্বতী পূজা, নববর্ষ ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে নাচ-গান-হল্লা করতে চাও, তাদের এ বইখানি বহুৎ কাজে আসবে। এমন কি মৌমাছি আসর যাতে ভালো করে জমে তার জন্য 'ম্যাজিক' সম্বন্ধেও লেখা সংগ্রহ করতে ভোলেন নি। বইখানির প্রথমে আছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ। এটি তিনি মৌমাছিকে দুবছর আগে পাঠিয়েছিলেন। বইটিতে অনেক ছবি আছে, ছাপা বাঁধাইও সুন্দর।

—শ্রীমতী অপর্ণা সেন

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কন্‌ট্রাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

## ❀নূতন ধাঁধা❀

### চিটি বিভ্রাট

নীচের এই চিঠি পেয়ে তুপূদের বাড়ী ভীষণ হুলুস্থুল।—

তুপূমণি আমার—

আমাদের খোকাবাবুর চোখ ফুলেছে কারণ তার মা মারা গিয়েছেন। তাকে মামার বাড়ী কিছুতেই সেজন্য তাকে পাঠান যাচ্ছে না। ওদের যে কুকুর ছানা হয়, নিতাই আমি কি তাহলে নিয়ে যাবো? ভুলো বেরালের চোখ বেঁধেছে আর কি তার কান নাক আটি বেঁধেছে! সেজন্য কাকা কিন্তু ভুলোর কান মলে দেন। নিভা ইতু পূজোর সে ছড়া মুখস্থ করবে তো? ইতি—দিদু

আসলে কিন্তু খোকাবাবুর মা মোটেই মারা যান নি, তিনি স্বশরীরেই বর্ত্তমান আছেন। ওদের কোন কুকুর ছানাও হয়নি। ভুলো বেরালের চোখ বেঁধেছিল বটে কিন্তু কান বা নাক কিছুই বাঁধেনি। আর ভুলো কান মলাও খায়নি। আর নিভা বলেও কেউ নেই তো ইতু পূজো! স-অ-ব ভুল খবর। তাহ'লে আসল চিঠিটা কি খুঁজে ঠিক করে লেখো তো দেখি?

### কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর—কাকাতুয়া

যাদের উত্তর নির্ভুল হয়েছে ঃ

সুজিত কুমার দত্ত, চট্টগ্রাম; কুমারী যুথিকা দেবী, কলিকাতা; বিশ্বজিৎ নাগ, দিনাজপুর; সুব্রত সিংহ, রংপুর; বেলারাণী গাঙ্গুলী, শ্রীহট্ট; কল্যাকুমার সেনগুপ্ত, শান্তিনিকেতন; অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দিল্লী; সতীনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটী; পিণ্টু, মিণ্টু ও সুরথ, রংপুর; হেমেন্দু শঙ্কর রায়, কলিকাতা; স্বপ্না, জয়ন্ত ও রত্না রায়, বাঁকিপুর; দীপেশ ও সত্যেন সরকার, রংপুর; দেবীপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ বসু চৌধুরী, বাঁকুড়া; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর; চিত্রা, সুধীর ও খুকু, কলিকাতা; শান্তিময় মুখার্জ্জি, ফয়জাবাদ; সুধীর সেন, শান্তিনিকেতন; বাচস্পতি লাইব্রেরী, সিঙ্গুর; সনৎকুমার রুদ্র, কলিকাতা; মিনতি চ্যাটার্জ্জি, কলিকাতা; দাদা, দিদি, রথীন, সুধীন ও লতিকা, খাগড়া; সাধনা ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ; দেবকুমার চৌধুরী, কলিকাতা; কানু, অমু, ভজুদা ও মামাবাবু, পুরুলীয়া; অমিতরঞ্জন রায়, কলিকাতা; নিতু, বুড়া, সুশীল ও অধীররঞ্জন দাস, বরিশাল; গীতা দে, কটক; বড়দা, মেজদা, গীতা, সবিতা ও দিদিমণি প্রভৃতি, পাটাভোগ; সুনিল ভট্টাচার্জ্জ, ফরিদপুর; সাধনচন্দ্র বসু,—; বিশু, রণজিৎ ও নিত্য, ভোলা; রূপবাণী দাস, কলিকাতা; সাধনা ও রেণু বিশ্বাস, চট্টগ্রাম।

### কার্ত্তিকের চিত্র-প্রতিযোগিতা

গ্রাহকগ্রাহিকাদের অনুরোধে এই চিত্র প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ২০ শে অগ্রহায়ণ করা হ'ল।

### "গল্প-দাদু"

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

বাংলার এবং পৃথিবীর বাঙালী কিশোর কিশোরী জীবন, এটি ছিল আমাদের মনের সম্মুখে। উজ্জ্বল কচিদের নিয়ে, কি করে বাংলা দেশ জাতির উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে, এই প্রশ্ন অতি তীব্র হল সেই সময়ে! শিক্ষালয়, শিক্ষার ভিতর দিয়ে তার কোন সুন্দর পথ আবিষ্কার করতে পারলে না। চিন্তার দুই তীর মেঘাচ্ছন্ন হল। অথচ মাঝখানে আনন্দ-নদীর জল। তার অজানা ঢেউয়ে পাল তুলে দিয়ে অতি দুঃসাহসের ঝঞ্ঝায় বেরতে হল দেশের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। যাঁরা বেরলেন, তাঁদের তপস্যার পথ, অবশেষে তাঁদের কাছে এল। উন্মুক্ত আকাশের নীলিমা, দেশের সবুজ রংএর স্নিগ্ধতা, পাখীর, জলের, মেঘের গান, অতীত বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের বাতাস, কৌতূহলী হ'য়ে, আগ্রহে, দেশের ছেলেমেয়েকে আবার ফিরে পেলে। বাঙালীর ছেলে-মেয়েরা বুকে পেলে বাংলার রক্তকে! কোথায় কি ধন আছে ছড়ানো, কোথায় জীবন রস, প্রাণের আদরে অসঙ্কোচে তার ভাণ্ডার খুলে দিলে দেশ, দেশের সামনে। যারা ভবিষ্যৎ দেশের—অর্থাৎ কচির দল, তারা পৃথিবীতে কোন্ জাত, তা টের পাবার বাঁশী—তারাই বাজিয়ে চললে। এই পথে সোনার মোহর নয়, লোহার অস্ত্র নয়, তপ্ত নেত্র কিংবা বেত্রের শাসন নয়, হীরের রাজসিক আলোও নয়, শুধু হাঁসের পাখার কলম এসেছিল আমাদের বন্ধু হয়ে, একটি রাঙা ভোরে। বাংলার জাগ্রত শৈশব রাজ্যের এই যুগ এসে-গিয়ে, যাঁরা সেবায় নেমেছিলেন তাঁদের সু-কৃতার্থ করে, স্বপ্ন ও ব্রত সার্থক হয়েছে এবং দেশের মাটি হয়েছে সজীব।

এই সজীবতার নূতন আকাশ যখন দেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দ কোলাহল ভরে উঠেছে, সেই সময়ে আরেক বন্ধু এল আকাশ বেয়ে, আরেক আনন্দখনির সন্ধান নিয়ে। অমল সুরে,

সচল কথায়, মধুময়তায় এবং সরল সহজ আদরে তা দেশের মনিদেরে সুচকিত করে তুললে
ব্যগ্রতায় তাদের ভিড় জমল সেখানে। এই নবীন বন্ধু, বাংলার রেডিওর গল্পদাদুর কণ্ঠস্বর। কিন্তু
ছেলেমেয়েরা তাকে নবীন বলে স্বীকার করতে চাইলে না। এ স্বর কত আপন, যেন কতদিনের
আপন, তারা কান পেতে রইল যাকে বুকে নেবার জন্যে। অনতিকালেই বুঝতে পারা গেল যে
এ স্বর শুধুই কণ্ঠের স্বর নয়, এ তাদের গল্পদাদুর গভীর অন্তরের স্বর।

প্রথম আমন্ত্রিত হয়ে যখন রেডিওতে যাই, যাঁরা অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন তাঁদের
মধ্যে একজনের চোখে এবং মুখভাবে একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করেছিলেম। তাঁকেই আমি গল্প
দাদুর কথা জিজাসা করেছিলেম। পরিচয়ের পরে যে প্রীতিবন্ধন এল, তাতেও ছিল বিশিষ্টতা
কেন না, তার মর্ম্মময় ছিল স্পষ্ট আন্তরিকতা। তাঁর ব্যক্তিগত অমায়িকতার কথা হয় তো অন্য
কেহ বলবেন, কিন্তু, তাঁর গল্পদাদুত্বের কথাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দি।

গুণী যোগেশচন্দ্রের—বাংলায় রেডিওর এবং বাংলার ছেলেমেয়েদের গল্পদাদুর এই অন্তর
একদিন উন্মুক্ত হয়েছিল আমার কাছে। তারহীন বেতারে যে কথা আসে, তার নেপথ্যে হৃদয়
তারের বেদনা এবং সাধনাতে তাঁর সঞ্চয় কত বেশি ছিল, তা বুঝিয়ে বলা আজকের দিনে শক্ত
আরম্ভের যুগের তাঁর সরস পরিকল্পনা, গড়ে তুলবার প্রণালী, দেশের মনের অনুসন্ধান, ব্যর্থতাকে
ঠেলে এগিয়ে যাবার অকুণ্ঠতা, বোধ হয় আজো একজনের মধ্যে এত সফলতা লাভ করে নি
একেও ছাপিয়ে, তাঁর দরদ ছিল—তাঁর কর্ম্মের ইতিহাসে অতুল্য। এই দরদ তাঁর খাঁটি পরিচয়
তাঁর স্বরে, তাঁর বাক্-বাচনে, তা গলে পড়ত। তাঁর এই দরদের কথাই আমার একান্ত মনে
পড়েছে। যে তপস্যা নিয়ে তিনি নেমেছিলেন, তা ছিল অকপট। কচিদের জন্য তাঁর ভাবনা
ছিল বিনিদ্র; তাদের মধ্যে আনন্দকে বিলিয়ে দেবার আকুতি তাঁর প্রাণের সঙ্গে গাঁথা ছিল
শুধু বাইরে নয়, মনের মাঠের মধ্যেও তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে জড়ো করতেন। এমন
চাইতেন দেশের আবহাওয়ার মধ্যে। এইজন্য, তাঁর সৃষ্টিকে তিনি দেশের স্বরূপের ভিতর থেকে
টেনে আনতে চাইতেন, যাতে সত্যই শুভ হয়। প্রকৃত পক্ষে তা হয়েছে। তার সুন্দর প
কচিদের কোলাহলে ভরে উঠেছিল। যে স্নেহাতুর সেবা তিনি সম্বল করেছিলেন, তাই তাঁর
সার্থকনামা করেছে।

আজ মনে হয় তিনি স্বর-জাদুর অমর গল্পদাদু, যাঁর দরদের সোনার সূতো
উপরে ভিত্তি করে কণ্ঠে বলার অরূপ পুরী তৈরী হয়ে চলুক। নূতন আনন্দ খনির সন্ধানের আশা
বাহন হয়ে তিনি শিশুদের অর্চ্চনা করেছেন, সে অর্চ্চনা অতি কল্যাণকর উল্লাসে ছন্দিত হয়ে
আছে এবং জাতির শিশুরাজ্যের ইতিকথা··· অন্তরের দীপ্তাক্ষরে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে।*

* গল্পদাদু (৺যোগেশচন্দ্র বসু)র নবম স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণ।

# পদ্মিনী

শ্রীইন্দিরা দেবী

চিতোরের সিংহাসনে তখন রাণা লক্ষ্মণ সিংহ, দিল্লীতে বাদশা আলাউদ্দীন। লক্ষ্মণ সিংহ নামে রাণা, প্রকৃতপক্ষে রাজ্য পরিচালনা করেন তাঁর পিতৃব্য ভীম সিংহ। নাবালক লক্ষ্মণ সিংহ পিতৃব্যকে পিতার মত শ্রদ্ধা করেন ও তাঁর আদেশ মেনে চলেন। চিতোরের রাজদুর্গে, প্রতি সৌধচূড়ায় মেবারের স্বর্ণ সূর্য্য আঁকা রক্ত পতাকা উড়ছে, পথে পথে জনতার অবিরাম আনাগোনা, আনন্দ চঞ্চল উৎসব মুখর চারিদিক, নগর তোরণে অষ্টপ্রহর নহবৎ হতে আনন্দ সুর ঝরে পড়ছে।

দূর সিংহল হতে চিতোরের অন্তর লক্ষ্মী রাণা ভীম সিংহের পত্নী রাণী পদ্মিনী আজ চিতোরে আসছেন—তাই সারা চিতোরের উৎসবময় বেশ, তাই জনতা আনন্দ মুখর। অসামান্যা রূপসী অনিন্দ্য সুন্দরী পদ্মিনী। 'পদ্ম সৌরভ যেমন সরোবরকে আমোদিত করে—পামগন্ধে দিগ দিগন্ত সুরভিত করে তোলে, পদ্মিনীও তেমনি তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্য ও অন্তর লাবণ্যে সারা মেবারকে পুলকিত করে তুললেন।

পদ্মিনীর এই অনিন্দনীয় রূপ লাবণ্যের কথা পুষ্প সুরভির মত বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

কিছুদিন পরে! চিতোরের রাজদুর্গে সেই স্বর্ণ সূর্য্য আঁকা রক্ত পতাকা, নগর তোরণে নহবৎ কিন্তু সে সুর সে আনন্দ নেই। দিল্লীর পাঠান বাদশা খিল্‌জী বংশের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীনের কানে পদ্মিনীর রূপের কথা পৌঁছল। লক্ষ লক্ষ পাঠান সৈন্য নিয়ে আলাউদ্দীন চিতোরের দিকে দুর্ব্বার বেগে এগিয়ে গেলেন—ভাবলেন তিনি বাজপাখীর মত চিতোরের লক্ষ্মী পদ্মিনীকে নিয়ে এনে নিজ হারেমের শোভাবর্দ্ধন করবেন।

তখন বসন্তকাল! সারা চিতোর জুড়ে বসন্ত উৎসব, হাসি গান আর বাসন্তী রংএর বাহার। এমন সময় খবর পৌঁছুল, আলাউদ্দিন আসছেন অগণিত সৈন্য নিয়ে চিতোরে দিকে। মুহূর্ত্তে আনন্দ উৎসব থেমে গেল। চিতোরের ঘরে ঘরে অস্ত্রের ঝনঝনানি, যুদ্ধের আয়োজন, মেয়েরা বীর সাজে সাজাল প্রাণ প্রিয়দের। লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোর জয় করা যাবে না একথা আলাউদ্দীন বুঝলেন, রাজপুত প্রাণ দেবে কিন্তু মান দেবে না, শির দেবে কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিতোরের এক মুঠি মাটী দেবেন না। তাই সন্ধির প্রস্তাব করে দূত পাঠালেন রাণা ভীম সিংহের কাছে, দাবী জানালেন রাণী পদ্মিনীকে পেলেই তিনি ফিরে যাবেন। এই অপমানে রাজপুতরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—দ্বিগুণ বিক্রমে পাঠানদের আক্রমণ করলো, হাজারে হাজারে

তারা প্রাণ দিলো আর নিলো। দিনের পর দিন লোক ক্ষয় হতে লাগলো, কত নারী তার প্রিয়জনকে হারালো, কত মা তার সন্তানকে দান করলো এই মরণ যজ্ঞে। রাজপ্রাসাদে বসে রাণী পদ্মিনী প্রতিদিনকার দুঃখ কাহিনী শোনেন, মেবারের বীর সন্তানেরা আত্মদান করে হাজারে হাজারে,—সহস্র নারীর অন্তর বেদনা ও দুঃখ নিজে অন্তরে অনুভব করেন রাণী পদ্মিনী! এই করে দিন যায় রাত নামে।

আলাউদ্দীনের দূত আবার এলো; তাঁর প্রস্তাব মাত্র একটী, রাণী পদ্মিনীকে দেখে তিনি চিতোর ছেড়ে চলে যাবেন। দূত অবধ্য বলে এবারেও তাই রক্ষা পেল। পদ্মিনী দেখলেন লোকক্ষয় বন্ধ করার এই একমাত্র সুযোগ। ভীম সিংহকে ডেকে তিনি বল্লেন, রাজপুত নারী তো চিরকাল অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকে না, প্রয়োজন উপস্থিত হলে শত্রু নিধনে উন্মুক্ত তরবারী হাতে সেও সিংহীর বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আলাউদ্দীন যদি তাঁকে মাত্র একটি বারের জন্য দেখে চিতোর ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তো আপত্তি কিছু থাকে না, অকারণ লোকক্ষয় সহস্র রাজপুতের আত্মত্যাগ বন্ধ করা দরকার।

একটি নারী অপূর্ব্ব মমত্ববোধ নিয়ে সারা দেশ ও জাতিকে ভালবেসেছিল, রাণী পদ্মিনীর এই উক্তি তাঁর অন্তরের স্নেহ করুণা ও ভালবাসা সহস্রধারে বহন করে আনে। বহু পরামর্শের পর সব্যস্ত হলো তিনি প্রকাশ্যভাবে আলাউদ্দীনের সামনে আসবেন না। তাঁর ছায়া আয়নাতে প্রতিবিম্বিত হবে! বাদশা সেই ছায়ামূর্ত্তি দেখবেন। দূত সংবাদ নিয়ে পাঠান শিবিরে ফিরে গেলো! আলাউদ্দিন তো আনন্দে অধীর। পরদিন বিকেলে গোলাপ জলে স্নান করে অপূর্ব্ব বেশ-ভূষা করে দু'শ জন রক্ষী নিয়ে চল্লেন। এই সব রক্ষীরা পথের ধারে আত্মগোপনে রইল। রাণা ভীমসিংহ পরম সমাদরে তাঁকে পদ্মিনীর শ্বেত পাথরের রাজ দরবারে নিয়ে গেলেন। হাজার মোমবাতির আলো অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করলো। মনে হলো যেন রৌদ্রজ্জ্বল একটি দিন এসেছে সেই শ্বেত পাথরের রাজ-প্রাসাদে। রাণা তাকে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে সরবৎ-এর পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। আলাউদ্দীনের অন্তর ক্ষেপে উঠলো—বিষ নেই তো এতে? রাণা তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বল্লেন, শাহানসা রাজপুতের ঘরে অতিথি দেবতা, শত্রুমিত্র বাদ বিচার সে করে না।

আলাউদ্দীন উদগ্রীব হয়ে আছেন কখন আসবেন স্বপ্নের সুরপরি রূপলাবণ্য! ইচ্ছা প্রকাশ করতেই রাণী ভীমসিংহ সম্মূখের আয়নার পর্দ্দা সরিয়ে দিলেন আর সহস্র বিদ্যুৎ যেন সে আয়ানাতে ঝলসে উঠলো। আলাউদ্দীনের দুটি চোখ ধাঁধিয়ে গেল। উন্মাদ আলাউদ্দীন সেই ছায়াময়ী অগ্নিশিখাকে গ্রহণ করতে চঞ্চলপদে এগিয়ে যেতেই ভীমসিংহ হাতের পেয়ালা সজোরে আয়নার দিকে ছুঁড়ে মারলেন! ঝনঝন করে সেই প্রকাণ্ড আয়না মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়লো। অগ্নিশিখা গেল মিলিয়ে।



বাদশা বুঝলেন ভীমসিংহ রুষ্ট হয়েছেন, তিনি ভীমসিংহের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাদের মাঝে নতুন করে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো। ভীমসিংহ বাদশাকে নগর বাহিরে এগিয়ে দিতে গেলেন তখন আলাউদ্দিনের ইঙ্গিতে চারদিকে থেকে এলো অজস্র পাঠান সৈন্য। ভীমসিংহের দেহরক্ষীরা স্বল্প সংখ্যক হলেও তাদের আক্রমণ করলো কিন্তু ভীমসিংহ বন্দী হয়ে পাঠান শিবিরে এলেন। এবং শিবিরে ফিরেই আলাউদ্দীন ঘোষণা করলেন ভীমসিংহের মুক্তির মূল্য হবে রাণী পদ্মিনী।

সমস্ত মেবারে বিষাদের কালো ছায়া! রাজপুতেরা এই শঠতা শত্রুতা ও অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে কৃতসঙ্কল্প হলো। শঠের সঙ্গে শঠতাই করা হচ্ছে তার যোগ্য উত্তর। তিনি আলাউদ্দীনকে পত্র লিখলেন—তাঁর আত্মসমর্পণে রাণা যদি মুক্তি পান, রক্তপাত যদি থামে, তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছেন কিন্তু তিনি রাজমহিষীর মত উপযুক্ত সম্মানের রক্ষার জন্য বাদশা যেন সৈন্য অপসারণ করেন এবং তাঁদের প্রতি যাতে যোগ্য সমাদর করা যায় তা যেন দেখেন, আর জীবনে শেষবারের জন্য তিনি ভীমসিংহকে একবার দেখতে চান।

আলাউদ্দীন তো পত্র পেয়ে আনন্দে অধীর। পদ্মিনীর অনুরোধ মত বাদশার আদেশ প্রচার করা হলো—রাণী পদ্মিনী ও তার সহচরীদের কেউ যেন উত্যক্ত না করে।

পরদিন প্রভাতে সাতশত দাসী নিয়ে রাণী চিতোর ছেড়ে আলাউদ্দীনের শিবিরের দিকে চল্লেন, পদ্মিনীর পাল্কীর একদিকে গোরা অপর দিকে কিশোর কুমার বাদল ঘোড়ায় চড়ে চল্লেন!

যে কারাগারে ভীমসিংহ বন্দী ছিলেন—সেখানে এসে পাল্কী থামলো, কারারক্ষী সসম্মানে দোর খুলে দিল। ভীমসিংহ হাসলেন—সে হাসি যেন এ কথাই বলে দিল, আমি জানি আমার জন্য তুমি মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে নির্ভয়ে আসতে পারো। পদ্মিনী ক্ষিপ্রগতিতে অস্ত্র দিয়ে ভীমসিংহের শৃঙ্খল মোচন করলেন! ভীমসিংহের ভীম দেহ দাসীর পোষাকে ঘিরে রইল। তারপর স্বামীকে নিয়ে তিনি পাল্কীতে উঠলেন। কতক পাল্কী সুলতানের শিবিরের দিকে গেল! বাকী গেল চিতোরের দিকে—রাজপুত রমণীরা যেন পদ্মিনীকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে চল্লেন।

পদ্মিনীর এই কাজ, স্বামীকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার প্রচেষ্টা, বিচার বুদ্ধি ও বিপদে নির্ভীকতার পরিচয় দেয়! বন্দী স্বামীর জন্য তার অন্তরে হাহাকার জেগেছিল কিন্তু তার পরিসমাপ্তি শুধু অশ্রুজলেই শেষ হয়ে যায়নি।

আলাউদ্দীন যখন বুঝতে পারলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন, নারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন, তখন তিনি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্বারোহী সেনা পাঠালেন চিতোরের পথে যে সব পাল্কী গিয়েছে তা আটক করবার জন্য। সহচরী হিসাবে যারা পদ্মিনীর অনুগমন করেছিল আসলে তারা হলো শ্রেষ্ঠ রাজপুতবীর। পদ্মিনী ও ভীমসিংহ নিরাপদে চিতোরে ফিরে যেতেই তারা নিশ্চিত মৃত্যু জেনে মুক্ত তরবারী হাতে আত্মপ্রকাশ করলো!

যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সুরু হলো তা বর্ণনা করা যায় না। স্বল্প সংখ্যক রাজপুত সেনার উপর বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়লো পাঠান সেনারা। রাজপুতরা দলে দলে প্রাণ হারালো বটে কিন্তু পিছু হটে হটে চিতোরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। সম্মুখের দিকে যারা ছিল তারা অকাতরে প্রাণ দিলো। কিশোর কুমার বাদল অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে রক্তাক্ত তরবারী হাতে নিয়ে রাণী পদ্মিনী ও ভীমসিংহকে নিয়ে নিরাপদে চিতোরে প্রবেশ করলো। নগরের দ্বার রুদ্ধ করতে গিয়ে বীর গোরা অগণিত শত্রু নিধন করে রাজপুতের যোগ্য মৃত্যু বরণ করে নিল।

গোরার স্ত্রী বাদলকে বুকে টেনে নিলেন কিন্তু কাঁদলেন না। নববধূর মত বেশভূষায় চন্দন কাঠের চিতা প্রস্তুত করে, বাদলের মুখে স্বামীর অসামান্য বীরত্ব কাহিনী শুনতে শুনতে তিনি প্রজ্জ্বলিত চিতায় হাসিমুখে প্রবেশ করলেন।

আলাউদ্দিন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর অবরোধ করে বসে আছেন, সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিল। আলাউদ্দীনের কাছে খবর এলো তৈমুরলং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। আলাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ শিবির ওঠাবার হুকুম দিলেন।

তারপর? আবার তেরো বছর পরে!

আবার চিতোর অবরোধ করলেন আলাউদ্দীন, পদ্মিনীর আশা তিনি তখনও ছাড়েন নি। পুরাতন ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তি, চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীরেরা দিনের পর দিন প্রাণ হারাতে লাগলো। ভীম সিংহ তখন বৃদ্ধ, লক্ষ্মণ সিংহ তখন প্রকৃত রাণা।

হয় সন্ধি নয় মৃত্যু। সন্ধি মানে আত্ম বিসর্জ্জন দেওয়া নয়, সমস্ত জাতির মানমর্য্যাদাকে ধূলি ধূসরিত করা। একদিন লক্ষ্মণ সিংহ রাজ প্রাসাদের চারিদিকে শুনতে পেলেন অশরীরি কণ্ঠের আর্ত্তনাদ—'মঁ্যয় ভুঁখা হুঁ'। মহারাণা যেন স্বপ্ন দেখলেন—মেবারের দেবী যেন বলছেন, বড় ক্ষুধা, রক্ত চাই, আরো আরো রক্ত।

প্রতিদিন অজস্র ধারে রাজপুতের রক্তে মাটি সিক্ত হয়ে ওঠে—আরো রক্ত না দিলে চিতোরের উদ্ধার নেই। মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহ তাঁর বড় ছেলে অরি সিংহের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র অজয় সিংহকে তার স্ত্রী পুত্র নিয়ে—কৈলওয়ারা দুর্গে চলে যেতে বল্লেন—কারণ মরণোৎসবে যদি সকলেই প্রাণ ঢেলে দেয়, তাহলে পিতৃপুরুষের জল গণ্ডুষ পান করাবে কে? কেই বা আবার রাজপুত জাতিকে জাগ্রত উন্নত করে তুলবে? একে একে এগারোটি ভাই যুদ্ধে নিহত হলেন, চিতোরের শেষ দুই বীর—লক্ষ্মণ ও ভীম সিংহ যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। রাণার হুকুমে ভগবান একলিঙ্গের দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ একত্রিত হলো। তাদের এক হাতে শূল অন্য হাতে কুঠার, দুই কানে শাঁখের কুণ্ডল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘছালের অঙ্গরাখা, পিঠে ঢাল।

অদ্ভুত ফৌজ চিতোরের এই শেষ বাহিনীকে ডাকা হলো।



দেশের দুর্য্যোগময় দিনে, জাতির জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যারা এসে দাঁড়াত, তারাই আজ এলো হাজারে হাজারে।

তারপর অমাবস্যা রাত্রে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারো হাজার রাজপুত রমনীর জহর ব্রত সুরু হলো। সুন্দরী সুবেশা তরুণী যুবতীরা নির্ভয়ে হাসিমুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে—তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রাণী পদ্মিনী, মুখে তাঁর পরম শান্তির আভাস, স্মিতমুখে বারো হাজার নারী মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়ায়। সে দৃশ্য অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। কল্পনা যেন এগোয় না।

নিস্তব্ধ নিশিথ রাত্রি অন্ধকারময়ী। মাথার উপর শুধু তারা-ভরা আকাশ আর তার নীচে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের কাছে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বারো হাজার নারী—গৌরবে, গর্ব্বে, তেজে, ত্যাগে, দিব্য বিভায় সমুজ্জ্বল।

আলাউদ্দীনের সৈন্য দেওয়ানী ফৌজের কুঠারের সামনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো। বহু ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধের পর আলাউদ্দীনের সেনারা চিতোর অধিকার করলো।

আলাউদ্দীন দেখলেন—সারা চিতোর জুড়ে একটি অখণ্ড চিতা-শয্যা। তিনি অগ্নি দেখলেন কিন্তু দীপ্তিময়ী অগ্নিশিখার দেখা পেলেন না।

রাণী পদ্মিনী রাজপুত পুরমহিলাদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিলেন।

---

## নব-উৎসব

নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

চঞ্চল সুর শুনাইছে শীত
রেশমী নরম রেশ্‌খানি তার
নিলয়ে নিলয়ে বুঝি প্রীতিভোজ
গ্রামান্তরের উৎসব হ'বে
রাতের চোখের জল দিয়ে ধোয়া
শীতের বসন পরেছে, তবুও
শাদা কুয়াশার চাঁদোয়ার তলে
শোনা যায় সেথা লক্ষ বুকের
কুসুমের বনে না-জাগা-কলির
চঞ্চল সুরে নব উৎসব
কঠিন শীতের মাঝখানে আছে
এতদিন যারা স্বপ্ন দেখেছে
বহু অতীতের নম্র আশিস্
শীতের গ্রামের শিহরণ-জাগা

পবনের বাঁশরীতে,
পারি না তো পাশরিতে।
নব পৌষের প্রাতে—
প্রান্তর-আঙিনাতে।
ছোট কচি ঘাস ফুল
চিনিতে হয় না ভুল।
মধুর মহোৎসব,
অলক্ষ্য কলরব।
চোখ্ ভরা আধোহাসি,
ওঠে যেন উচ্ছ্বাসি'।
জীবনের নব সাড়া—
সুপ্ত র'বে না তারা!
পাই যেন মোরা মনে
উৎসব-অঙ্গনে।

# শেষ কথা

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সে ছিল আদর্শ রুশ কিশোর। মাথায় কোঁকড়া চুলের রাশি, আর উজ্জ্বল চোখ দু'টিতে আকাশে নীলিমা। পনেরো বছর তা'র বয়স। সে যেমন সাহসী আর তেমনি সরল। ভানিয়া বলে' সবা ডাক্‌তো তাকে।

হাসপাতালে যখন তার কাছে নানারকম উপহার যেত, সে লজ্জিত ও আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করতো: কে ওরা আর সকলের চেয়ে আমার জন্যে এত ব্যস্ত হয়?

ভানিয়ার বাড়ি ছিল ভলোকোলাম্‌স্ক্‌ জেলার নভিন্‌কি গ্রামে। শীত আরম্ভ হবার সময় তা'র গ্রামের কা এগিয়ে এল যুদ্ধ-সীমান্ত। তার মার ঘরখানা তখন লেফ্‌ট্‌নাণ্ট্‌ কোল্‌স্‌নিকভ্‌কে তাঁর ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দেও হ'ল। ভানিয়া ক'দিন লেফ্‌ট্‌নাণ্টের সঙ্গে বিপুল উৎসাহে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। সে তাঁর সঙ্গে লুকোচু খেল্‌তো আর মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে শুন্‌তো তাঁর বাজনা। তারপর তার অগ্নিপরীক্ষার সময় এল, কোল্‌স্‌নিকভের দলের সৈন্যদের সাহায্য করতে লাগ্‌লো ট্যাঙ্ক-মারা গর্ত্ত আর ট্রেঞ্চ্‌ খুঁড়ে।

জার্মানদের প্রথম আক্রমণ সে চোখের সামনে দেখ্‌লে। তারা কুচ্‌কাওয়াজ করে' এসে গ্রামরক্ষী ভীতিগ্রস্ত করে' দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। ভানিয়া রইল যোদ্ধাদেরই মতন অবিচলিত: কারণ যোদ্ধাদের সর্বদা নিজের আদর্শ হিসাবে দেখ্‌তো।

যুদ্ধের মধ্যে দু'জন সৈনিকের পা জখম হ'লে, ভানিয়া তাদের লাইনের বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্ষত পরিষ্কার ক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। তারপর তাদের গাড়ি করে' নিয়ে কাছের হাসপাতালে রেখে, ফিরে এল। রুশ সৈন্যদল নতুন এক ঘাঁটিতে সরে' এল এবং স্থির হ'ল রাত না হওয়া পর্যন্ত সে জায়গাটা আট্‌কে রাখতেই হবে।

সে সৈন্যদের জন্যে জল নিয়ে নিঃশব্দে পা' টিপে টিপে ট্রেঞ্চে এসে তাদের দিলে আর তারপর তাদের গোলাবারুদ সরিয়ে আন্‌তে লাগ্‌লো নতুন জায়গায়।

সমস্ত দলটি চলে' যাবার পর ভানিয়া হঠাৎ আর একজন আহতকে পড়ে থাকতে দেখ্‌লে। তৎক্ষণাৎ তার কাছে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। তাকে শুশ্রূষা করা শেষ হলে সে দেখ্‌তে পেলে, গ্রাম একেবারে খালি হ গেছে। কামানের গর্জন ক্রমেই সামনে এসে পড়লো। তাড়াতাড়ি সে আহত সৈন্যটিকে একটা ঘোড়ার চড়াবার চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ফ্যাসিষ্ট্‌দের গোলা আশে পাশে ফাট্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। একট এসে লাগ্‌লো তার হাতে; অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান-শূন্য হয়ে সে মাটীতে পড়ে গেল। জার্মানরা তখন গ্রামে ঢুকে প

আহত অবস্থায় এরা পড়লেও ছেলেটি নিস্তার পেলে না। যুদ্ধের বন্দী হিসাবে চালান হবার পর সুস্থ হওয়া মাত্র তাকে ভাল্‌ডিকিনো গ্রামে জার্মাণদের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে



গিয়ে হাজির করলে একটা কুঠীরের মধ্যে; সেখানে দু'জন অফিসার, একজন দোভাষী আর অন্য তিনজন জার্মাণ উপস্থিত ছিল। আর এক কোনে, উনুনের কাছে বসে ছিল এক বৃদ্ধা, এই কুঠীরের মালিক।

'তুমি সৈনিক নাকি?' দোভাষীকে দিয়ে ভানিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়।

'না।'

'তুমি কমিউনিষ্ট্‌?'

ভানিয়া উত্তরে বল্‌লে: 'না। লাল ফৌজ কিম্বা কমিউনিষ্ট্‌ পার্টি আমাদের বয়সী ছেলেদের নেয় না।'

তারপর তা'কে প্রশ্ন করা হ'ল তা'র বয়স কত আর কেমন করে' সে আহত হ'ল। সৈন্যদলের এক কেরানী মনোযোগ দিয়ে তার প্রত্যেকটি কথা লিখে রাখ্‌তে লাগলো।

তারপর সেই অফিসার একটা টিকিট বার করে' তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে: 'ঐ রকম একটা আছে তোমার কাছে?'

'না' ভানিয়া জবাব দিলে, আর একটু হেসে বল্‌লে, 'এক কৃষ সমবায় কৃষিক্ষেত্রের ছেলের কাছে নাৎসী টিকিট থাক্‌বে কি করে?'

অফিসার ভীষণ রেগে উঠে তার পায়ে ছাপ মেরে দিলে আর তারপর ভানিয়ার শরীর তল্লাসী করবার হুকুম দিল।

'আমার তখন মনে হ'ল,' ভানিয়া এই ঘটনার বিষয় পরে বলেছিল, 'ওরা আমায় ফাঁসী দেবে। অফিসারটা বাড়ির দিকে ফিরে 'এই মাগি, বেরো এখান থেকে' বলে, তাকে এক ধাক্কায় ঘর থেকে বার করে' দিলে। তারপর একটা টেবিল টেনে এনে ঘরের মাঝখানে রাখ্‌লে। আবার মনে হ'ল, আমায় ওরা ফাঁসী দেবে কিন্তু তা না করে' সে বল্‌লে: শুয়ে পড়, শুয়ে পড়্‌! তারপর তার হাতের চেটোয় মাথা রেখে শোবার ভঙ্গী করে' টেবিলের দিকে দেখাতে লাগ্‌লো। আমি ভাব্‌লুম্‌ যাক্‌, তাহলে ফাঁসে ঝোলাবেনা আমায়। তার কথা মতন টেবিলে গিয়ে শুলুম। তারপর অফিসারটা তার বেল্ট্‌ খুলে তাই দিয়ে আমার পা' দুটো টেবিলের পায়ার সঙ্গে বাঁধ্‌লে। তার কাছে বেশী দড়ার ফালি না থাকায়, দোভাষী আর আরেক জনের কাছ থেকে দুটো বেল্ট্‌ চেয়ে নিলে। তারা আমার হাত দুটো তেম্‌নি ভাবে বেঁধে ফেলে, নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসে' সিগারেট ধরালে। বোধহয় আধঘণ্টা ধরে তারা সিগারেট টান্‌তে লাগ্‌লো। এর মধ্যে আমি একটু নড়লেই ধমক দিয়ে উঠ্‌তো। সেই বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইলুম আমি তা'দের দিকে চেয়ে।'

যে ভাবে ভানিয়া তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেটা বোধহয় বিশেষ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল, কারণ নাৎসীদের মধ্যে থেকে একজন উঠে এসে হাত দিয়ে তার চোখ দুটো বন্ধ করে' দিলে আর আঙ্গুল নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বলে উঠ্‌লো: 'চোখ বুজে থাক্‌।' তারপর সে কুঠীরের পেছন দিকে চলে' গেল আর ক'এক মিনিট পরে ফিরে এল কামারের একটা করাত নিয়ে। আবার একবার সে ধমক দিলে,—'রাশ্‌। চোখ বুজে থাক্‌।'

কিন্তু সেই নীল-চোখ 'রাশ্‌' তেমনিভাবে চেয়ে ছিল। তাকে সেইখানে চোখ বুজে পড়ে' থাকতে বাধা দিলো তার আত্মসম্মান; তাই সে চোখ খুলে রইল। টেবিলের কিনারে তার মাথা ঝুল্‌তে লাগ্‌লো, হাত দুটো জ্বলে উঠ্‌লো, কিন্তু সে অবাধ্য হয়ে চোখ কিছুতেই বন্ধ ক'রলে না।

তারপর সেই দু'জন নাৎসী হাস্‌তে হাস্‌তে হাত পা-বাঁধা কিশোরটিকে ঘিরে ফেলে তার আহত হাতখানা ধরলে। হঠাৎ সে তার হাতে ঠাণ্ডা ইস্পাতের তীব্র জ্বালা অনুভব ক'রলে।

'তারা ততক্ষণে করাত চালাতে আরম্ভ করে' দিয়েছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি, বিশ্বাস করতে পারিনি যে এমন কাজ তা'রা ক'রতে পারে!'

তারা সব পারে।

ছ'টা ধণ্ডা নাৎসী দাঁত বার করে' হাস্‌তে হাস্‌তে আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একজন আহত, বন্দী বালকের হাত কেটে ফেল্‌তে লাগ্‌লো করাত দিয়ে।

ভানিয়ার ঠিক মনে পড়ে না, সে কেঁদেছিল কি-না। সম্ভবত কাঁদেনি। 'হাতের চামড়া কেটে তারা করাতটা আরো ভেতরে ঢোকামাত্র আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম,' সে বলে।

তারপর যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, সে চোখ চেয়ে দেখ্‌লে, তারা ঘরে নেই; সে মেঝেতে শুয়ে আছে চাপ্‌ চাপ্‌ রক্তের মাঝখানে আর রুশ এ্যাম্বুলেন্সের একজন স্বেচ্ছাসেবক পাশে হাঁটু পেতে বসে' তার ভিজে চুলে হাত বুলিয়ে বল্‌ছে: 'তুমি সেরে যাবে, তুমি সেরে যাবে ভাই, মন শক্ত করো; আমি ভাল করে' ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি।'

ভানিয়া প্রথমে ভাব্‌লে যে সে আবার তার দেশের লোকের হাতে ফিরে এসেছে, রুশরা গ্রামখানি পুনরুদ্ধার ক'রেছে; কিন্তু পরে জান্‌তে পারলে যে সেই স্বেচ্ছাসেবকটিও একজন বন্দী। তাকে তলব করা হয়েছিল ভানিয়ার হাত ব্যাণ্ডেজ করবার জন্যে। কব্জি সমেত তার ডান হাতখানি নিখুঁতভাবে কেটে বাদ দেওয়া হ'য়েছিল।

'জানো ভাই, ওরা হাস্‌তে হাস্‌তে বলাবলি ক'রছিল', সেই স্বেচ্ছাসেবক বল্‌লে ভানিয়াকে, 'তোমার সৈন্যগিরি করা ওরা শেষ করে' দিয়েছে, তুমি আর বন্দুক ছুঁড়তে পারবে না। তার মানে তুমি আর কখনো লড়াই ক'রতে পারবে না।'

'আচ্ছা সে আমরা দেখে নেবো। শেষ কথা আমারই থাক্‌বে।'

তারপর আবার সে অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

তিন সপ্তাহ সে জার্মানদের সঙ্গে ছিল। তার ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছিলো, জার্মানরা কী ভাবে লেফ্‌টেনাণ্ট কোল্‌সনিকভ্‌কে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো পেছন দিকে গুলী করে' মারবার জন্যে।

'আর তুমি বাজনা বাজাতে পার্বে না জর্জ', ভানিয়ার মনে হ'ল একবার; আর এই প্রথম সে ঝরঝর করে' কেঁদে ফেল্‌লো।

পরে তা'র মা গ্রাম থেকে তাঁর মেয়ের পোষাক সমেত এসে তা'কে ঘরে নিয়ে যান। কিন্তু জার্মানরা আর তা'র সম্বন্ধে মোটেই মাথা ঘামাতো না; একটা দুর্বল, পনরো বছরের ছেলে, যার ডান হাত নেই, সে আবার কী বিপদ ঘটাবে?

কিন্তু পরে ওই জন্যেই সে বিপজ্জনক হ'য়ে উঠ্‌লো।

এম্‌নিভাবে ব্যাপার'টা সুরু হ'ল: আহত হাত নিয়ে যতটুকু বেড়াতে পারে ততখানি সেই চত্বরে সে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াতো। ঘুরতে ঘুরতে একদিন কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে দেখতে পেলে—এইখানে শরৎকালে যুদ্ধ হ'য়েছিল—প্রচুর জার্মান অস্ত্রশস্ত্র পড়ে' রয়েছে: বহু রাইফ্‌ল্‌ অটোমেটিক বন্দুক, কলের কামান, এমন কি ছোট ছোট কামান পর্যন্ত। সে সেগুলি সমস্ত জড়ো করে' নিয়ে চুপি চুপি তরকারী ক্ষেতের ভেতর পুঁতে রাখলে পাছে লাল ফৌজকে সে-সব দেবার জন্যে। এমন কি সে তিনটে ঘোড়াও জোগাড় করে' আন্‌তে পেরেছিল আর খাইয়ে ঠিক করে' রেখেছিল রুশ সৈন্যদের হাতে দিয়ে দেবার জন্যে। শত্রুর গতিবিধির ওপর সে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। আর যেখানেই তারা টেলিফোন বসাতো, সে ঠিক তার কেটে লুকিয়ে রেখে দিত বনের মধ্যে বরফের তলায়।



জার্মানরা গ্রামে একখানা ছোট গাড়ি এনে রেখেছে দেখে একদিন সে একটা সাঁড়াশী খুঁজে নিয়ে এল আর গভীর রাতে নিঃশব্দে গাড়ির কাছে গিয়ে প্লাগ্‌গুলো খুলে ফেলে দিলে। এই গাড়িটাও পরে লাল ফৌজের হাতে এসে পড়ে!

নাৎসীরা শত্রুর গন্ধ পেয়েছিল। তারা বুঝ্‌তে পেরেছিল যে কাছেই কোন শত্রু লুকিয়ে আছে, কিন্তু তার কোন সন্ধান পায়নি। এই রুগ্ন, পাংশু ছেলেটিকে একেবারেই তাদের সন্দেহ হয়নি। কিন্তু এই সব কায করতে ভানিয়ার হাতের যন্ত্রণা সাংঘাতিক বেড়ে গেল আর ক্ষত-মুখ পেকে উঠ্‌লো। কিন্তু তবু সে নিরস্ত হ'ল না। ফ্যাসিষ্ট্‌ দস্যুদের ধ্বংশ করে' তাদের সাম্যবাদী সমাজ রক্ষা করবার জন্যে সে যথাসাধ্য কায করতে লাগ্‌লো।

লালফৌজ এসে সেই অঞ্চল পুনর্মুক্ত করবার কিছুদিন আগে, কাছাকাছি একটা বনের ধারে সে যখন ঘাস সংগ্রহ করছিল, কে যেন তাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে' জিজ্ঞেস ক'রলে, 'এসব কি তুমি জার্মানদের কাছে নিয়ে যাচ্ছো?'

ভানিয়ার নীল চোখ জ্বলে' উঠ্‌লো। সে জবাব দিলে, 'নিশ্চয়ই না। আমাদের ঘরে এখনো একটা গরু আছে, তার জন্যেই এগুলো নিচ্ছি।'

'আমাদের জন্যে কিছু খাবার এনে দাও', কে যেন খড়ের গাদার ভেতর থেকে বল্‌লে।

'কম্‌রেড! তুমি কি গেরিলাদলের লোক?' সোৎসুকে জিজ্ঞেস করলে ভানিয়া। 'আমার একজন কম্‌রেড বলে' জেনো, বেরিয়ে এসো।'

ভানিয়ার অনুমান সত্য। গেরিলাবাহিনীর দু'জন ছিল সেখানে।

দু' সপ্তাহ ধরে, ভানিয়া তাদের খাবার এনে দিত আর সেখানকার জার্মানদলের অনেক দরকারী খোঁজ খবর জানাতো: জার্মান রেডিও কোথায় আছে, কোন্‌খানে লুঠের জিনিষের লরীগুলো, কোথায় আর কতগুলো কলের কামান আর ছোট কামান জার্মানদের আছে ইত্যাদি।

পালাবার আগে জার্মানরা বোধ হয় তাকে সন্দেহ করেছিল। এমন কি তাকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে' মারতে পর্যন্ত গিয়েছিল, কিন্তু তখন বিপুল জয়োল্লাসে লাল সেনাদল জলোচ্ছাসের মতন গ্রামে ঢুকতে দেখে তা'রা তার বেল্ট্‌ আর জুতো জোড়া খুলে নিয়েই প্রাণপণে ছুটলো। লালফৌজ তখন জার্মান ঘাঁটিগুলোর ওপর অব্যর্থভাবে কামান দাগ্‌ছে।

গ্রামের ছোটছেলেরা আর মেয়েরা আর অন্য সকলে, যা'র কাছে যা লাল কাপড়ের টুক্‌রো ছিল, তাই নিয়ে ওড়াতে ওড়াতে বেরিয়ে এসে চীৎকার করতে লাগলো: আমাদের লালফৌজ। লালফৌজ ফিরে এসেছে! কম্‌রেড ষ্টালিন দীর্ঘজীবী হোন্‌। আমাদের সোভিয়েট দীর্ঘজীবী হোক্‌!"

আর ভানিয়া, দৃপ্ত বিজয়ী মুখে, আনন্দে বেদনায় সজল চোখে রুদ্ধকণ্ঠে তার আহত হাতটি নেড়ে অভিবাদন জানাতে লাগ্‌লো মুক্তির সেনাদলকে।

---

সোভিয়েট যুদ্ধের বাস্তব ঘটনামূলক শাক্‌প্‌স্‌কায়ার রচনা অবলম্বনে।

# মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রণ জিনি শ্রীরাম লক্ষ্মণে কোলাকুলি
রামজয় দিয়া কপিদের হুলাহুলি।
ভস্ম লোচনের কথা শুনিয়া তো কানে
কমল লোচন চান বিভীষণের পানে।
লক্ষ্মণ বিচক্ষণ শুধান বিভীষণে—
এই দুটির মত বীর আছে কত জনে?
বিভীষণ বলে লঙ্কায় বীর নাই আর
কেবল রাবণ আর ইন্দ্রজিত কুমার।

শুনে সুগ্রীব ছাড়েন হুহুঙ্কার মহাগ্রীব তুলি।
তখন রাম বলছেন—

"ভাই লক্ষ্মণ—
ইন্দ্রজিতে বধ করে আইস এইক্ষণ।
রণশ্রমে কাতর রয়েছি কিঞ্চিৎ
বিশ্রাম করি বধিব কাল রাবণে নিশ্চিত।
ঋণের শেষ শত্রুর শেষ কভু রাখতে নাই
ঝট্ ইন্দ্রজিত বধ করে এসো ভাই।"

বলেই রাম খট্টায় শুলেন। তখন লক্ষ্মণ বল্লেন—"দাদার তো আদেশ হল, এখন ইন্দ্রজিতকে কোথা পাই?"
বিভীষণ বলেন—"লঙ্কার মধ্যে চলেন।"
হনুমান বলেন—"পথ দেখাবে কে?"
তখন বিভীষণ বলেন—

"একজন দুজনে যাওয়া হবে ভার
দল বাঁধ, আমি আছি পথ দেখাবার।"

রাম তখন বলছেন—

"বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর
মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণ কলেবর।
কষ্ট পেয়ে বলহীন, তাই ভাবি মনে,
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিত সনে।



সুগ্রীবের দিকে রাম দৃষ্টিপাত করতে সুগ্রীব উদ্‌গ্রীব হয়ে ভাবলেন, রাম বুঝি তাঁকে ঠেলে পাঠাল ইন্দ্রজিত বধে লঙ্কার মধ্যে। তাড়াতাড়ি বলছেন—

"শত ইন্দ্রজিত বল ধরেন লক্ষ্মণ
তাহাতে স্বপক্ষ যদি হন হনুমন
মুহূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিত হবেই নিধন।"

হনু বল্লেন—

"গড় মধ্যে একা যাইতে শঙ্কা নাই মনে
কিন্তু ভয় পাই, পাছে হারাই ভাই লক্ষ্মণে।"

জাম্বুবান রামের কানে কানে বলছেন—

"বিশ্বাস কি বিভীষণে!"

বিভীষণ ভাব বুঝে বল্লেন—"এতে কি আছে শঙ্কার কারণ! এতই যদি ভয় হয়, আট বানর সঙ্গে চলুন—মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, সম্পাতি, নল-নীল কোমর বাঁধি, গন্ধমাদন, গবাক্ষ আর গয়।"

গন্ধমাদন বল্লেন—"রাক্ষসেরা আমার গায়ের গন্ধ পাবে, আমার যাওয়া হয় না, জাম্বুবান যান।"

জাম্বুবান বল্লেন—

"এতজনে একজনে মারা অবিচার
দুজনে দুজন মার, এই যুক্তি সার।
লক্ষ্মণ মারুন ইন্দ্রজিত, হনু ভাঙ্গুন দ্বার,
বিভীষণের ভার পথ দেখাবার।
অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, মার নাই এ কথার।"

রামকে আন্‌মনা দেখে বিভীষণ বলছেন—

"ইন্দ্রজিতে মারিলে রাবণ রাজা জিনি।
লক্ষ্মণের ভার লাগে আমার—আর চলুন যেতে চান যিনি।"

তখন রাম বিভীষণের হাতে লক্ষ্মণকে সমর্পণ করে বল্লেন—

"ভাই নির্ভয়ে চলো আগে—
বিভীষণের ভাল-মন্দ তোমার সে লাগে;
তোমার ভাল-মন্দ আমার সে লাগে।"

তখন জয়রাম দিয়ে হনুমান বল্লেন—"তবে আমিও চল্লাম, আর একবার জ্বালিয়ে আসি লঙ্কাধাম।" বলে অগ্রসর হলেন।

# খোদার ওপর খোদ্‌কারি!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

## মানুষ কি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না?

মনীষি বেকন একদা বলেছিলেন, মানুষ কখনো নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না—যা হয়ে রয়েছে তার নাড়াচাড়া করাই তার কাজ। এক জায়গার জিনিস আরেক জায়গায় নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা—তার সভ্যতার স্থাপত্য-লীলার আগাগোড়া এই মূলধন। তার সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ভেতরে থেকে প্রকৃতিই আদত কাজ করেন—সব কিছুর মাঝখানে থেকে থেকে প্রকৃতিই নিজে সব করেন, মাঝখান থেকে মানুষ গৌরব পায়। কিন্তু তাহলেও, মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞান আর কলকৌশলের সাহায্যে প্রকৃতিকে যে তার নিজের ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারে, তার প্রমাণ ভূরি ভূরি। এমন কি, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজেও প্রকৃতিকে বাগানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়নি।

## মেরীল্যাণ্ডে অবাক কাণ্ড!

মেরীল্যাণ্ডের বেল্‌ট্‌স্‌ভিলা নামক পরীক্ষণা কেন্দ্রে এই ধরণের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উদ্ভাবনা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতির মনের মধ্যে যে সবের পরিকল্পনাও ছিল না, তাঁর সৃজন-লীলায় যার সূচনার আভাসমাত্রও দেখা যায়নি—সেই সব অদ্ভুত সৃষ্টি সেখানকার বৈজ্ঞানিক সন্ধানীরা প্রতিনিয়ত উদ্ভূত করে পৃথিবী শুদ্ধ তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালা জন্তু জানোয়ার কীট পতঙ্গের মধ্যে জোড় বিজোড় বাধিয়ে নতুন জাতের গাছপালা, জীবজন্তু—এবং নতুন ধরণের ফল ও ফসল আবাহনের চেষ্টা করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়নি যে তা নয়—আমাদের দেশেও এক আমের গাছে অন্য আমের কলম্ লাগিয়ে আরেক দোআঁশ্‌লা আম্‌দানি তো আক্‌চার দেখা যায়—এসব প্রয়াসের মধ্যেও সেই প্রকৃতিকে টেক্কা মারার ইতিহাস রয়েছে।

## নতুন ফল ও ফসল!

বস্তুতঃ, আজকে আমরা ধানচালের যে-চেহারা দেখি, হাজার বছর আগেকার বুনো ধানের সে-চেহারা ছিল না। ক্রমশঃ তাদের চালচলন বদলানো গেছে!—বলাবাহুল্য, ক্রমাগত আয়াসের দ্বারা এই ক্রমোন্নত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য সব খাদ্যশস্য সম্বন্ধেও সেই কথা। সেদিনের অনেক অকিঞ্চিৎকর ফলন আজ ঢের উপাদেয় ও মূল্যবান্ ফসলে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত; সেদিনকার অনেক বুনো ফল—যাদের ফল—যাদের বেলায়, 'মা ফলেষু কদাচন' বল্‌লে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হোতো না—আজ অমৃতোপম সুখাদ্যে রূপান্তরিত; এমন একগাদা নাম করা যায়। মানুষের বিস্ময়কর সাধ্য-সাধনার পরিণতি—পরমাশ্চর্য্য পরিণাম—এই সব ফল ও ফসল।

## লোগান্‌বেরী ফল!

অত্যন্ত অধুনা উদাহরণস্বরূপ "লোগান্‌বেরি" নামক একটি ফলের উল্লেখ করা যেতে পারে! আমেরিকার মিষ্টার লোগান্ একদা কোন্ এক খেয়ালের বশে ব্ল্যাক্‌বেরি (কালোজাম) আর র‍্যাস্‌প্‌বেরির (গোলাপজাম?) মধ্যে জোড় বাধিয়েছিলেন, দুই ফলের গুণ একত্র করে' নতুন কলমে সাবেক নব গরিমা প্রকাশ করার হয়ত তাঁর বাসনা হয়েছিল। এবং প্রকৃতিও মিঃ লোগানের গুণপনায় মুগ্ধ হয়েই কিম্বা নিজের এতদিনকার ত্রুটি ঢাকবার লজ্জাতেই, সঠিক বলা যায় না, উক্ত নতুন ফলাও —নব সাফল্যকে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করেনি। মিষ্টার লোগানের মিস্টতর কৃতিত্ব—নব আমন্ত্রিত এই লোগান্‌বেরি—আর তার বংশধরদের এখন আর অভাব নেই; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাদের বাড়বাড়ন্ত। এবং কেবলমাত্র, 'ফলেন পরিচীয়তেই' নয়, লোগানসাহেবের নামযোগেও তার পরিচয়।

## রঙ্‌চঙে ডিম!

বেল্‌ট্‌স্‌ভিলার বিজ্ঞানীদের সাধনার ক্ষেত্র ঢের বড়ো যথেষ্ট উদার—কেবল ফল আর ফসলের মধ্যেই তা আবদ্ধ নয়। উদ্ভিদ জগৎ থেকে প্রাণী জগতেও বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর গবেষণার অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ফল পাওয়া যাচ্ছে। গাছের ফল থেকে নেমে হাঁস মুরগীর ডিমে পর্য্যন্ত তাঁদের নজর গেছে—সর্ব্বজীবে তাঁদের সমদৃষ্টি। এতদিন ইস্টার্ পর্ব্বের সময়ে, ছেলেমেয়েদের আনন্দদানের নিমিত্ত, ডিমদের রঙ মাখিয়ে, রঙীন্ করে' বাজারে ছাড়া হোতো—ইস্টারের খাতিরে (পশুপক্ষীরা পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মের বাধ্য এই কথাটা জানাবার জন্যেই বোধ হয়) হাঁসমুরগীরা এই সব রঙ্‌চঙে ডিম পেড়েছে বলে' কচি কাঁচাদের অবাক্ করে' দেয়া হোতো। কিন্তু এখন আর এই ধরণের প্রবঞ্চনার প্রয়োজন নেই। বেল্‌ট্‌স্‌ভিলার মুর্গীদের দিয়ে ইচ্ছামত হরেক রঙের ডিম যখন খুসি পাড়িয়ে নেয়া যায়! বিশেষ একটা নিয়মের বশে বিশেষ রঙের ডিম পরিত্যাগ করতে তারা ইতস্ততঃ করে না। পছন্দমত যে কোনো রঙের—এমন কি রামধনু-মার্কা সাতরঙা ডিমও নাকি হাঁস মুরগীর কারখানা থেকেই অর্ডার মাফিক্ এখন পাওয়া যাবে!

## যে আপেল মাটিতে পড়ে না!

নিউটনের আমলে আপেলরা নাকি মাটিতে পড়তেই অভ্যস্ত ছিল। বল্‌তে কি, ওদের সেই স্বভাবসিদ্ধ দোষের ছুতো ধরেই নিউটন্ সাহেব মাধ্যাকর্ষণের কানুন্ বার করতে পেরেছিলেন। এখনো এখানে সেখানে—আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর আরো বিস্তর স্থলে, আপেলরা গাছের ডালে নিজেদের আর ধরে রাখতে না পারলে মাটিতেই অধঃপতিত হয়। বেল্‌ট্‌স্‌ভিলার আপেলদের গতিক আলাদা—গতি বিধি স্বতন্ত্র। তারা মাধ্যাকর্ষণের থোড়াই কেয়ার করে—ও-নিয়ম একেবারেই মানে না! জানেই না একেবারে। সেখানকার ছেলেরা আপেলগাছে নাড়া দিলে বৃন্তচ্যুত আপেল যে জমিতে এসে জমা হবেই তার কোনো মানে নেই, আসন্ন জমিদারির লোভ সম্বরণ করে' যথাস্থানেই তারা থেকে যেতে পারে, পরিত্যক্ত শাখার পাশাপাশি ভাসাও তাদের পক্ষে সম্ভবপর, এমন কি বেলুনের মত ওপরে উঠে আকাশে উড়ে যাওয়াও কিছু নাকি বিচিত্র না!

## যে মৌমাছি হুল ফোটাতে জানে না!

কেবল এই উদ্ভন্ত আপেলের দুরন্তপণাই নয়, বেল্‌ট্‌স্‌ভিলার আরো অনেক চমৎকারিত্ব আছে। তাঁরা এমন সব শিক্ষিত মৌমাছি সভ্য জগতে এনেছেন যারা হুল্ ফোটাতে জানে না—এমন কি তাদের যদি ফুলের পেয়ালা থেকে মধুপানের আনন্দ হতে জোর করে ছিনিয়ে আনাও হয় তবু তারা অহিংস ধর্ম্ম আচরণ করবে।

## মার্কা-মারা মুরগীর ছানা!

মুরগীর ছানারা জন্মানোর সাথেই মার্কামারা হয়ে আসা—তাঁদের অসংখ্য আশ্চর্য্যের একটি। ডিম ফুটে বেরুনোর সময়েই দেখা যায় তাদের গায়ে এক দুই তিন করে' ধারাবাহিক নম্বর দাগা রয়েছে।

**যে পেঁয়াজ চোখে জল আনে না !**

এমন সব পেয়াজ তাঁরা আমদানি করেছেন যার চোখ-জ্বালানো—চোখে জল-আনা ঝাজ্ নেই—যে সব পেঁয়াজের পয়জারে অশ্রুপাত করতে হয়না। এম্‌নি হাজারো রকমের আজব আর অভিনব তাঁরা আবিষ্কার করছেন—যার ফলে পৃথিবীর বহুৎ অভাব মোচন হতে পারে—এমন সব অভাব যে সব অভাবের ভার কোনোদিন আমরা বোধ করিনি অথচ যারা আমাদের মাত্রা অনেকখানি বাড়িয়ে দ্যায়।

প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডারের অসংখ্য দরজা—তার চাবি কাঠি বার ক'রে অজ্ঞাতপূর্ণ অফুরন্ত লীলার রাজধানী আমাদের চোখের সামনে তাঁরা উন্মোচিত করছেন। প্রকৃতির নিজের অন্তস্থলে যে-অনন্ত রকমের সম্ভাবনা সুষুপ্ত রয়েছে তা যা কেবল আমাদেরই অজানা তাই নয়, হয়ত বা প্রকৃতির নিজেরও অগোচর—সেই সব অসম্ভবকে তাঁদের বৈজ্ঞানিক তপস্যায় তাঁরা সম্ভাবিত করছেন। একে নবীন বিশ্বামিত্রের নবজগত সৃষ্টিও বলা যেতে পারে। তবে বিশ্বের সঙ্গে এর অমৈত্রী নেই।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

দূরে দাঁড়িয়েই ডাক্তারদের মারামারি দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ দেখি ডাক্তারেরা একে একে অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এ আবার কি হ'ল ? সর্দারও কিছু বুঝতে পারল না। গত বারে যে মারামারি হয়েছিল তাতে নাকি এ রকম দলবেঁধে তারা অজ্ঞান হয়নি! তা হ'লে এবার নিশ্চয়ই নতুন কিছু বিপদ হয়েছে। সর্দারের সঙ্গে আমরা সেই ডাক্তারের গাদা ঠেলে চলতে লাগলাম। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখি একটি লোক চীৎকার করে বলছে, "আমিও ডাক্তার হয়েছি, আমিও ডাক্তার হয়েছি।" সর্দার তাকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারল সেই লোকটিই রোগী। তাকে চিকিৎসা করার জন্যই ডাক্তারদের ভীড় হয়েছিল। কিন্তু এবারে রোগী নিজেই ডাক্তার হ'য়ে পড়েছে কারণ গতবারের মতো সে আর একটি টাকাও এবারে নষ্ট করতে রাজি নয়। তাকে দায়ে পড়েই ডাক্তার হ'তে হয়েছে, আর এ রকম মর্মান্তিক খবর শুনে ডাক্তারদের মতো কঠিন লোকও যে মূর্ছিত হ'য়ে পড়বে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আমরা কিন্তু বিস্মিত না হ'য়ে পারলাম না। ৪৯৯৯ জন ডাক্তারের গাদা একটা দেখার মতো জিনিস।



সর্দারকে বললাম, "সর্দারজি আমরা যে-দেশে থেকে এসেছি সেখানে সব দৃশ্যই অতি মধুর। বাংলাদেশের সেই মধুর এবং স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখে দেখে মন কেমন যেন একটা মোহে আবিষ্ট হ'য়ে আছে, সেই মোহ এখন মন থেকে দূর করতে চাই। আমার মনে হচ্ছে ডাক্তারদের স্তূপের এই দৃশ্যটি আমার মনকে সজীব ক'রে তুল্‌ছে, মনের মুগ্ধ ভাবটা যেন দূর হ'য়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারছি না—তুমি একটু দাঁড়াও সর্দারজি, আমি এ দৃশ্যটি মনভরে দেখে নি।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সর্দার আমার কথায় রাজি হ'ল। আমি সেইখানে বসে পড়লাম, মণ্টুও একটু দূরে ব'সে ডায়েরি লিখতে লাগল। নিতাই কিন্তু বসল না, সে ডাক্তারদের খুব কাছে গিয়ে তাদের চোখমুখ ভাল ক'রে দেখতে লাগল। সর্দার দূরে বসে রইল।

মিনিট পাঁচেকও যায়নি এমন সময় হঠাৎ কার ধাক্কায় চমকে উঠলাম। পিছনে চেয়ে দেখি কেউ নেই। ভয়ে আমার সকল গা কাঁটা দিয়ে উঠল। কাউকে দেখি না···অথচ ধাক্কা মারল কে ?—ডাক্তার তো একটিও মরেনি, অজ্ঞান হ'য়ে আছে মাত্র। তাছাড়া মানুষ মরলেই যে ভূত হয় এটা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু তবু কেমন যেন ভয় হ'তে লাগল। ভয়ে চেঁচাতেও পারছি না, অথচ না চেঁচিয়েই বা কতক্ষণ থাকব ? আমার চীৎকার শুনলে মণ্টু আর নিতাই দুজনেই হয়তো ডাক্তারদের মতোই অজ্ঞান হ'য়ে পড়বে। চীৎকারটা গলা পর্যন্ত এসেছিল, তাকে গলাসুদ্ধ চেপে ধরলাম, তারপর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কে তুমি ধাক্কা মারছ ?"

শূন্য জায়গা থেকে উত্তর এল, "আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।"

আরও চমকে উঠলাম। আমার সমস্ত গা হাত পা কাঁপতে লাগল, মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোল না। শুনতে পেলাম "যে বাঘকে গুহার মধ্যে ফেলে এসেছ আমি সেই বাঘ।"

মুহূর্তে ভয় দূর হ'য়ে গেল। বললাম, "তা হ'লে তো খুব ভালই হ'ল, কিন্তু তুমি কি মরে গিয়ে ভূত হ'য়ে এসেছ ?"

বাঘ বলল, "না, আমি তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছি, তাই ইচ্ছে করলেই এখন অদৃশ্য হ'তে পারি। আর শুধু তাই নয়, আমি এতদিন কিছু না খেয়ে তপস্যা করেছি ব'লে, এখন সব কিছু খেতে পারি। আমি আগে যেমন হিংসা করতাম, এখন আবার সেই রকম হিংসা করতে পারি—তবে ভয় নেই তোমাদের কোনো অনিষ্ট আমি করব না।"

আমি বললাম, "এ আবার কেমন তপস্যা ? তপস্যা ক'রে কেবল অদৃশ্য হ'তে পারলে, হিংসা ছাড়তে পারলে না ?"

বাঘ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপে চুপে বলল, "খাওয়ার সঙ্গে তপস্যার কোনো সম্পর্ক আছে এমন কথা আমি আর বিশ্বাস করি না, কিন্তু এসব কথা এখন আর বলব না, তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝতেও পারবে না। তবে এইটুকু শুধু জেনে রাখ যে আমি আবার সংসারে ফিরে যাব, এবং আগে যা যা করেছি সে সবই করব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মানুষও খাবে ?"

বাঘ বলল, "তা বলতে পারি না ; তার কারণ যে-মাংস রোজ খাই সেইটেই খেতে ভাল লাগে। মানুষের মাংস তো আর রোজ পাই না, কাজেই খেতে প্রবৃত্তি হয় না, তবে তা যে খারাপ লাগে তা নয়। এক এক দেশের এক এক রকম মানুষ ভাল লাগে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বাংলা দেশের কোন্ কোন্ মানুষ তোমার ভাল লাগে ?"

বাঘ এদিক ওদিক চেয়ে খুব চাপা গলায় বলল, "কাউকে বল না, বাংলাদেশের কবিদের মাংস আমার ভারি পছন্দ।"

"কেন?"

বাঘ বলল, "কেন জানি না, তবে কবি দেখলেই জিভ দিয়ে জল পড়ে।"

আমি বললাম, "তবে যে লোকে বলে বাংলাদেশের কবিদের মাংস নেই!"

বাঘ বলল, "মাংস নেই ব'লেই খেতে খুব আরাম। হাড়গুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খাই, তাতে দাঁতের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে।"

মণ্টু ও নিতাই দূরেই ছিল, সর্দারও একটু দূরে বসে ছিল, তাই আমরা নির্ভয়ে চুপে চুপে আলাপ করতে লাগলাম। বাঘকে বললাম, "দু একটা ডাক্তার খেয়ে দেখ না কেমন লাগে।"

"তা কথাটা মন্দ বলনি। যাদের দেখছি এরা বুঝি সব ডাক্তার? কিন্তু এরা বেঁচে আছে তো—আমরা কিন্তু মরা মানুষ খাই না।" এই কথা ব'লে বাঘ অজ্ঞান হওয়া ডাক্তারদের শুঁকে দেখে বলল, "মরেনি তো! তা হ'লে তোমার অনুমতি নিয়ে শুভ কাজ আরম্ভ করি।"

বাঘকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু সুমুখেই দেখতে পেলাম একটা ডাক্তারের ঘাড় থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গেল, আর সেইখান থেকে তীরবেগে রক্তের স্রোত বইতে লাগল। কিন্তু এক সেকেণ্ডের বেশি আর দেখতে পারলাম না, আমার গায়ে এক ধাক্কা মেরে বাঘ বলতে লাগল, "আরে রামো-রামো—এর চোদ্দ পুরুষে কেউ ডাক্তার নয়! সব ভণ্ড, প্রতারক! কম করেও চার পাঁচটা ডাক্তার আমি এর আগে খেয়েছি, কিন্তু তারা তো এর মতো এমন অখাদ্য নয়!—নিশ্চয় এরা সব জোচ্চোর—লোক ঠকিয়ে খায়।"

মনে হ'ল বাঘ ঠিক কথাই বলছে। সর্দারও বলেছিল এদেশে ডাক্তারি শিখতে কাউকে কিছু পড়াশোনা করতে হয় না, ডাক্তারি করতে কাউকে কিছু শিখতে হয় না। বাঘকে সে কথা জানালাম। বাঘ বলল, "এদের সবাইকে মেরে রেখে গেলে মন্দ হয় না।"

আমি বললাম, "না ভাই বাঘ, ওরকম কিছু করো না, তা হ'লে আমাদের ভারি নিন্দা হবে, বিদেশে এদের নিন্দার কিছু করা উচিত নয়। তার চেয়ে চল আমাদের সঙ্গে, তুমি অদৃশ্য হ'য়েই থেকো, তা হ'লে বেশ মজা হবে।"

আমরা সবাই আবার চলতে লাগলাম। বাঘ অদৃশ্য হ'য়েই রইল। মণ্টু বলল, তার ডায়েরির নতুন লেখাগুলো খুব নাকি মনের মতো হয়েছে। নিতাই এক ডাক্তারের হাত থেকে প্রকাণ্ড এক থার্মোমিটার নিয়ে এসেছে, সে জন্য তারও খুব ফুর্তি হয়েছে। কিন্তু সর্দার সেটা দেখে বলল, সেটা থার্মোমিটার নয়, গোরু তাড়ানো ছোট লাঠি।

কিছুদূরে এগিয়ে যেতেই দেখি প্রকাণ্ড এক হলঘরে এই নতুন দেশের নাটক অভিনয় হচ্ছে। সর্দার জিজ্ঞাসা করল, "দেখবে আমাদের নাটক?"

আমি বললাম, "সকাল বেলাতেই নাটক?"—

সর্দার বলল, "শুধু সকাল বেলা নয়, চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রেই আমাদের নাটক অভিনয় হয়।"

আমি বললাম, "নিশ্চয় দেখব তোমাদের নাটক, নাটক দেখতে আমরা বড় ভালবাসি। আমাদের দেশে আমরা নাটক অভিনয় করি, তোমাদের নাটক দেখলে নিশ্চয় নতুন অনেক কিছু শিখতে পারব। কিন্তু সর্দার, টিকিট কেনার মতো পয়সা হয় তো আমাদের কাছে নেই।"



সর্দার বলল, "আমাদের দেশের নাটক দেখতে পয়সা লাগে না। এখানে লোক জোটানোই এক দায়। অথচ এমন সুন্দর আমাদের নাটক, আর এমন বাস্তব যে তোমরা দেখতে বসলে ভুলেই যাবে যে নাটক দেখছ; তোমাদের মনে হবে সত্যি ঘটনা দেখছ।

সর্দারের কথা শুনে ভয়ানক কৌতূহল হ'ল। আমরা কয়েকটা খালি আসনে গিয়ে বসলাম। নাটক আরম্ভ হ'তে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী, শুনলাম এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল সব সময়েই নাটক অভিনয় হচ্ছে। এখানে একই পালা দশবারো বার অভিনয় হয়। এখন অভিনয় হচ্ছে রাবণবধ। এই নতুন দেশের লোকেও রাবণের কথা জানে দেখে খুব ভাল লাগল।

দর্শকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর এক কোণে একটি লোককে দেখে আমরা হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম। দেখলাম লোকটা বসে আছে বটে কিন্তু তার মাথা নেই।

সর্দার আমাদের বিস্ময় দেখে বুঝতে পেরে বলল, "ওকে দেখে ভয় পেয়ো না, ঐ হচ্ছে নাট্যকার। রাবণবধ পালা ওরই লেখা।"

"তা হ'লে ওর মাথা নেই কেন?"—মণ্টু প্রশ্ন করল।

সর্দার বলল, "আমাদের দেশের নাটক-লেখকদের মাথা থাকতে নেই। তুমি হয়তো লক্ষ্য করো নি, আমাদের দেশে কতকগুলো লোকের মাথা নেই, শুধু হাত পা আর দেহটা আছে। তারা সবাই নাটক লেখে। কিন্তু এতে সুবিধা হয় কি জান? সুবিধা হয় এই যে এরা তাড়াতাড়ি অনেক নাটক লিখে ফেলতে পারে, দরকার হ'লে প্রতিদিন একখানা ক'রেও লেখে।

নিতাই এতক্ষণে কথা বলল। তাকে আমরা এতক্ষণ বিশেষ লক্ষ্যই করিনি। সে বিরক্ত হ'য়ে বলল, "তোমরা একটু চুপ কর, নাটক যে আরম্ভ হ'য়ে গেল দেখছ না?"

নাটক সত্যিই আরম্ভ হ'ল। আগেই বলেছি নাটকের নাম রাবণবধ, দুইপাশে রাম এবং রাবণের সৈন্যেরা এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে রাবণ প্রবেশ ক'রে একপাশে কখন দাঁড়িয়েছে টের পাই নি—কিন্তু দর্শকদের সবাই একসঙ্গে 'ঐ রাবণ ঐ রাবণ' ক'রে হেসে ওঠাতে বোঝা গেল রাবণ এসেছে। রাবণ তার সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিল—"মারো বানর সৈন্যদের, মেরে একেবারে শেষ ক'রে দাও।"

এ কথায় উপরের কোনো অদৃশ্য জায়গা থেকে হনুমান এক লাফে স্টেজের উপর প'ড়ে রাবণের দিকে ভেংচি কাটতে লাগল আর বলতে লাগল, "তবেরে হতভাগা রাবণ, তোর দম্ভ আজ আমি চূর্ণ করব।" রাবণ বলল, "সে আর তোর কাজ নয় পাষণ্ড হনুমান। আমি অমর, আমাকে কেউ মারতে পারে না।" হনুমান বলল, "সে আমি খুব জানি। তোর মৃত্যুবাণ কোথায় আছে তাও জানি।—আর এই দেখ তা নিয়েও এসেছি। এই বাণ রামের হাতে পড়লে তোর আর রক্ষা নেই।"

রাবণ হেসে বলল, "ওসব ধাপ্পাবাজিতে আমি ভুলছিনা, আমার মৃত্যুবাণ এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যে তোর মতো মূর্খ তার সন্ধান পাবে না। যেটা দেখাচ্ছিস ওটা নকল বাণ, তুই কোত্থেকে তৈরী করিয়ে এনেছিস, ওতে রাবণ ভয় পায় না।"

হনুমান বলল, "ভয় পাও কি না টের পাওয়াচ্ছি। ওখানে চুপ করে দাঁড়াও। প্রভু রামচন্দ্র, এই নিন রাবণের মৃত্যুবাণ, মারুন ওর বুকে।"

রামচন্দ্র একটি কথা না ব'লে হনুমানের হাত থেকে বাণটি ধনুকে লাগিয়ে এমন জোরে রাবণের বুকে ছুঁড়ে মারল যে রাবণ তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে চীৎকার কার মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস সৈন্যরা করুণ সুরের একটা গান ধ'রে দিল এবং গান শেষ হওয়ামাত্র বানর সৈন্যরা 'রামচন্দ্রের জয়' ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়ে রাক্ষস সৈন্যদের ঠাট্টা করতে করতে চলে গেল।

অভিনয় শেষ হ'য়ে গেলে সর্দার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগল?"

আমি বললাম, "কৈ সব সত্যিই ঘটছে এমন তো মনে হ'ল না।

সর্দার বলল, "কেন, রাবণের মৃত্যু?"

"ওকি সত্যিই মরেছে?"

সর্দার অবাক হ'য়ে বসল, "তা হ'লে এতক্ষণ দেখলে কি?"

(ক্রমশঃ)

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কন্‌ট্রাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

# লোলুপ পৃথিবী

শ্রীধর

নীল সমুদ্র-ঘেরা সবুজ দ্বীপে তার দেশ। বাপমা-হারা এক রত্তি ডুবুরীর ছেলে।

ডিঙ্গি থেকে অগাধ জলে ডুব দিয়ে সে শুক্তি-ঝিনুক তোলে। একশ ঝিনুকে তার একটি পয়সা মেলে। ব্যাপারী সাহেবরা ঝিনুক নেয় আর সে পয়সা পায়। জলের তলায় তলায় হাত পা মেলে খেলা করতে তার খুব ভাললাগে, প্রবাল পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঝালর মাছের পেছন পেছন সে ছুটে ছুটে যায় আর কোল জুড়ে ঝিনুক তোলে। ডিঙ্গির ওপর বসে সাহেবরা পাইপ টানে আর মিষ্টি রোদে ঝিমোতে ঝিমোতে মুক্তোর স্বপ্ন দেখে। দম্‌কা হাওয়ায় যদি তাদের সুখের স্বপ্ন ছুটে যায়, আল্‌সে চোখে তারা স্থির সমুদ্রের দিকে চায় আর ভাবে: কেলে ছোঁড়াটা মরে বুঝি!

কিন্তু কেলে ছোঁড়া মরে না। ছোট ছোট হাত পা মেলে সে বারবার ভেসে ওঠে, বার বার কোলে করে ওঠে গাদা গাদা শুক্তি-ঝিনুক। একশ ঝিনুক এক পয়সা। একটি সুন্দর তামার চাকতি। খুব সস্তা।

ঝিনুক পেয়ে সাহেবরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কাড়াকাড়ি করে তারা ঝিনুকের জোড়গুলি খুলতে থাকে। চোখে মুখে তাদের ফুটে ওঠে লোভের লাল স্বপ্ন। তারা মুক্তো খোঁজে। রূপোসী মুক্তো! একটা মুক্তোয় একটা গোটা রাজ্য কেনা যায়। ডুবুরীর ছেলে সেই মুক্তো আনে। সে পায় একটি তামার চাকতি, তাতেই হাসিতে তার ছোট্ট দাঁতগুলি একসার মুক্তোর মতই ঝক্‌ঝক করে ওঠে।

মুক্তো নিয়ে সাহেবরা একদিন উড়ন্ত জাহাজে করে কোন্ দুরন্ত দেশে চলে যাবে। যে দেশে মুক্তোর ভারী জাঁক ভারী কদর, যে দেশ থেকে ঐ ব্যাপারী সাহেবরা সবুজ দ্বীপে এসেছে। নিক্‌না তারা যত খুশী মুক্তো। সে শুধু সমুদ্রের তলার নীল রাজ্যে হাত-পা মেলে খেলা করবে, সে যেতে চায়না কোথাও আর কিছু তার ভালই লাগে না। ব্যাপারীরা সে কথা জানে না যে তা নয়, খুব জানে। তার দুঃসাহসী বাপ-মা তারাও যে ডুবুরী ছিল। তাদের কড়া হাত দিয়ে ডুবুরীর ছেলের নরম পিঠ তারা বারবার চাপড়ে দেয়। একমুখ হেসে বুকভরা দম নিয়ে ক্ষুদে ছেলেটা আবার ডুব দেয়। ঝিনুক নিয়ে আবার ভেসে ওঠে।

তারপর রাতে সে পাতা-ছাওয়া তার ছোট্ট গোল কুঠিরে ফিরে আসে। খেজুরের গুড় আর নারকোলের দুধ খেয়ে তার মাচার ওপর শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে সমুদ্রের গান শোনে। বড় করুণ গান গেয়ে গেয়ে সমুদ্র যেন তাকেই ডাকে। শুনতে শুনতে তার চোখের পাতা বুজে আসে। তারপর তার শান্ত সরল চোখেমুখে ভাসতে থাকে এক মধুর স্বপ্ন। সমুদ্র-তলার এক অপরূপ নীল স্বপ্ন।

···· গভীর গভীর তলায় কত রূপের কত রঙের প্রবাল, দেশ জুড়ে মেলাই রঙের মেলা। কত রঙের কত সৌখীন মাছ, পাৎলা পাখা মেলে খেলা করছে। আলোর মাছ, ঝালর মাছ, ঝুমুর মাছ, ঝুমকো মাছ, টোপর মাছ, মুকুট মাছ, আরো কত মাছ, কত তাদের বাহার! কেউ পরেছে ঢেউ-তোল্ ঘাঘরা, কেউ দিয়েছে নীল চুমকি-ওড়্না, কেউ পরেছে জোড়া ঘুঙুর, কেউ বা সীঁথি-মৌর। বড় মাছ, মেজ মাছ, ছোট মাছ, কুচো মাছ। আর কত রকম

জাব্বাজোব্বা জীবজন্তু, কত রকম পাখ্না ডানা, কত রকম কান্‌কো ফুল্‌কো, কত রকম মুখ যেন মুখোস, কত সঙ কত ঢঙ।—সবাই ভীড় করে আসে তাকে দেখতে। নরম সরম গাছপালারা, তারাও মাথা দুলোয়। তাদের দুলতুলে ননীর গড়ন, ঝলঝলে সাজপোষাক, ঢলঢলে।চালচলন। সবুজে সবুজে, সুনীলে নীলে রঙরঙে রাজ্য, কত চমক্ পাথর, কত মুক্তো-ভরা ঝিনুক, কত নীলমণি লালমাণিক। টল্‌টলে জল আর স্নিগ্ধ সুনীল আলো।·····

সারা রাত ডুবুরীর ছেলের মুখে মিষ্টি হাসি জেগে থাকে। সারা রাত ডুবুরীর ছেলে ঘুমিয়ে থাকে। গভীর রাতে আকাশের চাঁদ নীচে নেমে আসে ও চুপ করে দেখে।

রাতের নীল স্বপ্ন ভোরের লাল সমুদ্রে ফিরে যায়। ডুবুরীর ছেলে চোখ মেলে চায়। সমুদ্র-তলার নীল স্বপ্ন, সমুদ্র-তলার সুনীল রাজ্য, কোথায়? তার বাপ-মা বুঝি সেখানেই বেড়াতে গিয়েছে। সেও একদিন যাবে। রাতের নীল স্বপ্ন ভোরের লাল সমুদ্রে যেখানে লুকিয়েছে বুঝি সেইখানে।

লাল মুখে সূর্য্যি ওঠে। রূপোলী বকেরা চেঁচিয়ে ডাক দেয়—কাজে যাও।

দিন গড়াতে থাকে। ধাপে ধাপে সূর্য্য আকাশে উঠতে থাকে।

আর কালো জলের ওপর ডিঙ্গিতে সাহেবরা বসে থাকে। দূর থেকে তাদের সোলার টুপি দেখা যায়। একটা পুঁচ্‌কে কালো এক টুক্‌রো ছেলে, তার জন্য এক দল ধাম-ধুম্‌সো লোক বসে থাকে।

ঝিনুক তোলা শুরু হয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। কত সূর্য্য ওঠে, কত সূর্য্য অস্ত যায়। কত চাঁদিনী রাত, কত কোটি তারা, ঘুরে ফিরে আসে যায়। সমুদ্রের কত গান, কত নীল স্বপ্ন ভাসে, মিলিয়ে যায়।

গোটা পাঁচেক মুক্তো সাহেবদের পকেট বন্দী হয়েছে। আরো বুঝি চাই; ওতে কি হবে! অনেক অনেক দূর থেকে অনেক অনেক খরচ করে তারা না এসেছে। পাঁচটা নয়, গোটা পঁচিশ হলেই তারা নাকি চলে যাবে।

মোচার খোলার মত কাঁপতে কাঁপতে ডিঙ্গি ঘুরতে থাকে সমুদ্রের আনাচে কানাচে। ঢোট সবুজ দ্বীপ ছোট্ট হয়ে আসে। আর বুঝি দেখা যায় না। ডিঙ্গি থামলো এবার এক জায়গায়। জলটা এখানে কালো ও গভীর। রাজ্যটা যাদের সেই করাত মাছ, দাঁতল মাছ, হাঙ্গর, কুমীর, অক্টোপাস সবাই একে একে মুখ তুলে দেখল —একটা ছোট্ট পুঁচকে ছোঁড়াকে নিয়ে একদল বিদেশী এসেছে। এবার বুঝি কিছু একটা তামাসা হবে। মজা দেখতে জলে ডুব দিল তারা।

বন্দুক নিয়ে সাহেবরা সতর্ক হয়ে বসে। এ জায়গার জলের তলাটা বড় সুবিধের নয়, যদিও মুক্তো পাওয়ার পক্ষে খুব সুবিধে। তাদের মুক্তো চাই, পঁচিশটা পুরো হলেই তারা চলে যাবে।

এখানে সাহেবেরা তাকে একটা ঝিনুকে এক পয়সা দেবে। একটি মাত্র ঝিনুক এক পয়সা। চকচকে সুন্দর গোল তামার চাকতি। খুব সস্তা।

ছুরিটা কোমরে গুঁজে একরত্তি কালো ছেলেটা ফিক্ করে হেসে জলে ডুব দিল।

কিন্তু জলের নীচে গিয়ে ওপরের লোকদের কথা সে বুঝি ভুলে যায়, চক্‌চকে গোল তামার চাকতির কথা ভুলে যায়। তার সেই রোজ রাত-দেখা নীল স্বপ্ন সে বুঝি এবার চোখ মেলে দেখতে থাকে। দেখে দেখে তার বুঝি আশ মেটে না। গভীর জলের আনাচে কানাচে ওৎ-পাতা রাক্ষসগুলোকে সে গ্রাহ্য করে না, তাদের জ্বলন্ত চোখে জল



ফুটিয়ে সে নীচে আরো নীচে বিদ্যুৎগতিতে নেমে যায়। যতক্ষণ দম ততক্ষণ সে প্রাণভোরে খেলা করে বেড়ায় আর চোখভোরে দেখে। তারপর দুহাত মুঠো করে শুক্তি-ঝিনুক নিয়ে উঠে আসে।

আকাশ সূর্য্য দাহনে জলতে থাকে, পৃথিবী ও সমুদ্র টলতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন।

দশটা মুক্তো হয়েছে বিশটা দিনে। দশটা রাজ্য তাদের হাতের মুঠোয়। হলুদে দাঁতগুলো ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে থাকে। আর মিট্‌মিটে চোখে এদিক ওদিক চায়।

একুশ দিনের দিনটা ভোরেই যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু ডুবুরীর ছেলের চোখে আগের রাতের মধুর স্বপ্ন আজ গভীর রহস্যে ভাসছে। গভীর অতল সমুদ্রের সেই অতি অপরূপ সুনীল স্বপ্ন।

কালো জলের ওপরে সাহেবেরা পুড়তে থাকে। চোখে তাদের দুনিয়ার লোভ। কালো জলের নীচে থাকে হিংসুক হাঙ্গরেরা চোখে তাদের দুনিয়ার ক্ষুধা।

বারবার ডুব, বারবার ভেসে ওঠা; কালো ছেলে গভীর কালো জলে হেলায় জীবনমরণ খেলা করে। সে খেলা নেশা জাগায় ওপরের তপ্ত বাতাসের শিরায়, নেশা জাগায় নীচের গভীর কালো জলের পাঁজরে।

পৃথিবীর এক রত্তি এক ছোট্ট শিশু কেবল একলাই বুঝি স্বপ্ন দেখে। সমুদ্র-তলার সেই অপরূপ নীল স্বপ্ন। সমুদ্র তলার এক শান্ত সুনীল রাজ্য। লোলুপ পৃথিবীতে সে রাজ্য তৈরী হয়না। ছোট্ট এক রত্তি ডুবুরীর ছেলে বুক-ভরা দম নিয়ে হাত-পা মেলে তাই বুঝি দূর দূর চলে যায়—সেই নীল স্বপ্ন তারই খোঁজে·····

লোলুপ পৃথিবীর মানুষ তারা স্বপ্ন দেখে না। তাদের চোখ নেই। শুধু দুখানা মস্ত হাত আছে। লোলুপ পৃথিবীর হাঙ্গরেরা, তারাও স্বপ্ন দেখে না। তারা শুধু মুখ সর্ব্বস্ব, পেটের ও মুখের গহ্বরটা বড় করে যারা জলের তলায় ওৎ পেতে থাকে।

তাই ওদের না জানিয়ে বুঝি ডুবুরীর ছেলের চোখের সামনে সেই নীল স্বপ্ন চুপি চুপি ধরা দেয়। সে বুঝি এবার পৌঁছায় তার স্বপ্নে দেখা প্রবাল পুরীতে। কি অপরূপ সে রাজ্য! কি শান্তি। সেই ঝালর মাছ আর ঝুমকো মাছ ডাগর চোখে তাকে দেখছে, মুকুট-পরা মুকোস মাছও আসছে, তুলতুলে গাছপালারাও এলো। চমক্ পাথর, চুম্‌কি চুণী। ঢেউ-খেলানো প্রবাল পুরী।···শাঁখেরা বাজে। টুং টুং করে টলটলে জল আর ঢলঢলে নীল আলো।···

হঠাৎ জলের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল। মুহূর্ত্তের জন্যই বুঝি একবার জল কেঁপে উঠল।

নীচের খবর জানতে ওপরের পৃথিবীর দায় নেই। সাহেবেরা যেখানে ডিঙ্গির ওপর বসে পাইপ টানতে টানতে বাগ-বখরার গল্প করছিল, ঠিক তারই নীচে কালো সমুদ্রে হঠাৎ একটা লাল রেখা মুহূর্ত্তে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

সুদূর ফেনীল সমুদ্র সীমান্তে লাল সূর্য্যও অস্তমিত হল।

আর শান্ত হল সমুদ্র।

আবার টলটলে হল জল, সেই টলটলে জলের হাজার তলার নীচে ভাসতে ভাসতে স্বপ্ন-গড়া ঢেউ-তোলা প্রবাল-গুহায় হঠাৎ দেখা·····ডুবুরীর বাপ-মা! সে জানতো ওরা মিথ্যে বলেছে, তার বাবা মা নেই। সমুদ্র-তলার সেই অপরূপ নীলপুরীতে তার স্বপ্ন বুঝি এতদিনে সত্যি হল। বাপ মায়ের বুকের আদরে সে মিশে গেল।

আসন্ন আঁধারে সচকিত হয়ে বিদেশীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা লাগতে পারে আর অপেক্ষা করা চলে না। তাদের পকেটে যে মুক্তোগুলো আছে তাতে তাদের অধঃস্তন চোদ্দ কোটি পুরুষ গা ঢেলে জীবন কাটাতে পারবে। পাইপ টানতে টানতে তারা লোলুপ পৃথিবীর দিকে ফিরে গেল।

আর সেই পৃথিবী থেকে পালিয়ে শুধু একটি অপরূপ নীল স্বপ্ন সমুদ্রের গভীর কোলে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

---

BLEED THROUGH.

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

## সপ্তম অধ্যায়

### হৈম সংঘ

১৩৭০-১৩৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জেঙ্গীজ খাঁয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহা-সাম্রাজ্যের অধিকাংশই মানচিত্রের উপর থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তৈমুরের সাম্রাজ্যের উত্তরে ও পূর্ব্বে জেঙ্গীজের বংশধররা তখনো বিরাট এক ভূভাগের উপরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। একে ডাকা হ'ত "হৈম সংঘ" নামে।

কেবল এর শাসনকর্ত্তারা ছিলেন মোগলবংশীয়। অধীনস্থ জাতিদের মধ্যে নানাদেশীয় যাযাবরদের সঙ্গে ছিল অসংখ্য রুসীয়, বুলগেরীয়, আর্মেনিয়ান ও বেদে প্রভৃতি। আধুনিক রুসিয়ার অধিকাংশই ছিল এই হৈম সংঘের অধীনে।

শাসক-সম্প্রদায় বা মোগলরা অর্দ্ধ-পৌত্তলিক ছিল। তাদের তৈমুরের তাতারদের জাত-ভাই বলা যায়। তাদের প্রধান দুই নগর ছিল ভোল্গা নদীর তীরবর্ত্তী সরাই এবং কাস্পিয়ান সাগর তটস্থ অষ্ট্রাকান। সুদীর্ঘ দেড় শ বৎসর কাল ধ'রে য়ুরোপের শিয়রে তারা জেগেছিল দারুণ দুঃস্বপ্নের মত। পূর্ব্ব য়ুরোপ তাদের হস্তগত ছিল তো বটেই, তার উপরে তারা পোল্যাণ্ডেও এসে হানা দিয়েছিল।

মস্কোর রাজকুমার মিট্রি একবার মাত্র দেড়লক্ষ রুসীয় সৈন্য নিয়ে এই মোগলদের আক্রমণ ক'রে হারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নি।

এই সময়ে মোগল সম্রাট ছিলেন উরুস্ খাঁ।

উরুস-খাঁয়ের এক নিকট আত্মীয়ের নাম তোক্তামিস। সম্ভবত সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যে একদিন তিনি উরুস্ খাঁয়ের পুত্রকে হত্যা ক'রে তৈমুরের কাছে পালিয়ে গেলেন।

মোগলদের দূত তৈমুরের কাছে গিয়ে জানালে, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রভু মহামহিমময় উরুস্ খাঁ আমায় পাঠিয়েছেন। তৈমুর, হয় তুমি তোক্তামিসকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর, নয় কর অস্ত্রধারণ!"

তৈমুরের চোখে জাগছে তখন পৃথিবী-বিজয়ের স্বপ্ন! তিনি বুঝলেন, এ স্বপ্ন সফল করতে গেলে মোগলদের সঙ্গে একদিন না একদিন তাঁকে শক্তি-পরীক্ষা করতে হবেই। কাজেই এ সুযোগ তিনি ছাড়লেন না।

তৈমুর বললেন, "দূত, তোক্তামিস আমার আশ্রিত। তাঁকে আমি ত্যাগ করব না। উরুস্ খাঁকে গিয়ে জানিও, আমি অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত।"

দূত ফিরে গেল। তৈমুর তোক্তামিসকে 'পুত্র' ব'লে ডাকলেন। এবং হৈম সংঘের মোগলদের কাছ থেকে দুটি সহর কেড়ে নিয়ে তোক্তামিসের হাতে সমর্পণ করলেন। উপরন্তু তাঁকে অনেক সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থসম্পত্তি উপহার দিতে ভুললেন না।



তোক্তামিস হৈম সংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন, কিন্তু পরাজিত হলেন।

তৈমুর আবার তাঁকে নূতন সৈন্য দিলেন। তোক্তামিস আবার করলেন যুদ্ধযাত্রা। কিন্তু আবার হেরে ভূত হয়ে, কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এলেন তৈমুরের কাছে।

এমনি সময়ে উরুস্ খাঁয়ের মৃত্যু হ'ল এবং তোক্তামিস যুদ্ধে হেরেও লাভ করলেন হৈম সংঘের সিংহাসন!

রাজধানী সরাই সহরে গিয়ে তোক্তামিস প্রথমেই মস্কো ও রুসিয়ার রাজাদের কাছ থেকে কর চেয়ে পাঠালেন।

এরই দুই বছর আগে মিট্রির নায়কতায় রুসীয়রা হয়েছিল যুদ্ধে জয়ী। তারা কর দিতে রাজি হ'ল না।

মোগলরা বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত রুসিয়ার উপরে ভেঙে পড়ল। রুসিয়ার গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর দিগবিদিকব্যাপী অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল—লক্ষ লক্ষ লোক হ'ল হত ও আহত এবং মস্কো হ'ল তোক্তমিসের হস্তগত। সমগ্র রুসিয়া রক্তাক্ত হয়ে আবার মোগলদের অধীনতা স্বীকার করলে।

তোক্তামিস এখন আর পলাতক ও পরের গলগ্রহ নন—হচ্ছেন অর্দ্ধ য়ুরোপ-এসিয়ার সম্রাট! তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার কোনই মূল্য নেই।

সমরখন্দের আশ্চর্য্য ঐশ্চর্য্য স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছে। সেখানে তৈমুরের আশ্রয়ে বেশ কিছুকাল বাস করে তিনি যে বিলাসিতার আস্বাদ পেয়েছেন, মোগল-সম্রাজ্যের সিংহাসনে ব'সেও তা ভুলতে পারলেন না।

তৈমুর তখন রাজধানী থেকে বহুদূরে—কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে।

ঠিক সাতদিনে ঠিক নয়শত মাইল পার হয়ে রাজধানী সমরখন্দ থেকে এক অশ্বারোহী বার্ত্তাবহ এসে উপস্থিত!

কি খবর? না, তোক্তামিসের মোগলবাহিনী সমরখন্দের অনতিদূরে এসে হাজির হয়েছে!

তৈমুর বিদ্যুৎ-বেগে তখনি যুদ্ধযাত্রা করলেন।

তৈমুরের পুত্র ওমার শেখ প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেও মোগলদের কাছে হেরে গিয়েছেন, তাতার সৈন্যরা পলাতক। শত্রুরা বোখরা পর্য্যন্ত এসেছে—সেখানকার রাজপ্রসাদ পুড়িয়ে দিয়েছে। সুযোগ দেখে উরগঞ্জের সুফীরা এবং চিরশত্রু ভাটি-মোগরা আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

কিন্তু ঘটনাক্ষেত্রে তৈমুরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য-পরিবর্ত্তন।

তোক্তামিস সদলবলে স'রে পড়লেন। সুফী ভাটিদের দেশ প্রায় সমভূমিতে পরিণত ক'রে তৈমুর সেখানকার বাসিন্দাদের বন্দী ক'রে সমরখন্দে নিয়ে এলেন।

তৈমুর বললেন, 'নিমকহারাম তোক্তামিস অকারণে আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে—আমার প্রজাদের উপরে অত্যাচার করেছে। এর প্রতিশোধ চাই।"

আমীর-ওমরাও জিজ্ঞাসা করলেন, "কি প্রতিশোধ সম্রাট?"

—"আমি তোক্তামিসকে দমন করব, তার রাজ্য আক্রমণ করব।"

—"সম্রাট, সে যে অসম্ভব! তোক্তামিসকে ধরতে হ'লে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী মরুভূমির মধ্যে ছুটে বেড়াতে হবে। সে যে কোথায় লুকিয়ে আছে কেউ তা জানে না। আমাদের উচিৎ, আবার তার দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা।"

—"কিসের জন্যে অপেক্ষা করব? বিশ্বজয়ের সময় এসেছে, এখন আর অপেক্ষা নয়। তাঁবু ওঠাও! যাত্রা কর!"

বেজে উঠল তূরী ভোঁ ভোঁ ভোঁ, দামামা ডিমি-ডিমি-ডিমি! উড়ল নিশান, ছুটল অশ্বারোহী, কাঁপল পৃথিবীর প্রাণ! কাতারে কাতারে তাতারের দল চলল এক বিস্ময়কর কীর্ত্তি স্থাপন করতে।

বুদ্ধিমান আমীর ওমরাওরা সভয়ে ভাবলেন, তাঁরা আজ যাত্রা করেছেন বিরাট এক শ্মশানের দিকে—যেখানে বাস করে কেবল মৃত্যু, মড়ক ও দুর্ভিক্ষ!

তাঁদের ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত নয়। তৈমুরের কয়েক শতাব্দী পরে এই ভয়াবহ পথে পা বাড়িয়ে নেপোলিয়ন বিজয়ী হয়েও তাঁর বিরাট বাহিনীকে রেখে গিয়েছিলেন রুসিয়ার তুষার সমাধির মধ্যে!

পিটার দি গ্রেট রুসিয়ারই সম্রাট। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে এই পথে তুর্কীদের বিরুদ্ধে তিনি মস্ত একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাদের একজনও ফিরে আসে নি।

তারও এক শতাব্দী পরে আর একদল রুসীয় সৈন্য কাউণ্ট পেরোভ্স্কির অধীনে এই পথে যাত্রা করে। বিনা যুদ্ধেই অধিকাংশ সৈন্য হারিয়ে সেবারেও কাউণ্টকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়।

আর আজও বিজ্ঞানের এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যুগে রুসিয়ার তুষার-মরুর মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানদের কি হাহাকার করতে হচ্ছে, আমাদের কারুর তা শুনতে বাকি নেই।

সুতরাং আমীর-ওমরাওরা অকারণে ভয় পান নি।

কিন্তু তৈমুর ফিরলেন না। তাঁর তিনটি মূলমন্ত্র ছিল। প্রথমঃ নিজের রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ করব না। দ্বিতীয়ঃ আত্মরক্ষা নয়, আক্রমণ করব। তৃতীয়ঃ যত শীঘ্র সম্ভব, শত্রুর উপরে গিয়ে পড়ব।

তৈমুর বলতেন, "যথাস্থানে যথাসময়ে দশ হাজার লোক না পেলে দশজন লোক নিয়েও হাজির হওয়া ভালো। শত্রুরা পূর্ণশক্তি সঞ্চয় করবার আগেই তাদের আক্রমণ করা উচিত।"

তৈমুরের আগে আলেকজাণ্ডার ও তৈমুরের পরে নেপোলিয়নও এই যুদ্ধরীতির অনুসরণ করেছিলেন।

তোক্তামিস যুদ্ধ করবেন নিজের দেশে। তাঁকে রসদের জন্যে ভাবতে হবে না এবং তাঁর সৈন্য তৈমুরের তুলনায় অসংখ্য। কিন্তু তবু তৈমুর ভয় পেলেন না— ছুটে চল্লেন ঝড়ের মত। তৈমুর অগ্রসর হন, তোক্তামিস যুদ্ধ করেন না, খালি পিছিয়ে যান। এবং পিছিয়ে যেতে যেতে সমস্ত গ্রাম, সহর, খাদ্য, শস্য পুড়িয়ে দিয়ে যান। অর্থাৎ নেপোলিয়নের সময়ে এবং আজ জার্ম্মান আক্রমণের দিনে রুসীয়রা যে প্রথা অবলম্বন করেছে এবং এখন পৃথিবীর সমস্ত সামরিক জাতিই যে প্রথার উপকারিতা বুঝতে পেরেছে, তার প্রথম সৃষ্টি হয় সেই তৈমুরের যুগেই, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে।

দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা! চলেছে তাতার সৈন্যশ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে চলেছে এমন সব প্রকাণ্ড শকট, যাদের এক-একখানা চাকাই হচ্ছে মানুষের মাথার সমান উঁচু! এই সব গাড়ীর ভিতরে আছে আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষ এবং খাদ্যদ্রব্য—ময়দা, বার্লি ও শুক্নো ফলমূল প্রভৃতি। প্রত্যেক সৈন্যের সঙ্গে আছে দু'টো করে ঘোড়া। প্রত্যেক সৈনিকই অশ্বারোহী।

রীতিমত মরুভূমি—বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, ঝড়ো হাওয়া সেই মরু-সাগরে সৃষ্টি করে বালুকার তরঙ্গ! বেজে ওঠে সাত ফুট লম্বা তাতার তূরী, তারই সঙ্কেত-ধ্বনি শুনে সৈন্যেরা তাঁবু ফেলে বা তাঁবু তোলে।

মরু-বালুকার পর এল বৃক্ষহীন তৃণপ্রান্তরের দেশ। এ প্রান্তর যেন অনন্ত—কোথাও ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, লোকালয় নেই—এমন কি শত্রুও নেই!

মাঝে মাঝে শত্রুর চিহ্ন দেখা যায়। উট, ঘোড়া বা মানুষের পায়ের দাগ, নির্ব্বাপিত আগুনের চিহ্ন বা মানুষের মাংসহীন কঙ্কাল।



প্রত্যেক সৈনিকের জন্যে বরাদ্দ ছিল মাসে ষোল সের ময়দা। কিন্তু অবশেষে ময়দা ফুরিয়ে গেল। ঘোড়াদের ঘাসের অভাব হ'ল না বটে, কিন্তু মানুষেরা মূল কুড়িয়ে বা পাখীর ডিম সংগ্রহ ক'রে কোনরকমে বেঁচে রইল মাত্র।

আমীর-ওমরাওরা মাথা নেড়ে বিষণ্ণভাবে বলতে লাগলেন, "এ আমরা আগেই জানতুম! এখন আর ফিরে যাবারও উপায় নেই—এইবারে সবাইকে অনাহারে মরতে হবে।"

তৈমুরের মুখে কিন্তু চিন্তার রেখা নেই। তিনি দেখলেন, এই মালভূমিতে গাছপালা নেই বটে, কিন্তু পাঁচ-ছয়-সাত ফুট উঁচু এক জাতের তৃণ আছে।

তখনি তাঁর হুকুমে এক লক্ষ সৈন্য ত্রিশ মাইল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে বিপুল এক মণ্ডলের সৃষ্টি করলে এবং ক্রমেই এগিয়ে এসে তারা মণ্ডলের আকার ছোট ক'রে আনতে লাগল। তখন এক লক্ষ লোকের গগনভেদী চীৎকারে তূরী-ভেরী-দামামার ধ্বনিতে ভয় পেয়ে সেই সুদীর্ঘ তৃণদলের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল পালে পালে খরগোস, মৃগ, বরাহ, নেকড়ে, ভাল্লুক ও 'এল্ক' বা মহিষের মতন বড় বড় হরিণ! ক্ষুধার্ত্ত তাতারদের সেই সাংঘাতিক মণ্ডলের মধ্য থেকে একটিমাত্র খরগোসও বাইরে পালাতে পারলে না!

খাদ্যের দুর্ভাবনা দূর হ'ল তৈমুরের অদ্ভুত বুদ্ধিবলে। মাংস ভালো ভাবে রক্ষা করতে পারলে এখন বেশ কিছুকাল আহার্য্যের অভাব হবে না। শত্রুরা তাদের অনাহারে মারতে চায়, কিন্তু তৈমুরের প্রতিভা ব্যর্থ ক'রে দিলে তাদের সেই চেষ্টা!

তৈমুর বললেন, "সৈন্যগণ, আজ তোমাদের ছুটি! খাও-দাও, আমোদ কর!"

সারি সারি তাঁবু পড়ল। বহুদিন পরে সৈনিকরা পেট ভ'রে খেয়ে হাসিখুসি নাচগানে মেতে উঠল।

পরদিনেই আবার ছয় ফুট বড় ডঙ্কা গম্ভীর স্বরে বেজে উঠে সকলকে জানিয়ে দিলে—'আর বিশ্রাম নয়—যাত্রা কর, যাত্রা কর!'

এইবারে সামনে আছে আর এক ভয়ানক দেশ, লোকে যার নাম রেখেছে 'ছায়াচরের মুল্লুক!'

ক্রমশঃ

# এও কি ভগবানের চাবুক!

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু

এও কি ভগবানের চাবুক!

আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে—এই বালুকাস্তূপের উপর কত মৃতদেহ ভেসে আট্‌কেছে—তার ইয়ত্তা নাই। হয়ত কোন মুমূর্ষু শুধু একটুখানি আশ্রয়ের জন্য এখানে পড়ে থাকতে চেয়েছিল, হয়ত কোন মা তার শিশু পুত্রটিকে শুধু এর উপর রাখতে চেয়েছিল, নিষ্ঠুর কাল এসে তাদের নিয়ে গেছে ভাসিয়ে টান্‌তে টান্‌তে। ঐ যে দূরে বাদাম বন, ঐখানে, ঠিক ঐখানে হয়তো কত অসহায় নরনারী তাদের জীবন তুচ্ছ ক'রে তাদের বুকের মানিককে

আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। পিঠের উপর বৃষ্টির চাবুক পড়ছে, পেটে নাই অন্ন, পরনে নাই বসন, সমস্ত লাজ-লজ্জা-ক্ষুধা বিসর্জ্জন দিয়ে তারা শুধু একটু আশ্রয় চেয়েছিল—কিন্তু আশ্রয় কি তারা পেয়েছে? যে গাছকে তারা আশ্রয় মনে ক'রেছিল সেই গাছই সাক্ষাৎ যমের দণ্ডের মত হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে তাদের চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

আমি বর্ত্তমান কাঁথি সহরের নিকটবর্ত্তী একটী বালু আড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছি। এখানে নাই কোলাহল, পূর্ব্বে যে কোলাহল, কত কবির কল্পনাস্রোত ছিন্ন করেছে, কত মামলাবাজের আহার জুটিয়েছে এখানে এখন শুধু দেখা যায় ধু ধু বালিকারাশি।

যে সৌন্দর্য্য বঙ্কিমচন্দ্রকে বলতে বাধ্য করেছে—"আহা কি দেখিলাম, জীবনে এ দৃশ্য ভুলিবনা—"এখন তা দেখলে ভয়ে সেখান হ'তে পালিয়ে আসতে ইচ্ছে ক'রে মনে হয় সর্ব্বদা—ঐখানে কোন ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস লুকিয়ে আছে—আর সকলের মত তোমাকেও ধরে রক্ত চুষে খাবে!—কাউকে সে ছাড়বেনা!

এখানে এখন সে সব বাড়ী নাই, যেখানে স্বাস্থ্যান্বেষী সুখী, বিলাসী ভদ্রলোকগণ তাঁদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে বাস কর্ত্তেন; তাঁদের চলা পথ একেবারে মুছে গেছে—মাঠ বাঁধ সমুদ্র ঘর বাড়ী একাকার হ'য়ে গেছে।

এখন এখানে ভোর হ'তে আর কোলাহল মুখরিত পল্লীর ছবি দেখতে পাবেনা, শত শত নর নারীর চপল পদক্ষেপ আর পড়ে না—মনে হয় যেন কর্ম্মব্যস্ত জগৎ হ'তে এ স্থান একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

যে ধান গাছ এখানকার অধিবাসীদের বুকের মানিক ছিল, যা'র স্বর্ণোজ্জ্বল ছবি ভোর হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখে দেখে বিগত তিন বছরের দুঃখের কথা তারা ভুলতে পারত—আর মাত্র একটি মাস পরে তারা ধান কেটে তাদের খাজনা দিত, আবশ্যকীয় জিনিষ কিন্‌ত—এখন সে ধান গাছ আর নাই—সব এখন শূন্য, কোথায় যে সমূল উড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই। আজ চারিদিকে শুধু জলাভূমি আর জলাভূমি।

কৃষাণ আর কখনো এখানে ধান কাটতে আস্‌বেনা, কৃষাণ বধু আর কখনো দুগাছি চুড়ীর জন্য স্বামীর কাছে আবদার কর্ব্বেনা, ছোট্ট ছেলেটি আর কখনো তা'দের সাধের সহর হ'তে খেলনা কিনে আনতে বলবেনা—এখন সেখানে কিছুই নাই।

কালকে একটা বালু আড়ায় ওঠবার সময় একগাছি চুল দেখে এসে বড় দুঃখ হচ্ছে! আহা! কার সে ননীর পুতলি ওখানে, এই শীতে শুয়ে রয়েছে রে! সে কি উঠবেনা—আর কি কখনো ডাকবে না 'মা' বাবা' বলে!

সকালে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রং বেরংয়ের জামা কাপড় প'রে প্রতিমা দেখতে বেরিয়েছে; হঠাৎ ঈষৎ বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠল বাতাস, এ রকম বাতাস বা মেঘলা দিন তাদের গা সহা হ'য়ে আছে, বাড়ীতে বাড়ীতে নানা রকম গল্প চলছে, কারুর বাড়ীতে হয়ত বা হচ্ছে কমিক গান—

"এ বারের পূজা, মা দশভূজা, বড় দুর্গতিময়,
আকাশ ঘিরেছে ঘন মেঘে যেন আশ্বিন মাস নয়।"

—চাষের কাজ শেষ করে চাষীরা বসে বসে খোস গল্প কচ্ছে—বাড়ীতে রান্না প্রায় শেষ, এমন সময় শোনা যায়—"সমুদ্র ফেঁপে উঠেছে, পালা, পালা!"

—"কি ব্যাপার কি?"

উত্তর দেবার সময় নেই কারুর, সব ছুটে চল্‌ল—স্ত্রীপুত্রপরিবারকে নিয়ে, কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা। দেবতার করাল-কবলের কাছে ঐ পলায়ন নৈরাশ্যজনক, যারা পারলো তারা কোন মতে নিকটবর্ত্তী



গাছের উপর উঠে পড়্‌ল, তাড়াহুড়ার কোন গাছ হয়ত বা মড়মড় ক'রে ভেঙ্গে পড়্‌ল, কিন্তু মাত্র ১০১৫ মিনিট পরেই সেই ২২।২৩ ফিট উঁচু পর্ব্বত সমান ঢেউ এসে তাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কে জানে! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিকে শুধু জল আর জল! যারা ছোট গাছে উঠে বসে ছিল—তা'রা স্রোতের সে প্রবল টানে অর্দ্ধ মৃত হয়ে কোথায় প্রবল ধাক্কা খেয়ে একেবারে ইহলীলা সংবরণ কর্ল। গরু মহিষ বিড়াল, কুকুর—তারা আর কতক্ষণ মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ কর্ব্বে! এইরূপে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সারা জলাভূমি মৃতদেহে পূর্ণ হয়ে গেল, জীবন সংগ্রামে হতভাগ্যদের মধ্যে যারা জয়ী হয়েছে তারা উলঙ্গ, অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় হয়ত কোথাও কাঁটা গাছের উপর, নর্দ্দামায় আট্‌কে, পুলের ধারে পড়ে রইল। গা হাত ছিঁড়ে গেছে, কারুর বা মাথা ফেটে রক্ত পড়্‌ছে—কেউ বাক্‌শক্তি-হীন!

পরদিন প্রভাতে। বাপ ডাক্‌ছে নাম ধরে ছেলেদের-যারা হয়ত চিরদিনের মত বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে, স্ত্রী স্বামীকে খুঁজছে—ভাই ভগ্নিকে ডাক্‌ছে! সে কাতর চীৎকারে সারা জলাভূমি যেন প্রতিধ্বনি করছে, নাই, নাই! তারপর—

তারপর কাঁথি সহরে অবস্থিত সৈন্যেরা প্রত্যেক সক্ষম লোক খুঁজে সেই গলিত মৃতদেহ বালুকা স্তূপের ভিতরে প্রোথিত কর্ব্বার জন্য গর্ত্ত-খুঁড়াতে লাগল। প্রায় দেড় সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিন ভাগ শব সৎকার করা হোল। এখনও বাকী শব গুলি এখানে সেখানে জলাভূমির মাঝে, বালুয়াড়ীর উপরে শেয়াল কুকুরের ভক্ষ্যরূপে বিরাজ করছে, সমস্ত যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। যারা মরেছে—তারা কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে মরেনি, স্বাধীনতার জন্য মরেনি, তারা শুধু দু'টী খেয়ে কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে প্রাণ হারিয়াছে—তারা প্রাণ হারিয়েছে—নিজের স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নীকে রক্ষা করবার জন্য।

এই বিরাট মহাশ্মশানে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সূর্য্য কিরণ দান কচ্ছে, আকাশ চন্দ্রাতপের মত ঘিরে রয়েছে। প্রতি পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্র কিরণ সমস্ত বালুকা রাশিকে এক উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত করে ফেলে—কিন্তু যারা সে সৌন্দর্য্য, সে অপূর্ব্ব আলোক রাশি, অপূর্ব্ব দৃশ্য, উপভোগ করে জীবন ধন্য করত—তা'রা কেবল নাই!

তাই আজ মনে মনে একান্ত নির্জ্জনে বসে ভাবি—কি মহা পাপ এই ৭৫ হাজার গবাদি পশু করেছিল, কি মহা পাপ করেছিল ঐ অসহায় শিশুগুলি যারা এইরূপে একান্ত অসহায়ভাবে প্রাণ হারিয়েছে—কি মহা পাপ করেছিল এই মহকুমার হাজার অধিবাসী...যারা এই প্রলয়লীলায় প্রাণ দিয়েছে!

—এও কি ভগবানের চাবুক?

চোখে জল এসে যায়।

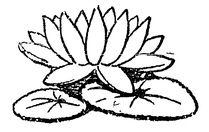

# চলতিকা

গত ২২শে অগ্রহায়ণ স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬৮ বৎসর বয়স হয়েছিল। তাঁর জীবন ছিল কর্ম্মময়। ১৯২৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের তিনি বিচারপতি হ'ন। কয়েকবার তিনি প্রধান বিচারপতির কাজও সুদক্ষভাবে করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে তাঁকে স্যার উপাধি ভূষিত করা হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি বড়লাটের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের আইন-সভ্য ছিলেন। এরপর তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দান করেন ও পরে সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। স্যার মন্মথ শুধু গুণী পণ্ডিত মানুষ ছিলেন না, তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহারে ও সৌজন্যে তিনি সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল বিরাট এবং বাংলার তিনি একজন অতি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। নির্ভীক সত্যান্বেষী, পরদুঃখকাতর ও দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি। সমস্ত ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশ তাঁর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়েছে।

মেদিনীপুর সাইক্লোন ও বন্যার কয়েকদিন পরই আবার ১৪ই ও ১৬ই নভেম্বর মাসে উড়িষ্যায় গঞ্জাম জেলার বহরমপুর চাত্রাপুর, গোপালপুর ও আশেপাশের দেশগুলি আর এক ঘূর্ণিবাবুর নির্ম্মাণ প্রকোপে মৃত্যুময় হয়ে উঠেছে। ঘরবাড়ী পড়ে গিয়েছে, বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং গরুবাছুর ধ্বংস হয়েছে। প্রকাশ, ৬৭১ লোক উড়িষ্যার এই সাইক্লোনে মারা পড়েছে। এই সাইক্লোন ও প্রবল বৃষ্টির ফলে চিল্কা হ্রদ ফুলে ওঠে ও তার জলরাশি নিকটের সমস্ত গ্রামগুলি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ক্ষতির সমূহ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয়নি।

কয়েকদিন আগে কলিকাতায় মহাবোধি সভাগৃহে ৺শ্রীযোগেশচন্দ্র বসুর (রেডিয়োর গল্পদাদু) নবম স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভার উদ্বোধন করেন রংমশালের পরিচালক অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন এবং সভাপতিত্ব করেন শিশু সাহিত্য সম্রাট শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। এই সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক, শিশু সাহিত্য লেখকগণ ও গল্পদাদুর কিশোর ভক্তরা যোগ দিয়েছিল। গল্পদাদু বেতারের মারফৎ শিশুদের পরম বন্ধু ছিলেন। তাদের কচি বুকের মনি কোঠায় তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন। আর সত্যই তিনি ছিলেন, "রসলোকের স্রষ্টা, যে রসের পরিকল্পনায় শিশু সাহিত্যের উপাদান পাওয়া যায়।" আজ তিনি, "স্বরজাদুর অমর গল্পদাদু।" আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর মধুকণ্ঠ ছোটদের বুকে অমর হয়ে আছে।

রাশিয়ার ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চল থেকে জার্ম্মাণ সৈন্য দিনের পর দিন অনবরত তাড়া খাচ্ছে। ভল্গা ও ডননদীর মধ্যভাগে রুশ সৈন্যদের আক্রমণ কঠোর হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও জার্ম্মাণরাও তীব্র পাল্টা আক্রমণ করছে। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল ঘটছে এখন রাশিয়ার স্বপক্ষে। হাজার হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য, যুদ্ধের উপকরণ ধ্বংস হচ্ছে। ষ্টালিনগ্রাদের মধ্যে রুশসৈন্য শত্রুদের ঘিরে ফেলেছে। রোষ্টোভের দিকে রুশসৈন্য ক্রমশঃই এগিয়ে চলেছে। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে অভ্যস্ত রুশসৈন্য অনভ্যস্ত জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করে তুলছে। এই শীতের কয়েকমাসেই রুশ সৈন্য জার্ম্মাণ সৈন্যকে যদি তাদের দেশের মাটিতেই নির্ম্মূল করতে পারে তাহলে রাশিয়ার জয় নিশ্চিন্ত।

৬ই ডিসেম্বরের সমর বিভাগের ইস্তাহারে এক সংবাদে প্রকাশ যে ৫ই ডিসেম্বর বিকেলে কয়েকটি জাপানী বোমারু বিমান যুদ্ধ বিমানের সহযোগে চট্টগ্রাম এলাকার উপর বোমাবর্ষণ করে। আর্ এ এফ্ বিমান তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে, ও পরে শত্রুবিমানদের বিতাড়িত করে। একটি শত্রু বিমান ধ্বংস হয়। সমস্ত ঘটনার বিবরণ এখনও



পাওয়া যায়নি। তবে প্রকাশ, সামান্য ক্ষতি হয়েছে। ১১ই ডিসেম্বরের আর এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে ১০ই ডিসেম্বর বিকেলে জাপানীরা চট্টগ্রাম এলাকার ওপর পুনরায় বোমাবর্ষণ করে। আর্ এ এফ্ হ্যারিকেন ও শত্রুবিমানের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ হয়। ফলে তিনটি শত্রু বিমান ও দুইটি আর্ এ এফ্ বিমান ভূপাতিত হয়। এই নিয়ে চট্টগ্রামের ওপর কয়েকবার বোমাবর্ষণ হ'ল। কিন্তু চট্টগ্রামের বাসিন্দারা ভয়ে কাবু হয়ে পড়েনি, তারা এই বিপদের মাঝেও অবিচলিত থেকে নিজেদের কাজকর্ম্ম সুস্থিরভাবে করে যাচ্ছে।

সখের জিনিষ নয়, লোকের নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্র ও খাওয়াপরা আজ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া বন্ধ, কালি কলম কাগজ আজ দুষ্প্রাপ্য। গরীবের পরবার মোটা কাপড় নেই, খদ্দরও পাওয়া যাচ্ছে না। এই শীতের সময় অনেকের গায়ের কাপড় নেই। তারপর লোকে যে পেটভরে দুমুঠো ভাত খাবে তাও হবার জো নেই। চালের দর আজ অগ্নিমূল্য, আটা, চিনি, ও কয়লাও তাই। এর কোনও সুব্যবস্থাই আজও আমরা দেখতে পেলাম না। জিনিষ আছে অথচ দেশে দুর্ভিক্ষ, কখনও বোধহয় এমন হয়নি। এর ফলে, না খেতে পেয়েই লোকের একদিন মারা পড়বে।

জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী স্যার মির্জ্জা ইস্মাইল ভারতবর্ষে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়—পাটনা, ঢাকা ও এলাহাবাদে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্ত্তন উৎসবে অভিভাষণ দিয়েছেন। এই অভিভাষণগুলি মন দিয়ে সকলেরই পড়া উচিৎ। তিনি কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বলেছেন, 'এক জাতীয়তার ধর্ম্ম, শক্তি ও গৌরব আমাদের অর্জ্জন করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা যে জাতি ও যে সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্তই হই না কেন, এদেশ আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ও মিলন সাধনে উৎসাহ দেওয়া সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই কর্ত্তব্য।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্ত্তন সভায় স্যার নির্জ্জা ইস্মাইল বলেছেন, "ভারতের ভাগ্য একতার উপর নির্ভর করছে। ভৌগোলিক অবস্থান, কাল, সাধারণ বিপদ ও সাধারণ স্বার্থ ঐক্যবন্ধনের চেষ্টাই করছে।" আজকে এই জাতীয় দুর্গতির দিনে, এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে, এই যুদ্ধের মরণোৎসবে, মানব স্বাধীনতার আহ্বানে, আমাদের একতা লাভের অগ্নিপরীক্ষা চলছে। একতার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারবো—এই বাণীই স্যার মির্জ্জা ইস্মাইলের অভিভাষণের সারমর্ম্ম।

---

## ❀আশ্বিন মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল❀

প্রথম পুরস্কার—শ্রীহরিভূষণ মৈত্র (গ্রাঃ নং ১৫৩৫)

এক-রঙা লাইন-ছবি। ছবিটির নাম—ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি।

এই ছবিটি ভবিষ্যতে রংমশালে ছাপা হবে।

**প্রশংসা যোগ্য ঃ** ছবি ও ফটোগ্রাফ

সুনীলকুমার মণ্ডল (গ্রাঃ নং ১৮৬৯)
রথীন্দ্রনাথ মজুমদার (গ্রাঃ নং ১৫২৫)
সাধনা বিশ্বাস (গ্রাঃ নং ১৬৬২)

ফটো — শ্যামগোবিন্দ মজুমদার (গ্রাঃ নং ৫৭৭)
ফটো — বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ নং ১২৮৭)
ফ — সুব্রত সিংহ (গ্রাং নং ১৩৯৩)
ফ — লালমোহন ভট্টাচার্য্য (গ্রাঃ নং ১৫৮৬)

ফটোগ্রাফ ও ডিজাইন কোনটিই পুরস্কারযোগ্য হয় নি বলে আমরা দুঃখিত।

**আমার ভাইবোনেরা—**

অত্যন্ত দুঃসময়ে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। জীবনের যেদিকেই দৃষ্টি দাও না কেন শুধু দুর্য্যোগের ঘন আঁধার।

এ দুর্য্যোগের শেষ কবে, কোথায়, জানি না। কিন্তু এই আশা রাখি মনে, এই বিশ্বাস রাখি অন্তরে—এ দুর্য্যোগ কেটে যাবে, নতুন ক'রে জাগবে সূর্য্য। এই নব জাগরণের প্রারম্ভে দুর্য্যোগের ঘনঘটা যে দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

দেশ ও জাতির এই দুঃসহ দিনে কি তোমাদের কাজ? কোন পথটা তোমাদের পথ?—এই কর্ত্তব্য কাজের কথা ভেবে, এই যোগ্য পথের সন্ধান-রত মন তোমাদের আকুল হয়ে উঠেছে, তোমাদের অন্তরের আকুলতা, তোমাদের কিশোর মনের সমস্যা তীব্রভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তোমাদের চিঠি-পত্রের আখরে আখরে। প্রতিটি আখরের মাঝে অনুভব করেছি দেখতে পেয়েছি তোমাদের প্রাণের স্পন্দন, শুনতে পেয়েছি তোমাদের অন্তরের আকুল প্রার্থনা। তাই আমাদের জাতীয় জীবনের এই দিনে কেবল একটি প্রার্থনাই বারবার আমার অন্তর থেকে ধ্বনিত হয়—তোমরা যোগ্য হও, বলদীপ্ত হও। গ্রহণ করার শক্তি অর্জন করো। আমরা যা কামনা করি, যে জীবনের স্বপ্ন আমরা দেখেছি—সে কামনা, সে জীবন তোমরা মূর্ত করে তুলবে তোমাদের সাধনায়, ত্যাগে, তেজে, আন্তরিকতায় ও আত্মদানে।

দেশ ও জাতিকে স্বাধীন জাতি বলে জগত সভায় উপস্থাপিত করার সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হও তোমরা। এই দুঃসাধ্য গুরু কর্ত্তব্য ভার বহন করার যোগ্য তোমরা হও, এই গুরু-কর্ত্তব্য সাধনের প্রস্তুতি কর তোমাদের মাঝে আজ থেকে সুরু হোক—তৈরী হও তোমরা। নিজেদের যোগ্য ক'রে তোলো সবদিক থেকে।

বর্ত্তমানে এছাড়া আর কি তোমাদের বলব? এবার এসো তোমাদের চিঠি-পত্রের জবাব দি—

**দিলীপকুমার কানুনগো, চট্টগ্রাম।** চিঠি পেয়েছি ভাই। প্রশ্নগুলির আর একবার লিখে পাঠাও। প্রেমপ্রসাদ বসু চৌধুরীর সঙ্গে পত্র মৈত্রী পাতাতে চাও ভাল কথা, কিন্তু ওর গ্রাহক নম্বর আমায় আগে জানাতে হবে। তোমাদের সব রচনা আমি সম্পাদক মশাইয়ের দপ্তরে পাঠিয়ে দিই সে সব রচনাগুলের বিচার করার ভার তাঁদের। রংমশালের জন্য তোমাদের সকলের উদ্বেগ দেখে এই আশা হয় যে তোমাদের সকলের সহানুভূতি আর সহযোগিতায় রংমশালের আলো নিভবে না। তোমার প্রার্থনার সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ আছে জেনো।

**রবীন্দ্রনাথ হাজরা, নিউদিল্লী।** চিঠি পেলুম। এবার জবাব পেলে তো। কিন্তু দুঃখিত হয়েছি—নিজের মাতৃভাষায় লিখতেও তোমার ভুল হয়। এটা কিন্তু ঠিক নয়। বাংলা দেশ থেকে দূরে আছ বলেই কি বাংলা ভুল শিখবে? ইংরেজ কি চীনা, কি ফরাসী, কেউ কি বিদেশে এলে তাদের মাতৃভাষা ভুলে যায়? আমি চাই তোমরা সবাই "সম্পূর্ণ" বাংলায় চিঠি, মায় নাম ঠিকানা তারিখ পর্য্যন্ত, লিখবে—এটা আমি তোমাদের সকলকেই বলছি। বাংলা ভাষায় চিঠি লিখতে বসে কেন আমরা বিদেশী ভাষার আশ্রয় নেবো? কেন একখানা চিঠি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় লিখতে পারব না।



রংমশাল বৈঠকের লেখা ভালো ও ছোটদের উপযোগী হওয়া চাই। সুন্দর ও সহজ করে লেখা প্রবন্ধ চাই।

**সাধনচন্দ্র বসু, কালীঘাট।** তোমার প্রশ্নের উত্তর পত্র লেখার প্রারম্ভে আমার লেখায় পাবে। তোমার কবিতাটি ভারী সুন্দর হয়েছে। সম্পাদক মশাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে লেখার সঙ্গে ডাক টিকিট পাঠাতে ভুলো না, শুধু তোমাকে নয়, সবাইকে বলছি। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁদের তাঁর রেকর্ডের গান ভালো লাগে না। "আজি হতে শত বর্ষ পরে" টীও খুব সুন্দর।

**প্রবোধচন্দ্র বসু, কাঁথি।** তোমার চিঠিখানা পেলুম। সেবার ভার নিজেরাই ঘাড়ে তুলে নিয়েছ এর চেয়ে আশ্বাসের কথা আর কিছু নেই। সারা ভারতবর্ষ, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার এই কল্পনাতীত দুঃখে দুঃখিত। সারা ভারত এসেছে বাংলার সেবায়। রংমশাল সম্বন্ধে তোমার প্রস্তাব—"বার্ষিক মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হোক, বা ছোট ছোট হরফে বই ছাপা হোক, বা বইয়ের সাইজ ছোট করা হোক"—মনে রইল ভবিষ্যতের জন্যে। তোমাদের সকলের শুধু-ইচ্ছায় রংমশালের সঙ্কটকাল এবারকার মত কেটে গেছে, উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ পাওয়া গেছে। তোমার কাঁথির করুণ-চিত্রটি এবার রংমশালে ছাপা হ'ল।

**বেলারাণী গাঙ্গুলী, হবিগঞ্জ।** ভারী আনন্দ হলো তুমি আর তোমার দিদি মেদিনীপুরের সাহায্যের জন্য ২৲ দান করেছ। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা হলেও অন্তর যে তোমাদের বড়, দেশের দুঃখে দৈন্যে তোমাদেরও যেমন মন কাঁদে তাই তোমাদের ক্ষুদ্র দানের মধ্যে প্রকাশ পায়। যারা দুঃখে অভাবে পড়েছে তারা অন্ততঃ জানতে পারুক তাদের এই দুঃসময়ে বাংলার রংমশালধারীরা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বন্ধুর সাহায্য নিয়ে।

**মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত, ঢাকা।** রংমশাল বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের জীবনে রংয়ের মশাল জ্বেলেছে। সে-মশাল কি সহজে নেভে ভাই! টাকা দিয়েও কাগজ পাবার যো নেই এমনি অবস্থা হয়েছে। কাগজ সঙ্কট, সেইজন্যই তো নানা গণ্ডগোল। তবে চৈত্র মাস অবধি এখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। জ্যৈষ্ঠ মাসের কাগজ পাও নি? পরিচালক মশাইকে পত্র যোগে জানাও। দেরী করো না। কেমন?

**দেবকুমার চৌধুরী, কলিকাতা।** আঁকা বাঁকা হাতের লেখায় স্নেহসম্পদ পেলুম অনেক। পূজার ফুল পাঠিয়েছ? তোমরাই তো দেবতার প্রসাদী ফুল তাই তোমাদের সকলকে এত ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। প্রার্থনা করি সে-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তোমাদের আর অন্তর স্পর্শ করুক।

**সাধনা ও রেণু বিশ্বাস, চট্টগ্রাম।** মেদিনীপুর সাহায্য-ভাণ্ডার পৃথক ভাবে রংমশালে করা সম্ভব নয়, অনেকগুলি সাহায্য ভাণ্ডার হ'য়েছে, তাদের কর্ম্মকর্ত্তাদের কাজ কর্ম্ম বেশ সুন্দর ভাবে চলেছে। তোমাদের জমান টাকা টাকা এমনি সাহায্য ভাণ্ডারের যে কোন একটিতে পাঠিয়ে দাও। দেরীতে পত্রিকা পেয়েছ? কিন্তু উপায় কি বলো? তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি এটুকু বলতে পারি চিঠির উত্তর দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। উত্তর দেবার মত থাকলে উত্তর দেওয়া হয়। তোমাদের আমি তাচ্ছিল্য করি একথা ভাবতে পারো?

**গণেশ**—চিঠি পেলুম। গ্রাহক নম্বর ও পুরো নাম ঠিকানা দাও না কেন? এবার থেকে এই রকম চিঠির উত্তর আমি দেবো না ঠিক করেছি। একই কথা তোমাদের কেন বার বার বলতে হয়—চিঠি লেখার নিয়ম গুলো মেনে চলা উচিত। আশা করি এর পর থেকে এ নিয়মগুলো তুমি মেনে চলবে। চারজন গ্রাহক নতুন করলে একজনকে ফ্রী করে নেওয়া হয়। এই চার জন গ্রাহকের চাঁদা একত্রে যিনি পাঠাবেন তাঁকে বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে ফ্রী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

**অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, নদীয়া।** প্রকাণ্ড চিঠি। কিন্তু অনেকবার করে পড়েছি। রংমশাল যে তোমাদের কত প্রিয় তা তোমার চিঠিখানাই সাক্ষ্য দেয়। তোমার প্রস্তাব দেখে ভাবা যাবে। তবে একথা সদাসর্ব্বদা মনে রেখো, এ আলো যাতে স্থায়ীভাবে তোমাদের মাঝে রঙের আলো বিস্তার করতে পারে সেদিকে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা আছে। তোমার প্রস্তাব—' আমার যতগুলি ভাইবোন রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকা আজ সকলেই যদি' ১৲ টাকা করে [ যারা না পারবে ॥০ ] দেয় তাহলে যে টাকা উঠ্‌বে সেই টাকা কাগজ কেনার জন্যে থাক্। তারপর বৈশাখমাস থেকে রংমশালের বার্ষিক ৩৲ টাকার জায়গায় ৪৲ টাকা করা হোক, একসঙ্গে যারা ৪৲ টাকা দিতে পারবে না, তারা প্রতি তিনমাসে ১৲ টাকা করে ৪ বারে ৪৲ টাকা করে দেবে।" প্রস্তাব উত্তম। তবে বর্ত্তমানে তা কাজে পরিণত করা সম্ভব নয় আর তা ঠিক হবে না। তাছাড়া চৈত্রমাস অবধি রংমশালের কাগজ সংগ্রহ হয়েছে। অবশ্য তোমার প্রস্তাব তোমাদের ভাইবোনেদের কাছে পেস করলুম, দেখি তারা এবিষয়ে কি বলে? তোমার প্রকাণ্ড চিঠির প্রকাণ্ড উত্তর দিলুম। খুসী হলে তো?

**অধীর রঞ্জন দাস, বরিশাল।** চিঠি পেলুম। বিজয়ার প্রণাম বড় দেরী যে? স্থানাভাব বড় বেশী তাই ওটা উপস্থিত বন্ধ আছে। জায়গা পেলেই যাবে। বলো তো আমি আমার জায়গাটুকু ছেড়ে দিই? তোমার প্রশ্ন—প্রশ্ন বিভাগে দিলুম। না, ওটা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন। সম্পাদকের কাছে তোমার লেখা পৌঁছে দিয়েছি।

**সুশান্ত, পাটনা।** এই তোমার প্রথম চিঠি বুঝি? এতদিন লুকিয়েছিলে যে? ভারী অন্যায়। হ্যাঁ 'পাটলীপুত্রে' গেলে তোমাদের ওখানে যাবো। কিন্তু হাজারো দিকে আমার নিমন্ত্রণ যে, পথে গ্রামে নগরে তোমরা বিছিয়ে রেখেছ আমার জন্য প্রীতির আহ্বান, তোমাদের মত ভাইবোন পেয়ে আমি গর্ব্বিত। বাংলা ও বাঙালীর গর্ব্ব তোমরা হয়ে ওঠো, এ প্রার্থনা আমার সকল সময় তোমাদের সকলের জন্য। আমার আশীষ তোমরা সবাই নিও। ইতি—

দিদিভাই

## জীবন স্রোত

তরুণ রায়

দূর বহুদূর হতে,
কত নদী আঁকা বাঁকা স্রোতে
খুঁজিয়া ফিরিয়া আসে স্রোত হীন সাগরের মাঝে।
গভীর মন্দ্রে বাজে,
সেথা আসি কণ্ঠে মেলে একতার গান
নিমেষে বিলীন হয় অতীতের মান অভিমান।
ছোট বড় সব নদী আসি এই সাগরের কোলে
আপনার পরিচয় দেয় "নদী" বলে।
ছোট বড় ভুলে যায় সাগরের বিপুলতা মাঝে
কণ্ঠে সেই একতার গান শুধু বাজে।

মানব জীবন,
যোজন ভাসি আসে পথ তার দুর্গম নির্জন
জাতি ভেদ, অর্থ ভেদ, বর্ণ ভেদ মাণি
বহিছে সে আপনারে শ্রেষ্ঠ জাতি গণি
কিন্তু সে মৃত্যু পরে আসে একদিন
অতীতের ভেদাভেদ হয়ে যায় লীন,
সকলেরে ভাই বলি টানি লয় সেথা
এ বিধাতার চির, পুরাতন প্রথা।

Death the Stream কবিতার অনুবাদ

## কবি ও কাগজ

অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কাগজের দেখা মেলে নাকো আর কবিতা লেখাই দায়
কলম তুলিয়া সকল কবিরা করিতেছে হায় হায়।
কবির মগজে কবিতার দল মিছেই কাঁদিয়া মরে,
কাগজ বিহীনে তাদের মরণ ঘণায়ে আসিছে যে রে!
দিকে দিকে শুধু ধ্বংসই চলে—মৃত্যুর সমারোহ,
কবির প্রাণেতে প্রতিধ্বনি তার ধ্বনিতেছে অহরহ,
সে ধ্বনিকে কবি বাণী দিতে চায়—দিতে চায় তারে ভাষা
লেখনী তাহার উপবাসী থাকে, পূর্ণ হয় না আশা।
সভ্য মানুষ মানুষ মারিবে আপনার পাতা কলে
কবি কি গো তাই দেখিবারে পারে কিছুটি না কথা বলে?
যুদ্ধের কাজে কাগজ লাগিবে কবিদের তরে নাহি,
কেহ নাই হেথা বুঝিবে যে ব্যথা কবিদের মুখ চাহি।
বোমায় কবির মৃত্যু হয় নি—হবে নাক' কোন কালে
কবিরা সকলে আপনি মরিবে, কাগজ নাহিক পেলে।

# প্রার্থনা

## সাকিনা সুলতানা

পাড়াগাঁ। বাড়ীর দাওয়ায় বসে অমল অস্তমিত সূর্য্যের দিকে চেয়ে রয়েছে। সামনের বড় বড় আম গাছগুলোর মধ্য দিয়ে সূর্য্যের স্তিমিত আলো তাদের বাড়ীর দাওয়া উজ্জ্বল করে রেখেছে। সেই আলোছায়ার দর্শক হিসাবেই সে যেন বসে রয়েছে।

"বাবু"—এক বৃদ্ধ ফকিরের ডাকে অমলের চমক ভাঙ্গে। ফকিরের পরিধানে একটি শতছিন্ন কাপড়। শীর্ণ মুখের উপর দারিদ্র্যের কঠোর ছাপ ফুটে উঠেছে। উদাস ভাবে অমল তার মুখের দিকে তাকায়।

"সারাদিন খেতে পাইনি বাবু। কাল ট্রেণ থেকে নেমেছি। এখনও এক মুঠো জোটেনি। পা খোঁড়া, হাঁটতেও পারি না। দূরে একটা মোছলমানদের গাঁ আছে। যেতে পারলে একমুঠো খেতে পেতাম। আপনি আমায় সাহায্য করুণ বাবু। বড় দুঃখী আমি। আল্লা, আপনাদের মঙ্গল করবেন।" বৃদ্ধের কণ্ঠে কাতরতা ফুটে উঠল।

"তুমি দাঁড়াও আমি আস্‌ছি।" বলে অমল বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। মাকে সে সব কথা জানাল। মা বল্‌লেন, ওসব ভিখারীদের ছল বাবা, ওদের কথায় কানও তুল্‌তে আছে? তার উপরে আবার মুসলমান। হয়তো শুনবি ও একটা ডাকাত। কিছু দিতে হবে না। হাঁ, তুই আর যাসনে হয়তো শাপমন্নি দেবে।

অমল মার কাছে থেকে চলে এলো। কিন্তু তার মন বুঝ্‌তে চাইলে না সে ফকিরের মুখে যে দারিদ্র্যের কঠোর ছাপ রয়েছে তা তার অভিনয় মাত্র। নিজের কোটের মধ্যে সে হাত দিল। জলখাবারের দুআনা পয়সা তার মধ্যে রয়েছে। আস্তে আস্তে সেটা বার করে নিল। একবার যেন তার মন বলে উঠল, "দিস্‌না, দিস্‌না ও সব ভিক্ষুকের ছল, ও মুসলমান, ও তোর শত্রু। তুই ওকে পয়সা দিস না।" অমল পয়সাটা আবার কোটের মধ্যে রেখে দিল। নিজের মনেই সে ভাব্‌ল "আমার মন এতই দুর্ব্বল। দুআনা পয়সার এত মায়া। কাল স্কুলের টিফিনে নাই বা খেলাম। এই পয়সায় একজন লোক তো দুদিন খেতে পারবে।" এবার পয়সাটা সে দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধর্‌ল। "হাঁ হাঁ আমি এমনই এটা দেবো।" আবার তার মন বলে উঠল, "দিস্‌না ওকে তুই দিস্‌না, ঐ পয়সায় হিন্দু ভিখারী খেতে পারত। ও মুসলমান, ও ডাকাত, ও হিন্দু বিদ্বেষী।" পয়সাটা সে আবার রেখে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফকিরের মুখের দারিদ্র্যের কঠোর ছাপ তার সামনে ভেসে উঠল। "না না সে দেবেই।" দু' আনাটা হাতে নিয়ে সে ফকিরের সামনে এসে দাঁড়াল। ফকির শীর্ণ হাত খানা অমলের দিকে বাড়িয়ে দিল। আনন্দে ভিক্ষুকের চোখদুটো চক্ চক্ করে উঠল। যেন সে কল্পনাও করতে পারেনি যে দু'আনা পয়সা তাকে কেউ দিতে পারে।

"আল্লা, আপনার মঙ্গল করুন। আল্লা আপনাকে সুখী করুন। আল্লা আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।" বৃদ্ধের গলা আনন্দে কাঁপতে লাগল।

অমল বৃদ্ধকে বল্‌লে, "ফকির তুমি এই প্রার্থনা কর, হিন্দু মুসলমান এক হউক। হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হউক।"

"আল্লা, হিন্দু মুসলমানকে এক করো, ভাই-ভাই করো।" ফকির আকাশের দিকে মুখ করে আল্লার উদ্দেশ্যে তার করুণ প্রার্থনা জানিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

সূর্য্য তখন গ্রামখানির প্রতি তার শেষ আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

---

# মুতনা ধাঁধা

( শ্রীমতী নন্দিতার সৌজন্যে )

**আজব সমীকরণ অঙ্ক**

নদী থেকে সমুদ্র বাদ দিয়ে চন্দ্রযোগে শিবের নেত্রগুণে যা হয় আর বস্তু থেকে বাণবাদে বেদযোগে শিবের নেত্রগুণেও ঠিক তাই হয়।—কি করে হয় বলতো?

শুধু নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশিত হবে। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫শে পৌষ।

**অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর**

তুপুমণি আমার—আমাদের খোকাবাবুর চোখ ফুলেছে কারণ তার মামা রাগিয়েছেন তাকে। মামার বাড়ী কিছুতেই সেজন্য তাকে পাঠান যাচ্ছে না। ওদের যে কুকুর ছানা হয়নি, তাই আমি কি তাহলে নিয়ে যাবো? ভুলো বেরালের চোখ বেঁধেছে আর তার কি কান্না কাটি বেঁধেছে! সেজন্য কাকা কিন্তু ভুলোর কান মলে দেন নি। ভাই তুপু জোরসে ছড়া মুখস্থ করবে তো? ইতি—দিদু।

**নির্ভুল উত্তরদাতা—যুথিকা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।**

যাদের একটি বা দু'টি ভুল হয়েছে—

সত্যব্রত ঘোষ, কলিকাতা; সাধনা ও রেণু বিশ্বাস, চট্টগ্রাম; মিনতি চ্যাটার্জ্জি, কলিকাতা; সুহাস দাস, বিমল ও পরিমল রায়, রমানাথপুর; শান্তিময় ও রমানন্দ মুখোপাধ্যায়, ফায়জাবাদ; দেবকুমার চৌধুরী, কলিকাতা।

---

# বিবৃতি

বাজারে কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে এই খবর পেয়ে তোমরা অনেকেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আমাদের চিঠি লিখেছো। রংমশালকে যে তোমরা কি রকম ভালোবাসো তোমাদের চিঠিগুলি তারই পরিচয়। এমন কি কেউ-কেউ তোমরা জানতে চেয়েছো যে অতিরিক্ত চাঁদা দিলে আমাদের কাগজ কেনবার সুবিধা হয় কিনা এবং সে জন্য তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে এমন কথাও জানিয়েছো।

তোমাদের এই স্নেহ ও প্রীতিভরা অন্তরের পরিচয় পেয়ে আমরা সত্যিই নিজেদের ধন্য মনে করেছি। এবং সেই জন্যই তোমাদের তাড়াতাড়ি জানাচ্ছি যে **এ বৎসরের মত আমাদের যা কাগজ দরকার তা আমরা উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি।** অবশ্য যথেষ্ট চড়া দামে কিনতে হয়েছে। কিন্তু এ ভরসা তোমাদের এখন দিতে পারি যে রংমশাল তোমাদের হাতে নিয়মিত পৌছবে, কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

অবশ্য ভবিষ্যতে কি হবে কেউ বলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই উচিত শান্তভাবে নিজেদের কাজ করে যাওয়া। রংমশালের কাজও চলবে, আশা করি রংমশালের প্রতি তোমাদের প্রীতি অটুট থাকবে। যদি অবস্থা বিপর্য্যয়ের জন্য রংমশালকে অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখতে হয়, আশা করি তাতে আমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার কোনো বিচ্যুতি হবে না; কারণ আমাদের সম্পর্ক যে কেবল ব্যবসায়ের বা ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক তা তোমরাও মনে করো না, আমরাও না। তোমাদের সকলের কুশল প্রার্থনা করি।

ইতি, তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ
খগেন্দ্রনাথ সেন ( পরিচালক )

কথাসাহিত্য সম্রাট

পৃথিবীর মেঘলোক নিখিল-ক্লাসিক বঙ্গোপন্যাস ( ঠাকুরদাদার ঝুলি ) দুই টাকা

# দক্ষিণারঞ্জন

পৃথিবীর সবুজ সাথী চিরতরুণ কথা সবুজ লেখা ( শোভন চিত্রে ) দেড় টাকা

—পৃথিবীর চিরসুন্দর বই—

# ঠাকুরমার ঝুলি

## বাংলার রূপকথা

—উষারাগের মত উজ্জ্বল নতুন রাজসংস্করণ ১৸০—

নির্ভরযোগ্য

হারমোনিয়ম

কিনিতে হইলে

ডোয়ার্কিনের কিনিবেন

হারমোনিনা মডেল ডবল প্যারিস রীড ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ ২ বৎসরের গ্যারাণ্টি দ্বারা সুরক্ষিত বাক্সসহ ৪০৲ টাকা।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

DWARKIN & SON LTD.

11, Esplanade, Calcutta.

উপহার দেবার মত বই

# দুই খুণী

জীবজন্তুর ঘর-সংসার সুখ-দুঃখের কথা

দাম—মাত্র বারো আনা

রংমশাল কার্য্যালয়

৯১।১১-এ, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।

বড় বড় পুস্তকের দোকানে পাইবেন।




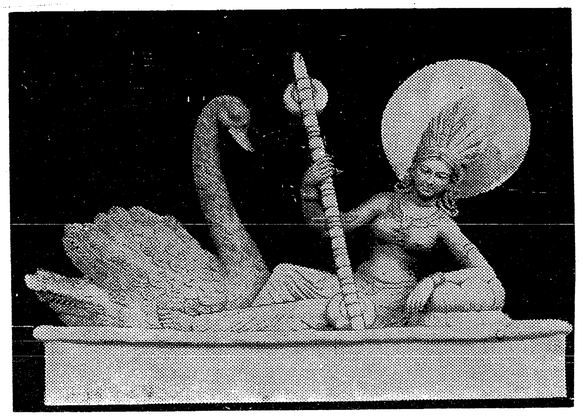

বীণাপাণি